নবজীবন

৩য় ভাগ

শ্রাবণ ১২৯৩

কলিকাতা

নবজীবন

৩য় ভাগ } শ্রাবণ ১২৯৩। { ১ম সংখ্যা।

সে কালের দারোগার কাহিনী

১—ভূমিকা।

লোকে বলে যে "ঘড়িকে ঘোড়া ছুটে"। সত্য সত্যই গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাহাই বঙ্গদেশের অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মে বিশ্বাস, বাণিজ্য, বিদ্যা-শিক্ষা, পূর্ত্ত-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, গৃহাদি নির্ম্মাণের প্রকরণ প্রভৃতি সমস্তই প্রলোড়িত হইয়াছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় "পরিবর্ত্তন" তাহার শত হস্ত বিস্তার করিয়া "স্থায়িত্বকে" বিনাশ করত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভেদ করিতেছে। বাষ্পীয় রথ, বাষ্পীয় জলযান, বিদ্যুৎসার, "দূর" শব্দকে লোপ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি সাধন ও ভ্রমণের কষ্ট ও বিঘ্ন বিনাশ করিয়াছে; পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রচারে জনসমূহের জ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়াছে, উন্নত শাসন প্রণালী ব্যবহারে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ফলে আমাদের জন্মভূমি ক্রমশ কিন্তু দ্রুতবেগে সমগ্ররূপে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব পঞ্চাশ বৎসরের সময়ের অবস্থার বর্ণনা শুনিলে, তাহা অবিশ্বাস-যোগ্য অত্যুক্তি বলিয়া লোকের বিবেচনা করা বড় বিচিত্র হইবে না। কত বিষয়ে এক্ষণ আমাদের সুবিধা হইয়াছে, কত নূতন দ্রব্য আমাদের সুলভ প্রাপ্য হইয়াছে,—তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। দুইটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। পূর্ব্বে বাড়ীর বিধবাদিগের কোন্ দিবস একাদশীর উপবাস হইবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত গ্রামান্তরে টোলের ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের নিকট

গমন না করিলে উপায় ছিল না। কিন্তু এইক্ষণ চারি পয়সার এক খানা বট তলার ছাপার পঞ্জিকা গৃহে রাখিলে বালক বালিকারাও তাহা বলিতে পারে। রাত্রিকালে টিকা কিম্বা প্রদীপ জালিবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ যাবৎ ঠক্ ঠক্ করিয়া শোলায় চকমকি ঠুকিতে হয় না, এক পয়সার এক বাক্স বিলাতি দিয়া-শলাই কিনিয়া রাখিলেই এক মাসের অভাব পুরণ হয়। এই প্রকার শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে, কিন্তু তাহা করিয়া এই প্রবন্ধের কায়া বৃদ্ধি করার আবশ্যক নাই। যে বিষয় বর্ণনা করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই আমার প্রস্তাবের প্রচুর পোষকতা হইবে।

তবে, আর এক কথা এই যে আমাদের দেশে ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভাব আছে। পূর্ব্বকালের কথা দূরে যাউক আমাদের মধ্যে জীবিত বৃদ্ধ লোকের প্রথম কিম্বা মধ্য বয়সে দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, ভবিষ্যতে তাহারও ঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া দুর্ল্লভ হইবে। ইংরাজের অধীনে দেশীয় কত শত বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় বিভাগে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন কিন্তু কেহই বঙ্গভাষায় তাঁহার বহুদর্শিতার ফল লিপি বদ্ধ করা আবশ্যক কিম্বা আহ্লাদের কার্য্য বিবেচনা করেন নাই। আজ কাল কত জন কত রূপক, কত নাটক, কত কবিতা লিখিতেছেন; কিন্তু কেহই দেশের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত সমস্ত আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে বিবৃত করিতে লেখনী ধারণ করেন নাই। অনেকে অনেক বিষয় লেখা অযোগ্য বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন, কিন্তু যিনি ভাবীকালে বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন যে অনেক তুচ্ছ সংবাদ অভাবে সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে। এই বিবেচনায় কেবল বর্ত্তমান পাঠকগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভবিষ্যত ইতিহাস লেখকদিগের সাহায্যের উদ্দেশে, এই দেশের দস্যুদিগের কীর্ত্তি কলাপের এবং সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব পুলিসের কার্য্যপ্রণালীর যত দূর পারি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমি যে কালের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই সময়ে বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলাতে ডাকাইতির প্রাদুর্ভাব ছিল এবং যদিও ইংরাজ শাসনের প্রথমাবস্থায় রঘুনাথ, বৈদ্যনাথ কিম্বা বিশ্বনাথ প্রভৃতি দস্যুগণ যেরূপ অকুতোভয়ে গৃহস্বামিকে পূর্ব্বে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকাইতি করিত, এই সময়ে সেই প্রথার অনেক লাঘব হইয়াছিল, তথাপি ডাকাইতি ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত

ছিল এবং কখন কখনও অতি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস ঘটনা সহকারে তাহা নির্ব্বাহিত হইত। চৌর্য্য ভয়ে ধন প্রবাদ—ছিল বিষম প্রমাদ। সমস্ত জীবনে বহু কষ্টে যে ধন উপার্জ্জিত হইত তাহা এক রাত্রিতে অপহৃত হইত, কিন্তু কেবল ধন লইয়া টানা টানি হইত, এমন নহে, কর্ত্তার এবং পুরৌজন সকলেরই প্রাণ-বিনাশের আশঙ্কা ছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া হাড়ভাঙ্গা মুষ্ট্যাঘাত এবং পদাঘাত করিয়া যদি দুরাত্মারা ক্ষান্ত থাকিত তাহা হইলেও যাহা হউক, কিন্তু অল্পধনে যেমন তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইত না, তেমন গৃহবাসীদিগকে অল্প প্রহার করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হইত না। আকাঙ্ক্ষা পুরিয়া ধন না পাইলে অস্ত্রাঘাত এবং মশাল দিয়া শরীর দগ্ধ করাও তাহাদের অসাধারণ প্রথা ছিল না, এবং এইরূপ গুরুতর এবং নিষ্ঠুর প্রহারের ফল যে কি হইত তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। নিষ্ঠুরাচরণ সম্বন্ধে ডাকাইতরা বালক বৃদ্ধ বনিতার বিচার করিত না। অন্তঃকরণে দয়ার কবাট দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া তাহারা ডাকাইতি করিতে যাত্রা করিত। তাহাদের ভয়ে স্ত্রীলোক নাসিকায় নত এবং কর্ণে ঝুমকা কিম্বা অন্য প্রকার অলঙ্কার পরিয়া রাত্রিতে শয়ন করিত না; কারণ ডাকাইতের হস্তে ধরা পড়িলে দুরাত্মারা তাহাদিগকে অলঙ্কার খুলিবার অবকাশ না দিয়া, সজোরে টানিয়া মাংস ছেদন করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। আমি এইরূপ ছিন্ন-নাসিকা-কর্ণ-বিশিষ্ট দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি। আমার সহিত তাহাদের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাহারা উভয়েই বৃদ্ধা ছিলেন, শুনিলাম যে তাহাদের যৌবন কালে এই ঘটনা হইয়াছিল।

ডাকাইতি যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল, তাহা তোমাদের এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হওয়া কঠিন। ডাকাইত পড়িয়াছে শুনিলে আক্রান্ত গৃহের লোকের ত কথাই নাই, গ্রামস্থ সর্ব্বলোকের বর্ণনাতিরিক্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইত। বিত্তশালী যাবতীয় মনুষ্য পরিবারদিগকে সঙ্গে করিয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করত বনের মধ্যে এবং দুর্গম স্থানে যাইয়া লুকাইত। "যাউক ধন, থাকুক প্রাণ" এই নীতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে প্রাণ রক্ষা পায়, কেবল তাহারই চেষ্টা করিত। ধন কিম্বা গৃহের দ্রব্য সমস্তের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি করিত না। আমি শুনিয়াছি, যে এক গ্রামে এক বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া পৌষ মাসের রাত্রিতে রব উঠিলে পর, প্রতিবাসী আর এক জন ধনী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার স্ত্রী যুবতী কন্যা ও একটী শিশু বালককে

কোলে লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করত গ্রামের প্রান্তে একটা শৈবালপূর্ণ পুষ্করণীর জলে প্রবেশ করিল এবং যে পর্য্যন্ত গ্রাম নীরব না হইল, সে পর্য্যন্ত তাহারা সকলে গলা জলে কেবল মাথা জাগাইয়া দুরন্ত শীত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিল।

কেবল গ্রামবাসীদিগের ভীরুস্বভাব বশত ডাকাইতরা অনায়াসে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত। যে যে স্থানে গ্রামের লোকেরা একত্রিত হইয়া দস্যুদিগকে প্রতিরোধ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইত, সেই সেই স্থানে অধিবাসীরা জয়লাভ করিত। চোর ও সাধুতে অনেক প্রভেদ। চোরের চিরস্বভাব এই যে তাহারা দুর্ব্বলীর যম, বলীর গোলাম। অতএব সাধুরা অল্পমাত্র সাহস দেখাইতে পারিলেই চোরে পলাইতে পথ পায় না। ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উলা গ্রাম।

বঙ্গদেশে উলার নাম কে না জানেন এবং উলার বারোয়ারি পূজার কথা কে না শুনিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম স্থিত, এবং কৃষ্ণনগর জেলার নিজ কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও রাণাঘাটের ন্যায় উলাও একটি বৃহৎ জনপদ। ইহাতে বহুসংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণের বাস এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধনী এবং সম্পত্তিশালী। বিশেষত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের ঘর, দেওয়ান মুখোপাধ্যায়দিগের এবং মুস্তৌফিদিগের ঘর, খুব প্রসিদ্ধ। বামন দাস বাবু বড় জমিদার, দেওয়ান মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরাও বিত্তশালী; বিশেষত ইহারা বড় বলবান এবং ব্যায়াম বিদ্যায় নিপুণ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে খ্যাতনামা বলবান রাধা গোয়ালা, দেওয়ান মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের অন্ন খাইয়া এবং তাঁহাদিগের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া মানুষ হইয়াছিল। মুস্তৌফি মহাশয়েরা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ মধ্যে মিত্র বংশোদ্ভব এবং অত্যন্ত মানী এবং সম্পত্তিশালী; এবং ঐ শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে কুলীনও ছিলেন কিন্তু প্রবাদ আছে যে তাঁহারা কোন সময়ে মাধব বসু নামক একজন কায়স্থ কুলের ঘটকের মাথা মুণ্ডন করিয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই আক্রোশে ঘটক মহাশয় প্রতিশোধ লইবার মানসে কুলজী পুঁথিতে নিম্ন কবিতা ছন্দ লিখিয়া তাঁহাদের কুলে খোঁটা দিয়াছেন—

মুড়ালে মাথা উঠিবে চুল।
তবু না হ'বে মুস্তৌফির কুল॥

আমি দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ নহি, অতএব ঠিক বলিতে পারিনা যে মুস্তৌফি মহাশয়েরা এখনও কুলীন বলিয়া পরিগণিত কি না। যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনি লিখিলাম।

উলা একটি বিলক্ষণ গণ্ডগ্রাম এবং ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে পরিপূর্ণ। মহামারীর পূর্ব্বে আমি একদিন অধিক রাত্রিতে কাঁটা-আড়ির ঘাট হইতে বামনদাস বাবুর বাড়ী যাইতে পথিমধ্যে বহুলোক দেখিয়াছিলাম এবং রাস্তায় উভয় পার্শ্বস্থিত বাড়ীতে গীত বাদ্য শুনিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কয়েক বৎসর পরে দিবসে সেই পথ দিয়া যাইতে—হায়! কি শোচনীয় দৃশ্য দেখিলাম! পথে লোক নাই, গৃহ সমস্ত জন শূন্য, রবের মধ্যে কেবল এক স্থানে এক দল শৃগালের চীৎকার শুনিলাম।

বামনদাস বাবুর এক পূর্ব্বপুরুষের সময় তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইতি হইয়াছিল। ডাকাইত কে তাহা শুনিয়াও পাঠকের বিস্ময় জন্মিবে। সে ভদ্রবংশোদ্ভব এবং কৃষ্ণনগর জেলার একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর পুত্র। বালককাল হইতে কুসংসর্গ দোষে কুক্রিয়া সমস্তে রত হইয়া বন্ধু বান্ধব ও বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করত ডাকাইতের দল ভুক্ত হইয়া ডাকাইতের একজন সর্দ্দার হইয়াছিল। এই ব্যক্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে বহু অস্ত্রধারী দস্যু সমভিব্যাহারে ডাকাইতি করিতে প্রবিষ্ট হইল। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পরে উঠানে একখানা চৌকী আনাইয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইল এবং বাড়ীর কর্ত্তাকে ডাকিয়া তাঁহার সমুদয় নগদ টাকা প্রদান করিতে আজ্ঞা করিল। কর্ত্তা চতুরতার সহিত দোতালার শিঁড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া এক তোড়া টাকা লইয়া বারেন্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেইস্থান হইতে এক মুষ্টি এক মুষ্টি করিয়া উঠানে তাহা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গন শান বাঁধান ছিল, অতএব উচ্চ হইতে নিক্ষিপ্ত মুদ্রা সকল উঠানের চতুর্দ্দিকে ছত্রাকার হইয়া পতিত হওয়াতে ডাকাইতেরা এক একটি করিয়া তাহা তুলিয়া লইতে বাধ্য হইল। কর্ত্তা বুঝিয়াছিলেন যে এই প্রণালীর কার্য্যে ডাকাইতদিগের অনেক সময় ক্ষয় হইবে এবং যত বিলম্ব হয়, ততই ডাকাতদিগের অমঙ্গল ঘটিবে। ইত্যবসরে গ্রামের লোকেরা যোটবদ্ধ হইয়া ক্রমশ আক্রান্ত বাড়ীর চতুর্দ্দিকে জমা হইতে লাগিল। দশ পাঁচ জন লোক নহে বহু অস্ত্রধারী মনুষ্য ডাকাইতদিগের চক্ষে পড়িল। বাহির বাটির পাইক এইরূপ বিভ্রাট দেখিয়া সর্দ্দার বাবুকে জ্ঞাপন করিল।

সে তাহাদের সকলকে বাড়ীর ভিতর আসিতে আদেশ করিল। গ্রামস্থ লোকেরা সদর দরজায় এবং গৃহ হইতে বহির্গমনের সমস্ত পথে খড় ও শুষ্ক বাঁশ প্রভৃতি জ্বালনীয় দ্রব্যাদি একত্র করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া ডাকাইতদিগের পলায়নের পথ অবরুদ্ধ করিয়া প্রত্যেক স্থানে অনেক লোক পাহারা দিতে এবং দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। দস্যুরা অপ্রতিভ হইয়া সমস্ত রাত্রি সেই প্রাঙ্গণে কাল যাপন করিল এবং সম্পূর্ণ অনুপায় দেখিয়া প্রাতে আক্রমণকারীদিগের হস্তে ধরা দিয়া অবশেষে কৃষ্ণনগর প্রেরিত হইল। এই অবধি উলা বীরনগর আখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মুস্তৌফি মহাশয়দিগের বাড়ীতেও এক অসাধারণ ঘটনা হয়। আশাশুনী নামক শান্তিপুরের এক ব্যক্তি সিন্ধ চোরের রাজা হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ব্যাটার দৌরাত্মে কাল্না, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, রাণাঘাট এবং উলা প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীরা শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আশাশুনী কিন্তু সিন্ধ চুরি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার চৌর্য্য-বৃত্তিতে ব্রত হইত না; এবং সিন্ধ চুরিতে তাহার অসাধারণ প্রাধর্য্য ছিল। লোকের মনে এমন এক সংস্কার ছিল যে আশাশুনী কি এক মোহিনী-মন্ত্র জানিত এবং সে তদ্দ্বারা জাগ্রত ব্যক্তিকেও অজ্ঞান করিয়া ঘরের দ্রব্যাদি অপহরণ করিত, তাহার কোন ব্যাঘাত হইত না; ফলেও সে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত। ধনী মনুষ্য ভিন্ন ডাকাইতের ভয় করে না, কিন্তু সকল অবস্থার লোকই আশাশুনীর ভয় করিত। বর্ণিত সময়ে সকল বিত্তশালী ব্যক্তির গৃহে বিত্ত অনুযায়ী এক কি ততোধিক প্রহরী রাখার প্রথা ছিল এবং মুস্তৌফি মহাশয়দিগের বাড়ীতেও কয়েকজন দেশী সর্দ্দার ছিল। আশাশুনীর আয়ুশেষ হইয়া আসিয়াছিল এবং সে কুক্ষণে এক রাত্রিতে চুরি করার মানসে তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ধরা পড়ে। ধৃত ব্যক্তি আশাশুনী বলিয়া ব্যক্ত হওয়াতে মুস্তৌফি মহাশয়েরা তাহাকে কৃষ্ণনগর চালান করার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বহুকালের প্রহরীরা তৎপ্রতি প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, তাহা "আমরা কখনও করিতে দিব না। এই ব্যাটার ভয়ে আমরা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি না, এবং সমস্ত দেশের লোক ইহার ভয়ে সশঙ্কিত। হাকিমের কাছে পাঠাইলে চারি কি পাঁচ বৎসর কারারুদ্ধ থাকিয়া আশাশুনী ফিরিয়া আসিবে এবং পুনরায় সকলকে জ্বালাতন করিবে, অতএব তাহাকে আমরা

বিশেষ শাস্তি দিব যে সে আর কখনও চুরি না করিতে পারে। আপনারা ঘরে যাউন আমরা যাহা জানি তাহা করিব।" এই বলিয়া আশাশুনীকে মণ্ডপ ঘরের সম্মুখস্থিত যূপ কাষ্ঠে ফেলিয়া সন্ধিপূজার ছাগলের ন্যায় প্রহরীরা তাহাকে বলী দিয়া সেই রাত্রিতেই তাহার দেহ জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিল। এখন অনেকে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতে পারেন কিন্তু ধীর ভাবে তৎসাময়িক দেশের অবস্থা সমালোচনা করিয়া দেখিলে, প্রহরীদিগের এই নৃসংশ কার্য্য নিতান্ত অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিবেন না। প্রহরীরা কেবল তাহাদের নিজ শত্রু দূর করিয়াছিল এমন নহে, সাধারণের শত্রুও বিনাশ করিয়াছিল। কথিত হইতে পারে যে প্রহরীরা যেন তাহাদের ইতরবুদ্ধি অনুযায়ী ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিল কিন্তু মুস্তোফি বাড়ীর কর্ত্তাদিগের তাহাতে সম্মতি প্রদান করা উচিত হয় নাই। তাহা সত্য বটে, কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে সেই শান্তি বিপ্লব সময়ে শান্তি রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রহরীর পরামর্শ তাচ্ছল্য করিতে পারেন নাই; এবং ইহাও নিতান্ত সম্ভব যে প্রহরীরা আশাশুনীকে বলী দিবে বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন নাই।

উপরের এই দুই ঘটনার কোন্ ঘটনা অগ্রে, কোন্ ঘটনা পরে হইয়াছিল, তাহা আমি অবগত নহি, কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানি, যে উভয় ঘটনাই দীর্ঘ কালের কথা।

ডাকাইতি হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত ধনীলোকে অধিক বেতন দিয়া, সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী খোট্টা এবং দেশীয় প্রহরী নিযুক্ত করিতেন,কিন্তু মধ্যে মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিরাই "ঘরের ঢেঁকি কুমীর" হইয়া অন্য ডাকাইতকে আহ্বান করিয়া মুনিবের গৃহ আক্রমণ করিতে দিত, এবং এই সকল ঘটনায় গৃহস্বামীর নিস্তার থাকিত না, কারণ ইহারা গৃহের সমস্ত ছিদ্র সন্ধান অবগত হইয়া অক্লেশে এবং সুন্দররূপে অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত।

উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ইষ্টকালয়ও ডাকাইতি নিবারণের আর এক উপায় ছিল। কাষ্ঠের কবাটে ঘন ঘন মোটা লৌহ পেরেক মারিয়া রাখার প্রথা ছিল, যে দস্যুরা কুঠারাঘাতে তাহা শীঘ্র ছেদন করিতে না পারে। ত্রিতলে উঠিবার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির মাথায় চাপা কবাট ফেলিয়া দৃঢ় কাষ্ঠের হুড়কা দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ রাখিলে নিম্ন হইতে উপরে যাওয়ার পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ থাকিত। এবং ছাদের উপরে ছোট বড় ঝামা ও ইট স্তূপ করিয়া রাখা

হইত, যে ডাকাইত পড়িলে ছাদের উপর হইতে তাহা নিক্ষেপ করিলে দস্যু-দিগকে দূরীকৃত করিবার এক সহজ এবং সুন্দর উপায় হইত। পল্লীগ্রামে বোধ হয় এখনও অনেক পুরাতন বাটীতে চাপা কবাট এবং লৌহাচ্ছাদিত কবাট দেখিতে পাওয়া যায়।

নীচ জাতীয় লোক দ্বারা ডাকাইতের দল গঠিত হয়। মুসলমান, বাগদি, কাওরা, চণ্ডাল, মুচি এবং গোয়ালারা সাধারণত এই অপকার্য্যে অধিক রত।

কৃষ্ণনগর জেলায় অধিকন্তু গোয়ালারাই ডাকাইতি করিত। এই জেলায় গোপ-জাতীয় বহুলোকের বাস; তন্মধ্যে "গড়ো গোয়ালারা" শরীরের গঠন, ও বল, ও সাহসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই নিমিত্ত "গোড়-গোয়ালা" উপমার বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিপুরের গড় হইতে এই বংশীয় গোয়ালারা "গোড়গোয়ালা" আখ্যাতি প্রাপ্ত হয়। বোধ হয় পূর্ব্ব কালে ঐ গড় রক্ষার্থে এক দল গোয়ালাকে তাহার মধ্যে বাস করিবার স্থান প্রদত্ত হইয়া ছিল, কাল সহকারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়াতে কৃষ্ণনগর জেলার নানাস্থানে তাহারা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এইক্ষণ ঐ প্রদেশের এমন গ্রাম নাই যাহাতে দুই চারি ঘর গোয়ালার বাস নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদের আকার প্রকৃতি সমান রহিয়াছে। দীর্ঘচ্ছন্দ, ক্ষীণকটি, প্রশস্ত-বক্ষ, শ্যামবর্ণ, ইহাই তাহাদের সাধারণ আকৃতি। ইহারা যেমন দ্রুতবেগে দৌড়িতে পারে, লাঠির ভর করিয়া লম্ফ দিতে পারে, এবং লাঠি খেলায় স্ফূর্ত্তি দেখায়, বাঙ্গালীর মধ্যে তেমন অন্য কোন জাতিই পারে না, এবং এই নিমিত্ত গোয়ালারা বিশেষত কৃষ্ণনগর জেলার গোয়া-লারা উৎকৃষ্ট লাঠিয়াল বলিয়া পরিগণিত। যেমন যশোহর জেলার মুসলমানেরা শড়কিওয়ালা বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেইরূপ কৃষ্ণনগর জেলার গোয়ালারা লাঠিয়াল বলিয়া আদরিত ছিল। জাতীয় ব্যবসায়ে গোয়ালা-দিগের অন্য জাতীয় পুরুষ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রম করিতে হয়। ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য অধিকাংশই স্ত্রীলোক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, পুরুষেরা কেবল এক গাছা পাচন (লাঠি) হস্তে করিয়া গরু কিম্বা মহিষের পাল লইয়া মাঠে মাঠে ভ্রমণ করে। সর্ব্বদা অনাবৃত নূতন নূতন স্থানে নির্ম্মল বায়ু সেবন করে, পশ্বাদির পশ্চাতে দৌড়ঝাঁপ করে এবং উদরপূর্ণ করিয়া দুগ্ধ পান করে; এমন কি পান্তাভাতের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খায়। ইহার সকল কার্য্যই স্বাস্থ্যকর এবং বল-প্রদায়ক, কাজেই লাঠিয়ালি করিতে

তাঁহাদের বিশিষ্ট উপযোগিতা হয়। ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন প্রচলনের পূর্ব্বে যখন জমিদার ও নীলকরদিগের সর্ব্বদা দাঙ্গা হাঙ্গামা করার রীতি ছিল, তখন এই সকল লোকের বিস্তর আদর ছিল, সুতরাং অনেকেই অধিক বেতন এবং লুটের লোভে এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত; এবং ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি অনুসারে এক কুবৃত্তি হইতে অব্যবহিত অধম কার্য্যে অধোগমন করা বড় বিচিত্র কিম্বা কঠিন ব্যাপার ছিল না। দিবসে লাঠিয়ালি, রাত্রিতে ডাকাইতি, উভয় কার্য্যই এই সকল ব্যক্তির নিকট আদরণীয় এবং অনায়াস-সাধ্য ছিল। বিশেষত আপদ বিপদে ইহারা জমিদার এবং নীলকরের নিকট বিস্তর সহায়তা পাইত। কোনও মোকদ্দমায় নামাঙ্কিত হইলে পুলিসের হস্তে রক্ষা করার নিমিত্ত তাঁহারা প্রথমে লাঠিয়ালদিগকে স্বীয় স্বীয় বাড়ীতে কিম্বা কুঠিতে আশ্রয় দিয়া গোপন করিয়া রাখিতেন, অবশেষে ধৃত হইলে আপন আপন উকীল মোক্তার দিয়া এবং আবশ্যক হইলে কর্ম্মচারীর দ্বারা সাফাই সাক্ষ্য দেওয়াইয়া, তাহাদিগকে আদালত হইতে খালাস করাইতে যত্ন করিতেন। এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া দুরাত্মারা ক্রমশ পাকা ডাকাইত হইয়া উঠিত এবং কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে পুলিসের হস্তে অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা, তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিয়া লইত, সুতরাং অনেক সময় ইহাদের চতুরতা নিবন্ধন পুলিসের চেষ্টা নিষ্ফল হইত, এবং দুষ্টেরা গায় ফুঁ দিয়া যাবজ্জীবন নিরাপদে বেড়াইয়া বেড়াইত।

কৃষ্ণনগর জেলার মধ্যে শান্তিপুর, কৃষ্ণপুর, মায়াকোল, বাহাদুরপুর, ধুবুলিয়া, মহারাজপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি গ্রামের গোয়ালারা শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল এবং সেই সময়ে মনোহর, মাণিক, নয়ান, গলাকাটা হরিশ প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত ডাকাইত ছিল।

কৃষ্ণনগর জেলার মধ্য দিয়া তিনটি সুন্দর নদী বহমান আছে। প্রথম পবিত্র ভাগীরথী, দ্বিতীয় জলঙ্গী অথবা খড়িয়া এবং তৃতীয় মাথাভাঙ্গা,—উহা কোনও স্থানে পাঙ্গাসিয়া নামে এবং হাঁসখালী ও রাণাঘাট অঞ্চলে চূর্ণী নদী বলিয়া অভিহিত। এই তিন নদী পদ্মা নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। এইক্ষণ পদ্মার দক্ষিণ কূলে চড়া পড়িয়া তিন নদীরই মোহনা বন্ধ হওয়াতে শুষ্ক কালে এই সকল নদীর মধ্য দিয়া নৌকা যাতায়াতের কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন মোহনা খোলা ছিল, এবং রেলের

রাস্তা এবং কলের জাহাজ না থাকাতে, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের সমুদয় পণ্য দ্রব্যাদি নৌকা যোগে এই তিন নদী দিয়া কলিকাতায় আসিত এবং তথা হইতে নানা স্থানে যাইত। বিশেষত পদ্মার এবং এই তিন নদীর উভয় তটে বহু হাট বাজার ও গঞ্জ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সকল স্থলে যাত্রী এবং নাবিকদিগের খাদ্য এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য অনায়াসে প্রাপ্ত পাওয়া যাইত, কাজেই লোকে সুন্দরবনের কষ্ট-জনক পথ উপেক্ষা করিয়া এই সকল পথ অবলম্বন করিত। সুতরাং ভাগীরথী ও খড়িয়া ও চূর্ণীর গর্ভ, সকল সময়ে সকল প্রকার নৌকায় পরিপূর্ণ থাকিত এবং তাহাতে দস্যুদিগেরও প্রলোভন জন্মিত। নির্জ্জন স্থানে এবং অসাবধান অবস্থায় পাইলে দস্যুরা নৌকা আক্রমণ করিতে এবং যাত্রীদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে ত্রুটি করিত না। এই জন্য কৃষ্ণনগর জেলায় যেমন ডাঙ্গাতে, সেইরূপ জলপথেও ডাকাইতির অভাব ছিল না। কিন্তু শেষোক্ত ঘটনা সকল সর্ব্বদা জেলার কর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর হইত না, কারণ বিদেশী যাত্রীরা কোথায় হাকিম, তাহার অনুসন্ধানে সময় নষ্ট করা এবং জানিতে পারিলেও নালিশ করা—কেবল পণ্ড শ্রম বিবেচনা করিয়া যত শীঘ্র পারে, স্বীয় স্বীয় বাঞ্ছিত স্থানে গমন করিত।

বৈধব্য-ব্রত।

যখন পুরুষদিগের পক্ষেই দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ ধর্ম্ম-ব্যাঘাতক, তখন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে, দ্বিতীয় পরিণয় অবিধেয়, সে কথা বলিবার অপেক্ষা করে না। যে যে কারণে পুরুষদিগের দ্বিতীয় বার বিবাহ অনুচিত, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সে সকল কথাই খাটে। তদ্ভিন্ন, স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয় পরিণয়ে কতকগুলি বিশেষ দোষ আছে। কিন্তু আমি ও সকল বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমি বলিয়াছি * যে, পুরুষেরও দ্বিতীয়বার বিবাহ করা অনুচিত।—আমি বলিয়াছি যে, গৃহশূন্য ব্যক্তি স্বদেশ-বৎসল রূপেই হউক, আর ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়াই হউক, তপশ্চরণ করিবেন। এখন দেশের এবং সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বিধবা কি করিবে, আর পরিবারের অপর সকল লোকেই বা বিধবার প্রতি কি ভাবে চলিবে, আমি সেই কথাই কিছু বলিব।

* এই প্রবন্ধ পারিবারিক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ।

বৈধব্য একটি মহৎ ব্রত। ব্রতটি পরার্থে আত্মোৎসর্গ। আত্মোৎসর্গ ব্রতের অনুষ্ঠান কিছু না কিছু সকলকেই করিতে হয়—কেহ জেনে শুনে করেন, কেহ না বুঝিয়া করেন,—কেহ অল্পমাত্রায় করেন, কেহ অধিক মাত্রায় করেন—কিন্তু সকলেই ইহা করিয়া থাকেন। তবে অন্যের পক্ষে এই ব্রতের শিক্ষা এবং ইহার পালন ধীরে ধীরে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য ইহার ক্লেশানুভব অল্প হয়—স্থল-বিশেষে কোন ক্লেশই হয় না। বিধবার পক্ষে এই ব্রতের ভার একেবারে চাপিয়া পড়ে, এইজন্য সে বিকল হইয়া যায়। এত বিকল হয় যে, সে যে একটি মহৎ ব্রতের ব্রতী হইল, তাহা বুঝিতেই পারে না—সে বুঝে "আমি জন্মের মত গেলুম।" বাস্তবিক সে নিজের পক্ষে জন্মের মতই যায়। সে একেবারেই উদাসীনী, সর্ব্বত্যাগিনী, ব্রহ্মচারিণী হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী, উদাসীন ব্যক্তিদিগের প্রতি মনুষ্য সাধারণের মনের ভাব কি হয়? সকল মনুষ্যই সংসার-বিরাগীদিগের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিধবাও তদ্রূপ ভক্তি এবং শ্রদ্ধার পাত্রী। তবে একটি কথা আছে। যাঁহারা জ্ঞানপথাবলম্বী হইয়া সংসারের প্রতি একান্ত তিতিক্ষা বশত সংসারত্যাগী হয়েন, তাঁহাদিগের মানসিক বল এবং দৃঢ়তার প্রতি যতটা ভক্তি হয়, যাঁহারা সাংসারিক দুঃখে পরিতপ্ত ও দৈব দুর্ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া, সংসার পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের প্রতি ততটা প্রগাঢ় এবং বিশুদ্ধ ভক্তি হয় না—তাঁহাদের প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহার সহিত অনেকটা দয়াও মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি জানি, ৬ কাশীধামে একটি অতি পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ আছেন, যিনি প্রথমে শুদ্ধ দৈব বিড়ম্বনা বশতই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশাতেই পুত্র কলত্র গতাসু হইয়াছিল। তিনি সেই দুঃখেই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে যোগাভ্যাস এবং অনন্যসাধারণ তপশ্চরণ দ্বারা সর্ব্বলোকের প্রতি, অগাধ প্রীতিসম্পন্ন, অতি সদালাপী, মধুরভাষী এবং পরোপকার পরায়ণ হইয়া সকলের প্রীতি, ভক্তি এবং বিশ্বাসভাজন হইয়া আছেন। ঐ মহাপুরুষই বিধবাদিগের আদর্শস্থলীয়। তাঁহার ন্যায় দৈববিড়ম্বনা নিবন্ধন সন্ন্যাসাশ্রমপ্রাপ্ত বিধবারও কর্ত্তব্য, আত্ম-দমন এবং পরোপকার-ব্রত পালনদ্বারা আপনাকে তেমনি শুচি, শান্ত এবং সুখী করিয়া তুলেন।

যে পরিবারে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, সে পরিবারস্থ কোন

সধবা স্ত্রীলোকেরা যেন ঐ সকল ব্রত অথবা তদনুরূপ অপরাপর ব্রত করিতে না পারেন, এবং তাঁহাদের ব্রতাদি উদ্‌যাপনে যেন স্বল্পতর ব্যয় এবং অনধিক আড়ম্বর হয়।

(৬) বিধবাকে কোন অনুজ্ঞা করিতে হইলে কর্ত্তা তাহা স্বয়ং করিবেন—স্ত্রী, কন্যা, কিম্বা পুত্রবধূ প্রভৃতি অপর কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা করিবেন না। কিন্তু অনুজ্ঞা যেন সত্য সত্যই কর্ত্তার নিজের হয়, নিজেই দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া যেন অনুজ্ঞা করেন—গৃহিণী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং স্বয়ং তাঁহারই মুখ-স্বরূপ না হয়েন। নিতান্ত স্ত্রৈণ কর্ত্তার দ্বারা বিধবার সুপালন প্রায়ই ভালরূপ হইয়া উঠে না।

উল্লিখিত নিয়মগুলি বুদ্ধিপূর্ব্বক পালিত হইলে, বাল-বিধবার যে কিরূপ ধর্ম্মোন্নতি সংসাধিত হয়, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিবেন। বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগসুখ পরিত্যাগ করে, গৃহকার্য্যে অতি নিপুণা হইয়া উঠে, অতিথি, অভ্যাগত, কুটুম্ব, সজ্জনদিগকে খাওয়াইতে ভাল বাসে, স্বয়ং সবল এবং সুস্থ শরীরী হয়, এবং ঈর্ষাদি দোষ-পরিশূন্য হইয়া সধবাদিগের প্রতি অনুগ্রহশালিনী এবং তাহাদিগের পুত্রগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহশীলা হয়। যে বাটীতে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে বাটীতে একটি জীবন্ত দেবীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান। যে পরিবারের মধ্যে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে পরিবারের স্ত্রী পুরুষেরা নিরন্তর ঋষি-চরিত্রের দ্রষ্টা এবং ফলভোক্তা। তাহারা "পরার্থজীবন" ব্যাপারটি কি, তাহা শুদ্ধ মুখে বলে না এবং পুস্তকে পড়ে না—উহার জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি স্ব-স্ব চক্ষে দেখিতে পায়।

যখন মদ্য-সেবী, মাংসাহারী ইউরোপীয়দিগের কন্যাগণও ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবে চিরকৌমার ব্রতের নিয়ম যথাযথ পালন করিতেছে, তখন অত্যুদার সংস্কৃত শাস্ত্রের সাহায্যে পবিত্র আর্য্যবংশোদ্ভবা বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য পালন না হইবার কথা—নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

কাব্য।

১

কবি (স্বগত)।

"ওই—নীল আকাশে, ভাসিয়া ভাসিয়া, যাইলে—কোথায় যাই!
আদি কিবা অন্ত, মিলিলে উহার, দেখি সে কেমন ঠাঁই!
উঠিতে উরধে মিলে যদি পথ, ছুটি তায় অবিরত!
দেখে আসি শূন্য, শিখরে কি ভাবে হইয়াছে পরিণত!
ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্র রবি শশী, ক্ষুদ্র সিন্ধু গিরি বন,
ক্ষুদ্র নদ হ্রদ ক্ষুদ্র বসবাস ক্ষুদ্র জীব জন্তুগণ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুকে ক্ষুদ্র আশা তৃষা, ক্ষুদ্র দান প্রতিদান,
হেরিয়া মেটে না মনের বাসনা সতত আকুল প্রাণ!
সাধ যায় তাই ভাসিয়া ভাসিয়া অকূলে কোথাও যাই!
কেবলি অকূল কেবলি অনন্ত যেখানে দেখিতে পাই!"

২

ঊর্দ্ধদৃষ্টে পতি গবাক্ষে বসিয়া আকাশে ভাসিতে চায়,
চীর বাসখানি শীর্ণ অঙ্গে ঢাকা গৃহিণী সুধায় তায়;—
"কি ছাই ভাবিছ উঠ, শুন, বলি, একবার হাটে যাও,
কণ্ঠ-হার ছড়া বেচিয়া কাহাকে দেখ যদি কিছু পাও।
ক্ষুধায় কাতর কাঁদিছে সন্তান কি যে হ'বে নাহি জানি।
আহা উপবাসে শুকায়ে গিয়াছে তোমারো যে মুখখানি।"
"উঠ উঠ" বলি ধরি দুই কর প্রিয়া ডাকে ঘন ঘন।
নাহি সংজ্ঞা তবু ভরিয়া গিয়াছে আকাশে পতির মন।
পাশেতে তনয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাতরে আহার চায়!
জনক তাহার ভাবিছে গগণে কেমনে ভাসিয়া যায়।

৩

কবি (স্বগত)।

"যেখানে দাঁড়ায়ে খুলিলে নয়ন নিরখিব একাকার,—
রবি শশী তারা আকাশ অবনী ভেদাভেদ নাহি আর!

ছোটতে বড়তে কঠিনে কোমলে সুরূপে কুরূপে মিশি
একই গঠনে একই বরণে একেতে মগন দিশি !
একেরি হইয়ে অনাদি অনন্ত হয়েছে আপনা হারা !
আনন্দে মজিয়া কেবলি ঢালিছে অনন্ত হৃদয় ঝারা !
বিভোর হইয়া পড়েছে অনন্ত হয়ে অন্যজ্ঞান হীন,
একেরি প্রণয় ধরিয়া হৃদয়ে হয়েছে একেতে লীন।
নাহি অভিলাষ নাহিক নৈরাশ নাহি দান প্রতিদান,
শুধু প্রাণে প্রাণে মিশিয়া অনন্ত হয়েছে একটি প্রাণ !

৪

শিরে করাঘাত করি কহে নারী আঁখি ভাসে অশ্রুজলে—
"হায় রে কপাল অভাগীর ভাগ্যে শেষে কি পাগল হ'লে।
কতদিন হায় ! ব'লে ছিনু যে গো অত পড়া ভাল নয় !
অধিক পড়িলে অধিক ভাবিলে মানুষ পাগল হয় !
শুনিতে না কথা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে পড়ায় বিভোর হ'তে
তাও নাহি জানি কি যে সুখ এত ছাই পড়া হতে পেতে !
পোড়া বই গুলো প'ড়ে যদি লোকে কেবলি পাগল হয়,
সর্ব্বনেশে লোকে কেন বই লেখে লিখে কি পৌরুষ হয় !
পাগলের মত চেয়ে আছো যে গো ওগো শোন ফিরে চাও
খিদে কি পায়না ? চাল ভিক্ষা আছে এনে দিই দুটি খাও।"

৫

কবি (স্বগত)।

অনন্ত প্রাণের অকূল অতল কি যে সুধাময় বুক।
ভাবিলে পুলকে শিহরে শরীর উথলে সাধের সুখ।
সেই বুকে প্রাণ না যদি ঢালিলে তবে এ জনম ছার।
প্রাণীর জীবনে সেই এক সুখ অন্য সুখ নাহি আর !
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বাঁধা যথা প্রাণ সেখানে কি মিলে সুখ।
শুধু কামনায় ভরা যে সংসার সেথায় কি মিটে দুখ।
চিরে ধর বুক, তবে বুঝে দুখ, হায় রে যেখানে প্রাণী !
যে যত কুটিল, যে যত চতুর, সেই হয় তত জ্ঞানী।
যেথা নরনারী সোণা রূপা পূজে সুখের কামনা ক'রে !
তেমন নরকে রহে কি কখন সুখ দিনেকের তরে।

৬

মুছি অশ্রুজল পতির বদন মুছাইল নারী ধীরে।
ফিরাইয়া আঁখি পতি হেরে পাশে ম্লান মুখ রমণীরে।
স্থির দৃষ্টে হেরি প্রিয়া মুখ পানে আপনার মনে কয়।
"রমণীর মুখ হেরিয়া কেবলি মানব ভুলিয়া রয়।
রাখিলে নয়ন এ মুখের পানে সংসার নয়নে ভাসে।
কত সুখ দুঃখ কত শত প্রাণী হৃদয়ের কাছে আসে।
বিপুলা ধরণী বিরাজে সম্মুখে ধর্ম্ম কর্ম্ম তার হেরি।
সংসারীর কাজ যা কিছু ধরায় এই মুখ আছে ঘেরি।
সে মুখো শুখায় যেখানে ক্ষুধায় সেখানে কি সুখ আর?
রমণীর মুখে সংসারের সুখে শুধু বিড়ম্বনা সার।"

৭

সে উদাস দৃষ্টি হেরিয়া পতির রহিতে না পারি আর,
চীৎকার করিয়া কাঁদে পতিপ্রাণা জড়াইয়া গলা তার।
মেলিয়া বদন ভেদিয়া গগন পারশে কাঁদে তনয়,
নয়ন মুদিয়া সম্বোধি উভয়ে কবিবর ধীরে কয়;—
"কেঁদো না গৃহিণি কাঁদিও না শিশু কাঁদিলে না যায় ক্ষুধা,
সাধনা বিহনে জীবের জীবনে সকল কামনা মুধা;
আজ ক্ষুধা যাবে কাল ক্ষুধা পাবে শেষ নাহি এ ক্ষুধার।
ভুলে যাও ক্ষুধা ভুলে যাও মায়া ভুলে যাও এ সংসার!
অকূলে ভাসিতে পারিবে যাহাতে তাহারি সাধনা কর,
ঐ নীল গগনে চাহিয়া চাহিয়া অকূলে হৃদয়ে ধর।"

৮

রোদন শুনিয়া কবির শ্যালিকা ত্বরিত ছুটিয়া আসে,
দেখিয়া শুনিয়া অঞ্চল চাপিয়া ক্ষণকাল ধরি হাসে।
চতুরা সে নারী বুঝিত কবিত্ব জানিত ঔষধ তার
নবীন যৌবনে তারো পতি ছিল এক কবি অবতার!
চাঁদিনী রাত্রিতে ছাদের উপরে তারো পতি মন সুখে;
হাসিত কাঁদিত ভাসিতে চাহিত নীল গগনের বুকে।

অনেক ঠেকিয়া তবে শিখেছিল সে নারী ঔষধ তার।
অগ্রসর হয়ে সরায়ে শিশুরে সরাইল মায়ে আর।
দুটি কাণ ধোরে দিল প্যাক জোরে শিহরিয়া কবি চায়;
শালী বলে কবি "উড়িবে আকাশে ডানা যে নাহিক পায়!"

ঈশান—

শাক্যসিংহের লিপিশিক্ষা।

কুমার শাক্যসিংহ শুদ্ধোদনের গৃহে দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বিদ্যারম্ভ কাল আগত হইল। রাজা শুদ্ধোদন শুভদিনে মহামহোৎসব সহকারে কুমারকে লিপিশালায় প্রেরণ করিলেন। আজ রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বিদ্যারম্ভ হইবে, লিপিশিক্ষা আরম্ভ হইবে, শুনিয়া নগরবাসী জনগণের বিশেষত বালক বৃন্দের আহ্লাদের পরিসীমা নাই, কপিলনগর আজ যেন হর্ষে মাতিয়া উঠিল।

লিপিশালার প্রধান শিক্ষকের নাম বিশ্বামিত্র। আজ বালকাচার্য্য বিশ্বামিত্র মনে মনে "সুপ্রভাত" প্রভৃতি সুখ ভাবনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার লিপিশালা সম্মুখে মহা সমারোহে উপস্থিত হইল। অগ্রে শত শত শাক্য বালক, মধ্যে রাজা ও রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, পশ্চাতে অসংখ্য জনসম্বাধ ও হয় হস্তী প্রভৃতি যান যাত্রিকগণ লিপিশালা অভিমুখে আগমন করিতেছে।

বালকরূপী বোধিসত্ত্ব যথাসময়ে ও যথা নিয়মে পাঠশালায় প্রবেশ করিলেন; করিয়া তত্রস্থ প্রধান শিক্ষক বিশ্বামিত্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বিশ্বামিত্র অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ভাবিতেছিলেন, "রাজপুত্রের গুরু হইব" এক্ষণে তাঁহার সে মোহ অপগত হইল। তাঁহার জ্ঞান হইল, কোন বালক তাঁহার নিকট শিষ্য হইতে আইসে নাই, এক অনিবার্য্য ও অপূর্ব্ব তেজ

তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। বালকরূপী বোধিসত্ত্বের অঙ্গশ্রী ও তেজ দেখিবামাত্র তাঁহার দর্শনপথ অবরুদ্ধ করিল। তিনি বিস্ময়ে ও মোহে লীনচিত্ত হইলেন এবং মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন।

ললিত বিস্তর নামক বৌদ্ধ ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বালকাচার্য্য বিশ্বামিত্র শাক্য সিংহের তেজে অভিভূত ও ভূপতিত হইলে পর শুভাঙ্গ নামক দেবপুত্র সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণকে হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্থিত করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত গাথা গান করিয়াছিলেন।

"শাস্ত্রানি যানি প্রচরন্তি চ দেবলোকে।
সংখ্যা লিপিশ্চ গণনাপিচ ধাতু তন্ত্রম্।
যে শিল্পযোগ পৃথু লৌকিকে অপ্রমেয়া,
স্তেষেযু শিক্ষিতু পুরা বহুকল্প কোট্যঃ॥
কিন্তু জনস্য অনুবর্ত্তনতাং করোতি,
লিপিশাল মাগতৃং সুশিক্ষিত শিক্ষনার্থম্।
পরিপাচনার্থম্ বহুদারক অগ্রযানে,
অন্যাংশ্চ সত্ত্ব নিযুতান মৃতে বিনেতুম।
নৈতস্য আচরিতু উত্তরি বা ত্রিলোকে,
সর্ব্বেষু দেব মনুজেষ্বয় মেব জ্যেষ্ঠঃ।
নামানি তেষ লিপিনাং নহি বেশ্ম যূয়ং,
যত্রৈষ শিক্ষিতু পুরা বহুকল্প কোট্যঃ।"

ললিত বিস্তর।

তাৎপর্য্য এই যে, ইহলোকের কথা দূরে থাকুক, দেবলোকেও যে সকল শাস্ত্র, সংখ্যা, লিপি ও গণনা প্রভৃতি প্রচলিত আছে, সে সমস্ত ইনি পূর্ব্বে শিখিয়াছেন।

ইনি কোটি কোটি কল্প লোক শিক্ষার নিমিত্ত মনুষ্যগণের অনুকরণ করিতেছেন, এবং শিক্ষিত শিক্ষার নিমিত্ত বহুবালক অগ্রগামী করিয়া এই লিপিশালায় আগমন করিয়াছেন। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য কেবল লোক শিক্ষা, সত্ত্ব পরিপাক ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীকে বিনীত করা ও মুক্ত করা।

তিন লোকে যাহা প্রচারিত আছে, তাহার কিছুই ইঁহার অবিদিত নাই। কি দৈব, কি মনুষ্য, সকলের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। ইনি বহুকল্প পূর্ব্বে যাহা শিখিয়া

রাখিয়াছেন, তোমরা তাহার নামও জান না। সে সকল লিপির কিছুই জান না।

অনন্তর সেই দেবপুত্র এই গাথাত্রয় গান করিয়া তন্মুহূর্ত্তে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারে তত্রস্থ জনগণ মুগ্ধপ্রায় হইল। অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন ও অমাত্যবর্গ কুমারকে লিপিশালার অধ্যক্ষ বিশ্বামিত্রের নিকট অর্পণ করিয়া যথাগত স্থানে গমন করিলেন, কেবল দাস দাসী ও ধাত্রীগণ কুমারের রক্ষণার্থ তথায় অবস্থান করিলেন।

ললিত বিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এই সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বর্ণনা আছে, তাহা দেখিয়া বিবেচনা হয়, প্রাচীনকালের সকল লোকই অলৌকিক বর্ণনা ভাল বাসিত। যথা——

বালকাচার্য্য বিশ্বামিত্র শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া কুমারকে আহ্বান করিলেন। কুমার বোধিসত্ত্ব চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত লিপিফলক * হস্তে করত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন "কতমাং ভো উপাধ্যায় লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি? ব্রাহ্মীং খরোষ্ঠীং পুষ্করসারীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মাঙ্গল্য লিপিং মনুষ্যলিপিং অঙ্গুলীয় লিপিং শকারি লিপিং ব্রহ্মবল্লি লিপিং দ্রাবিড় লিপিং কিনারি লিপিং দক্ষিণ লিপিং উগ্র লিপিং সংখ্যা লিপিং অনুলোম লিপিং অর্দ্ধধনু লিপিং দরদ লিপিং খাস্যলিপিং চীনালিপিং হূন লিপিং মধ্যাক্ষর বিস্তরলিপিং পুষ্পলিপিং দেবলিপিং নাগলিপিং যক্ষলিপিং গন্ধর্ব্বলিপিং কিন্নরলিপিং মহোরগলিপিং অসুরলিপিং গরুড়লিপিং মৃগচক্রলিপিং চক্রলিপিং বায়ুমরুল্লিপিং ভৌমদেবলিপিং অন্তরীক্ষদেব লিপিং উত্তরকুরুদ্বীপ লিপিং অপর গৌড়ান লিপিং পূর্ব্ববিদেহ লিপিং উৎক্ষেপ লিপিং নিক্ষেপ লিপিং বিক্ষেপলিপিং প্রক্ষেপলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রতিলেখ লিপিং অনুদ্রুতলিপিং শাস্ত্রাবর্ত্তলিপিং গণনাবর্ত্তলিপিং উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপিং নিক্ষেপাবর্ত্তলিপিং পাদলিখিত লিপিং দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপিং যাবদ্দশোত্তর পদসন্ধিলিপিং অধ্যাহারিণী লিপিং সর্ব্বরুত সংগ্রহনি লিপিং বিদ্যানুলোমা লিপিং বিমিশ্রিত লিপিং ঋষি তপস্তপ্তাং রোচমানাং ধরণী-প্রেক্ষণ লিপিং সর্ব্বৌষধি নিঃষ্যন্দাং সর্ব্বসার সংগ্রহণীং সর্ব্বভূতরুত গ্রহণীং আসাং ভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্টিলিপীনাং কতমাং লিপিং মাং ত্বং শিক্ষয়িষ্যসি?

---

* অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকালের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাষ্ঠ ফলকে লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল। এমন কি আমরাও বাল্যকালে দোকানদারদিগকে ও পাঠশালার ছাত্রদিগকে কাষ্ঠ ফলকে লিখিতে দেখিয়াছি।

হে গুরো! আমাকে কোন্ লিপি শিখাইবেন? ব্রাহ্মী লিপি? না খরোষ্ঠী লিপি? অথবা অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি ও মগধলিপি প্রভৃতি চৌষট্টি লিপির কোন্ লিপি? *

শুনিয়া বিশ্বামিত্র অবাক্। তিনি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলেন, তাঁহার বিদ্যাভিমান তিরোহিত হইল, দর্প অন্তর্হিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এ ত

---

* সংস্কৃত লিপি তালিকাটির অনুবাদ দিতে পারিলাম না। কারণ ঐ সকল লিপি বোধক শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? তাহা বুঝা যায় না। ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে; কিন্তু তন্মধ্যে আমরা ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, শকারিলিপি, দরদলিপি, দ্রাবিড়লিপি, চীনলিপি, হূনলিপি, ষাশ্যালিপি বা খশলিপি—এই ১০টি মাত্র শব্দের যৎকিঞ্চিৎ আভাস বুঝিতে পারি, অবশিষ্ট গুলির কিছুই বুঝি না; কাজেই উহার বঙ্গানুবাদ পরিত্যক্ত হইল। যদি কোন বিজ্ঞ পাঠক ঐ সকল শব্দের অর্থ বা তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানান। ঐগুলি বুঝিতে পারিলে উহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় কোন কোন ভাষার ও দেশের প্রাচীনত্ব পক্ষ উত্তমরূপে সমর্থিত হইতে পারে। যদি কেহ বলেন, উহা বুদ্ধদেবের কথা নহে, উহা গ্রন্থকারের বর্ণনা মাত্র। তাহা বলিলেও উহার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিব। কেননা, অন্যূন সার্দ্ধেক সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের মহাবস্তু অবদান নামক অন্য একখানি গ্রন্থেও ঐ সকল দেশের ও ঐ সকল ভাষার উল্লেখ আছে। বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্যপ মহাকাত্যায়নকে বলিতেছেন,—

"যা ইমা লোকে সংজ্ঞা ব্রাহ্মী, পুষ্করসারী, খরোস্তী, যাচনী, ব্রহ্মবাণী, পুষ্পলিপি, কুতলিপি, শক্তিনলিপি, ব্যত্যস্তলিপি, লেখলিপি, মুদ্রালিপি, উকর-মধুর-দরদ-চীন-হূন-পারা, বঙ্গা, অঙ্গা, দ্রাবিড়া, সাহলা, এমিদা, দচুরা, রমঠ-ভয়-বৈচ্ছেতুকা, গুন্মনা, হস্তদা, কসুলা, কৈতকা, কসুরা, লতিকা, জচরি-দেম্, অকখরবর্দ্ধং সর্ব্বা এষা বোধিসত্ত্বানাং নীতিঃ।"

এই গণনার মধ্যে "মুদ্রালিপির" উল্লেখ আছে; উহা যদি ঠিক্ নামানুরূপ তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বুদ্ধদেবের অথবা তাঁহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ তিনসহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্বে মুদ্রালিপি প্রচলিত ছিল। তখন কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদিত করিয়া ছাপিত। বৌদ্ধগ্রন্থের এই প্রমাণ আমাদের দেশের ব্যবস্থা শাস্ত্র দেখিলে অবশ্যই বলবান হইবে। কেননা আমাদের দেশের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রেও মুদ্রালিপির উল্লেখ আছে। চণ্ডীপাঠ ও পুরাণ পরায়ণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, মুদ্রালিপি পাঠ করিলে পুণ্যফল হয় না। মুদ্রালিপি না থাকিলে কি প্রকারে তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে? সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, স্মৃতিকালেও মুদ্রালিপি বা ছাপার অক্ষর ছিল।

বালক নয়, নিশ্চিত ইনি কোন জ্ঞান মূর্ত্তি অথবা বিদ্যার অবতার। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী গান করিলেন।

আশ্চর্য্যং শুদ্ধ সত্ত্বস্য লোকে লোকানুবর্ত্তিনঃ।
শিক্ষিতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু লিপিশালা মুপাগতঃ॥
যেষামহং নামধেয়ং লিপিনাং ন প্রজানামি।
তত্রৈবঃ শিক্ষিতঃ সন্তো লিপিশালা মুপাগতঃ॥
বক্তুং চাস্য ন পশ্যামি মূর্দ্ধানং তস্য নৈবচ।
শিক্ষয়িষ্যে কথং হ্যেনং লিপিপ্রজ্ঞা পারগতম্॥
দেবাতিদেবো হ্যতিদেবঃ সর্ব্বদেবোত্তমো বিভুঃ।
অসমশ্চ বিশিষ্টশ্চ লোকেষ্ব প্রতিপুদ্গল॥
অস্যৈব হ্যনুভাবেন প্রজ্ঞো পায়ং বিশেষতঃ।
শিক্ষিতং শিক্ষয়িষ্যামি সর্ব্বলোকে পরায়ণম্॥

ললিত বিস্তর।

ইহলোকে মনুষ্যরূপধারী শুদ্ধ সত্ত্বের লিপিশালায় আগমন হওয়া অতি আশ্চর্য্য। কেন না, তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষিত। আমি যে সকল লিপির নামও জানি না, সেই সকল লিপিতে সুশিক্ষিত থাকিয়াও ইনি লিপিশালে আগমন করিয়াছেন। আমি ইহার মুখপানে চাহিতে অক্ষম, মস্তক দেখিতেও অক্ষম, কি প্রকারে আমি লিপি-জ্ঞান-পারদর্শীকে লিপি-শিক্ষা দিব? ইনি দেব, অতি দেব, সকল দেবতার মধ্যে উত্তম দেবতা। ইহার সমান নাই এবং ইহার সদৃশ সত্ত্ব বা জীব নাই। ইঁহারই প্রভাবে প্রজ্ঞালাভের উপায় শিক্ষা করা যায় এবং এই সর্ব্বলোকাশ্রয়কে আমি কি শিখাইব?

মহাত্মা শাক্যসিংহের বিদ্যারম্ভ কালের এইরূপ ইতিহাস আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছে এবং সত্য মিথ্যা সংশয়ে বিলোড়িত করিতেছে। যাহাই হউক ঐরূপ ঘটনার পর কি হইয়াছিল, একবার তাহারও অনুসন্ধান করা যাউক।

বালক-গুরু বিশ্বামিত্র ভয়ে, মোহে ও বিস্ময়ে জড়ীভূত হইলে ভগবান্ শাক্যমুনি তৎপরে আর তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই, সামান্য বালকের ন্যায় লিপিফলক হস্তে গুরুর অভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া যথা নিয়মে উপদেশ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মোহভঙ্গের পর গুরু বিশ্বামিত্র প্রোক্ত ঘটনা জাগ্রত স্বপ্ন

অথবা ভ্রমের প্রতারণা বিবেচনা করিলেন। অনন্তর যথা নিয়মে অ-কারাদি বর্ণ সকল একে একে উপদেশ করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে যে, ভগবান (শাক্যসিংহ) যখন যে বর্ণ উচ্চারণ করেন, তখন সেই বর্ণের এক একটি বৈরাগ্যসূচক রহস্য অর্থ আকাশ হইতে প্রতিধ্বনিত হয়।

গুরু উপদেশ করিলেন, অ।
শাক্যসিংহ বলিলেন, অ।
আকাশে ধ্বনিত হইল, "অনিত্যঃ সর্ব্বঃ সংসার স্কন্ধঃ।"
গুরু উপদেশ করিলেন, আ।
বুদ্ধদেব উচ্চারণ করিলেন, আ।
আকাশে ধ্বনিত হইল, "আত্মপরহিতঃ কার্য্যঃ।"
গুরু বলিলেন, ই।
শাক্য বলিলেন, ই।
আকাশে ধ্বনিত হইল, "ইন্দ্রিয় বৈপুল্যম্ মা কুরু।"
গুরু উপদেশ করিলেন, ঈ।
শাক্যও উচ্চারণ করিলেন, ঈ।
আকাশে উচ্চরিত হইল, "ঈতিবহুলং জগৎ।"
গুরু বলিলেন, উ।
শিষ্য সিদ্ধার্থও বলিলেন, উ।
আকাশে শব্দ হইল, "উপদ্রব বহুলং জগৎ।"

প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ কালে আকাশে এক একটি প্রতিশব্দ উত্থিত হইয়াছিল।* সেই সকল অমানুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরু ও শিষ্যবৃন্দ যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে যে, ঐ সকল অমানুষ বাক্য বুদ্ধের প্রভাবেই আকাশে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছিল। এবং ঐ সকল অমানুষ প্রতিশব্দের এক একটি প্রতিশব্দ এক একটি ধর্ম্মরাজ বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গ। তাৎপর্য্য এই যে, ৫০ অক্ষরে ৫০টি আকাশবাণী হইয়াছিল এবং সেই ৫০ আকাশবাণী বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার।

---

* প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে সকল অক্ষরের প্রতিশব্দ দিলাম না। ফল, ৫০টি অক্ষরের ৫০টি প্রতিশব্দ আছে এবং ৫০টিই ধর্ম্মমূলক।

কুমার শাক্যসিংহ লিপিশালায় থাকিয়া প্রোক্ত প্রকারে প্রথমে বর্ণ, তৎপরে পদ, তৎপরে বাক্য-যোজন, তৎপরে শাস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করিলেন। এই সকল শিক্ষা করিতে তাঁহার অধিক সময় অতিপাতিত হয় নাই।

বৌদ্ধ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, ভগবান বুদ্ধদেব যখন লিপিশালে থাকিয়া লিপি শিক্ষা করেন, তৎকালে সেই পাঠশালায় নাকি দ্বাদশ সহস্র বালক লিপি শিক্ষার্থ উপস্থিত ছিল এবং সেই সকল বালকদিগকে তিনি গোপনে গোপনে সম্যক্ জ্ঞান উপদেশ করিতেন। সম্যক জ্ঞান কি? বুদ্ধদেবের অভিমত সম্যক্ জ্ঞান কি? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

শ্রীরামদাস সেন।

ভারত উদ্ধারিণী সভার কার্য্যবিবরণ।

"বোধ হয় আপনি ও আপনার পাঠিকা পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, সহর কলিকাতা * * * ষ্ট্রীট * নং ভবনে বিগত শনিবারে এক রাক্ষসী মহিলা সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কোন বিশেষ কারণ বশত সভার কার্য্যবিবরণ অদ্য বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অপ্রকাশ রাখিবার কথা ছিল। এক্ষণে আপত্তি বিদূরীত হইয়াছে এবং সভাও বঙ্গদেশের প্রত্যেক নারীনরের নিকট হইতে সহায়তা আহ্বান করিতেছেন।

উচ্চ ও অনুচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্তা অন্যূন ৫০টি মহিলা সভা গৃহে উপস্থিতা ছিলেন। তদ্ব্যতীত আরও অনেকে আসিবেন বলিয়া আশ্বাসিতা করিয়াছিলেন। ঘোষিত হইয়াছিল যে, বিলাত প্রত্যাগতা Mrs. এন, কে, চৌধুরাণী এম, এ, ভারতে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রস্তাব করিবেন, মহিলাকুলের পরম বন্ধু বিলাত প্রত্যাগতা Mrs. এস, মজুমদার বি, এ, ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন এবং বিশেষ উপযুক্তা শ্রীমতী নিস্তারিণী হালদার বি, এ, শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পারিজাত দত্ত (এফ, এ) দ্বিতীয় অনুরোধ পর্য্যন্ত উক্ত স্বাধীনতা প্রদর্শিত সভার অনুমোদিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন।

ঠিক সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু যেমন ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিতে আরম্ভ হইল, অমনি এক খানি পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, অনিবার্য্য প্রসববেদনার জন্য চৌধুরাণী মহোদয়া সভায় যোগ দান করিতে অসমর্থা। এই নিদারুণ সংবাদে সভাস্থ সকলেই নিরাশায় বজ্রাহতা হইলেন। হতাশার স্রোত ক্রমে নিবারিত হইলে, উপস্থিতা মহিলাগণের মধ্যে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, সন্তান প্রসব করিবার কথাই অবশ্য প্রধান ও প্রথম তর্কের বিষয়। এই বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ তর্ক বিতর্ক চলিলে পর, বঙ্গ সমাজে মহিলাকুলের দুরবস্থার বিষয় উপস্থিত হইল। তৎপরে কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার ব্যয়বাহুল্যের বিষয় আসিয়া পড়িল। তর্ক বিতর্ক চলিতেছে এমন সময়ে সপ্তদশ বর্ষীয়া গর্ভবতী শ্রীমতী বীরেন্দ্রবালা গঙ্গোপাধ্যায় নাম্নী জনৈক সভ্যা দণ্ডায়মানা হইয়া উপস্থিতা সভ্যা-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, 'অদ্যকার প্রস্তাবিত বিষয়ের বক্তৃতায় যখন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, তখন কেন, কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার ব্যয়-বাহুল্যের বিষয়েই বক্তৃতাদি হউক না ?' সভাস্থ অনেকেই এ প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন এবং গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়াকে প্রস্তাব-কারিণী ও শ্রীমতী চমৎকারিণী গুঁই তর্ক-রত্নকে অনুমোদনকারিণী স্থির করিলেন। শ্রীমতী বীরেন্দ্রবালা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর, শ্রীমতী চমৎকারিণী দণ্ডায়মানা হইয়া ২ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট কাল অগ্নিময় শিলাবৃষ্টির ন্যায় বক্তৃতা করিলেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহার যুক্তি ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেম—কেবল তিনটি-পুত্রের-জননী একটি রমণীকে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তর্করত্ন মহোদয়া বক্তৃতাকালে তিন বারের অধিক জলপান করেন নাই। যদি আপনার পত্রে স্থান হয়, তাহা হইলে সমস্ত বক্তৃতাগুলি সবিস্তারে পাঠাইতে পারি—মিস্ চারুমুখী দাস বি, এস, সি, সমস্ত বক্তৃতাগুলি সাঙ্কেতিক অক্ষরে ক্ষিপ্রহস্তে শাদায় কালায় উঠাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিষয় ব্যতীত আর * টী বিষয়ে বক্তৃতাদি হইয়াছিল—এই জন্য বক্তৃতা বহুবচনে প্রয়োগ করা হইল। অনুগ্রহ করিয়া আপাতত সভার মন্তব্যগুলি সাধারণের গোচর করিবেন।

* * * তারিখের ভারত উদ্ধারিণী সভার অসাধারণ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

শ্রীমতী রাধামণি গণেশ—সভাপত্নীর আসনে। ৪৮ জন বঙ্গের মুখোজ্জল-কারিণী কুলকামিনী উপস্থিতা। শ্রীমতী কুসুম ঘোষ (এফ্, এ)—কার্য্য-সম্পাদিকা।

১। এই সভা অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, Mrs এন্, কে চৌধুরাণী এম্, এ, গৃহমধ্যে আবদ্ধ হওয়াতে অদ্যকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতাদি নব-মতে ষষ্ঠী পূজার কাল পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

২। এই সভা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, অনেক দিন যাবৎ স্ত্রীলোকে প্রসববেদনা সহিয়া সন্তান প্রসব করিয়া আসিয়াছেন এবং স্ত্রী জাতির স্কন্ধ হইতে এ কষ্টভার বিমুক্ত করিতে আমেরিকাতেও কোন চেষ্টা হয় নাই।

৩। সংসারে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগের বিবাহে অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে এবং এক্ষণে আর স্ত্রীলোক "রত্ন" নাই সুতরাং স্ত্রী সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত কেহ আর কন্যা প্রসব করিতে পারিবেন না। অপিচ রোগীকে অরোগ করা অপেক্ষা রোগ উৎপন্ন হইতে না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া কন্যার বিবাহের ব্যয়বাহুল্য নিবারণের প্রতি সভা কিছু মনোযোগ দিলেন না।

৪। স্ত্রীজাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে পুরুষে পরিণত করা সভার অভিপ্রায় বিধায়, স্ত্রীজাতি ষোল আনা পরিমাণে পুরুষে পরিণত হইতে পারে কি না, জানিবার জন্য বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতা শ্রীমতী সুকুমারী চট্টোপাধ্যায় এম্, ডি, মহাশয়াকে পত্র লেখা হইবে এবং কার্য্য সম্ভব হইলে স্ত্রীকে পুরুষ করিবার জন্য দেশ বিদেশে উপদেষ্ট্রী প্রেরিত হইবেন।

৫। এই সভার মন্তব্য দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে এবং যাঁহারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যোগ দিতে চাহেন, আদরে তাঁহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করা হইবে। সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকদিগকে পত্রাদি লিখিলেই চলিবে।

* নং * ষ্ট্রীট,
* ই আগষ্ট ১৮৮৬।

শ্রীমতী * * * এফ্, এ।
অবৈতনিক কার্য্য-সম্পাদিকা।

উদ্ভট কথা।

—o—

চতুর্থ শাখা।

উদ্ভট কথার মূল কথাটা এই সময়ে পাঠকবর্গকে একবার স্মরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সে কথাটি এই; ইতিহাসে ও উপন্যাসে,—বর্ণনায় ও কল্পনায়,—ঘটনায়, ও রূপকে—প্রকৃতি ও পরাকৃতিতে—জাগরণে ও স্বপ্নে—এবং জীবে ও জড়ে—যে পরস্পর সত্য মিথ্যার ভেদ আছে—একথা আমরা বুঝি না ও মানি না। ইতিহাস সত্য, উপন্যাস মিথ্যা—বর্ণনা সত্য, কল্পনা মিথ্যা—ঘটনা সত্য, রূপক মিথ্যা—প্রকৃতি সত্য, পরাকৃতি মিথ্যা—জাগরণ সত্য, স্বপ্ন মিথ্যা,—জীব সত্য, জড় মিথ্যা—ইহার একটি কথাও বুঝি না ও মানি না। কেন মানি না, প্রথম তিন শাখায় তাহার কতক কতক বলিয়াছি; আজি জাগরণ ও স্বপ্নের কথা বলিব।

আপনারা অনেকেই বলেন, জাগরণ সত্য, স্বপ্ন মিথ্যা। কথাটা আমার নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ইচ্ছা হয়, যে ঠিক উহার বিপরীত কথাই বলি। বলি যে, জাগরণ মিথ্যা, স্বপ্নই সত্য; কিন্তু তাহা হইলে আমার এই সমস্ত লেখাটুকু পণ্ড হইবে ভাবিয়া, আপাতত অতদূর বলিতে পারিলাম না। আমি বেদান্ত-বাগীশ নহি—সুতরাং আমাদের জাগ্রত অবস্থা যে ভ্রমের অবস্থা—এমন দিব্যজ্ঞান আমার নাই। কিন্তু জগতের সমক্ষে—ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য—ক্যাণ্ট, কুজাঁন, কোম্‌ত—সমস্ত দর্শন অদর্শনের দোহাই দিয়া মুক্তকণ্ঠে এতটুকু বলিতে পারি, যে মনুষ্যের জাগ্রত অবস্থা যদি সত্য হয়, তবে স্বপ্নাবস্থাও সত্য—সত্য—পরম সত্য।

কথাটা অনেক বিস্তার করিয়া বলিতে হইতেছে। একেবারে গোড়া হইতেই ধরা যাউক; বালক, বৃদ্ধ—যুবক, যুবতী—মূর্খ, জ্ঞানী—দুঃখী, ধনী—সকলেই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন যদি মিথ্যা, তবে এ মিথ্যা কুহকে সকলকেই ভুগিতে হয় কেন? স্বপ্নাবস্থ মানবের উপর, তবে কি শয়তানের অধিকার আছে না কি? যাঁহারা স্বপ্নাবস্থাকে মিথ্যার অবস্থা বলেন, তাঁহাদিগকে ঐরূপ একটা বলিতেই হইবে, নতুবা মনুষ্যের চেষ্টায়, জ্ঞানে, গুণে, বয়সের পরিণামে, ঐ মোহের অবস্থা হইতে পরিত্রাণ নাই কেন? স্বপ্ন যদি কেবল মায়া মোহ, মিথ্যা ভ্রান্তি মাত্র, তবে হয়, উহা নিতান্ত নিষ্ফলা সামগ্রী, না

হয়, একান্ত অনর্থকর পদার্থ। অথচ এমন সার্ব্বজনিক, সার্ব্বত্রিক বিড়ম্বনা হইতে আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় নাই! কাজেই বলিতে হয়, যে তবে এই সংসারের অন্তত কিয়দংশভাগ কেবল ভূতগত কাণ্ড মাত্র। শয়তান আসিয়া ঘুম পাড়াইয়া মানুষকে কেবল ঠকাইতে থাকে, আর আমরা অনুপায় হইয়া, কেবল ঠকিতেই থাকি!

স্বপ্ন মিথ্যা বলিবার অভিপ্রায় এই—যাহা নয়, স্বপ্নে তাহাই হয়। এক স্থানে শয়ান থাকিয়া, মনে হয়, যেন অন্য কোন স্থানে বিচরণ করিতেছি, কত গ্রাম নগর দর্শন করিতেছি। একস্থানে স্থির হইয়া শুইয়া থাকাই সত্য, আর ঐরূপ অন্য স্থানে ভ্রমণ বিচরণ, দর্শন শ্রবণ উহার সমস্তই মিথ্যা। আমি গত রাত্রি কলিকাতায় শুইয়া থাকিয়া আপনাকে যে দিল্লীতে বোধ করিয়াছিলাম, সেই বোধটাই স্পষ্ট মিথ্যা। যাঁহারা স্বপ্ন মিথ্যা বলেন, তাঁহারা এইরূপই বুঝিয়া ও বুঝাইয়া থাকেন।

এই কথার উত্তর স্বরূপ আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে; একটু কটভজ লাগিবে, ক্ষমা করিবেন। যখন রাম-যাত্রা শুনিতে বসিয়াছেন, তখন বানরনাচে বিরক্ত হইলে চলিবে কেন?

আমাদের হিন্দুর শাস্ত্রে, দর্শনে—কাব্যে, ইতিহাসে—জ্ঞানীলোকের গবেষণায়,—সাধারণ লোকের বিশ্বাসে—দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। রথ রথীর ন্যায় দেহ দেহী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। আপনারা কত লোকে, এ কথা মানেন, তাহা এখন আর আমি বলিতে পারি না; কিছু কাল পূর্ব্বে মনে করিতাম, যে অনেকেই ঐ কথা স্বীকার করেন, কিন্তু বিধবা-বিবাহের সাম্প্রতিক আন্দোলনের পর, ক্রমেই আমার ধারণা হইয়াছে, যে অনেক কৃতবিদ্য যুবকে আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই ধারণায় আমি মর্ম্মাহত হইয়া আছি। আত্মার পৃথগ্ অস্তিত্ব-বাদের প্রতিপোষণার্থ এস্থলে আমি কিছুই বলিতে পারিব না; তবে এই প্রবন্ধের মূল কথা স্বপ্ন বিষয়ের সিদ্ধান্তে যদি আত্মার পৃথগস্তিত্বের প্রতিপোষণ হয়, তাহা হইলে আমি শ্লাঘা বলিয়া মনে করিব।

দেহ এবং আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ববাদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাস প্রধানত—কাল-গত এবং স্থান-গত। স্বতন্ত্র আত্মাসম্বন্ধে কালগত বিশ্বাস এই যে—আত্মা নিত্য। পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে। কাজেই হিন্দুমতে পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম উভয়ই স্বীকৃত হয়। স্বতন্ত্র

আত্মা সম্বন্ধে স্থানগত বিশ্বাস দ্বিবিধ। এক মত এই যে, আত্মা পক্ষী মক্ষীর ন্যায় বিচরণ-শীল। রথ হইতে অবতরণ করিয়া রথী যেমন এখানে সেখানে ভ্রমণ করিতে পারেন, আত্মাও সেই রূপ (দেহে থাকিয়া ত কার্য্য করিতে পারেই) দেহ হইতে দূরে গিয়াও কার্য্য করিতে পারে। আর একটি মত এই যে, আত্মা যূপলগ্ন জলৌকার মত, বা বালকের হস্তে ধৃত উড্ডীয়মাণ ঘুড়ীর মত, এক স্থানে থাকিয়াই নানা স্থানে কার্য্য করিতে পারে। এমনও কথা আছে, যে আত্মার উন্নতি বা পরিষ্কৃতি হইলে, এক স্থানে থাকিয়াই সর্ব্বস্থানে কার্য্য করিতে পারে।

দেহ হইতে দূরে গিয়া দেহীর স্বেচ্ছা-বিচরণ করিবার ক্ষমতা আছে,— এই বিশ্বাস হইতে বহুতর পৌরাণিকী এবং আধুনিকী কাহিনী কল্পিত হইয়াছে। * শঙ্করাচার্য্যের রাজ-শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজৈশ্বর্য্য ভোগ এবং মহাপ্রাণী তৃষ্ণাতুর হইয়া জল পানার্থ কলসী মধ্যে প্রবেশ করিলে ছোট বৌ হঠাৎ অচ্ছিদ্র নারিকেল-মালা কলসী-মুখে চাপা দেওয়াতে, মহা-প্রাণীর মহানিগ্রহ—এইরূপ শত সহস্র গল্প ঐ একই বিশ্বাসমূলক।

স্বতন্ত্র আত্মার স্বেচ্ছা-বিচরণ ক্ষমতায় অথবা এক স্থানে থাকিয়া নানা স্থানে কার্য্য করিবার ক্ষমতায় যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, আমার বোধ হয়, স্বপ্ন মিথ্যা বলিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। কলিকাতায় দেহ, আর দেহী আপনাকে দিল্লীতে মনে করিতেছে,—এটি স্পষ্টই ভ্রম

* It has been a favourite fancy with many, and it is the confirmed belief of some, that in sleep the Soul occasionally quits the body and that the objects supposed to be merely the baseless visions of a dream are really perceived by the wandering spirit. In support of this conjecture, the fact is adduced that some persons often, and all sometimes, see in dreams places and persons whom they are confident they had never seen with the bodily eye, but which when actually seen long afterwards they recognise as being the very places and persons they had beheld in the dream. But this indisputable fact admits of three in interpretations.

First, a picture of the place, or a portrait of the person, or a person resembling the personage of the dream, may have been presented to the eye and stored in the memory, although afterwards forgotten and even without consciousness at the moment of vision ; for every impression made upon the brain, even if we are unconscious of it, is written upon the memory, whence nothing once inscribed is ever erased.

* * * * * *

Thirdly, as will be seen hereafter, there can be no doubt that under some very rare and as yet unknown conditions, the human mind has a power of perception far beyond the range of the senses, and apparently through some other medium to which distance and the interposition of molecular matter are no impediments? conditions such as those under which the soul might be supposed to perceive when severed from its alliance with matter.

Introduction to Psychology Vol II. P, W. Cox.

সুতরাং মিথ্যা—এরূপ তর্ক করিতে তাঁহারা পারেন না। তবে বলিতে পারেন, যে আমরা সে দিন চীনাবাজার হইতে জাগ্রতাবস্থায় যে আয়নাখানি ক্রয় করিয়া আনিলাম, তাহা ত বেশ সম্মুখে রহিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু গত রাত্রিতে আপনি যে দিল্লীর চাঁদনি চৌক হইতে হালব্বি আরসী স্বপ্নাবস্থায় কিনিয়া আনিয়াছিলেন, বলিলেন, তাহা কৈ? তাহা ত কোথাও দেখি না; তবেই বোধ হইতেছে, যে আপনার দিল্লী যাওয়া, আরসী কেনা, প্রভৃতি সমস্ত স্বপ্নকাণ্ডই মায়ামোহ জড়িত মিথ্যা ব্যাপার। উত্তরে, আমরা সকলেরই বালককালের কথা তুলিব। সেই থৈ থৈ সিক্ত শয্যায় মাতৃ পার্শ্বে প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। একটু লজ্জিত, একটু কুণ্ঠিত। মা বিছানায়, পার্শ্বের বালিসে, গায়ে, পিঠে, হাত দিয়া বলিলেন "বাবা হরি! তুই কি হলি রে! এই বেটের কোলে আট বছরেও তোর রোগ গেল না,—এর পর বৌ এলে বাছা বল্‌বে কি রে!" বালক কালের সেই সকল কথা স্মরণ করিলে, আর সকল স্বপ্নই মিথ্যা বলিতে কেহ পারিবেন না, কেননা তখন দিল্লীর আরসী হাতে হাতে; স্বপ্নের সত্যতার সাবুদ শয্যা সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তবে এখন, এই কথা বলিবেন যে, যেগুলির সাবুদ নাই সে গুলিত মিথ্যা? আমি বলি, সে কথা ঐ মুনসেফ বাবুর কাছে বলুন গিয়া—আমার কথার উত্তরে ও কথা আসে না। আমি বলিয়াছি, স্বপ্নের অবস্থা মিথ্যা নহে। আপনি যদি বলেন, কতকগুলি মিথ্যা আর কতকগুলি সত্য—তাহা হইলে আমার মতেই আপনার মত দেওয়া হইল। আর দিল্লীর আরসী খানি আমি দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া, যে আমার গত রাত্রির স্বপ্নটি মিথ্যা—তাহাও আমি বলিব না। কেন বলি না, তাহা পরে বলিব। এখন এই মাত্র বলিয়া রাখি যে স্বপ্ন অধিকাংশ স্থলেই আত্মময়ী অবস্থা। কিন্তু আত্মময়ী বলিয়া মিথ্যা নহে।

তাহার পর, এখন দেখিতে হইবে, যাঁহারা আত্মার নানা স্থানে বিচরণ ক্ষমতা অথবা ব্যাপ্তি-ধর্ম্ম স্বীকার করা দূরে থাকুক, দেহ হইতে আত্মার পৃথগস্তিত্বই স্বীকার করেন না, স্বপ্ন মিথ্যা বলিবার তাঁহাদের অধিকার আছে কি না? আমার বোধ হয়, যাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, জাগ্রত অবস্থাও মিথ্যা বলিবার তাঁহাদের অধিকার আছে। কিন্তু যদি তাঁহারা জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার মধ্যে সত্য

মিথ্যা ভেদ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকেও আমার কিছু বলিবার অধিকার আছে।

যাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝেন না, স্বীকার করেন না, তাঁহাদের কাছে মন এবং আত্মা একই পদার্থ। ইংরাজিতে এই মত বড় প্রবল। খৃষ্টান ধর্ম্মনীতিতে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হইলেও য়ুরোপের দর্শন-শাস্ত্রে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। বড় বড় দর্শনশাস্ত্রে (Self, Soul, Mind, Ego.) আত্মা, জীব, মন, অহং—একই পদার্থ-বাচক। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, য়ুরোপের দর্শননীতিতে ও ধর্ম্ম-নীতিতে অনেক স্থলেই সামঞ্জস্য নাই। দার্শনিক সিদ্ধান্ত ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইতেছে, যে মন কেবল মস্তিষ্কের বিকাশ-বিশেষ মাত্র। যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা যদি বলেন, যে জাগ্রত অবস্থা সত্য, আর স্বপ্নের অবস্থা মিথ্যা, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে আমার কিছু বলিবার আছে।

এটা বোধ হয়, একরূপ স্থির হইয়াছে, যে, জাগ্রত অবস্থায় যে ভাবে, মস্তিষ্কের ক্রিয়া হয়, প্রায় ঠিক সেই ভাবেই স্বপ্নাবস্থায়ও হইয়া থাকে। সুতরাং শারীর-তত্ত্ব ধরিলে, একটি সত্য অন্যটি মিথ্যা, বলিবার কোন কারণই নাই। কেবল মনস্তত্ত্ব ধরিয়া বিচার করিলেও স্বপ্নকে মিথ্যা বলিতে পারিবে না।

স্বপ্ন প্রধানত হয়, দৃষ্টিময়, না হয়, সৃষ্টিময়; অথবা দৃষ্টি ও সৃষ্টির মিশ্রণময়; প্রথম দুই প্রকার স্বপ্নের বিচার করিলেই হইবে; মিশ্র স্বপ্নের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে না। সৃষ্টি বা কল্পনাময় স্বপ্ন মিথ্যা বলিতে পার না। কল্পনাকে যে মিথ্যা বলিতে পারা যায় না, তাহা আমরা দ্বিতীয় শাখায় দেখাইয়াছি। তবে অ-খাপস্ত বা অ-সাজন্ত বলিয়া কোন একটি স্বপ্নকে যদি মিথ্যা বল তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

তাহার পর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিবিধ দৃষ্টিময় স্বপ্ন হইয়া থাকে। ভূত-দৃষ্টি অর্থ স্মৃতি। স্মৃতি মিথ্যা এ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই। সুতরাং স্মৃতিময় স্বপ্ন যে মিথ্যা তাহাও বোধ হয় কেহ বলিবেন না। তবে স্মৃতিও যেমন অনেক সময়ে অবিশ্বাসিনীর মত মিথ্যা জোবানবন্দি দেয়, স্মৃতিময় স্বপ্নও সেইরূপ অনেক সময়ে মিথ্যা দৃশ্য দেখাইয়া থাকে; মিথ্যা কেন মিথ্যা নয়, তাহা আমি অবশ্যই বলিতেছি না; স্বপ্নের অবস্থা যে একেবারে মিথ্যা নয়, তাহাই আমি বলিতেছি। মনে করুন, স্মৃতি

আমাদিগকে কত বার প্রতারণা করিয়াছে, তবু স্মৃতি মিথ্যা—এ কথা ত আমরা কখন বলি না ; বরং স্মৃতির উপরই সমগ্র অধ্যাত্ম জগৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা বেশ দেখিতে পাইতেছি। সেই স্মৃতিময় স্বপ্ন যখন মিথ্যা বলে, তাহাকে মিথ্যুক বল, কিন্তু স্বপ্নমাত্রই ভ্রান্তি বা মোহ—এ কথা বলিও না। তাহার পর স্বপ্ন বর্ত্তমান দৃষ্টিময়। সম্মুখস্থ ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থের উপলব্ধি স্বপ্নে কচিৎ হয়। যখন হয়, তখন তাহা মিথ্যা এ কথা কে বলিতে পারে? প্রগাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল, এক ঘর হইতে অন্য ঘরে আসিতে লাগিল ; দুই ঘরের মাঝ খানে কতকটা নিম্নতল প্রায় তিন হাত ভূমি সেই স্থলটা ডিঙ্গাইয়া পার হইল, একখানি ছুরী যেখানে থাকিবার সম্ভাবনা, সেই খানে গিয়া খুঁজিতে লাগিল, 'কি খুজিতেছ?' জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, 'ছুরী ছুরী ;' না পাইয়া শয়ন-ঘরের দিকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল ; আবার সেই নিম্নতল ডিঙ্গাইল ; ঘরে গেল ও শয্যায় যেমন ভাবে ছিল, তেমনই ভাবে গিয়া শয়ন করিল ; —আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার কোন্‌টি মিথ্যা বলিব? সেই ব্যক্তির গমনাগমনের, দ্রব্যানুসন্ধানের, সঙ্গত উত্তর দানের—কিছু যদি মিথ্যা বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত অণ্ড-কটাহাচ্ছাদিত এই বিশ্ব মণ্ডলও মিথ্যা বলিতে পারা যায়।

ইংরেজি পুস্তকে আছে, এক জন সৈনিক পুরুষের নিদ্রিতাবস্থায়, তাহার কাণে কাণে কোন কথা বলিলে, সে সেই কথার মর্ম্মানুসারে স্বপ্ন দেখিত। এই স্বপ্ন-দর্শন যদি মিথ্যা হয়, তবে রামের কাণে কাণে শ্যাম আসিয়া যখন মিথ্যা করিয়া বলিল, যে যদু রামকে গালি দিতেছে, আর রাম একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। তখন রামের সেই ব্রহ্ম-রাক্ষস অবস্থাও কেন মিথ্যা বলি না? তা বলিতে পারি না। হায়! কাণে কাণে সঙ্গোপনে, সন্তর্পণে দুই দশটি মিথ্যা কথা গ্রহণ করিয়া আমাদের যে অবস্থান্তর হইয়াছিল, তাহা যদি আমরা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে সংসারের কত কষ্টই না অপসারিত হইত! না রে ভাই! মোহ হইতে অংশত জাত বলিয়া স্বপ্নকেও মিথ্যা বলিতে পারি না। একটি স্বপ্ন দেখিলে, যখন বুকের ভিতর দশ বৎসর রেঁদা চালিতে থাকে, তখন যে বলে সে বলুক, আমি স্বপ্নকে মিথ্যা বলিতে পারিব না। মনকে কেবল চোক ঠারিয়া রাখিবার চেষ্টা করিব কেন?

স্বপ্নে কখন কখন দূরদৃষ্টি হয়। যাহা দেখিবার বা শুনিবার সম্ভাবনা নাই, চক্ষুকর্ণের অগোচর, এমন সকল বিষয় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। পুত্র পীড়িত, পিতা কিছুই জানেন না; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় দেখিলেন, পুত্র রোগশয্যায় কাতর, গৃহিণী পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, চিকিৎসকগণ বিমর্ষভাবে দূরে বসিয়া আছেন। পরে জানা গেল, যে প্রকৃত ঘটনা ঠিক সেইরূপই হইয়াছিল *। এরূপ অবস্থাকে ভ্রমের অবস্থা বলা বাতুলতা মাত্র। এরূপ স্বপ্নের অবস্থা আমাদের সকলেরই স্পৃহণীয় অবস্থা।

এই স্থলে একটি গল্প বলিব। আজ কয়েক বৎসর হইল, বঙ্কিম বাবু কিছু কালের জন্য বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট বা সহকারী ছিলেন। চুঁচুড়ায় তখন কমিশনরের আফিস্। বঙ্কিম বাবুর বাসা আফিসের নিকটেই ছিল। কোন এক মাসের মাহিয়ানার টাকা (নোটে নগদে) এক জন কেরাণী সকলকে বাঁটিয়া দিবার ভার পান; যত টাকা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, বাঁটিয়া দিয়া তাহার চল্লিশ টাকা কম পড়িল। কেরাণীবাবু, কিছু চিন্তিত, কিছু লজ্জিত, কিছু দুঃখিত হইলেন, টাকার অনুসন্ধানের জন্য আফিসে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ডেস্ক বাক্স সমস্তই উলটিয়া পালটিয়া দেখা হইল, হয়ত কালেক্টরি হইতেই কম টাকা আনা হইয়া থাকিবে—এরূপ সন্দেহে সেখানেও তথ্য জানা হইল, টাকার কোন কিনারা হইল না। তাহার পরদিনও ও হইল না। কেরাণী বাবু ম্রিয়মাণ হইলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার পিতা (বহুদিন তাঁহার পরলোক হইয়াছে) পরিচিত বেশে সৌম্যমূর্ত্তিতে তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তুমি দুই কেতা নোট নিজেই আফিস ঘরের (অমুক) কোণের আলমারির একটা বৃহৎ কেতাবের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে

* বিলাতে যে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একবারেই কেহ মানেন না, তাহা নহে। আজি কয় বৎসর হইল, বিলাতের অনেকগুলি মহা-বৈজ্ঞানিক একত্র হইয়া আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। উপরে যেরূপ ঘটনা বিবৃত হইল, এইরূপ ঘটনা সকল বিশেষ বিশ্বস্তসূত্র হইতে সংগ্রহ করণার্থ, এই সভা বিস্তর অর্থব্যয় করিতেছেন। এক স্থানের লোক যে শক্তি দ্বারা সুপ্তাবস্থায় (বা জাগ্রতাবস্থায়) দূরদেশস্থ অন্য স্থলের রূপ, রস, গন্ধাদি অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা সেই শক্তিকে দূরানুভূতি (Telepathy) নাম দিয়াছেন। ইহাতে এমন অনুমান করা যায়, যে য়ুরোপে ক্রমে আত্মার স্বতন্ত্রতা ও ব্যাপকতা স্বীকৃত হইবে।

রাখিয়াছিলে, এখন মনে নাই বলিয়াই এত কষ্ট পাইতেছ, সেইখানে যাও দেখিতে পাইবে।” পরদিন প্রভাতেই কেরাণীবাবু বিস্ময়ে, বিষাদে, বঙ্কিম বাবুর নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া চাবি ও চাপরাশী লইয়া আফিসে গেলেন, নোট দুইখানি লইয়া আসিলেন। এই স্বপ্নে সৃষ্টি দৃষ্টি—স্মৃতি ও কল্পনা—সকলেরই লীলা খেলা আছে বলিতে পার, কিন্তু স্বপ্ন মিথ্যা বলিতে পার না। একটি কার্য্যে কতকগুলি লোকের মনের স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়াছিল, আর একটি কার্য্যে,—স্বপ্নে,শান্তি পুনঃস্থাপিত হইল,শেষের কার্য্য মিথ্যা বলিব কিরূপে? স্বপ্নে কখন কখন আবার ভবিষ্যদ্দর্শন হয়। ইংরাজীনবীশ মাত্রেই ইংলণ্ডের একজন রাজমন্ত্রীর হত্যাকাণ্ডের গল্প শুনিয়াছেন। এমন কত শত স্থলে হইয়া থাকে; ভবিষ্যতের ছোটখাট ঘটনা আমি কত বার স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাহা বলিতেই পারি না। সাঙ্গোপাঙ্গ একটি গুরুতর ঘটনা আমি একবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। আমি একরাত্রি বহরমপুরে থাকিতে হঠাৎ* স্বপ্নে দেখি যে, পূজ্যপাদ পিতৃদেব যেন চট্টগ্রামে কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন, আর আমি তাঁহাকে কলিকাতায় রাত্রিকালে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিতে গিয়াছি। আলোয় জাহাজ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, খালাসীরা কল কল করিতেছে, নীচে গঙ্গা কুল কুল করিতেছে, আর উপরে বায়ু ঝর ঝর করিয়া বহিতেছে। স্বপ্নের কথা দুই এক জনকে বলিয়াছিলাম। ইহার কয় মাস পরে, ঠিক সেইরূপ ঘটনা হইল। তেমনই আলো; তেমনই গঙ্গা; আমার বোধ হইল, সেই রেঙ্গুননামা জাহাজই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম।—স্বপ্ন মিথ্যা আমি কখনই বলিতে পারি না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমরা যদি আপন আপন মনের অন্তপরীক্ষা কর, তাহা হইলে তোমরাও কখন স্বপ্ন মিথ্যা বলিতে পারিবে না।

সময় সময় এমন হয় যে, একটি স্বপ্ন দেখিলে, দুই দণ্ড কাল বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে, শীতের রাত্রিতে মুক্তবাতায়ন-পথে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহরৈক কাল কেবল চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয়, স্বপ্নের পর, বোধ হয়, কি যেন হারাইয়াছে, কি যেন ভুলিয়া গিয়াছি, চন্দ্রমণ্ডলে খুঁজিলেই বুঝি মিলিবে। কখন স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রির শেষার্দ্ধযাম যেন মহাযুগ

* হঠাৎ বলিবার ভাব এই যে, যে বিষয়ে স্বপ্ন দেখি, সে বিষয়ে জাগ্রত অবস্থায় কোন তোলাপাড়াই করি নাই।

বলিয়া মনে হয়, প্রতিপলে হৃদয় যেন খসিয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়, আবার কখন স্বপ্ন দেখিয়া বোধ হয় যে, চির আরাধনার বস্তু বুঝি পাইয়াছি, জীবনের ব্রত বুঝি বুঝিতে পারিয়াছি, এমন কখন-অশান্তিকর, কখন-শান্তি-প্রদ অবস্থাকে মিথ্যা বলিলে চলিবে কেন?

আরও এক কথা আছে। যখন রোগে কাতর, শোকে অস্থির, সংসার-তাড়নায় ব্যাকুল, দুশ্চিন্তায় আকুল, যখন বিষয়-আশীবিষের নিয়ত দংশনে অস্থিমজ্জায় জর্জ্জরিত, অর্থচিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাও না, হিংস্রকের হিংসাভয়ে সর্ব্বদাই ম্লান ও মলিন—নির্দ্দয়, দুর্জ্জয়, সপ্তরথি-বেষ্টিত বালক অভিমন্যুর মত, চারি দিক হইতে তাড়িত, বিতাড়িত, প্রহৃত, লুণ্ঠিত,—সংসারের সেই জাগ্রত কালকে তুমি বল সত্য, আর যখন সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী নিদ্রা তোমার গাত্রে স্বীয় কোমল-কর-পল্লব-স্পর্শে তোমাকে সুস্থ, স্বস্থ, প্রকৃতিস্থ করিলেন, পরের খেয়ালের উপাসনা না করিয়া, তুমি আপনার খেয়াল আপনি দেখিতে লাগিলে,—সেই স্বপ্নের অবস্থা হইল—মিথ্যা। তবে বল, যে শশব্যস্ততাই সত্য—আর শান্তির সুস্থতাই মিথ্যা। তোমরা বলিবে বল, আমি বলিতে পারিব না। আসল কথা, নিতান্ত জড়-সর্ব্বস্ব লোকেরাই বলিতে পারে যে, স্বপ্ন মিথ্যা,—এবং তাহারা বলিলে, তাহার অর্থও বুঝা যায়, যদিও আমরা ক্রমেই জড়গত প্রাণ হইতেছি বলিয়াই, আমার এক এক সময় মনে হয় বটে, কিন্তু আমরা যে নিতান্ত জড়-সর্ব্বস্ব হইয়াছি, এমন ধারণা আমার এখনও হয় নাই; স্বপ্ন নিতান্ত আত্মময়ী অবস্থা—আত্মময়ী অবস্থা যে, ভ্রমের বা মোহের অবস্থা—এ কথা আত্মবান্ লোকে কখনই বলিতে পারে না।

যাহাতে সুখ দুঃখ, আসে যায়, বাড়ে কমে, তাহারই অস্তিত্ব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। যদি এমনই বলা যায় যে, যাহাতে সুখ আসে, বাড়ে, উঠে, ফুটে, তাহাই সত্য, আর যাহাতে দুঃখ হয়, বা বাড়ে, তাহাই মিথ্যা, —তাহা হইলেও জাগ্রত সত্য ও স্বপ্ন মিথ্যা বলিতে পারে না।

স্বপ্নে তন্ময়তা জন্মে; তন্ময়তা হইতে একরূপ মোহ হয়। কিন্তু তা বলিয়া স্বপ্ন মিথ্যা বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে, চিত্র, পুতুল, কাব্য, সঙ্গীত—সকলই মিথ্যা বলিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিতান্ত জড়-সর্ব্বস্ব লোকে তাহা বলিলে বুঝি।

'গোপাল কৈ, গোপাল কৈ' বলিয়া যখন অভিনেত্রী ক্রন্দন করিতে

থাকেন, তখন একরূপ মোহ হয়; মনে হয়, সত্য সত্যই যশোদা আমাদের সম্মুখে বিলাপ করিতেছেন; কিন্তু সে মোহ ক্ষণিক মাত্র; সেটুকু সঙ্গীতের তন্ময়কারিণী শক্তি হইতেই জন্মে। মোহ ভাঙ্গিলে পর, সম্মুখে জড় যশোদাকে না দেখিয়া আমরা যদি বলি সঙ্গীত মিথ্যা—তাহা হইলে, সেই কথায় যেরূপ সুযুক্তি থাকে, আর স্বপ্নে দিল্লী গিয়া স্বপ্ন-ভঙ্গের পর হাতে আরসী নাই বলিয়া স্বপ্ন মিথ্যা বলাও সেইরূপ সুযুক্তি। স্বপ্ন আত্মময়ী অবস্থা, স্বপ্নে আত্মার সুখদুঃখের তারতম্য হয়। স্বপ্ন দেখিয়া চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এমন বহুতর লোকের দৃষ্টান্ত শুনা গিয়াছে—তবে স্বপ্নে জড়পদার্থসম্বন্ধে মোহ হয় বলিয়া, স্বপ্নকে মিথ্যা বলিতে পারা যায় না।

স্বপ্নসম্বন্ধে আমার শেষ কথা এই যে, স্বপ্ন যোগ-জীবনের অনায়াসলব্ধ নমুনা। ভাল জিনিসের নমুনা যদি অনায়াসে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাল জিনিস্‌টা যে কি তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। এই জন্য স্বপ্ন আমাদের অনায়াসলব্ধ বস্তু। কিন্তু অনায়াসলব্ধ বলিয়াই আমরা উহার আদর বুঝিলাম না। টুক্‌রা টুক্‌রা খণ্ড খণ্ড নমুনাকে প্রথমেই ধরিয়া লইলাম যে, ঐটাই আসল জিনিস্; আসল ত নয়, কাজেই বলিলাম, মেকী। কিন্তু আসল মেকী ছাড়া নমুনা বলিয়া যে একরূপ পদার্থ আছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারিলাম না। নমুনার মর্ম্ম না বুঝিয়া তাহা অসার অপদার্থ বলিয়া দূরে ফেলিয়া দিলাম—জানি না সেই মহাজনের মহাজন আমাদের এই নির্ব্বুদ্ধিতার ব্যবহারে হাসিলেন কি রাগিলেন!

মানবের ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া, মানবের চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া,—স্বপ্নে আত্মার সৃষ্টি-শক্তি বৈচিত্র্যময়ী এবং দৃষ্টি-শক্তি প্রখরা, দূরব্যাপিনী এবং কালভেদিনী হয়। আত্মার একদিকে স্থানগত ও কালগত ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে আবার তেমনই তন্ময়তা প্রবলা হইতে থাকে। সুতরাং আত্মশক্তির বোধ বিস্তৃতি উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্বপ্নে যেগুলি অনায়াসে পাওয়া যায়, অথচ ইচ্ছা করিলে কিছুতেই পাওয়া যায় না,—অভ্যাস-যোগে ইচ্ছামত সেইগুলি পাওয়ার নামই যোগ-সিদ্ধি। তাহাতেই বলিতেছিলাম, স্বপ্ন যোগজীবনের অনায়াসলব্ধ নমুনা।

নমুনাকে মেকী জিনিস্ বোধে যদি আমরা হতাদর করিয়া ফেলিয়া দি, তাহা হইলে যে জিনিসের নমুনা, সে জিনিস্‌টা যে কি, তাহা আমরা কখনই বুঝিতে পারিব না। কিন্তু আসল জিনিস্‌টা যে কি, তাহা বুঝা আমাদের

নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যুবক য়ুরোপের দেখাদেখি জড়োন্নতির জন্য আমরা ব্যস্ত হইতেছি, আত্মার উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টিই নাই। আত্মশক্তির যে নানারূপ উন্নতি সম্ভব, তাহা আমরা এখন আর বিশ্বাসই করি না। এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে আমাদের নানা অনর্থ হইতেছে। সে কথা অদ্য সমালোচ্য নহে। তবে এই বলিতে চাই—যে, একস্থানে থাকিয়া অন্যস্থানে বিচরণ—যদি ইচ্ছা না করিয়াও হইতে পারে তবে যাহাতে ইচ্ছামত সেইরূপ করা যাইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করা কি মূঢ়তা? তাহার পর, এমন দেখা যায় যদি, মহাজ্ঞানীরা এইরূপ আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াছেন এবং তাহার জন্য প্রকরণ-পদ্ধতি সমস্তই বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে, সেইগুলি না দেখিয়া শুনিয়া, সমস্তই অবিশ্বাস করা মূঢ়তা নয় কি? এই জন্য কৃতবিদ্যমণ্ডলীর নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা না করিয়া, যাহাতে স্বপ্নের অবস্থা আমরা আমাদের ইচ্ছার আয়ত্ত করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদের সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধ হিন্দুর আশা।

মহাহিন্দু-সমিতি নামে একটী মহাসমিতি-সংস্থাপনের সূচনা।

"ছিন্ন, ভিন্ন, হীনবল,
ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল
করিতে কি ভয়?"

জাতীয় সঙ্গীত।

(১) কেবল হিন্দুরা মহাহিন্দু-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। হিন্দুরা দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত; নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী। বৈদান্তিক ও ব্রাহ্ম নিরাকারবাদী হিন্দু। হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস না থাকুক, তথাপি যখন

তাঁহারা বিবাহাদি গার্হস্থ্য-ক্রিয়াতে প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তখন হিন্দু-সমাজের যেমন অন্যান্য শ্রেণীর লোকদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায়, সেইরূপ হিন্দু তাঁহাদিগকেও গণ্য করা কর্ত্তব্য। বিলাত-ফেরত হিন্দুরা—ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এই দলভুক্ত। সকল প্রকার হিন্দু এই মহাহিন্দু-সমিতির সভ্য হইতে পারেন।

(২) হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা, এবং সাধারণতঃ হিন্দুজাতির উন্নতিসাধন করা মহাহিন্দুসমিতির উদ্দেশ্য। হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। ধর্ম্ম যেমন হিন্দুদিগের প্রিয় পদার্থ, এমন আর কিছুই নহে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের সময়ে নিমতলার ঘাটে শবদাহ-বিষয়ক এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাসসময়ে শালগ্রাম শিলার অবমাননা উপলক্ষে—যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাতে ইংরাজীতে শিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্মেরা সাধারণ হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে ধর্ম্ম যেমন হিন্দুদিগের প্রিয় পদার্থ, এমন আর কিছুই নহে এবং হিন্দুসমাজের কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকারের প্রতি হস্তার্পিত হইলে সমস্ত হিন্দু-সমাজ সমবেত হইয়া যেন একটী মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করে।

(৩) দ্বিতীয় পেরাগ্রাফের প্রথমে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সকল সাধন করিবার জন্য মহাহিন্দু-সমিতি ভারতবর্ষস্থ সকল হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন। ইংরাজী ১৮৫৭ সালে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমতী ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরী দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের রাজ্যভার-গ্রহণ উপলক্ষে তিনি যে মহা-ঘোষণা-পত্র বাহির করেন, বিনীত অথচ আশ্বাসিত চিত্তে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সমিতি উক্ত কার্য্যসাধন করিবেন। ইহা যথার্থ যে, হিন্দুদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অথবা জাতিবিভেদসম্বন্ধীয় বৈচিত্র্য আছে; কিন্তু এক রাজার অধীন হওয়াতে রাজভক্তিতে ও রাজনৈতিক উন্নতির আশাতে সকল হিন্দুর ঐক্য আছে। এত দিন উক্ত ঐক্য নিগূঢ়রূপে বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে উক্ত রাজকীয় মহৎপত্রী সমস্ত হিন্দুজাতির দৃষ্টিসম্মুখে সেই ঐক্য জাজ্বল্যমান-রূপে আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে সকল হিন্দু-সম্প্রদায় ও জাতি পরস্পর সদ্ভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে এবং সাংসারিক উন্নতি-সৌভাগ্যের সমান আশা লাভ করিয়াছে। এক্ষণে

তাহারা অনায়াসে জাতীয় উন্নতি সাধন করিবার জন্য আপনাদিগের মত-বিভেদ ও জাতি-বিভেদ ভুলিয়া ঐক্য ভাবে কার্য্য করিতে পারে। ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর সকল হিন্দুর উপাস্য, ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবী তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের অথবা গুণের রূপকমাত্র। হিন্দুধর্ম্মের এই সাধারণ ভাব, হিন্দু-দিগের আচার ব্যবহার যাহা ভারতবর্ষের সকল হিন্দু জাতির আছে, হিন্দু-দিগের সাধারণ গৌরবসূচক পুরাকালের মহিমার প্রবাদ—এই সকলকে পত্তন-ভূমি করিয়া ভারতবর্ষীয় সমস্ত হিন্দু জাতির উল্লিখিত ঐক্য সাধন হইতে পারে। প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও উক্ত মহিমার প্রবাদ সকল অবলম্বন করিয়া পতিত জাতি উত্থিত হইতে সমর্থ হয়। আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত উক্ত ঐক্য সাধন হইতে পারে না, যে হেতু তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, পুরাকালীন প্রবাদ, আমাদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, পুরাকালীয় প্রবাদ হইতে ভিন্ন। কিন্তু যখন আমরা একদেশবাসী ও এক রাজার অধীন, তখন তাঁহাদিগের সহিত অন্য ঐক্য না হউক, রাজনৈতিক ঐক্য অবশ্য সাধিত হইতে পারে। ইহার প্রমাণ, সুরেন্দ্রবাবুর কারাগার-গমন-সময়ে মহারাজনৈতিক আন্দোলন এবং লর্ডরিপণের বিলাত গমন সময়ে তাঁহার অভিনন্দনে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য। আমাদিগের সহিত মুসলমান ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম-বিষয়েও একপ্রকার ঐক্য সাধন হইতে পারে। সুরেন্দ্র বাবুর কারাগার উপলক্ষে জজ্ নরিস কর্ত্তৃক শালগ্রাম শিলার অবমাননা লইয়া যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাতে উক্ত অবমাননার কার্য্য দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বত্ব ও অধিকার আক্রমণ করা হইয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতিবাদার্থ মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সহিত এক হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে পাটনা নগরে কোন মৌলবী উক্ত আক্রমণের বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। এ প্রকার ঐক্যসাধন ব্যতীত মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের গাঢ় সম্মিলন পূর্ব্বে উল্লিখিত কারণ সকল জন্য অসম্ভব। কিন্তু হিন্দুদিগের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ প্রিয় বস্তু রক্ষা জন্য তাঁহাদিগের এইরূপ সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। এই সূচনা-পত্রের প্রণেতা হিন্দু ও মুসল-মানদিগের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। মহাদেশসাধারণ-সভা (National Congress) এবং প্রজা সমিতিতে (Mass meeting) এই প্রকার ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত গাঢ় সম্মিলন হওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু যে প্রণালীতে মহাহিন্দু-সমিতি সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব

হইতেছে, এইরূপ প্রণালী অনুসারে তাঁহাদিগের জাতীয় ভাবানুযায়ী আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের দ্বারা একটি মহামুসলমান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং এই উভয় সমিতি রাজনৈতিক আন্দোলনে একত্র কার্য্য করিতে পারে। মুসলমানদিগের সহিত রাজনৈতিক ঐক্যসাধন-বিষয়ে জাতিগত প্রতিবন্ধক থাকিতে দেওয়া উচিত হয় না। আমাদিগের স্বজাতি অর্থাৎ হিন্দুজাতির উন্নতি জন্য যদি আমরা একটি সমিতি স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করি; মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত গাঢ় সম্মিলন অসম্ভব বলিয়া মহহিন্দু-সমিতি সংস্থাপন না করা বিধেয় নহে। সকল দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সকল কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য হওয়া কর্ত্তব্য।

(৪) মহাহিন্দু-সমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা থাকিবে,* তাহাতে "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" এই বাক্য অঙ্কিত থাকিবে। এই বাক্যের নিম্নে একটি পদ্ম-পুষ্পের প্রতিকৃতি থাকিবে। পদ্ম পুষ্প এ দেশে ঈশ্বরের সৃজন-শক্তি এবং দেবপূজার সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ গণিত হইয়া থাকে। ইহা হিন্দু দেব-দেবীর পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সহিত সহস্র প্রকারে জড়িত রহিয়াছে। উহা এই দেশের ভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপও গণ্য হইতে পারে। যেমন গোলাপ পুষ্প ইংলণ্ডের চিহ্ন, মিসেলটো পুষ্প স্কটলণ্ডের চিহ্ন, শ্যামরক পুষ্প আয়র্লণ্ডের চিহ্ন, স্থলপদ্ম ফ্রান্সের চিহ্ন, তেমনি পদ্ম ভারতবর্ষের চিহ্নস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। মহাহিন্দু-সমিতির প্রত্যেক সভ্য উক্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও মহাবাক্য নিজ নিজ অঙ্গুরীয়ের উপর অঙ্কিত করিয়া তাহা ধারণ করিবেন। এই রূপ অঙ্গুরী ধারণ মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইবে।

(৫) হিন্দুদিগের মতে সকল বিষয়েরই ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। মহা-হিন্দু-সমিতির অধিবেশনে হিন্দু-সমাজের সকল প্রকার উন্নতি অর্থাৎ হিন্দু

---

* "Patriotism, the life flowing out of national instincts is one of the characteristic types of true spiritual life in a nation; and, from this point of view, a banner, a flag, a color, an emblem of any kind that has become associated with a nation, must always be sacred. That nation is near destruction, if not already destroyed, that has no outward symbol of its unity which and under which its sons can gather."

Tha "Dawn" quoted in the "Liberal" 6th, April, 1884.

দিগের ধর্ম্ম, শরীর, মন, নীতি, রাজনীতি, কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতি-বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। ধর্ম্মবিষয়ে কেবল সাধারণ হিন্দুবর্গের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। সাম্প্রদায়িক বিষয়ে যেমন ঘোরতর মনোবাদকারী তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা, এই সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ে সেরূপ তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সামাজিক বিষয় আদপে বিতর্কিত হইবে না; যেহেতু উহা হিন্দু-সমাজের মধ্যে ঘোরতর বিবাদস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা আলোচনা করিতে গেলে সভ্যদিগের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। সমাজ-সংস্কার কার্য্য সমাজ-সংস্কারকের হস্তে অর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত বিষয় সকল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠের পর প্রবন্ধের বিষয় লইয়া তর্ক হইবে। প্রস্তাব পাঠ ও তর্ক ব্যতীত সমিতিতে এমন সকল বক্তৃতা করা হইবে, যাহা ভারতের পূর্ব্ব-মহিমার স্মৃতি সভ্যদিগের মনে জাগরিত করিয়া এবং ভারতের বর্ত্তমান অনুন্নত অবস্থার প্রতি তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় ভাব অবতারিত এবং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে ঐক্য সাধন করিতে পারে।

বক্তৃতার নমুনা।

"হিন্দু নাম আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দু নামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতী-নদী-তীর-বাসী আদিম আর্য্যদিগের বরণীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"ত্বং হি নো পিতা বসো ত্বং হি নো মাতা," "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতণাম্" "স্বাদু সখ্যং সাদ্বী প্রণীতি" "ত্বং অস্মাকং তবাস্মি।" "তুমি আমাদিগের পিতা, তুমি আমাদিগের মাতা," "তুমি সখা, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা," "তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু," "তুমি আমাদিগের, আমরা তোমার।" হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিত্তির ঋষির বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়া গিয়াছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" "যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে আপনার হৃদয়া-

কাশে স্থিত বলিয়া মানেন, তিনি সেই জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন।" হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই বরণীয় আর্য্যমূর্ত্তি মাণ্ডুক্য আসিয়া উপস্থিত হয়েন, যিনি বলিয়াছেন, "শান্তং শিবমদ্বৈতং" "তিনি শান্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ এবং অদ্বৈত স্বরূপ।" যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরজটাকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়, যিনি বলিয়াছেন,"আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।" "আপনার মঙ্গলের যাহা প্রতিকূল, পরের প্রতি তাহা করিবে না।" যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে মধুরস্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন, "যুক্তিযুক্তং উপাদেয়ং বচনং বালকাদপি অন্যং তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যযুক্তং পদ্মজন্মনা।" "বালক যদি যুক্তিযুক্ত বাক্য বলে, তাহা উপাদেয়; আর স্বয়ং ব্রহ্মা যদি অযুক্তিযুক্ত বাক্য বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।" হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই নবীন দূর্ব্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েন, যিনি পিতৃসত্য-পালন নিমিত্ত চতুর্দশ বৎসর কাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও সংযত মনের এবং পরস্পর বিপরীত গুণের সামঞ্জস্যের সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মানসক্ষেত্রে সেই নন্দের নন্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েন, যিনি জ্ঞানীর শিরোমণি, প্রেমিকের শিরোমণি, যিনি ধর্ম্মবক্তার প্রধান, যাঁহার কথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কালেও ভারতবর্ষে ও য়ুরোপখণ্ডে উভয়ত্রই স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে; যিনি ভক্তি ও প্রেমধর্ম্মের সংস্থাপক অথচ রাজনীতিজ্ঞ ও কৌশলীদিগের চূড়ামণি, যাঁহার বিচিত্র মহিমা কবীন্দ্রসকল স্বীয় স্বীয় রচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থে যথোপযুক্তরূপে বর্ণন করিতে পরাস্ত হইয়াছেন, যাঁহার পরমাদ্ভুত চরিত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে চিরকালই হারি মানিয়াছেন ও মানিতেছেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হয়েন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম্ম শব্দের প্রতিবাক্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, সেই

অলোক-সামান্য পুরুষ আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যুসাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ নাম উচ্চারিত হইলে, সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও, এক মুহূর্ত্ত অধ্যাত্ম যোগ হইতে স্খলিত হইতেন না। এই নাম উচ্চারণ করিলে, মহাত্মা পুরুরাকে স্মরণ হয়, যিনি এলেক্জাণ্ডারের নিকট শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেক্জাণ্ডার "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "এক রাজা অন্য রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবেন" এই উত্তর দিয়াছিলেন। হিন্দুনাম কি মনোহর! ঐ নাম কি আমরা কখন পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ধারণ করে; এই নাম দ্বারা বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, রজপুত, মাহারাট্টা, মাদ্রাজী—সমস্ত হিন্দুগণ একহৃদয় হইবে; তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে; সকল প্রকার স্বাধীনতালাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আর্য্য-শোণিতের শেষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে, সেই পর্য্যন্ত আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা আমাদিগের জাতীয় ভাব কখন পরিত্যাগ করিব না। মহাত্মা নিউমান্ বলিয়াছেন, "জাতীয় ভাব প্রত্যেক সুস্থমনা ব্যক্তি সম্বন্ধে মাতা এবং স্ত্রীর ন্যায় প্রিয় ও পবিত্র বস্তু।" আমরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্‌প্রকারে কি অন্য জাতির ক্রীতদাস হইব? আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস হইব না! আমাদিগের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে। হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে, তাহারা বলে, তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে। হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইবে। হিন্দুরা প্রাচীনকালে তাহাদিগের ধর্ম্মোৎপাদিকা সভ্যতার জন্য বিখ্যাত ছিল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও নীতি হিন্দুদিগের পৈতৃক অধিকার। বাহ্য বিষয় সম্বন্ধীয় সভ্যতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সভ্যতা শ্রেষ্ঠ—কিন্তু যেমন আমরা পূর্ব্বকালের আধ্যাত্মিক সভ্যতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিব, তেমনি বাহ্য বিষয় সম্বন্ধীয় সভ্যতাও বৃদ্ধি করিব। আমরা

আশা করি,এইরূপে আমাদিগের জাতি,পৃথিবীর সকল জাতির অগ্রণী হইবে; কিন্তু আমরা যদি জাতীয় ভাব হারাই, তাহা হইলে এইরূপ অগ্রণী-পদলাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা ত রাজ্যবিষয়ে স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার কি সামাজিক রীতিনীতিবিষয়েও স্বাধীনতা আমাদিগকে হারাইতে হইবে? মহাকবি হোমর বলিয়াছেন, "যখনই মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্দ্ধেক পুরুষত্ব হারায়।"যদি আমরা সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি,আর কি আমাদিগের উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে কি মনের বীর্য্য থাকে? মনের যদি বীর্য্য গেল, তবে উন্নতিলাভ কি প্রকারে হইবে? হিন্দুজাতি এই রূপে সর্ব্বপ্রকারে পর-হস্তগত হইয়া কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? আমার ত ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, পুনরায় হিন্দু সেই বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ও ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন স্বজাতির উন্নতিসম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন, "Methinks I see in my mind a noble and puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep, and shaking her invincible locks; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazled eyes at the full mid-day beam."—আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি "আমি দেখিতেছি, আমার সম্মুখে মহাবল-পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর-কুন্তল পুনরায় পরিপাটী করিতেছে এবং দৈব বিক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে। হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দু-জাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

এইরূপ এবং অন্যরূপ বক্তৃতা মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যগণ নানাস্থানে বিঘোষিত করিবেন।

(৬) ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে মহাহিন্দুসমিতির শাখা সকল সংস্থাপিত হইবে। এই সমস্ত শাখার সমষ্টি মহাহিন্দুসমিতি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) প্রত্যেক শাখায় এক জন সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক থাকিবেন। কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইবেন। যদি

সংস্কৃতজ্ঞ ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য অথবা শাস্ত্রী-শ্রেণীমধ্যে তেমন উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিকে না করিয়া তাঁহাকেই উক্ত পদে মনোনীত করা হইবে।

(৮) যে ঘরে শাখা-সভার অধিবেশন হইবে, তাহার দ্বারে নারিকেল ফল ও আম্রশাখাযুক্ত পূর্ণকুম্ভ ও কদলী বৃক্ষ সংস্থাপিত হইবে। যে গালিচা বা মাজুরির উপরে অধিবেশন হইবে, তাহার মধ্যস্থলে পুষ্প-পূর্ণ পুষ্প-পাত্র শোভার্থ রাখা হইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত ভারতীয় চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি ও "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" এই বাক্য-অঙ্কিত ধ্বজা প্রতি অধিবেশনে সভাগৃহের উপরে সংস্থাপিত হইবে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধুনা পোড়ান হইবে ও ধূপ দীপ জ্বালা হইবে এবং শঙ্খধ্বনি করা হইবে। দিবসে অধিবেশন হইলেও দীপ জ্বালা হইবে।

(৯) সম্পাদক, উপস্থিত সকল সভ্য যেরূপ আপনি আপনি বসিয়া গিয়াছেন, সেই অনুসারে সকলের কপালে চন্দনচিহ্ন ও গলায় মালা দিয়া সমিতির কার্য্য আরম্ভ করিবেন। তার পর সভাপতি সকল হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপযোগী, ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃত, নিম্নলিখিত স্তব দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিবেন; সভ্যেরাও তৎসময়ে দণ্ডায়মান থাকিবেন।

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব॥
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্॥
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ।
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্॥"

"তুমি মুমুক্ষু ব্যক্তির জ্ঞাতব্য পরম ব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের উৎকৃষ্ট আশ্রয়,

তুমি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক, ও নিত্য পুরুষ। তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই এবং তোমার প্রভাবও অনন্ত। আমি দেখিতেছি তোমার বাহু অনন্ত, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র এবং প্রদীপ্ত হুতাশন তোমার মুখ। তুমি স্বতেজে এই বিশ্বকে প্রদীপ্ত করিতেছ। তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তুমি পরম ধাম, হে অনন্তরূপ! তুমিই এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছ। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় তোমাকে সহস্রবার নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার। তুমি অনন্তপ্রভাব, তুমি অমিতবিক্রম, সকলই তোমার আয়ত্তাধীন, অতএব তুমি সর্ব্বস্বরূপ। তুমি চরাচর ভুবনের পিতা, তুমি পূজ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। ত্রিলোকে তোমার সমান কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। তোমার প্রভাব অসীম। তুমি স্তবনীয় ঈশ্বর, এই জন্য আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গ শরীরে প্রণাম করিতেছি; তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও*।"

সভাপতি উক্ত স্তব উভয় সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় পাঠ করিলে পর সকলে সাষ্টাঙ্গ শরীরে ঈশ্বরকে প্রণাম করিবেন। তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইলে সভাপতি বলিবেন, "ঈশ্বরের যে অমিত প্রভাব আমি এক্ষণে কীর্ত্তন করিলাম, সেই প্রভাবের অণুমাত্র আমাদিগের উপর অবতরণ করিয়া আমাদিগের সমিতির পবিত্র কার্য্যে সাহায্য প্রদান করুক। ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া যাহাকে আমি এই মাত্র কীর্ত্তন করিলাম, তিনি আমাদিগের প্রিয় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন।" তৎপরে সভাপতি ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের কেবল মাত্র নিম্নলিখিত বাঙ্গলা অনুবাদ পাঠ করিবেন।

"একত্রে গমন কর, একত্রে কথা কহ, তোমাদিগের মন এক বলিয়া জান, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমাদিগের হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের চেষ্টা এক হউক, তাহা হইলে মঙ্গল তোমাদিগের অনুগামী হইবে।"

---

*ভগবদ্গীতা হইতে সঙ্কলিত এই স্তোত্র জন্য আমি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে ঋণী আছি। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা প্রকার আকারবাদীর সভার নিমিত্ত এই প্রকার অসম্প্রদায়িক স্তোত্র না হইলে চলে না।

উক্ত মন্ত্রার্থ পঠিত হইলে পর, উপস্থিত সভ্যসকল উল্লিখিত দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিয়া সমস্বরে বলিবেন, "আমরা ঐরূপ করিব, আমরা ঐরূপ করিব; জাতীয় ঐক্যকে নমস্কার করি, জাতীয় ঐক্যকে নমস্কার করি।" তৎপরে সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যগণ উল্লিখিত দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিয়া সমস্বরে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী" এই শ্লোকার্দ্ধ, তিন বার বলিবেন। তৎপরে উপবিষ্ট হইবেন। তৎপরে কোন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত আর্য্যনামাবলী পাঠ করিবেন। এই আর্য্যনামাবলীতে ভারতবর্ষের বিখ্যাত আর্য্যদিগের নাম উল্লিখিত আছে। মহাহিন্দুসমিতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা সকল আপন আপন অভিমতানুসারে তাহাতে নূতন নাম সংযুক্ত করিতে পারেন। আর্য্যনামাবলী পঠিত হইলে পর সাধারণ হিন্দু মহাত্মাদিগের কীর্ত্তনপূর্ণ গান গীত হইবে। ঐ আর্য্যনামাবলী ও গান ইহার পরেই দেওয়া গেল।

আর্য্যনামাবলী।

রাজা।

(১) মান্ধাতা
(২) পুরুরবা
(৩) সগর
(৪) দিলীপ
(৫) ভগীরথ
(৬) অজ
(৭) দশরথ
(৮) পরশুরাম
(৯) শ্রীরামচন্দ্র
(১০) লব
(১১) কুশ
(১২) জরাসন্ধ
(১৩) দুর্য্যোধন
(১৪) যুধিষ্টির
(১৫) নন্দ
(১৬) মহানন্দ
(১৭) চন্দ্রগুপ্ত
(১৮) হরিশ্চন্দ্র
(১৯) তেজশেখর
(২০) বিক্রমাদিত্য
(২১) দেবপাল দেব

বীর।

(১) রাম
(২) লক্ষ্মণ
(৩) শ্রীকৃষ্ণ
(৪) ভীম
(৫) অর্জ্জুন
(৬) ভীষ্ম
(৭) কর্ণ

(৮) দ্রোণ
(৯) কৃপ
(১০) বঙ্গদেশের বিজয় সিংহ
(১১) পুরু (সেকন্দার সাহার প্রতিপক্ষ)
(১২) কাশ্মীরের ললিতাদিত্য
(১৩) পৃথুরায়
(১৪) রাণা প্রতাপ সিংহ
(১৫) শিবজি
(১৬) যশোমন্তরায় হোলকার
(১৭) রণজিৎ সিংহ

বীরাঙ্গনা।

(১) সীতা
(২) সাবিত্রী
(৩) দময়ন্তী
(৪) দুর্গাবতী
(৫) পদ্মাবতী
(৬) সমরশীর স্ত্রী কর্ম্মদেবী
(৭) পত্তুর মাতা কর্ম্মদেবী
(৮) পত্তুর ভগিনী কর্ণাবতী
(৯) পত্তুর স্ত্রী কমলাবতী

কবি।

(১) বাল্মীকি
(২) ব্যাস
(৩) কালিদাস
(৪) ভবভূতি
(৫) মাঘ
(৬) শ্রীহর্ষ
(৭) জয়দেব

দার্শনিক।

(১) ব্যাস
(২) বশিষ্ঠ
(৩) গৌতম
(৪) জৈমিনী
(৫) কপিল
(৬) পতঞ্জলি
(৭) কণাদ
(৮) শঙ্করাচার্য্য
(৯) মাধবাচার্য্য

পুরাবৃত্ত-লেখক।

(১) রাজতরঙ্গিণীর লেখকগণ

জ্যোতির্ব্বেত্তা।

(১) বরাহমিহির
(২) ভাস্করাচার্য্য
(৩) আর্য্য-ভট্ট *

* সংস্কৃত ভারতবর্ষের বিশ্বজনীন ভাষা এবং সংস্কৃতে লিখিত পুস্তক সকল ভারতবর্ষের সকল হিন্দু জাতির সাধারণ সম্পত্তি হওয়াতে কেবল সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তাগণের নাম এই ফর্দ্দে উল্লিখিত হইয়াছে।

গীত।

(রাগিণী সাহানা, তাল ঝাঁপতাল)

আর্য্যগুণনিধিগণে করহে স্মরণ,
ধরাধামে সে নিধির নাহিক তুলন।
আর্য্য-শূর সম শূর,
আর্য্য-কবি সম কবি,
আর্য্য-জ্ঞানী সম জ্ঞানী,
মিলিবে কোথায়? খুঁজি এস,
ত্রিভুবন।
মনে কর না এমন,
পুনঃ হবে না কখন,
ভারত আকরে এ হেন গুণ-রতন।

(২)

য়ুনান জাগিল,
ইটালী জাগিল,—
জাগিবে না কি—ভারত পুনঃ?
নব রবি সম জাপান উদিল,
উদিবে না কি ভারত পুনঃ?
গাহিবে নাকি দ্বিতীয় বাল্মীকি?
যোধিবে না কি দ্বিতীয় অর্জ্জুন?
চিন্তিবে না কি দ্বিতীয় শঙ্কর?
গণিবে না কি দ্বিতীয় ভাস্কর?
নব্য ভারত হবে কি ন্যূন?

(৩)

আর্য্য-গুণ-নিধি স্মরি,
পদ-চিহ্ন অনুসরি,
উন্নতি বন্ধুর পথে চল হে সকলে।
ধর্ম্মরূপ বর্ম্মপরি,
ধৃতি অসি করে করি,
কুসমূহ* সনে রণ করহ সকলে।

(৪)

ঈশ্বর উপরে,
সাহস অন্তরে,
লাগ লাগ ভারত উদ্ধারে।
অসুর-নিচয়
হইবে হে জয়,
ধর্ম্ম যুদ্ধে কে বারিতে পারে?
নিত্য স্বর্গ—তার
যে হে একবার
সে সমরে প্রাণ দিতে পারে।"

আর্য্যনামাবলী পঠিত ও ঐ সকল গান গীত হইলে অধিবেশনের নিয়মিত কার্য্য আরম্ভ হইবে। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

(ক) শাখা সমিতি অথবা সমস্ত সমিতি দ্বারা—অনুষ্ঠীয়মান হিন্দুজাতির সাধারণের উন্নতিসাধক কোন কার্য্য সম্বন্ধীয় পরামর্শ।

(খ) সমস্ত হিন্দু জাতির সাধারণ কুশল-সাধক বিষয় সম্বন্ধীয় কোন লিখিত প্রস্তাব যদি কোন সভ্য পাঠ করিতে চাহেন, তাহা পাঠ করিবেন।

* সকল প্রকার মন্দ।

(গ) সভ্যদিগের দ্বারা উক্ত প্রস্তাবের বিষয় আলোচনা।

(ঘ) স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক বক্তৃতা। যদ্যপি সমিতির কোন অনুষ্ঠীয়মান কার্য্য-সম্বন্ধীয় কোন বিবেচনার বিষয় থাকে, প্রস্তাব পাঠ ও বক্তৃতা না হইয়া কেবল তাহাই আলোচিত হইবে। বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাঠ অপেক্ষা কার্য্য অধিক প্রয়োজনীয়। সভার কার্য্যের পরে "বন্দে মাতরং", "জয় ভারতের জয়" প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত সকল গীত হইবে। পরিশেষে জাতিসাধারণ রাজ-মঙ্গল গীতি (National Athem) গীত হইলে এবং সভাপতি আশীর্ব্বচন ঘোষিত করিলে সভা ভঙ্গ হইবে। জাতিসাধারণ রাজমঙ্গল গীতি গীত হইবার সময় সকলে দণ্ডায়মান থাকিবেন।

(৯) স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু সিমন্তিনীগণ যে ঘরে সমিতির অধিবেশন হইবে, তাহার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী অন্য কোন ঘরে বসিবেন। দুই ঘরের মধ্যে একটি পর্দা ফেলা থাকিবে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিতব্য ক্রিয়া-পদ্ধতিতে সমস্বরে বলিবার জন্য যে সকল বাক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,সেই সকল বাক্য উচ্চারণ করিবার সময়ে তাঁহারা পরদার ভিতর হইতে পুরুষদিগের সঙ্গে যোগ দিবেন। এবং উল্লিখিত গীত সকলের মধ্যে প্রত্যেক গীত পুরুষেরা গাইলে পর, তাঁহারা তাহা গাইবেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি যে সকল দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত আছে, সেখানে উল্লিখিত পরদার আবশ্যক নাই, কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(১০) যে স্থানে সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানে যে ভাষা প্রচলিত, সেই ভাষাতে তাহার কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

(১১) মহাহিন্দুসমিতির সভ্যেরা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানের সভ্যগণ হিন্দি ভাষা ও দেবনাগর অক্ষর বা বঙ্গাক্ষর অবলম্বন করিয়া পরস্পর পত্র লিখেন ও আলাপ করেন, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবেন। ঐরূপ আলাপের জন্য বিদেশীয় ভাষার সাহায্য লওয়া স্বদেশপ্রেমী হিন্দুদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয়। বঙ্গদেশে ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যেখানকার প্রচলিত ভাষা হিন্দি নহে, তথাকার সভ্যদিগের উক্ত কার্য্যসাধন জন্য হিন্দি শিখা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা হিন্দি শিখেন, ইংরাজী ভাষা অগত্যা উক্ত আলাপের উপায় হইবে। ভারতবর্ষের কোন বিশেষ দেশে সংস্থিত ভিন্ন-ভিন্ন শাখা সমিতির সভ্যেরা পরস্পরকে অবশ্যই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতে পত্রাদি

লিখিবেন। স্বদেশপ্রেমী ও মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তিদিগের ইহাই করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করিলে সেই দেশের অতি অল্প লোকেই ইংরাজী জানে, অতএব সেই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতেই সভার কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে আলাপ অথবা তাহাদিগকে পত্র লিখিবার সময় হিন্দি (অগত্যা ইংরাজী) ব্যবহৃত হইবে।

(১২) প্রত্যেক গ্রাম বা নগর যেখানে শাখা সমিতি সংস্থিত, সে নগরে অথবা গ্রামে মধ্যে মধ্যে নগর-সংকীর্ত্তন হইবে, তাহাতে "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক বাক্য-অঙ্কিত ধ্বজা সকল হস্তে বাহিত হইবে। ঐ নগরসংকীর্ত্তনে জাতীয় সঙ্গীত সকল গীত হইবে। যদ্যপি শাখার সভ্যেরা খোল করতাল ঐরূপ সঙ্গীতের উপযুক্ত অঙ্গ মনে না করেন, তাহা হইলে অন্য বাদ্য ব্যবহার করিতে পারেন।

(১৩) মহাহিন্দুসমিতি যুবকদিগের জন্য ব্যায়ামাগার সংস্থাপন করিবেন এবং তাহাদিগকে ব্যায়ামাভ্যাস ও পৌরুষসূচক ক্রীড়া করিতে উৎসাহ প্রদান করিবেন। অস্ত্র-আইন প্রযুক্ত ভারতবর্ষের লোকেরা বন্য পশু এবং বন্য পশু অপেক্ষা নির্দ্দয় দস্যু তস্কর হইতে এক্ষণে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম। অস্ত্রের ব্যবহারের অভাবে তাহারা ক্রমে ভীরু ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যে জাতি পৃথিবীর অন্য জাতি অপেক্ষা জনসংখ্যায় অধিক এবং এক সময়ে সাহস জন্য বিখ্যাত ছিল, সেই জাতি উক্ত আইন বশত হীনবীর্য্য ও পৌরুষহীন হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেনা আহরণের উপায় ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে; অতএব মহাহিন্দুসমিতি উক্ত আইন রদ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত আন্দোলন করিবেন।

(১৪) মহাহিন্দুসমিতি যত দূর সাধ্য, দেশীয় শিল্পে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং য়ুরোপীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবেন। আমরা এ বিষয়ে অনেক করিতে পারি, অল্প করিয়া যেন আমরা তাহাই "যত দূর সাধ্য" মনে না করি। মহাহিন্দুসমিতি দেশীয় শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয় সকল এবং কাপড়ের কল প্রভৃতি সংস্থাপনে যত্নবান্ হইবেন।

(১৫) মহাহিন্দুসমিতি ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতির জন্য এবং দিন দিন

গোজাতির যে অবনতি হইতেছে, তাহা নিবারণ জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিবেন। ভারতবর্ষের লোক কৃষিজীবী। গাভী যেমন তাহাদিগের উপকারী, এমন অন্য কোন জন্তু নহে; এজন্য তাহারা গাভীকে অতি পবিত্র জীব জ্ঞান করে। গোদুগ্ধ হিন্দুজাতির প্রধান আহার। তাহা তাহাদিগের বলবীর্য্যের প্রধান কারণ। গোজাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন জন্য চেষ্টা যেমন সাধারণ হিন্দুজাতির ঐক্য সাধনের উপায়, এমন অন্য কিছু নহে।

(১৬) মহাহিন্দুসমিতির মফস্বলবাসী সভ্যেরা নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগকে হিন্দুনীতি শিক্ষা এবং কৃষি বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয় সকল সংস্থাপনে যত্নবান্ হইবেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে প্রাচীন হিন্দুদিগের মহিমা ও ধার্ম্মিকতা বিষয়ে এবং তাহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা মোচন এবং বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন জন্য বক্তৃতা করিবেন্।

(১৭) মহাহিন্দুসমিতি আপনাদিগের অধীনে নানা স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিবেন। সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণে সমিতি যত্নবান্ হইবেন।

(১৮) মহাহিন্দু সমিতি বক্তা ও গায়ক নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল বক্তা ও গায়ক আর্য্য কীর্ত্তিকীর্ত্তন করিয়া লোকের মনে স্বদেশপ্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবেন কিন্তু এই কীর্ত্তন সাম্প্রদায়িকভাবে হইবে না, সাধারণ হিন্দুভাবে হইবে। ইহারা নানা স্থানে মহাহিন্দুসমিতির শাখা সংস্থাপনে ও সমিতির অন্যান্য কার্য্য সাধনে যত্নবান্ হইবেন।

(১৯) ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও প্রত্যেক গ্রামে মহাহিন্দুসমিতির শাখা সংস্থাপিত হইবে। এই সকল শাখা পরস্পর স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন; কিন্তু সকলেই সমিতির সাধারণ উন্নতির জন্য যত্নবান্ হইবেন। গ্রামস্থ সমিতি সকল নাগরিক সমিতির এবং নাগরিক সমিতি সকল মহানাগরিক সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। মহানাগরিক শাখাসমিতি সকল নিম্নলিখিত নামে আখ্যাত হইবে।

(১) কলিকাতা শাখাসমিতি

(২) বোম্বাই শাখাসমিতি

(৩) লাহোর শাখাসমিতি

(৪) প্রয়াগ শাখাসমিতি

(৫) মান্দ্রাজ শাখাসমিতি।

সকল গ্রাম্য, নাগরিক এবং মহানাগরিক শাখার সমষ্টি মহাহিন্দুসমিতি নামে আখ্যাত হইবে। ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, প্রবল জাতীয় ভাবে গঠিত উক্ত গ্রাম্য সমিতি সকল ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের মহোপকারী হইবে।

(২০) প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশের মহানগরে সেই দেশের সকল শাখা-সমিতি হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের একটি সাধারণ সভা হইবে এবং প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষের সকল স্থানের শাখা সমিতি হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের মহাসভা হইবে। এই মহাসভার অধিবেশন কোন বৎসর কলিকাতা, কোন বৎসর বোম্বাই এইরূপ কোন মহানগরে হইবে। মহাদেশ সাধারণ সমিতি (National Congress) যাহা বৎসর বৎসর কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে হইতেছে, সেই মহাসমিতিতেও মহাহিন্দু সমিতির শাখা সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। সেই সকল প্রতিনিধি তথায় আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত একত্র কার্য্য করিবেন।

(২১) প্রত্যেক সভ্যকে সভ্য হইবার পূর্ব্বে সমিতিকে প্রবেশ-দক্ষিণা স্বরূপ এক টাকা এবং বাৎসরিক দাতব্য এক টাকা অথবা অধিক দিতে হইবে।

এই অনুষ্ঠানপত্র এক্ষণে হিন্দুসমাজের বিবেচনার জন্য অর্পিত হইল। যদ্যপি ইহা কোন গ্রাম অথবা নগর অথবা নগরের বিশেষ পল্লীর ব্যক্তিদিগের মনোনীত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা একেবারেই শাখা সংস্থাপন করিতে পারেন; পরে ঐ সকল সভার মধ্যে যোগ সংস্থাপিত হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত না এইরূপ যোগ সংস্থাপিত হয়, প্রত্যেক শাখার সভ্যেরা আপনাদিগের সংগৃহীত অর্থ কেবল সেই শাখার ব্যয়ে অর্পণ করিতে পারেন।

বৃদ্ধ হিন্দু।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥"

গীতা, ৮—১৮।

১। এই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার।

রাত্রিকালে আমরা যে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে পাই, তাহার এক একটি তারকা এক একটি সূর্য্য। আমাদের সূর্য্যও একটি ক্ষুদ্র তারকা মাত্র; অনেক তারকা ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর। সহজ দৃষ্টিতে আমরা ছয় হাজারের অধিক তারা দেখিতে পাই না; কিন্তু দূরবীক্ষণ-গোচর তারার সংখ্যা প্রায় দুই কোটী। দূরবীক্ষণেরও অগোচর কত নক্ষত্র জগতে রহিয়াছে, কে বলিতে পারে?

এই জগৎ অতি বিশাল। আমাদের ক্ষুদ্র সূর্য্যটির আয়তন পৃথিবীর বার লক্ষ গুণ। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ৯ কোটী ২০ লক্ষ মাইল। সর্ব্বাপেক্ষা সমীপবর্ত্তী নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে সাড়ে তিন বৎসর অতীত হয়; আলোকের বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল। এতদ্রূপ কিম্বা ইহা অপেক্ষাও অধিক ব্যবধানে রহিয়া দুই কোটী তারকা বিচরণ করিতেছে, মনে কর জগৎ কত বড়! দূরবীক্ষণ-গোচর দূরতম প্রদেশস্থ তারকা হইতে আলোক আসিতে ৩৫০০ বৎসর অতিক্রম হয়।

২। সৌর জগৎ।

এই অসংখ্য তারকাপুঞ্জের মধ্যে আমাদের তারকা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেনস্, নেপ্‌চুন এই আটটি বড় বড় গ্রহ, এবং সার্দ্ধশতাধিক ছোট ছোট গ্রহ স্ব স্ব কক্ষে নির্দ্দিষ্ট বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আবার বৃহত্তর গ্রহ কতিপয়ের পার্শ্বে কতকগুলি উপগ্রহ নিয়মিত পথে ঘুরিতেছে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ধূমকেতু, উল্কাপুঞ্জ সূর্য্যের চারি দিকে ভ্রাম্যমান। এই গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু-বেষ্টিত সূর্য্যকে লইয়া জগতের যে অংশ, তাহারই নাম সৌরজগৎ। সূর্য্য ইহার কেন্দ্রীভূত। বৃহস্পতি

সকল গ্রহের বড়; নেপ্‌চুন্‌ সর্ব্বাপেক্ষা দূরতম; সূর্য্য হইতে নেপ্‌চুনের ব্যবধান পৃথিবীর ব্যবধানের ত্রিশ গুণ।

নিউটন দেখাইয়াছেন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মবলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু সমুদয়ই নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে; তাহাদের গতির সম্বন্ধে সকল বৈচিত্রই এই নিয়মের অনুযায়ী। কিন্তু সৌর জগতের গঠনে কয়েকটি বৈচিত্র্য আছে, নিউটনের নিয়ম তাহা বুঝাইতে পারে না।

৩। সৌর জগতের গঠন-বৈচিত্র্য।

(১) গ্রহগুলি আকাশমধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নহে; উহারা সকলেই প্রায় এক সমতলোপরি অবস্থিত; এবং সেই সমতল প্রায় সূর্য্যের নিরক্ষ-বৃত্তের সহিত এক সমতলে রহিয়াছে। (কেবল ছোট গ্রহগুলির, বিশেষত ধূমকেতুগণের কক্ষ সেই সমতল হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন।)

(২) সূর্য্য নিজের অক্ষোপরি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আবর্ত্তন করে; আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল গ্রহই ঠিক্‌ সেই মুখেই সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরে। (কেবল কতকগুলি ধূমকেতু মাত্র পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম-মুখে ভ্রমণ করে।)

(৩) আবার গ্রহদিগের অক্ষোপরি আবর্ত্তনেরও দিক ঠিক্‌ তাহাই, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। (কেবল য়ুরেনস্‌ ও নেপচুন্‌ এই নিয়মের বহির্ভূত।)

(৪) গ্রহের ন্যায় উপগ্রহগুলিও ঠিক্‌ সেই সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত; তাহাদেরও গতির মুখ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। (য়ুরেনসের উপগ্রহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম-মুখে ভ্রমণ করে।)

(৫) সূর্য্য হইতে গ্রহগুলির ব্যবধান একটি সুন্দর নিয়মের অনুযায়ী; (তাহার নাম Bode's Law)।

০	৩	৬	১২	২৪	৪৮	৯৬	১৯২

প্রত্যেকে ৪ যোগ কর।

৪	৭	১০	১৬	২৮	৫২	১০০	১৯৬
বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	—	বৃহস্পতি	শনি	য়ুরেনস্‌

বুধের দূরত্ব যদি ৪ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে পর পর লিখিত সংখ্যা পর পর লিখিত গ্রহের দূরত্ব-পরিমাপক হইবে। ২৮ সংখ্যার নীচে কোন গ্রহের নাম নাই; বহুপূর্ব্বে কেপ্‌লর অনুমান করিয়াছিলেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কোন অনাবিষ্কৃত গ্রহ থাকিবে। গত শতাব্দীতে যখন য়ুরেনস্‌ আবিষ্কৃত হইল এবং তাহার দূরত্বও উক্ত নিয়মানুযায়ী ১৯৬ পরিমিত

দেখা গেল, তখন পণ্ডিতেরা কেপ্‌লরের অনুমিত গ্রহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; সেই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ ২৮ পরিমিত প্রদেশে এক বৃহৎ গ্রহের পরিবর্ত্তে এ পর্য্যন্ত ১৬০টি অতি ছোট ছোট গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সহজেই মনে হয়, বড় গ্রহটি কোনরূপে ভাঙিয়া গিয়া এই খণ্ডগ্রহগুলিতে পরিণত হইয়াছে।

উল্লিখিত বৈচিত্র্যগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সৌরপরিবারস্থ জ্যোতিষ্ক-পিণ্ডের মধ্যে পরস্পর কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে। ইএ সম্বন্ধ তাহাদের সৃষ্টি বা জন্মকাল হইতেই রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধ কি? এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের কারণ কি? গ্রহ উপগ্রহাদি যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত না হইয়া, যদৃচ্ছপথে না চলিয়া, এরূপ সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত কেন?

সৌর-পরিবারের জ্যোতিষ্কদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এবং পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলি তত্ত্বের সাহায্যে দেখিতে গেলে এই প্রশ্নের একটি উত্তর সহজেই মনে উদিত হয়।

৪। পদার্থবিদ্যার সাহায্যে পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থা-পর্য্যালোচনা।

(১) পৃথিবীর অবস্থা।—পৃথিবীর অভ্যন্তর অতিশয় গরম। ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া যতই নীচে যাওয়া যায়, ততই তাপাধিক্য অনুভূত হয়। তদ্ব্যতীত, ভূকম্প, আগ্নেয়গিরি, উষ্ণপ্রস্রবণ, পর্ব্বতাদির উন্নয়ন, ভূখণ্ডবিশেষের ক্রমিক উত্থান ইত্যাদির একমাত্র সম্ভাবনীয় কারণ,—ভূগর্ভস্থ তাপ। উত্তপ্ত পদার্থ মাত্রেই তাপ বিকীরণ করে ও কালক্রমে শীতল হয়; শীতল হইলে তাহার আয়তন কমিয়া যায়। সুতরাং বহুপূর্ব্বে ভূমণ্ডল আরও উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় ছিল; তাহারও পূর্ব্বে যখন উত্তাপ আরও অধিক ছিল, তখন পৃথিবী বাষ্পময়ী ছিল, সন্দেহ নাই। তখন ইহার আয়তন যে অনেক বেশী ছিল, সহজেই বুঝা যায়। পৃথিবীর বর্ত্তমান কঠিনাবস্থা হইতে কল্পনাতীত কাল গত হইয়াছে। সর উইলিয়ম্ টমসন্ বিজ্ঞানোদ্ভাবিত প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথিবী কত বর্ষ পূর্ব্বে তরল ছিল, গণনা করিয়াছেন।

(২) সূর্য্যের অবস্থা।—সূর্য্যও অবিরত তাপ বিকীরণ করিতেছে। একটি কয়লার পৃথিবী গড়িয়া ছত্রিশ ঘণ্টায় পোড়াইতে পারিলে, যে পরিমাণ তাপ জন্মে, সূর্য্যপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট হইতে ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ নিয়ত

বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বিকীর্ণ তাপের ২২৫,০০,০০,০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র তাপ পৃথিবীতে পতিত হয়; তাহাতেই পৃথিবীতে এত কার্য্য চলিতেছে; মনে কর, সমস্ত তাপের পরিমাণ কত! সূর্য্য আজিও বাষ্পীয়, কিয়দংশ তরল আকারে বর্ত্তমান। কোটী যুগ পূর্ব্বে যখন এই সমস্ত তাপ বাহির হইয়া যায় নাই, সূর্য্যের অভ্যন্তরেই ছিল, তখন সূর্য্যের আয়তন কত বড় ছিল, অনুমান কর! বোধ হয়, এক সময়ে সূর্য্যমণ্ডল সমস্ত সৌর জগৎ ব্যাপিয়া ছিল। অন্যদিক্ হইতেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

(৩) সূর্য্যের তাপ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়।—কেহ বলিতেন সূর্য্যোপরি দহনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে; কেহ বলেন, অজস্র-ধারায় উল্কাপিণ্ড সূর্য্যোপরি বৃষ্ট হইতেছে, তজ্জন্যই এত তাপ। Helmholtz প্রভৃতি পণ্ডিতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কি রাসায়নিক ক্রিয়া, কি উল্কাপতন কিছুতেই এত তাপ জন্মাইতে পারে না। কেবল একমাত্র উপায় আছে। দ্রব্য মাত্রেই সঙ্কোচন কালে তাপোদ্ভাবন করে। একটি নলের ভিতর বায়ু পুরিয়া তাহাকে সহসা সঙ্কুচিত করিলে তজ্জনিত তাপে দাহ্যপদার্থ জ্বালাইতে পারা যায়। সূর্য্যের অবয়ব যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, তাহার পরমাণুরাশি যতই পরস্পর সান্নিধ্যে আসিতেছে, ততই তাপোদ্গম হইতেছে। Helmholtz গণিয়া বলেন সূর্য্যের ব্যাস ৮৫ মাইল মাত্র কমিতে হইলে যে তাপ জন্মে তাহাতে ২২৯০ বৎসর তাপ বিকীরণ চলিবে। উক্ত পণ্ডিত দেখাইয়াছেন সূর্য্য আদিকালে সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া ছিল, তাহা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং সেই সঙ্কোচনেই তাহার তেজ এতকাল উৎপন্ন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এতদ্ভিন্ন এই প্রচণ্ড তেজোরাশির উৎপত্তির আর কোন সম্ভবপর কারণ থাকিতে পারে না।

এই সকল অনুমান ও সিদ্ধান্ত মূল করিয়া বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে।

৫। সৃষ্টি-রহস্য।

(Nebular Hypothesis.)

নীহারিকাবাদ।

বিখ্যাত দার্শনিক (Kant) ক্যাণ্ট এই মহাতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা; অদ্বিতীয়

গণিতবিৎ (Laplace) লাপ্লাস্ নিজ অমানুষিক বুদ্ধিবলে ইহার ভিত্তিমূল দৃঢ় করিয়াছেন। দেখা যাউক সে তত্ত্ব কি।

আদিতে সূর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের সীমান্ত পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে ব্যাপ্ত ছিল। সেই বাষ্পরাশির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইত। কালক্রমে সেই বিভিন্নমুখী গতি একীভূত হওয়াতে সেই বাষ্পরাশির ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে এক মহতী আবর্ত্তগতি উৎপন্ন হইল। তাপ বিকীরণের সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক আকর্ষণবলে সেই বিশাল পিণ্ড সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। পিণ্ডের আয়তন হ্রাসের সহিত তাহার আবর্ত্তন বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেগ বৃদ্ধির সহিত কেন্দ্রাপসারণ বলের বৃদ্ধি হওয়ায় সেই অতি তরল জড়পিণ্ডের নিরক্ষদেশ স্ফীত হইল ও মেরুপ্রদেশ চাপিয়া গেল। ক্রমিক সঙ্কোচনে কেন্দ্রাপসারণ বল আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় স্ফীত নিরক্ষদেশ তরলপিণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি অঙ্গুরীয়ক আকার ধারণ করিল। এখন দেখিতে পাই, যে অভ্যন্তরে একটি অতিতরল বা বাষ্পীয় পিণ্ড নিজ অক্ষোপরি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে আবর্ত্তন করিতেছে এবং ক্রমেই ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হইতেছে; এবং একটি বিশাল চক্রাকার অঙ্গুরীয়ক তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইতে না পারিয়া তাহাকেই বেষ্টন করিয়া সেই মুখেই ঘুরিতেছে। কালক্রমে পিণ্ডটি আরও সঙ্কুচিত হইল, আরও প্রবৃদ্ধবেগ হইল এবং আর একটি ক্ষুদ্রতর অঙ্গুরীয়ক পরিত্যাগ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অন্যূন নয়টি অঙ্গুরীয়ক আজি পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইয়াছে; এবং মধ্যস্থ তরলপিণ্ড ঘনীভূত ও শীর্ণকায় হইয়া আজিও মহাবেগে নিজ অক্ষোপরি আবর্ত্তন করিতেছে এবং আজিও শরীর সঙ্কোচন দ্বারা তাপ জন্মাইয়া দিগন্তে বিকীরণ করিতেছে।

এই এক একটি অঙ্গুরীই এক এক গ্রহ সৃষ্টির নিদান। সেই অঙ্গুরী কখনই চিরকাল সমভাবে থাকিবে না; কিছু দিনেই তারল্য বশত ও বিভিন্নাংশে বিভিন্ন বলযুক্ত হওয়াতে ছোট বড় শতসহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে এবং খণ্ডগুলি বিভিন্নবেগে একই পথে চলিতে থাকিবে। যেমন কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন বেগে বৃত্তপথে দৌড়িতে আরম্ভ করিলে এক সময়ে নিশ্চয়ই একত্র হয়, সেইরূপ এই খণ্ড সহস্র কালক্রমেও একত্র সম্মিলিত হইয়া, আকর্ষণ বলে পিণ্ডাকার ধারণ করিবে। পূর্ব্বে যাহা অঙ্গুরীয়ক

ছিল, তাহাই আবার বর্ত্তুলাকার হইয়া সেই বিশাল আদিম পিণ্ডের চারি দিকে ঘুরিতে থাকিবে। এই ক্ষুদ্র বর্ত্তুলটিই একটি গ্রহ।

আবার সেই বড় পিণ্ড যে কারণে ঘনীভূত হইয়া নিজ শরীর হইতে গ্রহের সৃজন করিল, ক্ষুদ্র পিণ্ড গ্রহও সেই কারণেই ক্রমে শীতল, ও ঘনীভূত হইয়া নিজ অবয়ব হইতে ক্ষুদ্রতর অঙ্গুরীয়ক সৃষ্টি করিবে, এবং সেই অঙ্গুরী পিণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রতর উপগ্রহের জন্ম দিবে। এই রূপে পৃথিবীর এক, বৃহস্পতির চারি, শনির আট এবং য়ুরেনসের ছয় চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী তারল্য ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠভাগে কঠিন হইয়াছে, সুতরাং ইহার আর অঙ্গুরী-জননের সম্ভাবনা নাই; তথাপি আবর্ত্তন জনিত কেন্দ্রাপসারী বল প্রভাবে ভূমণ্ডলের নিরক্ষ দেশ আজিও স্ফীত এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশ "কিঞ্চিৎ চাপা।" শনৈশ্চরের অঙ্গুরীয়ক আজিও বর্ত্তমান এবং তাহাতে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন নিয়তই লক্ষিত হইতেছে।

উল্লিখিত গ্রহাদির উৎপত্তির বিবরণ কল্পনা সম্ভূত নহে। গণিত-শাস্ত্রান্তর্গত,—গতিবিজ্ঞানের অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা তাহার প্রত্যেক কথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। প্লাটোর পরীক্ষা।

কেবল মাত্র যুক্তির উপর বৈজ্ঞানিক নির্ভর করেন না; গণিতের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গুলিও পরীক্ষা (Experiment) দ্বারা চোখের উপর দেখিতে চাহেন। ফরাসিস পণ্ডিত প্লাটো (Plateau) তৈলে তরল পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহা কৌশলক্রমে ঘুরাইয়া তাহা হইতে তৈলের অঙ্গুরীয়ক ও তৈলের গ্রহ উপগ্রহ জন্মাইতে দেখিয়াছেন। এই বিশাল সৌরজগতের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র জগৎ সহস্র লোকের দৃষ্টিপথে প্রস্তুত হইয়াছে। লাপ্লাসের চিন্তাপ্রসূত মহাতত্ত্ব সামান্য ক্রীড়নকের সাহায্যে সাধারণের সহজ বুদ্ধির অধিগম্য হইয়াছে।

কতিপয় ঘটনা আপাত দৃষ্টিতে এই তত্ত্বের বিরোধী। কিন্তু তাহারও মীমাংসা হইয়াছে।

বিরোধের মীমাংসা।

(১) য়ুরেনস্ ও নেপ্‌চুনের অক্ষোপরি আবর্ত্তনের দিক্ সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত, অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে। ইহা আপাতত নীহারিকা তত্ত্বের বিরোধী।

য়ুরেনস্ ও নেপ্চুন্ প্রাচীনতম অঙ্গুরী সম্ভূত। তখন সূর্য্যমণ্ডলের আবর্ত্তন বেগ বেশী না থাকায়, উহার নিরক্ষ দেশ তত বেশী স্ফীত হইতে পারে নাই এবং অতিশয় তারল্যবশত অল্প মাত্র স্ফীত হওয়াতেই অঙ্গুরী বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাতেই বিচ্ছিন্ন অঙ্গুরীর বিস্তার তত বেশী ছিল না। বিস্তার অপেক্ষা বেধ অধিক হওয়ায় উৎপন্ন গ্রহের বৃহত্তর ব্যাস যে তলে অবস্থিত ছিল, অর্থাৎ যে তলে গ্রহটি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল সেই তলে অবস্থিত না হইয়া তাহাতে প্রায় লম্বভাবে অবস্থিত হইল। বস্তুত নিরক্ষ বৃত্ত ও কক্ষ-রেখার অন্তর্গত কোণ পৃথিবীর পক্ষে ২৩½ অংশ, মঙ্গলের ২৯ অংশ, শনির ২৬ অংশ, বৃহস্পতির ৩ অংশ মাত্র, কিন্তু য়ুরেনসের পক্ষে ১০০ অংশ। য়ুরেনসের নিরক্ষবৃত্ত কক্ষ তল (Plane of Orbit) হইতে এত বক্র বলিয়াই অতি সামান্য কারণেই তাহার অক্ষোপরি আবর্ত্তন বিপরীত মুখে হইয়া গিয়াছে।

আবার উরেনসের অক্ষোপরি আবর্ত্তন যে মুখে তাহার শরীরোৎপন্ন উপগ্রহগুলিরও সঞ্চারণের ঠিক্ সেই মুখ।

(২) প্রাচীনতম অঙ্গুরীয়ের বিস্তার নিতান্ত কম হওয়ায় সেই অঙ্গুরীয় জাত গ্রহের আকারও কাজেই ছোট হইবে; বস্তুতও প্রাচীনতম য়ুরেনস্ ও নেপ্চুন্ অপেক্ষা তৎপরবর্ত্তী শনি ৬।৭ গুণ বড়; আবার তদপেক্ষাও অল্প বয়স্ক বৃহস্পতি শনিরও ৩⅓ গুণ।

(৩) বৃহস্পতি গ্রহ অতি প্রকাণ্ড; বৃহস্পতি উৎপন্ন হইলে সূর্য্য একেবারে অনেক খানি ছোট হইয়া গেল এবং ক্ষুদ্রকায় সূর্য্যের প্রসূত পরবর্ত্তী অঙ্গুরী অতি ক্ষুদ্র হইল। সেই অঙ্গুরী বিভক্ত হইয়া শত খণ্ড হইলে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সন্নিহিত মহাকায় বৃহস্পতির প্রবল আকর্ষণে বিচলিত ও পথভ্রষ্ট হইল। আর একত্র সম্মিলিত হইয়া বড় গ্রহ নির্ম্মাণ করিতে পারিল না; ক্ষুদ্রত্ব বশত অচিরেই শীতল ও কঠিন হইল। আজিও সেই খণ্ডগুলি বিভিন্ন পথে ঘুরিতেছে; তাহাদের কোন কোনটির ব্যাস ৫০ মাইলেরও কম। বৃহত্তমের ব্যাস ২২৮ মাইল মাত্র।

(৪) সূর্য্যের আয়তন ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল, সুতরাং তৎপর জাত অঙ্গুরীয়ের পরিধি নিতান্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় শনি বা বৃহস্পতির ন্যায় গ্রহ আর জন্মিল না। মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র বুধ সকলেই ক্ষুদ্র কায়। পৃথিবী বৃহস্পতির ৩০০ ভাগের এক ভাগ; সকলের কনিষ্ঠ বুধ আবার পৃথিবীরও চতুর্দ্দশ ভাগ। বুধের পর আর নূতন গ্রহ সৃষ্ট হয় নাই।

(৫) খণ্ড গ্রহগুলির উপর বৃহস্পতির যে প্রভাব, মঙ্গলের উপর আকর্ষণ বল তাহার অর্দ্ধেকেরও কম; আবার পৃথিবীর উপর মঙ্গলের আকর্ষণ বল তাহার $\frac{১}{১৫০}$ মাত্র। সুতরাং মঙ্গল ও পৃথিবী নির্ব্বিঘ্নে বর্ত্তুলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বৃহস্পতির আকর্ষণে বাধা দিতে পারে নাই।

(৬) বড় গ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা অবশ্য ছোট গ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। বাস্তবিকই বুধ, শুক্র ও মঙ্গল উপগ্রহ হীন; পৃথিবীর একটি মাত্র; বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাকায় গ্রহের অনেক বেশী।

(৭) একমাত্র আয়তন উপগ্রহ সংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামক নহে। কেন্দ্রাপসারণ বলই অঙ্গুরীসৃষ্টির মুখ্য কারণ; যাহার সেই বল বেশী, উপগ্রহ সংখ্যা তাহার সেই পরিমাণেই বেশী হওয়া উচিত। পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় এক পাক ঘুরে, শনি তাহার বিশাল দেহ ১০ ঘণ্টা মাত্রেই একবার আবর্ত্তন করে। কাজেই ইহার কেন্দ্রাপসারণ বল অনেক বেশী। ইহার চন্দ্র সংখ্যাও ৮। ইহার অঙ্গুরীয়ক আজিও বিদ্যমান।

তবেই দেখা গেল, সৌরজগতের যেখানে যে কিছু বৈচিত্র্য আছে, যাহা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত, যাহা আপাত দৃষ্টিতে লাপ্লাসের তত্ত্বের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, তাহাও সেই তত্ত্বানুসারে সুন্দররূপে সমন্বিত হইয়া যায়।

অধুনাতন পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে চারিদিক্ হইতে নূতন নূতন প্রমাণ আসিয়া নীহারিকা-বাদের সমর্থন করিতেছে।

৮। লাপ্লাসের তত্ত্বের সমর্থনা।

(১) আদিতে পৃথিবী ও সূর্য্য এক ছিল, যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবী ও সূর্য্য একই পদার্থে নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব। এত দিন এই প্রশ্নের উত্তর অসম্ভাবিত ও কল্পনারও অগোচর ছিল, অধুনা নবাবিষ্কৃত আলোক বিশ্লেষণ (Spectroscope) যন্ত্রের সাহায্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়াছে, যে সূর্য্যেও লৌহ, তাম্র, দস্তা, সোডিয়ম্, উদজান প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান।

(২) ছোট গ্রহ সর্ব্বাগ্রেই শীতল ও কঠিন হইবে, বড় গ্রহের তদবস্থা পাইতে অবশ্যই বিলম্ব হওয়া উচিত। গ্রহদের প্রাকৃত অবস্থা দৃষ্টে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে; চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, ইহা একেবারে কঠিন হই-

য়াছে; জল ও বায়ুর লেশমাত্র ইহাতে নাই; ইহার প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি সমূহ বহুদিন অগ্ন্যুদ্গম ত্যাগ করিয়া নির্জীব হইয়াছে, সুতরাং ইহার অভ্যন্তরও উষ্ণতা রহিত। আবার পৃথিবী চন্দ্রের ৫৪ গুণ বড়। ইহার অভ্যন্তর আজিও অগ্নিময়; পৃষ্ঠভাগ কঠিন বটে, কিন্তু অদ্যাপি কিয়দংশ (বায়ুমণ্ডল) বাষ্পীয়, কিয়দংশ (মহাসাগর) তরল আকারে বর্ত্তমান। পৃথিবীর জীব-লীলা শেষ হইতে এখনও অনেক দিন বাকি। শুক্র ও মঙ্গল বয়সে ও আয়তনে অনেকাংশে পৃথিবীর অনুরূপ, তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থাও অনেকাংশে পৃথিবীর সদৃশ। মঙ্গল বায়ুরাশিতে বেষ্টিত; ইহার পৃষ্ঠভাগ মহাদেশ ও মহাসাগরে বিভক্ত; ইহার মেরুপ্রদেশ তুষার রাশিতে সমাচ্ছন্ন; গ্রীষ্মাগমে তুষার রাশি গলিতে থাকে; আবার শীত আসিলে পূর্ব্বাবস্থ হয়।

শনি ও বৃহস্পতি যেমন প্রকাণ্ডকায়, ইহাদের অবস্থাও তদনুরূপ। অদ্যাপি তাহারা তারল্য ত্যাগ করে নাই; নিম্নের তালিকায় পৃথিবীর সহিত তাহাদের ঘনত্বের তুলনা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

গ্রহ।		ঘনত্ব।	
বুধ	ক্ষুদ্র	১·২৪	প্রায়
শুক্র		·৯২	
পৃথিবী	গ্রহ	১·০০	সমান
মঙ্গল		·৯২	
বৃহস্পতি	বড়	·২২	অনেক
শনি		·১২	
উরেনস্	গ্রহ	·১৮	কম।
নেপচুন্		·১৭	

বৃহস্পতি আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড়; তাহার অবস্থাও অনেকাংশে সূর্য্যের অনুরূপ। রাশি রাশি বাষ্পীয় পদার্থ মহামেঘের মত তাহার বিশাল শরীর আবৃত রাখিয়াছে, এবং মহাবেগে ইতস্তত প্লাবিত হইতেছে। প্রবল বাত্যার ন্যায় প্রচণ্ডবেগশালী বাষ্পরাশি বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশ অনুক্ষণ আন্দোলিত করিতেছে। বৃহস্পতি সূর্য্যের উপযুক্ত সন্তান। শনিও অনেকাংশে বৃহস্পতির সদৃশ।

৯। তারকা-জগৎ।

আমাদের সৌর জগৎ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, তাহা অপরাপর তারকা জগৎ পক্ষেও খাটে। তারকাই এক একটি জগতের কেন্দ্রস্বরূপ; সেই প্রত্যেক জগৎই এই একই উপায়ে সমুদ্ভূত। তারাগুলি সর্ব্বাংশেই সূর্য্যের অনুরূপ; সুতরাং সৃষ্টিক্রিয়াও একই প্রণালীতে হইয়াছে। তবে কোনটি অত্যন্ত প্রাচীন, কোনটি বা আধুনিক, কোনটি বা শীতল ও নির্ব্বাণোন্মুখ, কোনটি আজিও নূতন নূতন অঙ্কুরী সৃজনে প্রবৃত্ত। আলোক বিশ্লেষ করিয়া দেখা হইয়াছে, সকল তারাই একই পদার্থে নির্ম্মিত। (Balfour Stewart প্রভৃতি) পণ্ডিতেরা নক্ষত্রের বর্ণ দৃষ্টে তাহাদের বয়স নিরূপণ করিয়াছেন। কোন কোন নক্ষত্র যুগ ব্যাপিয়া আলোক দান করিয়া পৃথিব্যাদি গ্রহের ন্যায় নিষ্প্রভ ও নির্ব্বাপিত হইয়াছে। (Sirius ও Phocyon) নামক অত্যুজ্জ্বল তারকাদ্বয়ের পার্শ্বসহচর তারা দুইটি এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে; দূরবীক্ষণের দূরদৃষ্টির তাহারা অগোচর, গণিতশাস্ত্রের অব্যাহত তীক্ষ্ণ দর্শনের বিষয়ীভূত মাত্র।

তাহাই যদি সত্য হয়, তবে আকাশের মধ্যে এমন সূর্য্য দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা, যাহারা আজিও জীবনোন্মুখ, আজিও যাহারা আদিম বাষ্পময় নীহারিকা অবস্থায় আকাশক্ষেত্রে বিস্তৃত অংশ ব্যাপিয়া আছে। যাহাদের শরীর হইতে গ্রহ-উপগ্রহ-শোভিত বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হইবে।

গত শতাব্দীতেই এইরূপ পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছিল। দূরবীক্ষণ সহকারে আকাশমধ্যে কুজ্ঝটিকার মত যাহা দেখা যাইত, লাপ্লাস্ শিষ্যদের মতে সেইসকল সেই আদিভূত বাষ্পময় জগৎ (Nebulæ)। উইলিয়ম হর্শেল তদীয় উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সহকারে দেখাইয়াছিলেন যে, সেগুলি বাষ্পময় নহে; অতীব দূরবর্ত্তী ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ মাত্র। সেই অবধি কোন কোন বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের বাষ্পময়ত্ব অস্বীকার করিয়া লাপ্লাসের মত ভিত্তিরহিত হইল, বোধ করিতেন। কিন্তু আজি কালি হগিন্স (Huggins) আলোক-বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইয়াছেন, তাহাদের কতকগুলি নক্ষত্রসমষ্টি হইলেও অনেকেই বস্তুত বাষ্পময়; এতদ্বিষয়ে আর কোনই সংশয় নাই। এই আবিষ্কার অবধি বৈজ্ঞানিকেরা নীহারিকাবাদের যাথার্থ্যে আর সন্দেহ করেন না।

(ক্রমশঃ)

মঙ্গলগীতি।

ঘন বিজন বিপিন, বিভু, মগন তব ধ্যানে।
রোধি নিশোয়াস-গতি যোগিবর বেশে। ১

সুধু শিশিরবিন্দু শত ঝরয়ে অবিরামে
প্রেম-ভর-গলিত চিত দরদরিত ধারা। ২

কল-বিহগ পাঁতি কত স্বরলহরী ঢালয়ে
মাতি বিভু তব মহিম-মঙ্গল-সুগীতে। ৩

প্রতিসরসি ফুল্ল ফুল স্নিগ্ধতর সৌরভে
মধুর উপহার ধরে প্রেমময় মানসে। ৪

বল্লি সুকুমারী রুচি তবকময় অঞ্জলি
গুল্মবধূ অমল ফুল ফুটায়ে হৃদি গোপনে। ৫

প্রৌঢ়তরু উর্দ্ধশিরে ধরি কুসুম-মালা
নিজ শকতি-রূপ সবে যতনে উপহারে। ৬

উদিল নবরাগভরে অহ, তরুণ ভানু, তব
হে সহজ-সুন্দর! বর-অঙ্গ-আভা। ৭

বিবিধ ফুল পরিমলে ভরয়ে ভবধাম যবে
ভাবি বিভু বরবপু-সুবাসভর সঞ্চরে। ৮

ধায় অবিরামগতি শত শত প্রবাহিণী
সিঞ্চি করুণায় তব তপত ভব-বক্ষে। ৯

অতি তৃষিত আঁখিযুগে যত যতই হেরি হে
হেরি শুধু তব করুণা ঢল ঢল প্রবাহে। ১০

জয় জগত স্বামি জগজীব-দুখহারী
জয় জয় অগাধ সুখ জ্ঞান ঘনরূপ হে। ১১

অধিকাংশ স্থলেই স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতানুক্রমে পাঠ করিতে হইবে।

নবজীবন।

৩য় ভাগ } ভাদ্র ১২৯৩। { ২য় সংখ্যা।

সে কালের দারোগার কাহিনী।

—o—

২—আমি নবদ্বীপের দারোগা হই।

আমি ইংরাজী ১৮৫৩ সালের ভাদ্র মাসে নবদ্বীপ থানার দারোগা হই। থানা নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর জেলার শান্তিপুর মহকুমার অধীন, এবং কৃষ্ণনগরের পশ্চিম চারি ক্রোশের মধ্যে ভাগীরথী ও খড়িয়া নদীর সম্মিলন স্থানে, ভাগীরথীর পশ্চিম পারে নবদ্বীপ স্থিত। কিন্তু যে স্থানে বর্ত্তমান নবদ্বীপ বিরাজমান সে স্থানে নিশ্চয়ই প্রাচীন নবদ্বীপ ছিল না। আধুনিক নগরের কোন্ দিকে আদিশূর প্রভৃতি হিন্দু রাজাদিগের বাসস্থান ছিল, তাহার কিছুমাত্র ঠিকানা নাই। জনশ্রুতি আছে যে বল্লালদিঘী নামে নবদ্বীপের উত্তরে যে এক খানা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই স্থানে উক্ত রাজাদিগের আবাস ছিল, এবং সেই গ্রামের সম্মুখস্থিত মাটির এক বৃহৎ স্তূপ দেখাইয়া লোকে বলে, যে এই স্তূপ বল্লাল সেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট। এরূপ একটি কিম্বদন্তি আছে যে পূর্ব্বে কৃষকেরা ঐস্থলের মৃত্তিকা কর্ষণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে মুদ্রা এবং রত্নাদি পাইত। এই অঞ্চলের মনুষ্যের মধ্যে এই কথায় এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে তাহা শুনিয়া স্বরূপপুরের নীলকুঠীর মালিক মেঃ ডুবেপ ডি ডসল নামক এক জন ফরাসীস্ সাহেবের এক পুত্র এই স্তূপ ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন,

যে তাহা হইলে তিনি তাহার স্বদেশীয় বিদ্বান মণ্ডলীতে বল্লাল সেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের অধিকারী বলিয়া গৌরবান্বিত হইবেন এবং সেই অভিপ্রায়ে তিনি বাস্তবিক আমার দ্বারা মহারাজা সতীশচন্দ্র বাহাদুরের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না। আদিশূর বল্লাল সেন প্রভৃতি রাজার কথা দূরে থাক, গত চারিশত বৎসরের মধ্যে যে মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে নবদ্বীপ বঙ্গ দেশের অন্য স্থান অপেক্ষা এত অধিক গৌরবশালী এবং পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই চৈতন্য প্রভুর জন্মগৃহ, পাঠগৃহ এবং লীলার স্থান কোথায় ছিল তাহাও এক্ষণে কেহ জানে না। যে নবদ্বীপের ধূলি ভক্তবৃন্দে পবিত্র রজ বলিয়া শিরে ধারণ করে, সেই স্থানে মহাপ্রভু কখনও পদপ্রক্ষেপ করিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহাদের কিছুমাত্র অনুধাবন নাই। আমরা জানি যে আমাদের দেশের নদী সমস্তের পরিবর্ত্তনশীল গতির জন্য শুদ্ধ নবদ্বীপের বলিয়া নয়, নদীতীরস্থ সকল জনপদেরই সীমানার ব্যতিক্রম হয় এবং মূর্ত্তির রূপান্তর হইয়া যায়। তথাপি নবদ্বীপের ন্যায় প্রসিদ্ধ স্থান সকল সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ ইতিহাস কিম্বা বিশ্বস্ত জনশ্রুতি থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর অনেক বৃত্তান্ত আছে কিন্তু তৎসাময়িক নবদ্বীপের ভৌগোলিক বিন্যাস এক কালে নাই। গ্রন্থকর্ত্তা বোধ হয় এই সকল বিষয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া লিপিবদ্ধ করেন নাই কিন্তু তিনি যাহা তুচ্ছ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট এক্ষণে কত গুরুতর কথা বলিয়া বোধ হইতেছে। *

---

* ইংরাজীতে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে রোমীয় সেনাপতি ও সম্রাটেরা যে সকল দুর্গ ও বর্ত্ম নির্ম্মাণ এবং শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয়ার্থ সাহেবেরা কত মাপ, পরিমাণ, মৃত্তিকাখনন, বাদানুবাদ এবং পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন তাহার অন্ত নাই। যে সময়ে বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে ইংলণ্ডে মহাকবি সেক্স্পিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের হস্তে চৈতন্যদেবের কিছুমাত্র চিহ্ন রক্ষিত হয় নাই কিন্তু ইংরাজেরা আবন গ্রামে সেক্স্পিয়ারের জন্মগৃহ এখন পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর মেরামত করিয়া পবিত্র দেব মন্দিরের ন্যায় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অদ্বিতীয় বিজ্ঞানবিৎ নিউটন যে কলমে লিখিতেন, ন্যাপোলিয়ন বোনাপার্ট যে যুদ্ধে যে তরবারী ব্যবহার করিয়াছিলেন,—তাহাও যত্নে রক্ষিত আছে। আমাদের দেশেও এইরূপ দ্রব্য সমস্ত এক্ষণে সংগ্রহ এবং রক্ষা করার উদ্যোগে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। মহাত্মা রামমোহন

নবদ্বীপবাক্যার্থে বুঝা যায়, আদিকালে এই স্থান জল বেষ্টিত ছিল এবং এখনও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, পশ্চিমে পোল্‌তার বিল; উহা পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ভাগীরথী নদী ছিল; এই বিল পশ্চিম হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া পুনরায় ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়।

আধুনিক নবদ্বীপ তিন খণ্ডে, বিভক্ত,—নদিয়া, বুঁইচ পাড়া এবং তেঘরি; তন্মধ্যে নদিয়াই প্রধান। ইহাতে বহু ইষ্টকালয়, অনেক মঠমন্দির, চৌপাড়ি আছে এবং বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শিল্পজীবী ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ধনী লোকের বাস; ফল, এই অঞ্চলের মধ্যে নবদ্বীপ একটি বিলক্ষণ ধনাঢ্য স্থান।

নবদ্বীপ থানার এলাকা বিস্তীর্ণ ছিল না সুতরাং ইহাতে অল্প পুলিশ আম্‌লা নিয়োজিত ছিল; কেবল একজন দারোগা ও পাঁচ জন বরকন্দাজ ভিন্ন, অন্য থানার ন্যায় ইহাতে নাএব দারোগা কিম্বা জমাদার ছিল না। তখন বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সমুদয় পুলিশের উপরে বৃদ্ধ ড্যাম্পিয়ার সাহেব (পাঠকদের পরিচিত রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর ড্যাম্পিয়ার সাহেবের পিতা) সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলীশ আখ্যায় সর্ব্বে-সর্ব্বা কর্ত্তা। সি, টি, মণ্ট্রেসর সাহেব কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি ভাদ্র মাসে দারোগা হই। নবদ্বীপে আমার পরিচিত কএকজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহারা কোথায় আমাকে দেখিয়া আহ্লাদের কথা বলিবেন, না, বরং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যে আমি অতি মন্দ সময়ে এই কার্য্য-গ্রহণ করিয়াছি। কারণ পূজা সম্মুখে। গত কএক বৎসরাবধি এই সময়ে গ্রামের লোক চুরি ডাকাইতির আশঙ্কায়

রায়ের হস্তলিপি এবং ব্যবহৃত অনেক দ্রব্য বোধ হয় তাহার পৌত্রদ্বয় হরিমোহন ও প্যারিমোহন বাবু ইচ্ছা করিলে সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিতে পারেন। সেইরূপে ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ রায়, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, নিধুবাবু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা বাঙ্গালীর বংশধর এবং বন্ধুবান্ধবগণের যত্নে তাঁহাদের চিহ্ন সকল সংগৃহীত হইতে পারে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে অনতিবিলম্বে কলিকাতায় বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ মনুষ্যদিগের পরিত্যক্ত দ্রব্য, সমস্ত সঙ্কলনের এবং রক্ষার জন্য স্থান করিবার আবশ্যক হইবে এবং তখন এই সকল বস্তু অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।

অস্থির হইয়াছিল এবং উপস্থিত বৎসরেও তাহাদের সে আশঙ্কা স্থায়ী আছে; বিশেষ আশঙ্কার কারণ এই যে, আমি নূতন দারোগা, কে চোর, কে সাধু, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, কাজেই এমন সংশয় সময়ে আমার দ্বারা শান্তি রক্ষিত হওয়া অসাধ্য না হইলেও, দুরূহ কার্য্য হইবে। কিন্তু তাঁহারা আরও বলিলেন যে নবদ্বীপের মধ্যে বদমায়েস অতি অল্প আছে, কেবল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে দস্যুরা আসিয়া ইহাতে চুরি ডাকাইতি করে। দস্যুদিগের নবদ্বীপে ডাকাইতি করার একটি সুবিধা এই ছিল, যে ভাগীরথীর পশ্চিম তটে নবদ্বীপের উপরি উক্ত তিন খানা গ্রাম ভিন্ন, অন্য কোন গ্রাম কৃষ্ণনগর জেলার অধীন ছিল না; পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামই বর্দ্ধমান জেলাভুক্ত; নবদ্বীপের পুলিশ আমলাকে বর্দ্ধমান জেলার কোন ব্যক্তিকে ধরিতে হইলে, ঐ জেলার পুলিশের সহায়তা লইয়া কার্য্য করিতে হইত; কাজেই অনেক বিলম্ব হইত এবং তাহাতে দস্যুরা সাবধান হইতে অবকাশ পাইত।

এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমি নিতান্ত ভীত হইলাম। কি উপায় অবলম্বন করিলে গ্রামের শান্তি ও আমার চাকরি রক্ষা পাইবে তাহা, শীঘ্র স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। পরামর্শ করিবার কিম্বা উপদেশ লইবার জন্য আমার অধীনস্থ চারি জন বরকন্দাজ ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নিকটে ছিল না; কিন্তু পূজার সময়ে কিসে দশ টাকা হস্তগত হইবে, সেই চিন্তায় তাহারা ব্যাকুল, এবং তাহাদের ভাব গতিকে আমার বোধ হইল, যে গ্রামে এই সময়ে একটা শান্তি ভঙ্গের ঘটনা উপস্থিত হইলেই তাহাদের রোজগারের সুন্দর একটি পন্থা হয়। অন্যান্য থানায় নায়েব দারোগা, জমাদার এবং অন্যূন ১৫ জন বরকন্দাজ থাকে, কিন্তু আমার ভাগ্যে আমার থানায় "দাদা বৈ পাইক নাই"। তথাপি আমার এই ভয়ঙ্কর অমানিশার অন্ধকার মধ্যে এক মাত্র আশাপ্রদ রশ্মি ছিল—গ্রাম্য চৌকীদার। থানার ৪ জন বরকন্দাজ যেমন ক্ষীণকায়, স্বার্থপর এবং অকর্ম্মণ্য,—চৌকীদারেরা ঠিক তাহার বিপরীত। সাধারণত তাহারা বলিষ্ঠকায়, কর্ত্তব্য পরায়ণ এবং পরিশ্রমী; তাহাদের স্ব স্ব চৌকীর লোক নিরাপদে থাকিবে, তাহাই তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, এবং আমার নিকট তাহারা অনেকে প্রকাশ করিল যে, ভিন্ন জেলার লোকে আসিয়া তাহাদের গ্রামে দস্যুবৃত্তি করিয়া যায়, ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত লজ্জা এবং দুঃখ হয়; এবং কহিল যে, যদি আমি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিকালে সমানি পরিশ্রম

করিতে স্বীকার করি, তাহা হইলে যাহাতে এই আশঙ্কার কাল নির্ব্বিঘ্নে কাটিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহারা যত্নের ক্রটি করিবে না। চৌকীদারদিগের মুখে এইরূপ আশ্বাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার মনে সাহসের উদয় হইল এবং তাহাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে আমার আর একটি সুবিধা উপস্থিত হইল। আমার অন্নদাতা মাতুল কৃষ্ণনগর জেলায় এক জন উচ্চ শ্রেণীর গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন; তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় নৌকা পথে দেশে যাইতেন এবং দস্যু ভয়ে স্বীয় রক্ষার্থ তিন চারি জন এই অঞ্চলের সুশিক্ষিত লাঠিয়াল সর্দ্দার নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে লইতেন। আমিও মাতুলের সঙ্গে বাড়ি যাইতাম। পথি মধ্যে সর্দ্দারদিগের সহিত আমার সর্ব্বদা কথোপকথন হইত এবং তাহারা আমার অল্প বয়স দেখিয়া নিঃশঙ্কায় কে কি প্রকারে ডাকাইতি এবং লাঠিয়ালি করিয়াছিল, তাহা অকপটে আমার নিকট বর্ণনা করিত। এমন এক বার নহে ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই সর্দ্দার কয়েক জন আমাদের সমভিব্যহারে যাতায়াত করিয়াছিল এবং প্রতিবারে আমি তাহাদের মুখে তাহাদের কীর্ত্তি কলাপের গল্প শুনিতাম। তখন কে জানিত, যে অল্প কালের মধ্যে আমি নবদ্বীপের দারোগা হইয়া তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে বসিব। তাহারাই যে গ্রাম্য চৌকীদার ছিল, তাহাও সে সময়ে আমি জানিতাম না, পরে শুনিলাম, যে অধিক বেতনের লোভে তাহারা থানা হইতে বিদায় লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইত। এই চারি ব্যক্তির মধ্যে তিন জন অর্থাৎ রাম কুমার বাগদী, শ্রীনাথ (ছিরু) বাগদী ও হারান খাঁ নবদ্বীপ থানার অধীন তিনটি গ্রামের চৌকীদার ছিল। চতুর্থ ব্যক্তি বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিত। উঁহারা তিন জনেই সরল চিত্তে আমার হিত সাধন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

এদিকে ক্রমশ অপর পক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে নিজ গ্রামের লোকের দ্বারা গ্রামের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার গ্রামস্থ দস্যুদিগের গতিরোধ করিতে পারিলেই নবদ্বীপের শান্তি সাধন করিতে সক্ষম হইব। এই কল্পনায় অন্ধকার পক্ষের প্রথম রাত্রি হইতে থানায় এক প্রহরের ডঙ্কা দিয়া, রাম কুমার ছিরু প্রভৃতি ২০ জন উৎকৃষ্ট চৌকীদার, একটা বন্দুক ও চারিটা মশাল ও তাহার উপযোগী তৈল ইত্যাদি সঙ্গে হইয়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কোনও দিন চারি এবং কোনও

দিন পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়া নবদ্বীপকে এক প্রকার বেষ্টন করত সমস্ত রাত্রি চৌকী দিতে আরম্ভ করিলাম। চুরি ডাকাইতি হইয়া গেলে পরে দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া দণ্ডনীয় করিতে পারিলে যে পরিমাণে হিত সাধিত হয়, তদপেক্ষা আমার বিবেচনায় ঐ সকল ঘটনা যাহাতে আদৌ হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করাই অধিকতর হিতকর কার্য্য। অতএব যাহাতে দস্যুগণ বুঝিতে এবং জানিতে পারে যে আমরা সতর্ক এবং দলে বলে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে সম্যক রূপে প্রস্তুত আছি, তাহা করিতে ত্রুটি করিলাম না। দণ্ডে দণ্ডে প্রত্যেক দল আপন আড্ডা হইতে পাইকি হাঁকে ডাক ছাড়িত এবং এক দলের চীৎকার শুনিলে আর সকল দল এবং গ্রামের ভিতর চৌকীদারেরাও তাহার অনুকরণ করিত এবং দুই একবার আমি বন্দুকেরও শব্দ করিতাম। এই রূপ ঘোর গোল করিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতাম এবং তদ্দ্বারা শত্রুরাও জানিতে পারিত, যে আমরা তাহাদের নিমিত্ত বিলক্ষণ সাবধানের সহিত প্রস্তুত আছি। ঘোর নিশাকালে জন শূন্য প্রান্তরের মধ্যে যখন রাম কুমার কিম্বা ছিরুর 'রে রে' ধ্বনি অন্ধকার ভেদ করিয়া গগনে উঠিত, তখন আমাদের সকলের মনে সাহস হইত, যে দস্যুরা আগমন করিলেও আমরা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব। এই দুর্ভোগের কষ্ট সমস্ত কষ্ট বলিয়া বোধ করিতাম না। যখন আলোক শূন্য, কেউটিয়া ভরা, ক্ষেত্রের পিচ্ছিল আলের উপর দিয়া গমনাগমন করিতাম, তখন সেই এক মাত্র মহীয়সী চিন্তা—নবদ্বীপবাসীগণের মঙ্গল চিন্তা—ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে আসে নাই। সর্পে দংশন করিবে, কিম্বা ডাকাইতের হস্তে প্রাণ হারাইব এবং তাহা হইলে বাটিতে যে বৃদ্ধা জননী, যুবতী স্ত্রী, এবং নবজাত পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি তাহাদের কি উপায় হইবে—ইহা ভ্রমেও মনে আসিত না। যখন অধিক রাত্রিতে নিদ্রায় আক্রান্ত হইতাম, ও বাসবার স্থান অভাবে কেবল পদব্রজে ৬।৭ ঘণ্টা ধরিয়া হাটিতে হাটিতে শরীর অবসন্ন হইত, তখন চৌকীদারদিগের দা-কোটা তামাকুতে নুটীর আগুনে হুকা অভাবে হস্ত হুকা করিয়া, সজোরে দুই চারি টান দিলেই সকল ক্লেশ দূর হইত এবং সেই তামাকুই বা কত মিষ্ট বোধ হইত। বহুকাল পরে মুরশিদাবাদের নবাব বাড়ীর সুবাসিত তামাকু খাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা চৌকীদারদিগের সেই তামাকের তুল্য সুরস বোধ হয় নাই।

কৃষ্ণপক্ষ যতই নির্বিঘ্নে শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, ততই আমার মনে

হইল যে বুঝি বনের বাঘ মিথ্যা, কেবল মনের বাঘের ভয়ে আমাদের এই সমস্ত পণ্ড শ্রম করা হইতেছে; কিন্তু অনতি বিলম্বেই আমার সে ভ্রম দূর হইল। ত্রয়োদশী কি চতুর্দ্দশীর রাত্রি তুই প্রহরের পরে টিপী টিপী বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হইল। আচ্ছাদন অভাবে আমরা সকলেই কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। সঙ্গে যে তুই জন বরকন্দাজ ছিলেন, তাঁহারা চৌকীদারদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া আমাকে থানায় প্রত্যাগমন করিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে এক যাত্রায় পৃথক ফল হইলে, উচিত কার্য্য হইবে না। বিশেষ আমি কার্য্যস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইলে পাছে সমভিব্যাহারী অধিকাংশ ব্যক্তিই আমার পথে অনুগমন করে, তাহা হইলে বিভ্রাট হওয়ার সম্ভাবনা, এই বিবেচনায় আমি বরকন্দাজ মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করত নিকটে কাহারও আনিত উপযুক্ত স্থান আছে কি না অনুসন্ধান করাতে শুনিলাম, যে কিছু দূরে আরও পশ্চিম দিকে আউশ ধান্য মাড়িবার এক খামার বাড়ী আছে, তথায় যাইতে পারিলে, এক খানা একচালা পাওয়া যাইতে পারে। তদনুসারে এক জন বরকন্দাজ ও এক জন চৌকীদার লইয়া খামারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে সেখানে সেই গভীর রাত্রিতে তুই জন মানুষ বসিয়া তামাকু খাইতেছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে তাহারা ধান পহর দিতেছে। অন্ধকারে তাহাদিগের আকার কিম্বা মূর্ত্তি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, কেবল এই মাত্র বুঝিলাম, যে আমাদের আগমনে তাহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে ব্যগ্র হইল। কিন্তু আমাদের সম্ভাষণ বাক্যে তাহারা আমাকে ভাল করিয়া এক ছিলাম তামাকু খাওয়াইবার যোগাড় করিল। ইতিমধ্যে আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথে আগন্তুক কয়েক ব্যক্তির পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া আমি উচ্চৈস্বরে "কে" বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে অল্প দূর হইতে প্রত্যুত্তর আসিল যে "আমি রামকুমার।" এই বাক্য শুনিবা মাত্রেই ঐ তুই ব্যক্তি কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া তুই জনেই এক সামরিক লম্ফ দিয়া চালা হইতে নির্গত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিল। আমি অমনি "ধর" বলিয়া চীৎকার করাতে আমার সঙ্গী বরকন্দাজ তাহার ঢাল তরবার লইয়া দৌড়িয়া যাইতে খামারের মধ্য স্থানে যে এক একটা বাঁশের খুটি পোতা ছিল তাহা অন্ধকারে ঠক করিয়া তাঁহার মস্তকে লাগাতে তাঁহাকে লাঠি মারিল, বিবেচনায় ভয়ে "দারোগা মশাই মেলে গো" বলিয়া ভূমিতে উপড়

হইয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেম। কিন্তু চৌকীদার কিছু দূর পর্য্যন্ত পলাতক ব্যক্তিদ্বয়ের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং প্রকাশ করিল যে অন্ধকারে সে কিছু ঠিকানা করিতে পারিল না।

রামকুমার চৌকীদার আসিয়া উপস্থিত হইলে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল যে "এ ব্যাটারা অবশ্যই মনোহর এবং তাহার একজন সঙ্গী হইবে, আমি দেখিলে তাহাদের চিনিতে পারিব ভয়ে, তাহারা শশব্যস্তে পলায়ন করিয়াছে।" রামকুমারের কথা সঙ্গত বিবেচনায় আমি তাহাদিগকে লইয়া পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলাম এবং প্রথম রাত্রিতে আমার মনে যে অভয় উদয় হইয়াছিল তাহা শেষ রাত্রির এই ঘটনা দেখিয়া একেবারে বিলুপ্ত হওয়ায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতার সহিত রোঁদ পাহারা দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এইরূপে ক্রমান্বয় ১৬ রাত্রি অতিক্রান্ত; হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া কাটাইয়া অবশেষে দেবী পক্ষের দেখা পাইলাম। ভাবিলাম এখন পরিশ্রমের লাঘব হইবে, কিন্তু আমার সে আশায় ছাই পড়িল। চতুর্থীর প্রাতে সংবাদ পাইলাম যে গত রাত্রিতে বল্লালদিঘীর ওপারে গঙ্গার নূতন চড়ার মধ্যস্থিত এক খাড়িতে এক খানা মহাজনী নৌকায় ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমা এক খানা পাটুলী নৌকা কলিকাতা হইতে এক সাহেবের চালানী বাক্সবন্দী বিলাতী সরাপ বোঝাই লইয়া কাশী যাইতেছিল। বিদেশী, বিশেষ খোট্টা মাঝি মাল্লা স্থানীয় অবস্থা জ্ঞাত না থাকাতে, কিছু বেলা থাকিতে নবদ্বীপ পৌছিয়া, মিথ্যা কাল ক্ষয় না করার অভিলাষে, যতদূর সাধ্য যাইতে যাইতে দিবা অবসান সময়ে এই খাড়ির মধ্যে লাগান করিয়াছিল। রাত্রিতে দস্যুরা আক্রমণ করিয়া নাবিকদিগের যে যে দ্রব্য অপহরণের উপযুক্ত তাহা এবং ৫টা সরাপের বাক্স লইয়া প্রস্থান করে। পরে সপ্তমী পূজার রাত্রিতে উপরি উক্ত ঘটনার স্থানের নিকটবর্ত্তী আর একস্থানে শাল কাষ্ঠের কড়ি বরগা বোঝাই আর একখানা ঐরূপ পশ্চিমা নৌকা লাগান দেখিয়া ডাকাইতেরা তাহাও আক্রমণ করে কিন্তু তাহাতে অপহরণের উপযুক্ত দ্রব্যাদি না পাওয়াতে এবং খোট্টা নাবিকেরা তাহাদের প্রথমে বাধা দিয়াছিল বলিয়া সেই আক্রোশে মারপিটের দ্বারা তাহাদিগকে নৌকা হইতে তাড়াইয়া দিয়া, নৌকায় ও কাষ্ঠে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

অগ্নি প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরিয়া জ্বলিয়াছিল এবং আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও

বোঝাই মালের কিয়দংশ বাঁচাইতে পারিলাম না। যে স্থানে এই দুই ঘটনা হয়,—তাহার চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের বাস ছিল না।

এক সপ্তাহের মধ্যে দুইটি নৌকায় ডাকাইতি সংবাদ পাইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আমার অব্যবহিত উপরিস্থিত হাকিম শান্তিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল আমাকে ভৎসনা করিয়া ভবিষ্যতে খুব সতর্ক থাকিতে আদেশ করিলেন; তাঁহারা জানিতেন না, যে ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিক সতর্ক হওয়া সাধ্যাতিরিক্ত ছিল।

যাহা হউক আমার অত্যন্ত উৎসাহ ভঙ্গ হইল। দেখিলাম যে গত কয়েক রাত্রির ন্যায় প্রত্যহ রাত্রিতে একাকী আমার এইরূপ পরিক্রম করা অসাধ্য হইবে। লোকে যাহা বলিত তাহাই প্রতিপন্ন হইল। এই সকল ডাকাইতির মূল বিনাশ করিতে না পারিলে কেবল চৌকী পাহারা দিয়া নবদ্বীপ রক্ষা করা যাইতে পারিবে না এবং অধিবাসীগণেরও চিত্তের আশঙ্কা দূর হইবে না। সেই মূলকে তাহা বিবৃত করার উদ্দেশেই ভূমিকা স্বরূপে আমার এই প্রবন্ধ লেখা হইল।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে যে আমারে রামকুমার চৌকীদার দুইজন অপরিচিত মনুষ্যের বৃত্তান্ত শুনিবা মাত্র মনোহরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, এবং 'মনোহর কে?' বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করাতে, সে তখন সংক্ষেপে উত্তর করে যে "আপনি যেমন পুলিসের মধ্যে, মনোহরও সেইরূপ চোর ডাকাইতের মধ্যে দারোগা"। সাধারণ লোকেরও সেই বিশ্বাস ছিল। মনোহর কে, তাহার শেষ কীর্ত্তি কি এবং সে ঘটনায় এবং যে প্রণালীতে তাহাকে দেশ ছাড়া করায় কার্য্য আমার ভাগ্যে হইল, তাহা আমি ইহার পরে বর্ণনা করিব।

হিন্দু কাহাকে বলে ?

১।

হিন্দু কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলিবেন, "যিনি ৩৩ কোটি দেবতা মানেন, এবং সমগ্র বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র মানিয়া ঐ সমস্ত শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনিই হিন্দু"। কিন্তু এবম্প্রকার হিন্দু পৃথিবীতে আছেন বা ছিলেন কি না সন্দেহ।

মহর্ষি কপিল ৩৩ কোটি দেবতা মানা দূরে থাকুক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। তাঁহার মতে "ঈশ্বরাসিদ্ধে" অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কপিল নিরীশ্বর ছিলেন না; সাংখ্যদর্শনের ৯২ সূত্রের অর্থ এই যে অন্যান্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ আছে তাহা অপ্রচুর; কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর ঐ উক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। কপিল আপন যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং ৯৩ ও ৯৪ সূত্রে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন (১)। তিনি বলেন ঈশ্বর হয় মুক্ত না হয় বদ্ধ। যদি তিনি মুক্ত হন, তাঁহার কোন প্রকার বাসনা থাকিতে পারে না; সুতরাং সৃষ্টির বাসনা থাকিতে পারে না: যদি তিনি বদ্ধ হন, তাঁহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাই থাকে না। সাংখ্যকারিকায় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত আছে; কিন্তু তাহাতেও পুরুষ কিছুই করেন না; প্রকৃতিই সর্ব্বেসর্ব্বা।

কপিল ঋষি নিরীশ্বর হইলেও এমন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গিয়াছেন (২)।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে কপিল ঋষি কি অহিন্দু বা অব্য হিন্দু ছিলেন?

ঋষভ যতি ধর্ম্ম প্রয়োজক বলিয়া বিখ্যাত। জৈনদিগের মতে পরমাত্মা নাই, জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন এবং নিত্য, সৃষ্টিকর্ত্তা নাই এবং যুগে

---

(১) মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। সাংখ্য ১। ৯৩ সূত্র।
উভয়থাপ্যসত্করত্বম্—ঐ ১। ৯৪ সূত্র।

(২) ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যকার কপিল বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বলিয়া পরিগণিত। ভাগবত মতে (১) কৌমার (২) শূকর (৩) নারদ (৪) নরনারায়ণ (৫) কপিল (৬) দত্তাত্রেয় (৭) যজ্ঞ (৮) ঋষভ (৯) পৃথু (১০) মৎস্য (১১) কূর্ম্ম (১২) ধন্বন্তরি (১৩) মোহিনী (১৪) নরসিংহ (১৫) বামন (১৬) পরশুরাম (১৭) বেদব্যাস (১৮) রাম (১৯) দুই অংশে কৃষ্ণ ও বলরাম, এই সমস্ত ভগবানের অতীত অবতার, এবং (২০) বুদ্ধ (২১) কল্কি তাঁহার ভবিষ্য অবতার। প্রচলিত মতে ভগবানের দশাবতার মাত্র, যথা "মৎস্যকূর্ম্মবরাহশ্চ, নরসিংহোঽথ বামনঃ। রামো রামশ্চ রামশ্চ, বুদ্ধকল্কী চ তে দশঃ॥" তবে এই শ্লোকের পাঠান্তর আছে। তৃতীয় "রামের" পরিবর্ত্তে কেহ কেহ "কৃষ্ণ" প্রয়োগ করেন। ভাগবতের উক্তি ও সাধারণের মতের পার্থক্য বুঝিতে আমরা অক্ষম। পুনশ্চ যে গ্রন্থে বেদব্যাস রামচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই বা, সেই গ্রন্থের রচয়িতা কিরূপে হইলেন, ইহাও আমাদের বোধাতীত।

যুগে মহাপুরুষ জন্মেন। তাঁহারা জিন বা তীর্থকর নামে খ্যাত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের মতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম। জৈনগণ ঋষভ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জিনদিগকে মানেন, বেদ মানেন না, এবং সাধারণ হিন্দুদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে মানেন না। ফলে জৈন ও বৌদ্ধে অত্যল্প পার্থক্য। জৈনরা ঋষভাদি তীর্থকরদিগকে মানেন, বৌদ্ধগণ কশ্যপ, গৌতম, মৈত্রেয় প্রভৃতি বুদ্ধদিগকে মানেন। ঋষভ ৩৩ কোটি দেবতা মানিতেন না এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। তথাপি ভাগবত পুরাণমতে তিনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। এবং তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্মের এই বলিয়া প্রশংসা আছে।

"বর্ত্মধীরাণাং সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃতং"।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে ঋষভ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হইয়াও কি অহিন্দু বা নব্যহিন্দু ছিলেন ? কপিল ও ঋষভ কেবল শ্রীমদ্ভাগবত মতে বিষ্ণুর অবতার, সাধারণ প্রবাদ মতে তাঁহার অবতার নহেন ; কিন্তু বুদ্ধ উভয় মতে বিষ্ণুর অবতার। বুদ্ধ যে পরমাত্মা মানিতেন না তাহার কোন সন্দেহ নাই। ললিত বিস্তরে লিখিত আছে যে যাহারা মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত, ব্যাপী বা লোকগত পুরুষের ধ্যান করে, তাহারা বুদ্ধের মতে কুতপা ঋষি। বৌদ্ধদিগের ব্রহ্মজালসূত্র ও অভিধর্ম্ম পীটক নিরীশ্বরবাদে দূষিত। বুদ্ধ যে বেদশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। ভাগবতমতে সুর-বিদ্বেষীদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। বঙ্গ কবিকুল চূড়ামণি জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন বটে ; কিন্তু অবতার সম্বন্ধে ভাগবত পুরাণকর্ত্তা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিতেন না বোধ হয় ; কারণ, তিনি দশ অবতাব মানিতেন, ২১ অবতার মানিতেন না, এবং বলিয়াছেন যে ভগবান পশুদিগের প্রতি দয়া করিয়া বুদ্ধাবতারে বেদ শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছেন, যে হেতু বৈদিক যজ্ঞে পশুবধের বিধি আছে (৩)। বুদ্ধাবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাগবতকর্ত্তা বলিয়াছেন, "সংমোহায় সুরদ্বিষাম্"। কিন্তু এই মত আদৌ যুক্তি বিরুদ্ধ ; জয়দেবের মত অপেক্ষাকৃত সঙ্গত

(৩) নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং ॥
কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ।

বোধ হয়, কারণ বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্র অত্যুৎকৃষ্ট; তাঁহা মোহশাস্ত্র নহে। অহিংসা, অক্রোধ, অলোভ, ইন্দ্রিয়সংযম, অমৎসরতা, এসমস্ত বিষয়ে উপদেশ প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ, মোহ শাস্ত্রোপদেশ নহে। পুনশ্চ ভগবান মুগ্ধদিগকে জ্ঞান পথে না লইয়া গিয়া অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলায় তাঁহার নিন্দা হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে যদি যতিধর্ম্মকে অর্থাৎ জৈন ধর্ম্মকে "বস্ত্রধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতং" বলা সঙ্গত হয়, তবে বৌদ্ধধর্ম্মকেও ঐরূপ বলা অসঙ্গত হইতে পারে না। যাঁহারা "বৌদ্ধা বেদনিন্দকাঃ" বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও নিরীশ্বর ও বেদনিন্দক বুদ্ধকে অহিন্দু বা নব্য হিন্দু বলিতে সাহসী হন না। জাবালি ঋষি পরলোক মানিতেন না; অথচ তিনি দশরথের পুরোহিত ছিলেন; তাঁহাকে কেহই অহিন্দু বলিতে পারেন না, কারণ তিনি পৌরাণিক পুরুষ। কেবল আধুনিক হিন্দু পরলোক সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেই তিনি অহিন্দু। বস্তুত যিনি বলেন যে কেবল ইংরেজি শিক্ষার দোষে হিন্দুসন্তান শাস্ত্রের কোন কোন অংশে সন্দিহান হইয়াছেন, তাঁহার মহাভ্রান্তি। ঋগ্বেদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মণ্ডল পাঠে প্রতীত হয় যে অতি প্রাচীন কালে কোন কোন উপাসক ইন্দ্রের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। মহামুনি অগস্ত্য প্রথমত ইন্দ্রোপাসক ছিলেন না। বৌদ্ধাধিকারের সময়ে অধিকাংশ হিন্দুর বেদের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে রাজা দিবোদাসের সময়ে বিষ্ণু বুদ্ধরূপে স্বমত প্রচার করায় বিশ্বেশ্বরাদি দেবগণ কাশীপরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মগধরাজ অশোকের সময়ে ভারতবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মই বঙ্গের প্রচলিত ধর্ম্ম ছিল। আদিশূর বৌদ্ধদিগকে ক্ষয় করিয়া প্রাচীন বৈদিকমার্গ পুনঃ সংস্থাপন জন্য কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন (৪)। তথাপি বঙ্গদেশে বেদের চর্চ্চা এমন লুপ্ত হইয়াছিল যে হাতের লেখা একখানি ঋগ্বেদের পুথি বাঙ্গলায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে ম্লেচ্ছদিগের উপর গালি বর্ষণ করা এক্ষণে ধর্ম্ম প্রচারের এক অঙ্গ

---

(৪) শ্রীমদ্রাজা আদিশূরোঽভবদবনিপতিঃ * * * * মহাত্মা জিত্বাবুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যাগ্নিরস্তাম্ * * * ইতি।
দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

হইয়াছে, সেই 'আভ্যন্তরিক অস্তিত্বহীন'' ম্লেচ্ছগণ ঋগ্বেদ মুদ্রাঙ্কন না করিলে একখানিও ঋগ্বেদ কোন বাঙ্গালী দেখিতে পাইত কি না সন্দেহ। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ প্রকৃত কি না বেদ পারগ পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু তিনি যে আমাদের অমূল্য রত্ন ঋগ্বেদ স্বল্পমূল্যে ছাপাইয়া দেশের মহোপকার সাধন করিলেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ না হইয়া কোন কোন মহাশয়ের নিন্দার ভাজন হইয়াছেন। এই সংসারে কতই দেখিলাম, আর কতই দেখিব!

ঋগ্বেদের স্তোত্র সম্বন্ধে দত্তজ মহাশয়ের মত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু আমাদের তান্ত্রিক মহাশয়গণ কি বলেন? কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে, যে বৈদিক পন্থা উত্তম বটে; কিন্তু তদপেক্ষা বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণাচার বামাচার, ও সিদ্ধান্ত পন্থা ক্রমান্বয়ে উৎকৃষ্টতর, এবং কৌলপন্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (৫) এক পক্ষে তান্ত্রিক মহাশয়গণ বেদের অবমাননা করিয়া বলিতেছেন যে বৈদিক পন্থা পশুভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তদপেক্ষা দিব্যভাবে সংস্থিত বামাদি আচারত্রয় উৎকৃষ্টতর (৬)। অপরপক্ষে অপর পক্ষে বৈষ্ণবেরা বলেন যে বামাচারীরা ভ্রষ্টাচারী তাহারা নিশ্চয় নরকগামী হইবে (৭) বস্তুত ভৈরব তন্ত্রের কোন কোন বচনের (যথা মদিরায়াং মৈথুনে চ জাতি চিন্তাং ন কারয়েৎ) সহজ অর্থ করিলে, নাগোজি ভট্টের মত যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,—যে আগম শাস্ত্র মোহশাস্ত্র। আমরা জানি, যে অনেক তান্ত্রিক সুরা বা পরস্ত্রী স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না, এবং তাঁহারা বলেন যে ভৈরব ও শ্যামা-রহস্য তন্ত্রের নিগূঢ় অর্থ আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত সাধারণ বামাচারীগণ

---

(৫) সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা, বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং, শৈবাদ্দক্ষিণ মুত্তমং ॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং, বামাৎসিদ্ধান্ত মুত্তমং।
সিদ্ধান্তা দুত্তমং কৌলং, কৌলাৎ পরতরং নহি ॥

ইতি কুলার্ণবতন্ত্র।

(৬) চত্বারো দেবি বেদাদ্যা পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বামাদ্যাস্ত্রয় আচারো দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

ইতি নিত্যতন্ত্র।

(৭) ভ্রষ্টাচারাশ্চ বামাশ্চ তে যান্তি নরকং ধ্রুবং।

ইতি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ২৪ অধ্যায়।

নিগূঢ়ার্থ না বুঝিতে পারিয়া সহজার্থ অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করেন। তন্ত্রে বেদের নিন্দা এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তন্ত্রের নিন্দা দেখিয়া অনেক ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হিন্দুর মনে হয়, "বল মা তারা দাঁড়াই কোথায় ?" এক পক্ষে বঙ্গের বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গকে ভগবানের পূর্ণাবতার সংস্থাপন করার জন্য অনন্ত সংহিতাকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করেন (৮)। অপর পক্ষে বঙ্গের অনেক শাক্ত ও শৈব তন্ত্ররত্নাকরের মতাবলম্বন করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত শূলপাণি-হত ত্রিপুরাসুরের তিন অংশে অবতার, শিবধর্ম্মনাশ ও মনুষ্যদিগকে মোহিত করিবার জন্য ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (৯)।

বৈষ্ণবগণ বলেন যে তন্ত্ররত্নাকর কোন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ড প্রণীত জাল শাস্ত্র; এবং শাক্ত ও শৈব পণ্ডিতগণ অনন্ত সংহিতাকে শাস্ত্র বলিলে উপহাস করেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল বাঙ্গালার বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মপত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "শিবাদি ইতর দেবতার উপাসনা ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্ম বিষ্ণুর উপাসনা করাই কর্ত্তব্য"। যাঁহাকে অধিকাংশ হিন্দু দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া পূজা করেন, বৈষ্ণব সম্পাদক মহাশয়ের মতে তিনি ইতর দেবতা। ইনি ত শিবকে ইতর বলিয়াই ক্ষান্ত আছেন, কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন যে শিব পূজা করিলে অধোগতি হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণমতে শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা, তাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব উৎপন্ন হইয়াছেন। শিবপুরাণ মতে শিবই

---

(৮) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং।
কালে নষ্টং ভক্তি পথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥
কৃষ্ণশ্চৈতন্য গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌর হরির্গৌরোনামানি ভক্তিদানিমে॥ ইতি অনন্ত সংহিতা

(৯) স এষ ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
কৃপয়াপরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্ত্রিধা॥
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহ হেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ান সৃজদ্বহূন॥
অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে॥

ইতি তন্ত্ররত্নাকর

পরমাত্মা, ব্রহ্মা তাঁহার দক্ষিণ বাহু হইতে এবং বিষ্ণু তাঁহার বাম বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পদ্মপুরাণ মতে মহাবিষ্ণুই পরমাত্মা, তাঁহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার ব্রহ্মাকে ক্ষুদ্র করিবার জন্য বলেন যে ব্রহ্মা স্বর্গ-বেশ্যা মোহিনীর শাপে অপূজ্য হইয়াছেন। ফলে, যিনি সম্প্রাদয়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া হরি হরে ভেদ দেখেন, অথবা অপর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার নিন্দা করেন, তিনি অতি স্থূলদর্শী। তাঁহার প্রলাপ শাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্যই হইতে পারে না। যে পরম পুরুষ স্রষ্টা, তিনিই পালয়িতা এবং তিনিই সংহর্ত্তা। ইহাই আমাদের সর্ব্বোত্তম শাস্ত্র উপনিষদের শিক্ষা। এই পরম সত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কর্ম্মকাণ্ডের শাস্ত্রকারগণ স্থানে স্থানে ভ্রম জালে পতিত হইয়াছেন। বস্তুত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির কেবল কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা শান্তিলাভ করা নিতান্ত কঠিন; ক্রমে ক্রমে জ্ঞানকাণ্ডে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। জ্ঞানকাণ্ডে কেবল সত্যের আদর এবং সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনা। তাহাতে ভ্রম নাই, মত বিরোধ নাই, সংপ্রাদায়িক সঙ্কীর্ণতা নাই, ও অযৌক্তিক কিছুই নাই। সমস্তই শান্তিপ্রদ।

উপসংহারে দেখাইব, যে আমাদের শাস্ত্র জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় "হিন্দু কাহাকে বলে?" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

—o—

সৃষ্টিতত্ত্ব।

১০। কয়েকটী প্রশ্নের মীমাংসা।

(১) ধূমকেতু কি? ধূমকেতুও মাধ্যাকর্ষণবলে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে। ইহাদের আকার নানাবিধ। আয়তন অতিশয় বৃহৎ; ১৮৬১ অব্দের ধূমকেতুর পুচ্ছ ২ কোটী মাইল দীর্ঘ; ১৮৪৩ অব্দের ধূমকেতুর পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ১২ কোটী মাইল। কিন্তু ইহাদের ওজন নিরতিশয় কম; এক সের কি আধ সের মাত্র, সামান্য কারণেই ইহারা কক্ষভ্রষ্ট হয়। ইহাদের পুচ্ছ বাষ্পময়; এজন্যই অনুমান হয় ইহারা সৌরজগতের উপাদানভূত বাষ্পরাশির অবশেষ মাত্র। আদিম জগতের মেরুপ্রদেশ সান্নিধ্যে গতির বেগ

অল্প হওয়ায়, সেখানকার দুই এক টুক্‌রা বাষ্প কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া সঙ্কোচনশীল মধ্যস্থ পিণ্ডের অনুসরণ করিতে পারে নাই; তাহারাই আজও ধূমকেতুরূপে বর্ত্তমান। বস্তুত অধিকাংশ ধূমকেতুই সৌরজগতের মেরু-দেশ হইতে আইসে; যে তলে গ্রহগণ অবস্থিত, ধূমকেতুদের কক্ষপ্রায় তদুপরি লম্বভাবে বর্ত্তমান।

(২) উল্কাপিণ্ড। অগণিত উল্কাপিণ্ড দল বাঁধিয়া ধূমকেতুগণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘুরে; নবেম্বর মাসে পৃথিবী এইরূপ একটী উল্কাপুঞ্জের কক্ষ-সন্নিহিত হওয়ায় সেই সময়ে উল্কাবর্ষণ হয়। উল্কার সংখ্যা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; প্রতি রাত্রে দূরবীক্ষণ দ্বারা ৪০ কোটী পিণ্ড দেখা যায়। ইহারা সকলেই পার্থিব উপকরণে নির্ম্মিত; ধূমকেতুর বাষ্পীয় অংশ ঘনীভূত হইয়া এই সমস্ত পিণ্ড জন্মে; ধূমকেতুও উল্কাপুঞ্জে বেশী পার্থক্য নাই; বস্তুত কোন কোন ধূমকেতু এইরূপ অসংখ্য উল্কাপিণ্ডের সমবায় মাত্র।

(৩) ছায়াপথ।—ইহা আপাত ঘনসন্নিবিষ্ট তারকাপুঞ্জের সমবায়ে নির্ম্মিত। দূরবীক্ষণে যে দুই কোটী তারকা দেখা যায়, তন্মধ্যে ১ কোটী ৮০ লক্ষ এই ছায়াপথের অন্তর্গত, অবশিষ্ট ২০ লক্ষ মাত্র ইহার বাহিরে। অতএব দেখা যাইতেছে, যেমন সৌরজগতের প্রায় সকল গ্রহই এক তলে অবস্থিত, কেবল দুই চারিটা তল ছাড়াইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ তারকা জগতেও প্রায় সকল তারকাই এক তলে (যাহাকে ছায়াপথ বলে) অবস্থান করিতেছে; দুই চারিটা মাত্র তল ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং তারকা জগৎ ও সৌরজগৎ একই রূপ গঠন বিশিষ্ট; তবে বড় আর ছোট।

(৪) আশ্চর্য্যের বিষয়, ধূমকেতু সকল যেমন সৌরজগতের মেরুদেশ সান্নিধ্যে; দূরবীক্ষণ গোচর নীহারিকাগুলিও সেইরূপ তারকা জগতের মেরু-প্রদেশে অর্থাৎ ছায়াপথ হইতে দূরতম স্থলে দেখা যায়। ধূমকেতুও যেমন নানা আকারবিশিষ্ট ও বাষ্পময়, নীহারিকাও তদ্রূপ। সহজেই অনুমান হয়, সৌরজগতে যেরূপ ধূমকেতু, তারকা জগতে সেইরূপ নীহারিকা। সৌর-জগতের নির্ম্মাণাবশেষে ধূমকেতু জন্মিয়াছে, আবার এই দ্বি কোটী সৌর-জগতের সমষ্টিভূতই বিশালপ্রমাণা জগতের নির্ম্মাণাবশেষ সেইরূপ আজিও বাষ্পময়ী নীহারিকাবস্থাতেই বিদ্যমান। ধূমকেতু হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র গ্রহ উপগ্রহ বা উল্কাপিণ্ড জন্মিয়াছে, এই নীহারিকা হইতেও সেইরূপ ক্ষুদ্র সূর্য্যাদি নির্ম্মিত হইতেছে।

১১। বিবর্ত্তবাদ, বিকাশ ও বিনাশ। *

আমরা এই বিশালতত্ত্ব যথাসাধ্য বিবৃত করিলাম। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সাধারণ বিবর্ত্তবাদের অন্তর্গত। বিবর্ত্তন বা বিকাশের অর্থ ক্রমিক ঘনীভবন: বিকাশকালে পরমাণু সকল পরস্পর নিকটস্থ হয়; বাষ্পীয় অবস্থা দূর হইয়া কাঠিন্য উপস্থিত হয়। যাহা একাকার ছিল, তাহা বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে; যাহা নিরবয়ব ছিল, তাহা অবয়ব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট হয়; যাহা অসীম ছিল, তাহা সীমাবদ্ধ হয়। সমস্ত শরীরে যাহা, প্রতি অঙ্গে, প্রতি প্রত্যঙ্গে তাহাই হয়। বিশ্বব্যাপী বাষ্পরাশি ঘনীভূত ও ছিন্ন হইয়া তারকামণ্ডলী জন্মিয়াছে; প্রত্যেক তারকা ঘনীভূত হইয়া গ্রহগণের সৃষ্টি করিয়াছে; আবার গ্রহদের ঘনীভবনে উপগ্রহচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র চিত্রিত জগতের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে।

বিকাশের ন্যায় বিনাশও বিবর্ত্তনের অন্তর্গত। বিকাশ ও বিনাশ সর্ব্বত্র যুগপৎ চলিতেছে; তবে বিকাশাপেক্ষা বিনাশের প্রাবল্যে বিনাশাবস্থা বলা যায়। চন্দ্রাদিতে বিকাশ শেষ হইলেও সাধারণ সৌরজগতে এখনও বিকাশেরই প্রাধান্য। বিকাশের যেখানে পরিণতি; বিনাশের সেইখানে আরম্ভ। সকলই—এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড—এই মহানিয়মের অধীন; এই ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইতি মধ্যেই স্থানে স্থানে বিনাশ আরম্ভ হইয়াছে।

১২। জগতের ভবিষ্যৎ।

চন্দ্র ক্ষুদ্রতা বশত কঠিন হইয়াছে, চন্দ্র এখন নির্জীব ও মৃত; চন্দ্রের বিকাশবিস্থা শেষ হইয়াছে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর আজিও উষ্ণ, উপরিভাগে আজিও তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ বিদ্যমান; পৃথিবীর আজিও বিকাশ চলিতেছে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হইতেছে, তাপবিকীরণপ্রযুক্ত সঙ্কোচনে আজিও মহাদেশ, পর্ব্বত গঠিত হইতেছে।

চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়; এই বল পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রতিকূল; পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ ক্রমেই হ্রাস হইতেছে; আরও কমিবে। এখন যাহা ২৪ ঘণ্টায় ঘুরে, তাহাই ঘুরিতে এক মাস কি ততোধিক সময়

* নবজীবনের ২ খণ্ড ১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিবর্ত্তনের সংজ্ঞা দেখ।

লাগিবে। চন্দ্রেও এক সময়ে তরল পদার্থ ছিল ; পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণে চন্দ্রপৃষ্ঠেও প্রবলতর জোয়ার উৎপন্ন হইত। পৃথিবীর প্রতিকূলতায় চন্দ্রের আবর্ত্তন বেগ একবারে কমিয়া গিয়াছে ; চন্দ্র এখন ২৮ দিনে নিজ ক্ষুদ্রকায় একবার আবর্ত্তন করে। তজ্জন্যই আমরা কেবল চন্দ্রের এক পৃষ্ঠ মাত্র দেখিতে পাই।

আলোক এবং তাড়িত শক্তি বাহী যে সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে, পৃথিব্যাদি গ্রহ ও সূর্য্যাদি তারকা তাহার ভিতর দিয়া বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই সূক্ষ্ম পদার্থের ঘর্ষণে নিশ্চিতই ইহাদের বেগ কমিতে থাকিবে ; এবং কালক্রমে গ্রহাদি সূর্য্যের সন্নিহিত হইবে। তার পর, পৃথিব্যাদির সূর্য্যে পতন ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আর সূর্য্য ? সূর্য্যও এই নিয়মের অধীন ; সূর্য্য ক্রমেই ঘন হইতেছে ; যখন ঘনীভবন শেষ হইবে, সূর্য্যের বিকাশেরও তখন শেষ হইবে ; সূর্য্য আর তেজ দিবে না ; সূর্য্য নিষ্প্রভ হইবে ; জগতের প্রদীপ নিবিয়া যাইবে। কতকগুলি তারকা ইতি মধ্যেই নির্ব্বাপিত ; সূর্য্যেরও নির্ব্বাণ নির্দ্ধারিত।

জগতের ভবিষ্যৎ কি ? কতিপয় দীপ্তিহীন জীবহীন পিণ্ড কি চিরকাল শূন্যপথে ভ্রমিবে ! মনে কর, পৃথিবী সূর্য্যে পড়িল ; পতনসংঘর্ষে তাপোদ্ভব অনিবার্য্য। সর উইলিয়ম টমসন্ সাহেবের গণনায় সমুদয় গ্রহের পতনে যে তাপ উদ্ভূত হইবে, তাহাতে ৪৬০০০ বৎসরকাল সূর্য্যের তেজ বর্ত্তমান ভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে। তার পর ? তাহার পর, সূর্য্যে সূর্য্যে সংঘর্ষণ। তজ্জনিত তাপের পরিমাণ অনেক বেশী, সেই তাপে আবার সূর্য্য দুইটিই বাষ্পীভূত হইবে ; আবার নীহারিকা অবস্থা ধারণ করিয়া আকাশক্ষেত্র ব্যাপ্ত করিবে। এইখানে বিনাশাবস্থার পরিণতি।

১৩। উপসংহার।

বিজ্ঞানের অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিতেছে, এই যে মহাকায় সৌরমণ্ডল মহাবেগে অনন্ত আকাশে ভ্রাম্যমান, যাহাদের লইয়া জগতের এই শোভা, জগতের এই সৌন্দর্য্য, জগতের এই জীবন, তাহারা সকলেই কালক্রমে পরস্পর আঘাতে চূর্ণীকৃত ও বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে। সৃষ্টির আরম্ভে অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া জড় পরমাণু আস্তীর্ণ দেখিয়াছিলাম ; সৃষ্টির অন্তে (?) আবার সেই জড় পরমাণু মহাকাশে সমাকীর্ণ দেখিতে পাইতেছি। হায়-

কাশ ব্যাপিয়া জড়ের এই মহাশরীর; মহাকাল ব্যাপিয়া জড়ের এই পরমাণু। মনুষ্যের অগোচর কত জগৎ যে মহাকাশে রহিয়াছে কে বলিবে; মহাকালে কতবার এই বিবর্ত্তন চলিবে কে বলিবে; আমাদের জগৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের এক বালুকণা; আমাদের জগতের বিবর্ত্তন কাল মহাকালের এক নিমেষ। মানবের বুদ্ধি এইখানে পরাহত, মানবের কল্পনা এখানে স্তম্ভিত। বিজ্ঞান তাহার, আলোক বর্ত্তিকা হস্তে ধরিয়া ধীরপদ বিক্ষেপে ভীতচিত্তে এই মহাদৃশ্যের সম্মুখীন হয়; নিবিড় তিমিররাশির অভ্যন্তরে, ঘোরতর নীরবতার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া একাকী এই মহাপটে তাহার ভীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

এই মহাপটের অপর পার্শ্বে কি আছে? এই মহাপট উত্তোলন করিবে কে?

——o——

দিল্লী।

(যুধিষ্ঠির ও চন্দ্র গুপ্তের কাল নির্ণয়)

হস্তিনাপুরী, ইন্দ্রপ্রস্থ, দিল্লী এবং সাজাহানাবাদ, এই সকল নাম অনেকেই অবগত আছেন। কেহ কেহ ভ্রমত হস্তিনাপুরী এবং ইন্দ্রপ্রস্থকে অভিন্ন বলিয়া জানেন; প্রকৃত পক্ষে উহা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্থান। ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনানদীর তটে, নূতন দিল্লীর ৫ মাইল দক্ষিণে, আর হস্তিনাপুরী গঙ্গাতীরে ছিল (১)। দুষ্মন্ত রাজার অত্যাতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র হস্তীনামা নরপতি হস্তিনাপুরী স্থাপন করেন; পরিক্ষিতের অত্যাতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র নেমি চক্রের রাজ্যকালে গঙ্গানদী হস্তিনাপুরী গ্রাস করেন; তাহাতে নেমিচক্র কৌশাম্বী নগরীতে রাজধানী আনেন (২)।

যাঁহারা দিল্লী সংক্রান্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই অর্থাৎ জেনেরেল কনিঙহাম, এবং হিন্দুপর্য্যটক, (৩) অবশেষে আর্যদর্শনে (৪) "দিল্লী"

১। হস্তিনাপুর কৌরবদিগের রাজধানী; বর্ত্তমান বিজনোর নগরের দক্ষিণ পশ্চিম এবং মিরাট নগরের উত্তর পূর্ব্বে গঙ্গার দক্ষিণ তটে ছিল।

২। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রয়াগের পশ্চিমে স্থিত দেশ বৎস নামে আখ্যাত। বৎস রাজ্যর রাজধানীর নাম কৌশাম্বী।

৩। Travels of a Hindoo. By Bhola Nath Chander. London Edition 1869.

৪। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের আর্য্যদর্শন।

প্রস্তাব লেখক লিখিয়াছেন "যুধিষ্ঠিরের পর তাঁহার ভ্রাতা অর্জ্জুনের বংশধর-গণ ক্রমান্বয়ে ৩০ জন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন, সর্ব্বশেষ নরপতির নাম ক্ষেমক, রাজাবলী গ্রন্থানুসারে এই ক্ষেমক, আপন মন্ত্রী বিশ্বরায় কর্ত্তৃক নিহত হন"। আর্য্যদর্শনের প্রস্তাব লেখক আরও কহেন, ভাগবত পুরাণানু-সারে যুধিষ্ঠিরের পর অর্জ্জুনের বংশধর ৩০ জন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেন। কিন্তু মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে ভিন্নরূপ ইতিহাস দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাসে প্রমাণ করিতেছে, খাণ্ডব-প্রস্থের অপর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ; তথা পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা করিয়া, দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত আহূত হইয়া হস্তিনাতে যান, এবং তথা হইতে বনগমন করেন; বনবাসের অন্তেই ভারত মহাযুদ্ধ হয়; পাণ্ডবেরা যুদ্ধজয়ী হইয়া হস্তিনাতে রাজ্য করেন, ইন্দ্রপ্রস্থে পুনরাগমন কি তথা রাজ্য করার ইতিহাস পাওয়া যায় না। দ্বারকাধিপতি পুরুষ প্রধান শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলা সম্বরণ এবং দ্বারকাপুরী সমুদ্র কর্ত্তৃক গ্রাসিতা হইলে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন, কৃষ্ণাত্মজ বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিক্ত করেন (১)। ইহার পরেই পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানে গমন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৃষ্ণাত্মজ বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহা-সনে অভিষিক্ত হওয়া লিখিত আছে (২)। বিষ্ণুপুরাণে পরিক্ষিতেরবংশাবলী লিখিত আছে; তদ্দৃষ্টে পরিক্ষিতের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ নেমিচক্র অথবা নিচক্ষুর রাজ্যকালে হস্তিনা পুরী গঙ্গা গর্ভে পতিতা হইলে, নেমিচক্র অথবা নিচক্ষু কৌশাম্বীতে বাস করেন, জানা যায় (৩)।

দিল্লীর বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে, ইন্দ্রপ্রস্থে কোন সময়ে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেন, কোন সময়ে ভারত মহা যুদ্ধ সঙ্ঘটন হয়, তাহা বিবেচনা করা

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত মৌষল পর্ব্বাধ্যায় ৭ অধ্যায়।

২। স্ত্রীবাল বৃদ্ধানাদায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য বজ্রং তত্রাভ্যষেচয়েৎ॥

ভাগবত ১১ স্কন্ধ ৩১ অধ্যায়।

৩। অসীম কৃষ্ণাৎ নিচক্ষুঃ। যো গঙ্গয়াপহৃতে হস্তিনাপুরে কৌশম্ব্যাং নিবৎস্যতি॥ বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ২১ অধ্যায়।

তথা, অসীম কৃষ্ণস্তস্যাপি নেমিচক্রস্তু তৎসুতঃ।
গজাহ্বয়ে হৃতে নদ্যা কৌশাম্ব্যাং সাধু বৎস্যতি। ভাগবত।

কর্ত্তব্য। বিষয়টি কিছু গুরুতর, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নানা রূপ প্রমাণ দর্শাইয়া খৃষ্টের জন্মের ১৪৩০ বৎসরের কিঞ্চিত পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের দেশীয় কোন কোন মহাত্মাও ঐ মত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। আমি, বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে আমাদের পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যুধিষ্ঠিরের বর্ত্তমান কাল নির্ণয়ের যত্ন করিব। তাহাতে বিষ্ণু পুরাণোক্ত মৌর্য্যবংশজ চন্দ্রগুপ্ত এবং মেগাস্থিনিসের সান্দ্রকোটস এক ব্যক্তি নহেন, ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। বিষয়টি গুরুতর, হয়ত আমি উপহাস্যাস্পদ হইব; না হয় আমার এই আন্দোলন পুরাবৃত্ত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের চিত্তাকর্ষণ করিবে।

বিষ্ণু পুরাণের ৪ অংশ ২৪ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,—

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দ শতং নৃণাং।
তেতু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম*।

ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া ভাগবতের ১২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে উহার অর্থ বোধক বচন লিখিত হইয়াছে। সেই অর্থ এইরূপ হইতেছে। পূর্ব্বাগ্র শকটাকার সাতটি তারাকে সপ্তর্ষি মণ্ডল কহে। সেই মণ্ডলের কিঞ্চিদুন্নত রেখাগ্রস্থানীয় তারার নাম মরীচি, তাহার পশ্চাৎ আনম্র যুগকন্ধরাকার তারার নাম সভার্য্য বশিষ্ঠ, তাহার পশ্চাৎ ঈষৎ উত্তর স্থানীয় তারার নাম অঙ্গিরা, তাহার পশ্চাৎ চতুরস্র তারা চত্বকের ঈশান কোণস্থ তারার নাম অত্রি, তাহার দক্ষিণে পুলস্ত্য, পুলস্ত্যের পশ্চিমে পুলহ, পুলহের উত্তরে ক্রতু। এইরূপ স্থিত সপ্তর্ষি মণ্ডলের ৭টি তারার মধ্যে দুইটির অর্থাৎ পুলহ এবং ক্রতুর অগ্রে উদয় দেখা যায়; এতদুভয়ের মধ্যে দক্ষিণত সম দেশাবস্থিত যে অশ্বিন্যাদি এক একটি নক্ষত্রকে রাত্রিকালে দেখা যায়, তাহার এক একটির সহিত যুক্ত হইয়া এই সপ্তর্ষি মণ্ডল মনুষ্য পরিমিত এক

---

* এই শ্লোকের শেষ দুই চরণ উদ্ধৃত হয় নাই। তাহা এই;—

তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।

অর্থ—তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর (প্রবৃত্ত) হইয়াছে। তাহা হইলে, পরিক্ষিতের সময় এখন হইতে (৪৯৮৭—১২০০) ৩৭৮৭ বৎসর পূর্ব্বে অথবা খ্রীষ্টের ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে হয়। [নবজীবন সম্পাদক।]

একশ বৎসর অবস্থিতি করেন, পরিক্ষিতের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল।

ইহার পর আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে যুধিষ্ঠিরের বর্ত্তমান কাল নিশ্চয়রূপে প্রমাণ হয়; তাহা এই;—

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠির নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিক দ্বিপঞ্চ যুতঃ শকঃ কালস্তস্য রাজ্যস্য॥

ইহার অর্থ এই যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল এবং শকাব্দারম্ভকালে যুধিষ্ঠিরের ২৫২৬ বৎসর গত হইয়াছিল।

বিষ্ণু পুরাণের অনুবাদক আসন্ মঘাসু ইত্যাদি প্রমাণকে বরাহমিহির কৃত বরাহ সংহিতার এবং কালিদাস কৃত জ্যোতির্ব্বিদাভরণের প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে বিক্রমাদিত্য সম্বৎ ১৯৪৩ বৎসর এবং যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ মিলিত হইয়া যে ৪৪৬৯ বৎসর হয়, তাহাই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল। কিন্তু ইহাতে গুরুতর একটি আপত্তি উপস্থিত হয়; তাহা এই;—কাশ্মীরের ইতিহাস কহ্লণ রাজ-তরঙ্গিণীতে আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ বচনটি ধরা হইয়া তাহারই অব্যবহিত পরে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জন্মকাল নির্ণয়ে লিখিত হইয়াছ।

গতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলেগতেষু বর্ষাণা মভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ।

অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু পাণ্ডব জন্ম গ্রহণ করেন, এখন বিবেচনা কর, বর্ত্তমান ১৯৪৩ সম্বতাব্দে ১৮০৮ শকাব্দ বহমান এবং কলির ৪৯৮৭ বৎসর গত। ৪৯৮৭ বৎসর হইতে ৬৫৩ বৎসর বিয়োগ করিলে ৪৩৩৪ বৎসর লব্ধ হয়, সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়; আর বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদকের মতানুসরণ করিলে অদ্য হইতে ৪৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল; তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের জন্মের ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ স্বীকার করিতে হয়। কহ্লন মিশ্র, "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ" এবং "গতেষু ষটসু সার্দ্ধেষু" এই উভয় প্রমাণই আপন গ্রন্থে উঠাইয়াছেন। তিনি পরস্পর বিরোধী প্রমাণ উঠাইয়া বাতুলতার পরিচয় দিবেন,—ইহা সম্ভব নহে। বস্তুত শকাব্দারম্ভ কালে যুধিষ্ঠিরের ২৫২৬ বৎসর গত হইয়াছিল ইহাই সমধিক প্রশস্ত বোধ হয়। সম্প্রতি ১৮০৮ শকাব্দ প্রবহমান তাহার সহিত ২৫২৬ বৎসর যোগ কর ৪৩৩৪ বৎসর হইল। এদিকে ৪৯৮৭ বৎসর হইতে

৬৫৩ বৎসর বিয়োগ কর ৪৩৩৪ বৎসর হয়। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝা যায়, যে যুধিষ্ঠিরের জন্ম বৎসর হইতে তাঁহার অব্দ গণনা হইয়াছিল।

এই মীমাংসাতে আর একটি আপত্তি উঠিতেছে; বরাহ মিহির বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন; তাঁহার কৃত বরাহ সংহিতাতে কি প্রকারে শকাব্দের উল্লেখ হইবে? (১) এতদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, যে বরাহ মিহির নামে তিন জন জ্যোতিষবেত্তা পণ্ডিত আমরা দেখিতেছি। এক জন বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন। দ্বিতীয় জন ১২২ শকে বিক্রমাদিত্যের পরে, তৃতীয় জন ৪২৭ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। (২)

জয়পুরের অধিপতি বিদ্যানুরাগী সওয়াই জয়সিংহের তত্ত্বাবধারণে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বিদ্যাধর কর্ত্তৃক রাজ-তরঙ্গিণী এবং পণ্ডিত রঘুনাথ কর্ত্তৃক রাজাবলী নামে গ্রন্থ প্রস্তুত হয়; রাজবারা দেশে উক্ত গ্রন্থ দ্বয় অতি বিখ্যাত। রাজাবলীতে লিখিত আছে, কলিযুগের ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে, যুধিষ্ঠিরের অব্দ বিলুপ্ত এবং বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভ হয়। সম্প্রতি ১৯৪৩ সম্বতাব্দ প্রবহমান, তাহার সহিত ৩০৪৪ অঙ্ক যোগ করিলে ৪৯৮৭ অঙ্ক লব্ধ হয়। তাহাই কল্যব্দ। পরন্তু স্কন্দ পুরাণের কুমারিকা খণ্ডে লিখিত আছে।

তত্ত্রিষু সহস্রেষু বিংশত্যধাধিকেষুহি।
ভবিষ্যদ্বিক্রমাদিত্য রাজ্যংসোহথ প্রনশ্যতে॥

ইহার অর্থ এই যে কলির ৩০২০ বৎসরে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য আরম্ভ হইবে। এই গণনার সহিত আপাতত ২৪ বৎসরের অন্তর দেখা যায়; যথা সম্বতাব্দ ১৯৪৩ এবং বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল কলির গতাব্দ ৩০২০ বৎসর মোট ৪৯৬৩ বৎসর। কিন্তু সম্প্রতি কলির ৪৯৮৭ অব্দ প্রবহমান্; সুতরাং ২৪ বৎসর ন্যূন দেখায়; বাস্তবিক এই অনৈক্য কিছু অনৈক্য নহে, কলির ৩০২০ বৎসরে বিক্রমাদিত্য রাজা হন; তাহার ২৪ বৎসর পরে ৩০৪৪ কল্যব্দে সম্বতাব্দ আরম্ভ হয়।

১। শকাব্দ এবং সম্বতাব্দের মধ্যে ১৩৫ বৎসর অন্তর, অতএব বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতর রত্ন বরাহ মিহিরের গ্রন্থে শকাব্দ উল্লেখ হইতে পারে না।

২। হন্টর সাহেব কৃত তালিকা; হন্টর সাহেব উজ্জয়িনীস্থ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ হইতে নিদর্শন প্রাপ্ত হন।

একশ বৎসর অবস্থিতি করেন, পরিক্ষিতের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল।

ইহার পর আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে যুধিষ্ঠিরের বর্ত্তমান কাল নিশ্চয়রূপে প্রমাণ হয়; তাহা এই;—

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠির নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিক দ্বিপঞ্চ যুতঃ শকঃ কালস্তস্য রাজ্যস্য॥

ইহার অর্থ এই যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল এবং শকাব্দারম্ভকালে যুধিষ্ঠিরের ২৫২৬ বৎসর গত হইয়াছিল।

বিষ্ণু পুরাণের অনুবাদক আসন্ মঘাসু ইত্যাদি প্রমাণকে বরাহমিহির কৃত বরাহ সংহিতার এবং কালিদাস কৃত জ্যোতির্ব্বিদাভরণের প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে বিক্রমাদিত্য সম্বৎ ১৯৪৩ বৎসর এবং যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ মিলিত হইয়া যে ৪৪৬৯ বৎসর হয়, তাহাই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল। কিন্তু ইহাতে গুরুতর একটি আপত্তি উপস্থিত হয়; তাহা এই;—কাশ্মীরের ইতিহাস কহ্লণ রাজ-তরঙ্গিণীতে আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ বচনটি ধরা হইয়া তাহারই অব্যবহিত পরে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জন্মকাল নির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে।

গতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলেগতেষু বর্ষাণা মভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ।

অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু পাণ্ডব জন্ম গ্রহণ করেন, এখন বিবেচনা কর, বর্ত্তমান ১৯৪৩ সম্বতাব্দে ১৮০৮ শকাব্দ বহমান এবং কলির ৪৯৮৭ বৎসর গত। ৪৯৮৭ বৎসর হইতে ৬৫৩ বৎসর বিয়োগ করিলে ৪৩৩৪ বৎসর লব্ধ হয়, সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়; আর বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদকের মতানুসরণ করিলে অদ্য হইতে ৪৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল; তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের জন্মের ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ স্বীকার করিতে হয়। কহ্লন মিশ্র, "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ" এবং "গতেষু ষটসু সার্দ্ধেষু" এই উভয় প্রমাণই আপন গ্রন্থে উঠাইয়াছেন। তিনি পরস্পর বিরোধী প্রমাণ উঠাইয়া বাতুলতার পরিচয় দিবেন,—ইহা সম্ভব নহে। বস্তুত শকাব্দারম্ভ কালে যুধিষ্ঠিরের ২৫২৬ বৎসর গত হইয়াছিল ইহাই সমধিক প্রশস্ত বোধ হয়। সম্প্রতি ১৮০৮ শকাব্দ প্রবহমান তাহার সহিত ২৫২৬ বৎসর যোগ কর ৪৩৩৪ বৎসর হইল। এদিকে ৪৯৮৭ বৎসর হইতে

৬৫৩ বৎসর বিয়োগ কর ৪৩৩৪ বৎসর হয়। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝা যায়, যে যুধিষ্ঠিরের জন্ম বৎসর হইতে তাঁহার অব্দ গণনা হইয়াছিল।

এই মীমাংসাতে আর একটি আপত্তি উঠিতেছে; বরাহ মিহির বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন; তাঁহার কৃত বরাহ সংহিতাতে কি প্রকারে শকাব্দের উল্লেখ হইবে? (১) এতদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, যে বরাহ মিহির নামে তিন জন জ্যোতিষবেত্তা পণ্ডিত আমরা দেখিতেছি। এক জন বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন। দ্বিতীয় জন ১২২ শকে বিক্রমাদিত্যের পরে, তৃতীয় জন ৪২১ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। (২)

জয়পুরের অধিপতি বিদ্যানুরাগী সওয়াই জয়সিংহের তত্ত্বাবধারণে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বিদ্যাধর কর্ত্তৃক রাজ-তরঙ্গিণী এবং পণ্ডিত রঘুনাথ কর্ত্তৃক রাজাবলী নামে গ্রন্থ প্রস্তুত হয়; রাজবারা দেশে উক্ত গ্রন্থ দ্বয় অতি বিখ্যাত। রাজাবলীতে লিখিত আছে, কলিযুগের ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে, যুধিষ্ঠিরের অব্দ বিলুপ্ত এবং বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভ হয়। সম্প্রতি ১৯৪৩ সম্বতাব্দ প্রবহমান, তাহার সহিত ৩০৪৪ অঙ্ক যোগ করিলে ৪৯৮৭ অঙ্ক লব্ধ হয়। তাহাই কল্যব্দ। পরন্তু স্কন্দ পুরাণের কুমারিকা খণ্ডে লিখিত আছে।

তত্রিষু সহস্রেষু বিংশত্যব্দাধিকেষুহি।
ভবিষ্যদ্বিক্রমাদিত্য রাজ্যংসোহথ প্রনশ্যতে॥

ইহার অর্থ এই যে কলির ৩০২০ বৎসরে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য আরম্ভ হইবে। এই গণনার সহিত আপাতত ২৪ বৎসরের অন্তর দেখা যায়; যথা সম্বতাব্দ ১৯৪৩ এবং বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল কলির গতাব্দ ৩০২০ বৎসর মোট ৪৯৬৩ বৎসর। কিন্তু সম্প্রতি কলির ৪৯৮৭ অব্দ প্রবহমান্; সুতরাং ২৪ বৎসর ন্যূন দেখায়; বাস্তবিক এই অনৈক্য কিছু অনৈক্য নহে, কলির ৩০২০ বৎসরে বিক্রমাদিত্য রাজা হন; তাহার ২৪ বৎসর পরে ৩০৪৪ কল্যব্দে সম্বতাব্দ আরম্ভ হয়।

১। শকাব্দ এবং সম্বতাব্দের মধ্যে ১৩৫ বৎসর অন্তর, অতএব বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতর রত্ন বরাহ মিহিরের গ্রন্থে শকাব্দ উল্লেখ হইতে পারে না।

২। হন্টর সাহেব কৃত তালিকা; হন্টর সাহেব উজ্জয়িনীস্থ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ হইতে নিদর্শন প্রাপ্ত হন।

উপরে যে সকল প্রমাণ উল্লেখ হইল, ইহার একাংশ লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যুধিষ্ঠিরকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে আনিতে যত্ন পাইয়াছেন। অন্যান্য ইউরোপীয় প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের কথা ছাড়িয়া দিয়া (ঐ সকল কথাতে তত সার নাই) জেনারেল কনিঙ্হামের মতের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

জেনেরেল কনিঙহাম কহেন, পুরাণোক্ত চন্দ্র গুপ্ত এবং গ্রীক গ্রন্থোক্ত সান্দ্রকোটস্ এক ব্যাক্তি হইতেছেন। সান্দ্রকোটস্ খৃষ্টাব্দারম্ভের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। চন্দ্র গুপ্তের পূর্ব্ব নন্দ উপাধি ধারী রাজার রাজ্য-কালে ১০০ বৎসর, এবং পরীক্ষিতের জন্ম হইতে প্রথম নন্দের রাজ্যকাল ১০১৫ বৎসর, এই তিন অঙ্কে ১৪৩০ বৎসর হয়, এবং খৃষ্টাব্দ ১৮৮৬ বৎসর; সমুদয়ে ৩৩১৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। (১)। পৌরাণিক চন্দ্র গুপ্ত এবং গ্রীকগণের উল্লিখিত সান্দ্রকোটস্ অভিন্ন কি না কনিঙহাম সাহেব সে বিষয়ে কোন আলোচনা না করিয়া পৌরাণিক চন্দ্র গুপ্ত এবং গ্রীকগণের উল্লিখিত সান্দ্রকোটসকে অভিন্ন বলিয়া লইয়াছেন। উপরি উক্ত গণনা ভিন্ন অন্য প্রকার প্রমাণেও কনিঙহাম সাহেব যুধিষ্ঠিরকে পূঃ খৃ ১৪২৫ বৎসরের সময়ে আনিতে চেষ্টা করেন। বেন্টলি সাহেব গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন মহাভারতে কোন কোন নক্ষত্রের স্থিতি স্থান যেরূপ লিখিত আছে তাহা পূঃ খৃঃ ১৪২৫ বৎসরে ঘটিয়াছিল, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সময়ে উক্ত নক্ষত্রের স্থিতি হইতে পারে না। এবং এতদনুসারে ভারত যুদ্ধের ৬ বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। (২)

পুরাণোক্ত চন্দ্র গুপ্ত এবং গ্রীক গ্রন্থোক্ত সান্দ্রকোটস অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, এখন তাহার বিবেচনা করা যাইতেছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়া-ছেন, তাহা সন্তোষপ্রদ এবং চূড়ান্ত প্রমাণ নহে। তাঁহাদের যুক্তি ও নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চন্দ্র গুপ্ত এবং সান্দ্রকোটস্ অভিন্ন ব্যক্তি, এই কথা প্রথমে সর উইলিয়ম জোন্সের মনে উদয় হয় (৩)। যে সকল যুক্তির দ্বারা উহাদের অভিন্ন

১। কনিঙহাম কৃত আর্কিলজিকল সরবে। ১ বালাম ১৩৫। ১৩৬ পৃঃ
২। আর্কিলজিকল সরবে। ১ বালাম ১৩৫। ১৩৬ পৃঃ
৩। আসিয়াটীক রিসার্চ্চ ৪ বালাম ৩২ পৃঃ।

বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয় তাহা অধ্যাপক উইলসন কর্তৃক উক্ত হইয়াছে (১)। তাহা এই। "যান্দ্রমস্" এবং সান্দ্রকোটস্, নামের সহিত ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকর্ত্তাগণের উল্লিখিত চন্দ্রমস নামের সাদৃশ্যতা; নীচকুলে জন্ম, অন্যায় মতে বল ক্রমে রাজ্যাধিকার, হিন্দু ও গ্রীক ইতিহাসে এক মত উক্ত আছে। এবং মেগাস্থিনিস যিনি সান্দ্রকোটসের সভায় দূত স্বরূপ ছিলেন তাঁহার বর্ণনা মতে "প্রাচ্য" দেশে পালিবোথ্রাতে রাজধানী, (২) এবং ব্রাহ্মণগণ চন্দ্র গুপ্তের যে সময় নির্ণয় করেন, প্রায় তাহাব সহিত সান্দ্রকোটসের সময়ের ঐকতা। উইলফোর্ড সাহেব খৃ পূঃ ৩৫০, উইলসন সাহেব ৩১৫ বৎসর সময় স্থির করিয়াছেন। এবং আবা ও সিংহল হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনে চমৎকৃত ভাবে উহা সমর্থিত হইয়াছে। আবা হইতে ক্রফোর্ড সাহেব যে বৌদ্ধ বংশাবলী পান, তাহাতে খৃঃ পূঃ ৩৯২ হইতে ৩৭৬ বৎসরে (৩) এবং সিংহলে প্রাপ্ত মহাবংশাবলীর অনুবাদক টরনার সাহেবের কৃত ভূমিকাতে খৃ পূঃ ৩৮১ হইতে ৩৪৭ বৎসরের মধ্যে রাজ্যকাল উক্ত আছে (৪)। পক্ষান্তরে গ্রীক নিদর্শন মতে খৃঃ পূঃ ৩১২ বৎসরে সেলিউকস রাজ্যাধিকার করেন এবং ২৮০ বৎসরে মরেন (৫)। এই সকল অনৈক্য বিদ্যমান থাকিলেও চন্দ্রগুপ্ত এবং সান্দ্রকোটস্ যে এক ব্যক্তি, তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে না।

অধ্যাপক উইলসন সাহেব যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তদপেক্ষা বিরুদ্ধ যুক্তিই প্রবলা। প্রথমত ব্রাহ্মণদের মতে পৌরাণিক গণনানুসারে চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ১২৪৩ অব্দে রাজা হন (৬)। কিন্তু সান্দ্র-

১। হিন্দুথিয়েটর ৩ বালাম ৩ পৃঃ।

২। প্রাচী, (পূর্ব্ব দিক্) পালিবোথ্রা (পাটলীপুত্র)।

৩। Princep's Useful Tables p. 132.

৪। Introduction (Turnour's Mahawanso).

৫। Clinton's Fasti.

৬। রাজাবলী গ্রন্থ অনুসারে যুধিষ্ঠির ৭৬ বৎসর বয়ক্রমে রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তাহার পর ১৩ বৎসর বনবাস; ১ বৎসর যুদ্ধের আয়োজন ও যুদ্ধ; সমুদয়ে ৯০ বৎসর বয়সের সময় যুধিষ্ঠির ভারত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, যখন ভারত যুদ্ধ হয়, তখন পরিক্ষিত গর্ভস্থ। ৪৩৩৪ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার ৯০ বৎসর পরে পরিক্ষিতের জন্ম হয়, অতএব ৪২৪৪ বৎসর পূর্ব্বে পরিক্ষিতের জন্ম। পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দ রাজ্যাভিষেক কাল

কোটস্ খৃঃ পূঃ ৩১৫ বৎসরে রাজাছিলেন। (১)

অতএব চন্দ্র গুপ্ত এবং সান্দ্রকোটস সম সাময়িক হইতেছেন না। মহাবংশাবলী এবং আবার নিদর্শনও পরস্পর এক নহে; ইহা উইলসন্ সাহেবের কথাতেই প্রকাশ। অধিকন্তু মহাবংশাবলীর নিদর্শনের সহিত গ্রীক নিদর্শন এক হইতেছে না। সেলিউকস্ বাবিলন ধ্বংস করিয়া খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দে ভারতবর্ষে আইসেন, কিন্তু মহাবংশাবলী মতে খৃঃ পূঃ ৩৪৭ অব্দে চন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়। (২) দ্বিতীয়ত, গ্রীক গ্রন্থ কর্ত্তারা সান্দ্রকোটস্ এবং যান্দ্রমস্ ইহাদের ভিন্ন ব্যক্তি কহিয়া সান্দ্রকোটস্‌কে উত্তরাধিকারী ও যান্দ্রমস্‌কে পূর্ব্বাধিকারী কহিয়াছেন। পক্ষান্তরে চন্দ্র গুপ্ত শেষ নন্দের পুত্র, অতএব চন্দ্র গুপ্ত এবং সান্দ্রকোটসের পিতৃ নাম এক না হওয়াতে সমুদয় কল্পনা বৃথা হয়। মোক্ষমুলর সাহেব শেষ নন্দের অপর নাম যান্দ্রমস্ হইতে পারে, এই আনুমানিক উক্তিতে সকল বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। (৩) মেগাস্থিনিস যিনি সেলিউকস্ নিকটরের দূত হইয়া সান্দ্রকোটসের

১০১৫ বৎসর এবং ৯ জন নন্দের রাজ্যকালে ১০০ বৎসর (বিষ্ণু পুরাণ ৪ অংশ ২৪ অধ্যায়।) পরিক্ষিতের জন্মকাল ৪২৪৪ হইতে ১০১৫ এবং ১০০, মোট ১১১৫ বৎসর বিয়োগ করিলে ৩১২৯ বৎসর পাওয়া যায়; তাহাই চন্দ্র গুপ্তের রাজ্য কাল; তাহাই খৃঃ পূঃ ১২৪৩ বৎসর; ৯০ বৎসর বয়সে ভারত যুদ্ধ হয় তাহার পর ৩৬ বৎসর যুধিষ্ঠির রাজ্য করেন। সমুদয়ে ১২৬ বৎসর যুধিষ্ঠির জীবিত ছিলেন দেখা যায়। এতৎ প্রতি সন্দেহ করিবার কারণ নাই, শাস্ত্রানুসারে ১০০ বৎসর ও আয়ুর্ব্বেদ মতে ১০৫ বৎসর উর্দ্ধ আয়ু হইলেও তাহার অতিরিক্ত বাঁচিতে দেখা যায়। আমাদের দেশেও দীর্ঘ জীবন হইয়া থাকে। তর্ক না হইতে পারে ভরসাতে, ইউরোপের দীর্ঘ জীবনের বিবরণ দেওয়া গেল। পিট্রার্ক জ্যায়ডেন, হঙ্গেরী দেশীয় কৃষক ১৮৫ বৎসর। লুইসা ফ্রাঙ্ক দক্ষিণ আমেরিকা বাসী ১৭৫ বৎসর। হেনরি জেঙ্কিন্স ইরাজ ১৭৯ বৎসর। তমাস পার ১৫২ বৎসর। তত্ত্ববোধিনী ৯ কল্প ৩ ভাগ ৪০৭ সংখ্যা ৫০ পৃঃ "মনুষ্যের আয়ু," প্রস্তাব দৃষ্টব্য।

১। সান্দ্রকোটস্ সেলিউকস্ নিকটরের সম সাময়িক; সুতরাং খৃঃ পূঃ ৩১৫ কি তৎসমকালে ছিলেন।

২। মহাবংশের অনুবাদক টরনার সাহেব এই অনৈক্য দোষের মীমাংসা করিতে কোন পথ না পাইয়া অবশেষে কহিয়া বসিলেন, বৌদ্ধ পুরোহিতগণ প্রবঞ্চনা করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক এই জাল করিয়াছেন।

৩। মোক্ষমুলর কৃত সংস্কৃত সাহিত্য প্রস্তাব। ২৭৯ পৃঃ।

সভাতে আসিয়াছিলেন তাঁহার বর্ণনা মতে জানা যায়, সান্দ্রকোটসের পুত্রের নাম, অলিত্রচাদেশ অথবা অমিত্রচাদেশ। এবং পিতার সভাতে মেগাস্থিনিস ও পুত্রের সভাতে ডিমাকস্ দূত স্বরূপ গিয়াছিলেন এবং সান্দ্রকোটসের সহিত সেলিউকসের কন্যার বিবাহ হয়। (১) অতএব গ্রীক সমাচার হইতে, সান্দ্রকোটসের পিতার য়ান্দ্রমস এবং পুত্রের নাম অলিত্রচাদেশ, ইহা প্রাপ্ত হই ; কিন্তু পৌরাণিক বর্ণনা মতে চন্দ্রগুপ্তের পিতার নাম নন্দ এবং পুত্রের নাম বিন্দুসার প্রাপ্ত হইতেছি। অতএব সহজেই য়ান্দ্রমস্ হইতে নন্দকে, সান্দ্রকোটস হইতে চন্দ্রগুপ্তকে, অলিত্রচাদেশ হইতে বিন্দুসারকে,—ভিন্ন ব্যক্তি বিবেচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

তৃতীয়ত, চন্দ্রগুপ্ত এবং সান্দ্রকোটসের রাজ্যলাভ সম্বন্ধীয় ইতিহাসও বিভিন্ন ; চন্দ্র গুপ্ত, শেষ নন্দের পত্নী মুরার গর্ভজাত, চাণক্যের সহায়তাতে বৈধ উত্তরাধিকারীকে নৈরাশ করিয়া পৈতৃক রাজ্য লন। কিন্তু সান্দ্রকোটস্ কি মতে মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন মেগাস্থিনিস তাহা কিছু বর্ণন করেন নাই, কেবল আলেকজেণ্ডরের গবর্ণরকে হত্যা করিয়া স্বাধীন হন, এতাবন্মাত্র বর্ণন করিয়াছেন।

পৌরাণিক চন্দ্রগুপ্ত আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন. তিনি গ্রীক কন্যা বিবাহ করিবেন কি গ্রীকগণ ভারতবর্ষবাসীকে গ্রীক কন্যা সম্প্রদান করিবে, ইহা অসম্ভব; এবং এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন ঘটনা শুনা যায় নাই। ইতি পূর্ব্বে প্রমাণ করা গিয়াছে খৃঃ পূঃ ১২৪৩ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্র গুপ্ত রাজ্যলাভ করেন এবং বিষ্ণু পুরাণের বর্ণন মতে চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি ১০ জন মৌরেয় (২) রাজা ১৩৭ বৎসর, তাহার পর ১০ জন শুঙ্গ উপাধিধারী রাজা ১১২ বৎসর, তাহার পর কাণ্বায়ন উপাধিযুক্ত ৪ জন রাজা ৪৫ বৎসর, তাহার পর অন্ধ্র ভৃত্য নামে বিখ্যাত ৩০ জন রাজা ৪৫০ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন ; মৌরেয় হইতে অন্ধ্র ভৃত্যের শেষ পর্য্যন্ত রাজগণের রাজ্যকালে ৭৪৪ বৎসর (৩)। চন্দ্র গুপ্তের রাজ্যারম্ভ কাল খৃঃ পূঃ ১২৪৩ বৎসর হইতে ৭৪৪ বৎসর বিয়োগ করিলে ৫৯৯ বৎসর যাহা লব্ধ হয়, তাহা খৃঃ পূঃ সময় বটে। বিষ্ণু

১। Introduction of "Ancient India" as described by Megasthenes.

২। বিষ্ণু পুরাণের টীকা কর্ত্তা শ্রীধর স্বামী কহেন নন্দের অন্যতর পত্নীর নাম মুরা; চন্দ্র গুপ্ত তাহার গর্ভজাত বলিয়া মৌরেয় আখ্যাত।

৩। বিষ্ণু পুরাণ ৪ অংশ ২৪ অধ্যায়।

পুরাণ মতে সেই সময়ে আভীর জাতির রাজ্য হয়; ৭ জন আভীর, ১০ জন গর্দ্দভিল, ১৬ জন শক, ৮ জন যবন, ১৪ জন ভুখার (১), ১৩ জন মুণ্ড, ১১ জন মৌন, ইহারা ১৩৯৯ বৎসর মগধে রাজ্য করেন। সম্ভবত মেগাস্থিনিসের সান্দ্রকোটস্ ইহার অনন্তর জাতীয় অনার্য্য বংশ সম্ভূত হইবেন (২)। যদি মৌরেয় চন্দ্র গুপ্ত গ্রীক কন্যা বিবাহ করিতেন তাহা হইলে পুরাণে তাহার কোন উল্লেখ থাকার সম্ভাবনা ছিল।

এখন বেণ্টলির গণনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। বেণ্টলি সাহেবের গণনানুসারে ভারত যুদ্ধের ৬ বৎসর পূর্ব্বে পরিক্ষিতের জন্ম হয়, কিন্তু মহাভারত পাঠে অবগতি হয়, ভারত যুদ্ধের সময়, পরিক্ষিত গর্ভস্থ। বেণ্টলি ও উইলফোর্ডের লেখাতে সহসা বিশ্বাস করা উচিত হয় না, বিশেষত জ্যোতিষ গণনাতে বেণ্টলি সাহেব পরস্পর বিরুদ্ধ মত বলিয়াছেন। তিনি আপনার মতকে আপনি খণ্ডন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বেণ্টলি সাহেবের মত যে ৪৬০ শকে এদেশীয় পণ্ডিতেরা তাবৎ প্রাচীন গ্রন্থ নষ্ট করিয়া নূতন গ্রন্থ সকল কল্পনা করিয়াছেন। তিনি এক স্থলে কহিয়াছেন কল্প, মন্বন্তর, যুগাদি কালের পরিমাণ যে গ্রন্থে আছে, তাহা ৪৬০ শকের পরে রচিত হইয়াছে। রামায়ণে ঐ প্রকার কালের পরিমাণ আছে, সুতরাং বেণ্টলির যুক্তি অনুসারে তাহা ৪৬০ শকের পরে রচিত; কিন্তু তিনি অন্য স্থানে ২১৬ শকে রামায়ণ রচিত হইয়াছে কহেন।

সাহেবের কৃত গ্রন্থের বিরুদ্ধে আমার উক্তি অনেকেই মান্য না করিতে পারেন অতএব বেণ্টলির গ্রন্থ সম্বন্ধে কোলব্রুক সাহেবের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“অনেক বিষয়ে বেণ্টলি সাহেব তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াও সরল ভাবে তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বরাহ মিহিরকে পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা পঞ্চ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত অন্য কোন সিদ্ধান্তের রচক বলিয়া আর স্বীকার করেন না। সূর্য্যসিদ্ধান্তকে বরাহ মিহির দ্বারা রচিত

১। প্রকৃত পাঠ ভুখার হইবে; ভুখারের (বোখারার) বাসীকে ভুখার বলা যায়, লিপিকর প্রমাদে বিষ্ণু পুরাণে তুখার লিখা হইয়াছে।

২। সান্দ্রকোটস্ গ্রীক কন্যা বিবাহ করাতেই তিনি অর্য্য বংশ সম্ভূত চন্দ্র গুপ্ত নহেন ইহা প্রবল অনুমান। শক যবনেরা গ্রীক কন্যা বিবাহ করা সম্ভব পর ঘটনা।

বলিয়া যে কাল নির্ণয় করেন, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতে কহেন, যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনায় প্রায় ৫০০ বৎসর পরে, আকবর সাহ বাদশাহের রাজ্যাভিষেকের ২৬ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, বরাহ মিহির বর্ত্তমান ছিলেন"। (১) পূর্ব্বে প্রদর্শন করা হইয়াছে বরাহ মিহির তিন জন এবং শেষ বরাহ মিহির ৪২৭ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। কোলব্রুক সাহেব বীজ গণিতের ভূমিকাতে বরাহ মিহিরের বর্ত্তমান কাল তদ্রূপই স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক বেন্টলি সাহেব ভারত যুদ্ধের সময় যে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। তুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির, যে সময় নিরূপণ হইয়াছে এবং তৎপরে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী যাহার অনুগমন করিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিয়া আধুনিক মত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সময় নির্ণয় পক্ষে তুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে উপকরণ ছিল, এক্ষণে অবশ্যই তাহা না থাকিতে পারে। আর হিন্দুরা মিথ্যামিথ্যি প্রাচীন সময়ে কেন যুধিষ্ঠিরকে লইয়া যাইবেন।

রামায়ণ, মহাভারত, এবং বিষ্ণু পুরাণ প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থে, দিল্লীনাম দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার সময়েও ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল না এবং দিল্লী নাম তখনও যে হইয়াছে ইহা বোধ হয় না। কেহ কেহ কহেন ২১০০ বৎসরের প্রাচীন দেহলু রাজার নাম হইতে দিল্লী নাম হইয়াছে। কনিংহাম সাহেব ফেরিস্তার মতাবলম্বী হইয়া বিক্রমাদিত্যের সময়ে দিল্লীনাম হইয়াছে কহেন। এবং টলেমির লিখিত দাইদালার সহিত দিল্লীর অনন্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। মোসলমানেরা দিল্লীকে দহলী কহে। নূতন দিল্লীতে পথে ঘাটে পারস্যাক্ষরে যে সকল সাইন বোর্ট লটকান আছে, তাহাতে দহলী শব্দ লেখা আছে। দহলী শব্দের অর্থ দলদলিয়া মৃত্তিকা; মোসলমানদিগের মধ্যে কিম্বদন্তী এই যে, গিজনির অধিপতি মহম্মদ সাহ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া মৃত্তিকার অদৃঢ়তা নিবন্ধন শিবির সংস্থাপনে ক্লেশ পাইয়া দহলী নাম রাখিয়াছিলেন তাহারই অপভ্রংশে দিল্লী নাম হইয়াছে। দিল্লীর মৃত্তিকা কঠিন, দিল্লী পার্ব্বত্য ভূমিতে, এবং মৃত্তিকা প্রস্তরময়; যাঁহারা প্রাচীন দিল্লী দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এই জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে ইতস্তত করিবেন। মহম্মদ সাহ দস্যুবৎ লুণ্ঠন ব্যাপার সমাধা জন্যই ভারতে আসেন অতএব

(১) Colebrooke quoted in Van. S. Kennedy's Researches into Ancient and Hindu Mythology. p. 149.

তিনি প্রথমে দিল্লীতে যাইয়া শিবির স্থাপন করিবেন ইহাও সম্ভব নহে। হয়ত যমুনার প্রশস্ত চর ভূমিতে ছাউনি করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি সত্য হইলে, মহম্মদ সাহার সময় হইতে দিল্লী নাম হইয়াছে। রাজস্থানের ইতিহাস লেখক কর্ণেল টড কহেন খৃঃ অষ্টম-শতাব্দীতে ইন্দ্রপ্রস্থ নাম লোপ হইয়া দিল্লী নাম হইয়াছে, তাহার কারণও তিনি দর্শাইয়াছেন। যথা, পুরাতন দিল্লীতে যে লৌহ স্তম্ভ স্থাপিত আছে, তাহা বাসুকির মস্তকোপরি স্থাপিত এই প্রবাদের প্রতি সন্দেহ করিয়া তুয়ার বংশীয় অনঙ্গ পাল স্তম্ভ মূল খনন করেন, তাহাতে লৌহ স্তম্ভ ঢিলী (নড় চড়) হয়; সেই ঢিলী শব্দের অপভ্রংশ দিল্লী নাম হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে দিল্লী অঞ্চলে নিম্ন লিখিত প্রবাদ চলন আছে।

খিলিতো ঢিলীতৈ তুয়ার ভায়া মাত্‌হিন্।

তুয়ারের মূর্খতা জন্য খিলি (লৌহ স্তম্ভ) ঢিলী হইল।

সাহেবেরা ঢিলী শব্দের Loose অর্থ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব!

ব্রহ্ম-ধারণা।

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।

সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।

মনু ১ম অধ্যায় ৯৩ ম শ্লোক।

উত্তমাঙ্গ হইতে জন্মিয়াছেন বলিয়া, জ্যেষ্ঠ বলিয়া, ব্রহ্ম-ধারণা করিতে পারেন বলিয়া—এই সকল সৃষ্টির ধর্ম্মত ব্রাহ্মণ প্রভু।

ব্রাহ্মণ সকলের মধ্যে জ্ঞানী বা ধর্ম্মশীল,—ব্রাহ্মণ সকলের আদরণীয় বা পূজনীয়,—ব্রাহ্মণ সকলের মধ্যে পবিত্রতম, বা অধিকতম ভক্তিমান্—শ্লোকে এরূপ কোন কথার আভাস নাই; অন্যান্য স্থলে সেসকল কথা আছে। এ শ্লোকে কেবল এই কথা মাত্র আছে, তিনটি কারণে ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু। একটি কারণ তাঁহার জাতি নিষ্ঠ; একটি বয়ো-নিষ্ঠ, একটি তাঁহার শক্তি নিষ্ঠ।

(১) ব্রাহ্মণ উত্তমাঙ্গোদ্ভব। পৌরাণিকী ভাষায় বলা হইয়াছে, যে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। মুখ হইতে উৎপত্তি হইল, তাঁহাতে কি

হইল? মুখ অন্যান্য অঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট তাহা কিরূপে জানিব? এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণের জন্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে;—

ঊর্দ্ধং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমং তস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা।

মনু ১ম অধ্যায় ৯২ ম শ্লোক।

পুরুষ সর্ব্বতোভাবে পবিত্র; (তাহার) নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর; তাহার মুখ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—ব্রহ্মা বলিয়াছেন।

মুখ যে পবিত্রতম অঙ্গ ব্রহ্মা এ কথা বলিয়াছেন, এই কথা বলাতেই, এক প্রকারে বলা হইল, যে উহাতে আর তর্ক করিও না। অথচ নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর বলাতেই, একরূপ যুক্তি যে আছে, তাহার আভাস দেওয়া হইল। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের প্রণালী অনেক স্থলেই এইরূপ।

পৌরাণিক বিবরণ আধুনিক ধরণে বলিতে গেলে, এইটুকু বলিতে হয়, যে বিশুদ্ধতম শ্রেষ্ঠবীজে ব্রাহ্মণের জন্ম।

(২) ব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠ। কেন? টীককার বলেন, ক্ষত্রিয়াদির পূর্ব্বে উৎপন্ন বলিয়া। ব্রাহ্মণই বা কবে হইলেন, ক্ষত্রিয়ই বা কবে হইলেন? পুরাণাদি শাস্ত্র বলেন;—অগ্রে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন, তাহার পর, তদীয় বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হন, পরে উরু হইতে বৈশ্য, পদ হইতে শূদ্র *। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, যে সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণেরা ভারতে আগমন ও অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। পরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রমে ক্রমে পরে পরে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, শূদ্র ভারতের অনার্য্য আদিম নীবাসী। আবার কেহ কেহ বলেন, শূদ্রেরা সর্ব্বশেষে ভারতে আগমন ও অধিষ্ঠান করেন। ভাষা-বিজ্ঞান বা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের জটিল তর্কের মধ্যে অধিক প্রবেশ না করিয়াও মোটামুটি বলা যাইতে পারে, যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ভারতে আর্য্য আগন্তুকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। আর আমাদের পুরাণাদিশাস্ত্রে সে কথা ত আছেই।

---

* শূদ্র যে অনার্য্য বা দস্যু তাহা বোধ হয় না; উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত নহে, বা সংস্করণীয় নহে, এরূপ আর্য্য সন্তানই শূদ্র বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতে এ কথার বিচার করিবেন। এটি যে বিচার্য্য বিষয়, এ স্থলে তাহা বলিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে।

(৩) ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-ধারণা করিতে পারেন। এটি বড় কঠিন কথা। প্রথমতঃ ব্রহ্ম কি তাহা বুঝা কঠিন; তাহার পর, পুঁথী দেখে, বা লোকের মুখে শুনে যদিও বা কিছু বুঝা যায়, কিন্তু সেই ব্রহ্মের যে আবার এমন কি একটা ধারণা আছে, যে তাহাতে প্রভুত্ব পাওয়া যায়, তাহা বুঝা আরও কঠিন। কিন্তু এটি না বুঝিলে, কিসে যে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের অসাধারণ প্রভুত্ব হইয়াছিল, এবং এখনই বা কেন ব্রাহ্মণ লক্ষধারী কাঙ্গালি,—তাহা ত বুঝিতে পারিব না। মনুর ভাষা অতি পরিষ্কার—তিনটি মাত্র কারণে ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু। ব্রাহ্মণ (১) জাতিতে বিশুদ্ধতম; (২) স্থিতিতে আদিম বাসী; (৩) শক্তিতে ব্রহ্ম-ধারণ-ক্ষম।

প্রথম দুইটি কারণ একটু একটু বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু শেষের কারণটি বুঝাও চাই।

মুনিঋষি ব্রাহ্মণেরা কিরূপে পুরাকালে ব্রহ্ম-ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা ভাল বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের যে ব্রহ্ম-ধারণা ছিল, তাহা একটু একটু বুঝিতে পারি। আর য়ুরোপ কি রূপে ব্রহ্ম-ধারণা করিবার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাও একটু একটু বুঝিতে পারি। বুঝি এই,—

ব্রহ্ম=পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের ভাবি চরম সিদ্ধান্ত।

সংশ্লেষণে শক্তির একীকরণ এবং বিশ্লেষণে জড়ের একরূপত্ব প্রদর্শন— এই উভয়বিধ একীকরণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং কার্য্য।

একটি আতা পাকিলে, যে শক্তি বলে উহা ভূতলে পতিত হয়, আর যে শক্তিবলে মঙ্গল বুধাদিগ্রহ বিমান পথে বিচরণ করিতেছে,—সৌরজগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ এইরূপ সকল কার্য্যে যে কোটি কোটি শক্তি আমরা নিয়ত স্ফুরিত হইতে দেখি, তাহা মাধ্যাকর্ষণী নামে একটি ব্যাপিকা শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র—জগদ্বিখ্যাত নিউটনের ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। ক্রমে ইহাও স্থির হইয়াছে, যে কেবল সৌরজগতেই যে মাধ্যাকর্ষণী শক্তির অধিকার, তাহা নহে। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের সূর্য্যকেন্দ্রী গ্রহচক্রের মত, লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ বা তারকাজগৎ আছে, যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহার সর্ব্বত্রই এই মাধ্যাকর্ষণী শক্তি একা কর্ত্রীরূপে ক্রিয়মানা। ইহাকেই বলি, সংশ্লেষণে শক্তির একীকরণ।

তাহার পর বিশ্লেষণে জড়ের একরূপত্ব প্রদর্শন। সেও এক রূপ একীকরণ। ঐ যে চারুজীর চম্পকাঙ্গুলির অঙ্গরীয়ক মণি হীরক খণ্ড, আর ঐ

যে অঙ্গনের আবর্জ্জনা মিশ্রিত অঙ্গার খণ্ড—এই দুই একই পদার্থ, অসম সাহসে হাসিতে হাসিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঐ কথা সকলকে বুঝাইয়া দেয়। উহা রসায়নের কথা। কিন্তু রসায়নের বিশ্লেষণ রাসায়নিক মূল পদার্থ পর্য্যন্ত গিয়াই নিবৃত্ত হয়। পদার্থ বিদ্যার বিশ্লেষণ আবার সেই নানাবিধ রাসায়নিক মূল পদার্থের একীকরণ করিয়াছে। পদার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়াছে, যে, হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, ক্ষার, অঙ্গার সকলই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। সমবেত পরমাণু পুঞ্জের পরস্পর মধ্যে দূরত্বের তারতম্যে, এবং পরস্পর সমাবেশের প্রকৃতি ভেদে—পদার্থের বিভেদ লক্ষিত হয় মাত্র। বস্তুত সকল বস্তুই এক।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান গতিতে বুঝিয়াছে মাধ্যাকর্ষণী পরমাশক্তি। স্থিতিতে বুঝিয়াছে সমবায়ী পরমাণু। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বৈতবাদী।

কিন্তু পাশ্চাত্যবিজ্ঞান দিন দিন অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যদিও তাপ, তেজ, তাড়িত প্রভৃতি পদার্থ মাধ্যাকর্ষণীর নিয়মাধীন বলিয়া এখনও প্রতিপন্ন হয় নাই, কিন্তু যখন ঐগুলি কেবল শক্তির বিকাশ মাত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন বুঝাই যাইতেছে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান অদ্বৈত-বাদের দিকে অগ্রসর।

হর্বর্ট স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্পষ্টতই অদ্বৈতবাদের আভাস পাইয়াছেন। তবে সেই, আভাস এখনও কেবল আভাসই আছে; এখনও বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই। তাহাতেই বলিতেছিলাম,—পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের ভাবি চরম সিদ্ধান্ত,—

এক।

ব্রহ্মং—একমেবাদ্বিতীয়ং। ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই কথার এখনও অবধারণা করিতে পারে নাই; কিন্তু পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা "ধারণা করিতে" পারিতেন। মনু বলেন, এই ব্রহ্ম-ধারণা ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের একটি কারণ; হয় ত প্রধান কারণ। ব্রহ্ম-ধারণায় প্রভুত্ব হয় কিরূপে?

সকলেই জানেন, ধনে প্রভুত্ব হয়, বলে প্রভুত্ব হয়, জ্ঞানে প্রভুত্ব হয়, বুদ্ধিতে প্রভুত্ব হয়। আমার ধন বাড়িলে আমার প্রভুত্ব বাড়িতে থাকে, আমার বল বাড়িলে আমার প্রভুত্ব বাড়িতে থাকে, আমার জ্ঞান বাড়িলে আমার প্রভুত্ব বাড়িতে থাকে, আমার বুদ্ধি বাড়িলে আমার প্রভুত্ব বাড়িতে থাকে। একটু আধটু প্রভুত্ব সকলেরই আছে; বেশী প্রভুত্ব হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে প্রভুত্ব বলা যায়। আপনার কিছু না কিছু, না বাড়িলে

প্রভুত্ব হয় না। অতএব, আত্মবিস্তৃতিতেই প্রভুত্ব। আর আত্মসংকোচেই দাসত্ব। আমি যদি কেবল আপনি আর কপ্‌নি হইয়া কাল যাপন করি, তাহা হইলে আমার কিছু প্রভুত্ব থাকে না; কে আমার কথা শুনিবে? কিন্তু যদি আমি আমার পরিবারবর্গের সকলকে আপনার বলিয়া সত্য সত্যই মনে করি, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে আমার একটু প্রভুত্ব হয়। যদি আমার দাস দাসীদের কাহার কি খাওয়া হইল, না হইল, তাহার জন্য আমি ব্যস্ত থাকি, পরিবার মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে, আমি শুশ্রূষায় নিবিষ্ট হই, আমার উপার্জ্জিত অর্থ তাহাদের ভরণ, পোষণ, সন্তোষণে চিরদিনই ব্যয় করি, তাহা হইলেই পরিবার মধ্যে আমার প্রভুত্ব আপনা আপনি হইয়া পড়ে; আমার আত্মশক্তি পরিবারে বিস্তৃত হইয়াছে, কাজেই সেই আত্মবিস্তৃতিতে আমার প্রভুত্ব হইয়াছে।

সেইরূপ আমি যদি গ্রামের সকলকে আপন ভাবিয়া কার্য্য করি, বলের দ্বারা তাহাদের সাহায্য করি, ধনের দ্বারা তাহাদের পোষণ করি, বিদ্যাদানে তাহাদিগকে উন্নত করি, তাহা হইলে গ্রামের মধ্যে আপনা হইতেই আমার প্রভুত্ব হয়। আত্মবিস্তৃতিই প্রভুত্বের মূল; আত্মবিস্তৃতিতেই যীশুখ্রীষ্ট—প্রভু। এবং চৈতন্যদেব—মহাপ্রভু।

আত্মবিস্তৃতির কথা এখনকার দিনে আমাদের কাছে হাস্যকর উপন্যাস মাত্র। দেশ, প্রদেশ, গ্রাম, পল্লী দূরে থাকুক, এখন আমরা আপন পরিবার মধ্যেই আত্মবিস্তৃতি করিতে পারি না। ছোট বোনটির একটু অসুখ হইয়াছে, অতুল তাহার একটু শুশ্রূষা করিবার জন্য, তাহার কাছে আসিয়া বসিল, একটু পরেই অতুলের পিতা আসিয়া বলিলেন, "অতুল তুমি তোমার পড়া ক্ষতি করিয়া এখানে কেন? যাও তোমার পড়ার ক্ষতি করিও না।" বালক আত্মসংকোচ শিক্ষা করিল। তাহার পর বিদ্যালয়ে গেলে, শিক্ষক মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন, যে "দেখ, কেহ কাহাকেও কিছু বলিয়া দিও না, কাহারও কাছে কিছু বলিয়া লইও না।" অতুলের আত্মসংকোচের আরও পরিপোষণ হইল। ক্রমে অতুলের পাঠবৃদ্ধি হইল, আত্মকুঞ্চিতিও বাড়িতে লাগিল। তাহার পর ক্রমে য়ুরোপের মজ্জানীতি (Individuality বা) স্বস্বপ্রধানতা অতুলচন্দ্র শিক্ষা করিলেন। অতুল এখন এক জন স্বপ্রধান ব্যক্তি (বা Individual)। আত্মবিস্তৃতির কথা উঠিলে, অতুল এখন, কখনও উপহাস করেন, কখনও দুঃখ করেন।

সম্পূর্ণ ব্রহ্ম-ধারণা হইলে আত্মবিস্মৃতির চূড়ান্ত হয়। অল্পে অল্পে করিতে পারিলেও আত্মবিস্মৃতি বাড়িতে থাকে। পূর্ব্বকালে অল্পবিস্তর পরিমাণে এই ব্রহ্ম-ধারণা অনেক ব্রাহ্মণের কিছু না কিছু ছিল, কাজেই ব্রাহ্মণের আত্মবিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রভুত্বও ছিল। অধিকাংশ বা অনেক ব্রাহ্মণই যে নির্দ্দোষ বা নিষ্পাপ ছিলেন, এমন ধারণা করিবার আবশ্যক নাই। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তিলককে মহাপাপে লিপ্ত ছিলেন, অথচ তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল। সেইরূপ মহর্ষি দুর্ব্বাসা মহাকোপন-স্বভাব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রভুত্বও ছিল।

ব্রাহ্মণের যে ব্রহ্ম-ধারণা ছিল, উপনিষৎ. গীতা—পুরাণ, ইতিহাস,—দর্শন, কাব্য—সর্ব্বত্র তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের সর্ব্বত্র যে ভাব ওত প্রোত রহিয়াছে, তাহা জাল সৃষ্টি বা ভণ্ড-কল্পনা বলিতে পারা যায় না। পুরাকালে ব্রাহ্মণের যে অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল, তাহা সকলেই জানেন। ব্রহ্ম-ধারণার অর্থ—সমস্তই এক—এইটি ধারণা হওয়া। আমি তুমি, তিনি সকলই এক, এইরূপ দৃঢ়ধারণা হইলে, অনেকটা যে আত্মবিস্মৃতি হয়, তাহাও চোখের উপর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং মনু যে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম-ধারণা ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের অন্যতর (এবং গুরুতর কারণ) তাহা অতি প্রামাণিক কথা বলিয়াই বোধ হইতেছে।

পুরাকালে ব্রাহ্মণের মহাপ্রভুত্ব ছিল, এখন কিছু নাই বলিলেও চলে। কেবল বঙ্গদেশ দেখিলে ব্রাহ্মণের গভীর অধঃপতনের পূরা ধারণা হয় না। বীরভূমির প্রান্ত সাঁওতাল পরগণা হইতে, মরুভূমির মধ্যস্থ পুষ্কর পর্য্যন্ত, একবার পর্য্যটন করিয়া আইস, দেখিবে ব্রাহ্মণের কি গভীরতম অধঃপতন!

"তীর্থস্থানের পুরোহিতবর্গ ব্যতীত সাধারণত দিল্লী, আগ্রা, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্মণের অবস্থা অত্যন্ত হীন; যে জাতি এক দিন, এক কাল, ভূদেব নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদেরই সন্তানগণ এখন যে, অশ্ব-পরিচর্য্যায়, গো-রক্ষণে, মৃত্তিকা কর্ষণে, ঘোর মূর্খতায় ও কঠোর দরিদ্রতায় জড়ীভূত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছে, তাহা দেখিলে, কেবল দুঃখ হয় এরূপ নহে, জাতীয়ত্বের আশা ভরসা অনেক পরিমাণে আঘাত প্রাপ্ত হয়। যে দূরবীক্ষণ হস্তে, সম্মুখে দূরদৃষ্টি করিয়া নিশান লইয়া অগ্রসর হইবে, সে যদি অবসন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবে, তাহা হইলেত আবার নূতন সজ্জা না করিলে চলে না!

"সামাজিক গণনায় অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ চতুর্থ হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান এখনও তীর্থস্থান ব্যতীত অন্যত্র পাতশাহের জাতি বলিয়া প্রথম বা দ্বিতীয়। লালাও তদ্রূপ; বণিয়া কোথাও লালার সমকক্ষ, কোথাও কৃপণতাবাদে কিছু নীচে; ব্রাহ্মণ প্রায়ই চতুর্থ। আমাদের দেশে কায়স্থ বা বণিক্‌কে আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ হস্ত উত্তোলন করেন, এদেশে ব্রাহ্মণ আত্মগৌরব, এতই হারাইয়াছে, যে লালাকে বা বণিয়াকে শিরনত করিয়া বাবুজি বলিয়া থাকে। বিদেশী মিশনরিদের কুহকে পড়িয়া যাঁহাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর এরূপ অধঃপতনে হর্ষানুভব করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রকৃত ইতিহাস বুঝেন, তাঁহারা এই অধঃপতন দেখিয়া মর্ম্মাহত!" *

তাই বলি, দাদা! তোমার ব্রহ্ম ধারণায় এখন কাজ নাই, তুমি একবার আত্মধারণা কর। তুমি কি ছিলে, আর কি হইয়াছ,—একবার স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ! এক দিন ব্রাহ্মণের কল্পনা দেব দেব বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, আর আজি সেই ব্রাহ্মণের কুল-কজ্জল তোমরা দনু-দানবের পদপ্রসাদ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত!

সে দিন কয় জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তৈলবটস্বরূপ সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন বলিয়া, আর এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রকাশ্য পত্রে অর্থের স্পৃহাকাঙ্ক্ষার কতই না উপহাস করিলেন! বল, ব্রাহ্মণের ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর অধঃপতন হইতে পারে? না—অর্থ অর্থ করিয়া আর অনর্থ বৃদ্ধি করিও না—আর কাহারও দিকে না চাহিতে পার, আপনার দিকে দৃষ্টি কর; অর্থই সংসারের সার পদার্থ নহে; যদি হইত, তাহা হইলে, য়িহুদীরা ভিটামাটী ছাড়া হইয়া ভবঘোরে ঘুরিতেছে কেন? আমাদের দেশে শেঠিয়া কেঁইয়ার এত দুর্দ্দশা কেন? নিরবচ্ছিন্ন অর্থ লালসাতেই তোমার অধঃপতন হইয়াছে। আবার ক্রমে ক্রমে সেই মায়া কাটাইয়া উঠ; আবার সেইরূপ আত্ম-বিস্মৃতি শিক্ষা কর, আবার সেইরূপ আধ্যাত্মিকতা জীবনের অবলম্বন কর;—দেখিবে, তুমি আবার এই সকল সৃষ্টির ধর্ম্মত প্রভু হইবে।

---

* ভ্রমণকারীর পত্র। সাধারণী। ১লা ফাল্গুন ১২৮৩।

সুরধুনী তীরে।

চিন্তাকুল।

এইত মা সুরধুনী কলুষনাশিনি,
তাপিত তাপহারিণী নগেন্দ্রনন্দিনি,
পতিতপাবনি মাগো, দ্রবময়ী গঙ্গে,
এসেছি, বুঝাও এবে, কি বল তরঙ্গে?

অনন্ত তরঙ্গমালা হৃদি'পরে ধরিয়া,
অনন্ত—অনন্তকাল চলেছ কহিয়া!
তরতর, তরতর, কি শবদ হয়?
অদম্য আবেগে কেন অস্থির হৃদয়।

জানি মা, জীবের তুমি শান্তিপ্রদায়িনী,
শোক,তাপ,দুঃখ,চিন্তা,পাপ বিনাশিনী,
তাই মা,তোমার তীরে আসি' দুখী জন,
শুনায় মরম কথা—হৃদয় বেদন।

পরদুখে অশ্রুজল পড়ে গো যাহার,
তাহার সমান বন্ধু কেবা আছে আর?
তুমিত মা, হৃদিব্যথা মুছাও সবার,
অভাগার অভিলাষ পূরাও এবার।

সঙ্গীতে হয়েছ দ্রব তুমি সুরবালা,
অক্ষম দ্রবিতে মোরে শোক গীতিমালা?
মস্তকে ধরেছে তোমা' দেব স্মরহর,
তাঁহার অধিক ভক্তি কি জানিবে নর?

অহঙ্কার মত্তগজে ভাসাইলে জলে,
অভাগার হৃদিপিণ্ড ডুবাও অতলে।
শাপে ভস্ম সগরের সন্তান সকলে,
উদ্ধারিলা আপনার মহিমার বলে,—
শোকে দুখে ভস্ম সম হয়েছে পরাণ,
উদ্ধার তারিণি,দিয়ে শান্তি বারিদান।

অই যে, আবার অই তরঙ্গ উঠিল,
একে একে সারি সারি তীরেতে লাগিল।
কি উহারা তব বক্ষে? কি কথা কহিছে,
থাকিয়া থাকিয়া কেন উচ্ছ্বাসে বহিছে?

বহুদিন মনে সাধ, জানিব কারণ,
শিখাও, বুকেতে উহা কি কর ধারণ।
শোকে, তাপে জরজর হইয়া যে জন,
কাঁদিবারে আসে মাগো, তোমার সদন,
দেখাও তাহারে অই তরঙ্গ সকল;
কখন মৃদুল বহে, কখন প্রবল।
আর যে কি বোল বলে,বুঝিতে না পারি,
বুঝি না, তথাপি উহা সর্ব্বতাপহারী।

শোক,দুখ, পাপ,তাপ, চিন্তার বিকার,
করেছে যাহার হায়, চিত্ত অধিকার,
মানবের শত শত প্রবোধ বচন,
চিত্ত বিনোদিতে তার নারে কদাচন।
শান্তিপ্রদ তব তটে বসিলে কেবল,
জুড়ায় জীবন জ্বালা মানব সকল।
নির্জ্জনে এসেছি আজি নিশীথ সময়,
বলিব বলিয়া তোমা' দুখ সমুদয়।
কিন্তু মাতঃ ভ্রম মম, চিত্তের বিকার,
প্রকাশ করিতে শক্তি নাহিক আমার।

পরাণ পাগল পারা কিসের লাগিয়া,
বুঝায়ে জননী, কর সুশীতল হিয়া।
অই যে অই যে ফের তরঙ্গ সঙ্কুল
হইল হৃদয় কেন? সঙ্গীত মৃদুল

উঠিল আবার অই; ধীরে ধীরে ধীরে,
কতদূর হ'তে সবে আসিতেছে তীরে।

বুঝেছি মা কে উহারা হৃদয়ে তোমার,
ছুটাছুটি করিতেছে, কুলকুল আর।
শোকাতুর শোক উহা, পাপীজন পাপ,
দুঃখিতের দুঃখ উহা, তাপিতের তাপ।
শোকী তাপী, সবে এসে তোমার সদন,
কেঁদেছে, কহেছে আর হৃদয় বেদন,
শান্তি প্রদায়িনী তুমি পতিতপাবনী,
সন্তানের দুখ ভার লয়েছ আপনি।
হৃদি হ'তে দুখ ভার মুছায়ে লয়েছ,
তরঙ্গ রূপেতে তাহা হৃদয়ে ধরেছ।

তরঙ্গ রূপেতে তব বক্ষের উপর
শোকের দুখের গীতি গায় মনোহর।
থেকে থেকে কতগুলি অধীর হইয়া
সচঞ্চল করে তোমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

আবার যখন কোন পাপী তাপী জন
তোমার নিকটে আসি' করে মা ক্রন্দন,
দুখী জন দুখ কথা সদা ভাল বাসে,
শুনিতে—শুনাতে তারা নিকটেতে আসে।

আমার মরম জ্বালা কহিবার নয়,
না শুনে যদ্যপি হয় দয়ার উদয়,
লও তবে দয়া ক'রে কোলেতে আমায়,
মা'র কোলে সুখে শুয়ে যেন প্রাণ যায়।

দান ধর্ম্ম।

স্বদেশে।

রেল হওয়ার পূর্ব্বে আমি একবার পালকীডাকে মুরসিদাবাদ যাইতে-ছিলাম। পলাশীর মাঠ ছাড়াইয়া পীলখানার নিকটে এক স্থানে আসিয়া, বৈকালে বেহারারা কিঞ্চিৎ বিশ্রামের নিমিত্ত, রাস্তার ধারে এক ফকিরের আস্তানার সম্মুখে পালকী নামাইয়া, তামাকু খাইতে লাগিল। সেই আস্তানায় কেবল একটি ফকিরণী থাকে। ইহা বলা অনাবশ্যক, যে ঐ ফকিরণী শুদ্ধ ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে। আমার পালকী নামাইবার পরক্ষণেই এক জন বলিষ্ঠকায় অর্দ্ধ বয়স্ক মুসলমান আমার নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল, যে সমস্ত দিন অনাহারে সে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে, অত্যন্ত ক্ষুধান্বিত হইয়াছে, আমি তাহাকে কিছু দিলে, সে তদ্দ্বারা তাহার ক্ষুধা নিবারণ করিবে। তাহাকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার নিকট যথেষ্ট পয়সা ছিল, কিন্তু আমি তাহার কথা মিথ্যা বিবেচনা করিয়া, কিছু দেওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাকে কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা করা অনুচিত কার্য্য ইত্যাদি কথায় এক দীর্ঘ (লেকচর) বক্তৃতা শুনাইয়া দিলাম। ফকিরণী

তাহার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ভিক্ষুকের সহিত আমার কথোপকথন শুনিতেছিল এবং যেই দেখিল যে, ঐ ব্যক্তি আমার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছে, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিল এবং তাঁহাকে এক ছিলিম তামাকু খাইতে দিয়া বলিল "বাবা তুমি এইখানে বইস—আমি দেখি খোদা আমাকে মেহেরবাণী করে কি না।" এই বলিয়া, সে একখানা মাটির সানক হস্তে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া এক দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু আমি সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে করিতেই, সে ঐ সানক ভরিয়া কড়কড়া ভাত ও কিছু ডাইল লইয়া আসিয়া আনন্দ চিত্তে পথিকের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "বাবা খাও"। পথিকও দেখিলাম যেরূপ আগ্রহের সহিত সমুদায় অন্নগুলি এবং অবশেষে চক্ চক্ করিয়া এক লোটা জল উদরস্থ করিল, তাহাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, যে সে যথার্থই ক্ষুধিত ছিল এবং ঐ ভাতগুলি আহার করিয়া বিলক্ষণ পরিতৃপ্ত হইল। তাহা দেখিয়া ফকিরণী ত স্বভাবত আনন্দিত হইবারই কথা, আমি যে পাপিষ্ঠ, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দোষে এমন ক্ষুধান্বিত ব্যক্তিকে বৈমুখ করিয়াছিলাম, আমারও মনে সুখের উদয় হইল। শুনিলাম যে ফকিরণী পথিককে যে ভাত আনিয়া দিল, সে তাহা গ্রামের মধ্যে গিয়া ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং সে প্রত্যহই ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার দ্বারে ক্ষুধিত বলিয়া কেহ উপস্থিত হইলে, সে গ্রামের গৃহস্থদিগের নিকট খাদ্য দ্রব্য সকল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়ায়। গ্রামের সকলে ফকিরণীর এই সদ্গুণের কথা অবগত থাকাতে তাহাকে সকলে যথাসাধ্য দ্রব্য সামগ্রী দিয়া সাহায্য করে। পরমেশ্বর যাহাকে দাতা করিয়াছেন সে অতি দরিদ্র হইলেও পরোপকার করার নিমিত্ত তাহার উপায়ের অভাব থাকে না।

বিদেশে।

ফ্রান্স দেশের মার্সাই নগরে পূর্ব্বে বড় জল কষ্ট ছিল *। কূপের জলের উপরে নগরবাসী সকলে নির্ভর করিত, কিন্তু সেই প্রস্তরময় দেশে কূপ খনন

---

* এই বিবরণটি আমি Chamber's Journalএ পড়িয়াছিলাম কিন্তু বহু দিন হইল বলিয়া আমার ঠিক স্মরণ নাই যে উহা মার্সাই কি অন্য কোন নগর; যাহা হউক নামের প্রভেদে বিবরণের কোন প্রভেদ হইবে না।

করা বহু ব্যয়সাধ্য। কেবল ধনশালী ব্যক্তিরা আপন আপন বাড়িতে কূপ রাখিতে পারিতেন। সাধারণের নিমিত্ত নগরের রাজকোষ হইতে কয়েকটা কূপ খনিত ছিল এবং তাহা হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ সেই দিনের খরচের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বোতলে করিয়া জল বিতরণ করা হইত। কিন্তু সকল বৎসর কূপে সমান জল হইত না। যে বৎসর কম জল হইত, সেই বৎসর বাসিন্দাগণের অসীম কষ্ট হইত, এমন কি লোকে দুই বেলা কেবল দুই গণ্ডূষ জলের অধিক ব্যবহার করিতে পাইত না।

এইরূপ কোন জল কষ্টের বৎসর, এক দুঃখিনী মায়ের কোলে শুইয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত একটি ১২ বৎসরের বালক ছটফট্ করিতেছে এবং "মা জল দে, মা জল দে" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। জননী জ্বরা সন্তানের তৃষ্ণা নিবারণের পর্য্যাপ্ত জল কোথায় পাইবেন? নিজে দুই দিবস যাবৎ এক বিন্দু জলও মুখে না দিয়া দুই জনের সমস্ত জল পুত্রকে পান করাইয়াছেন, তথাপি রোগান্বিত তৃষ্ণার বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হইতেছে না। উভয়ে ক্রন্দন করিতেছেন, পুত্র রোগের জ্বালায়, জননী পুত্রের দুঃখ দেখিয়া। কিন্তু উপায় নাই। প্রতিবেশীগণের নিকট সাহায্যেরও অধিক আশা নাই কারণ এমন জল কষ্টের সময় কে তাহার নিজের পানীয় জলটুকু অন্যকে দিবে? এইরূপ কান্দিয়া কাটিয়া কষ্ট ভোগ করিয়া, বালকটি ঐ যাত্রায় জননীর পুণ্য বলে রোগ হইতে মুক্তি পাইল। কিন্তু এই কষ্টের কথা চিরকাল তাহার মন মধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

বালক তাহার পরে ক্রমশ বয়োধিক হইয়া পৈত্রিক ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রকৃতিরও অনেক পরিবর্ত্তন দেখা দিল। লোকে বিবেচনা করিত, যে সেই পীড়াতে তাহার মস্তিস্ক দূষিত হওয়ায় ঐরূপ ঘটিয়াছে। প্রতিবেশীদিগের কিম্বা সমবয়স্ক যুবকদিগের সহিত সে আলাপ কিম্বা সঙ্গ করিত না। অথচ অর্থ উপার্জ্জনে বিলক্ষণ পটুতা দেখাইতে আরম্ভ করিল। দিবসের কাজ কর্ম্ম সমাধান্তে সে তাহার ঘরে আসিয়া প্রদীপ এবং অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কোন ভোজ কিম্বা আমোদের স্থানে যাইত না এবং কাহাকেও নিজে কখনও নিমন্ত্রণ করিত না। ১৮।১৯ বৎসরের সময় সে এক তরুণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, যে তাহাদের দুই জনের জীবন ধারণের উপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই, সে তাহাকে নিশ্চয় বিবাহ করিবে। তাহার মাতাও এই কথা

শুনিয়া আহ্লাদিত হইল এবং মনে করিল যে বিবাহ করিলে পুত্রের প্রকৃতি ভাল হইবে। কিন্তু মাতার সে আশা পূর্ণ হইল না; কারণ পুত্রের যদিও অল্প কালের মধ্যে বিলক্ষণ ধন সঞ্চিত হইল, তথাপি বিবাহের প্রতি তাহার বিশেষ প্রবৃত্তি কিম্বা আকিঞ্চন দৃষ্টি হইল না। যুবতীও যুবার ভাব গতিক দেখিয়া অন্য ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিল। মাতাও কিছু কাল পরে লোকান্তর গমন করিলেন এবং সেই অবধি তাহার স্বভাব আরও নীচ হইতে নীচতর হইতে লাগিল। মাতা জীবিত থাকিতে সে তাহার মাতার সঙ্গে যে গৃহে বাস করিত, তাহা ও তাঁহার সমুদায় দ্রব্যাদি মাতার মৃত্যুর পরে বিক্রয় করিয়া, অতিশয় দরিদ্রেরা যেরূপ কুটীরে বাস করে, সেইরূপ এক কুটীর সংগ্রহ করিয়া, তাহার মধ্যে যুবা বাস করিতে আরম্ভ করিল। সরঞ্জামের মধ্যে কেবল একখানা সামান্য খাটিয়া কিন্তু তাহাতেও বালিশ কিম্বা তোষক ছিল না। সন্ধ্যার পরে প্রদীপের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিত না। শীতকালে অতিশয় অসহ্য শীত না হইলে, সে তাহার আতসখানায় কয়লা পোড়াইত না। যত অল্প মাত্রায় এবং সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া মানুষে জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহা সে করিত, বোধ হয় অনাহারে থাকিতে পারিলেও তাহাতে সে বিরত হইত না। তাহার পরিচ্ছেদের অবস্থাও সেইরূপ ছিল; কেহ কখনও তাহাকে নূতন জুতা কিম্বা নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দেখে নাই; পথের মধ্যে পুরাতন নেকড়া কিম্বা চর্ম্ম খণ্ড পাইলে, তাহা যত্নে সংগ্রহ করিয়া আনিত এবং তাহা দিয়া সে নিজ হস্তে তাহার কোর্ত্তা পেন্টুলন এবং জুতা সংস্কার করিত। এইরূপে তালির উপরে তালি, সেলাইয়ের উপরে সেলাইয়ে, তাহার বস্ত্র এবং জুতা আচ্ছাদিত ছিল। পথ মধ্যে লোকে তাহাকে দশ হাত অন্তরে রাখিয়া গমন করিত। রাস্তায় বাহির হইলে নগরের বালক বালিকারা তাহাকে উপহাস এবং তাহার গাত্রে ধুলা কর্দ্দম নিক্ষেপ করিত, কিন্তু তাহাতে সে হাস্য করা ভিন্ন, বিরক্তি কিম্বা বিরাগ প্রকাশ করিত না। কেবল ধন উপার্জ্জন, ধন-সঞ্চয় করাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যের সম্মুখে সে তাহার শরীরের সুখ স্বচ্ছন্দ, আহার বিহার, আমোদ, প্রমোদ,—সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছিল। দেশস্থ লোকে তাহার নাম উচ্চারণ করিত না। তাহার উল্লেখ করিতে হইলে "অমুক পল্লীর পাপিষ্ঠ, নরাধম" কিম্বা "অমানুষ" বলিয়া উল্লেখ করিত। নগরে আরও অনেক ব্যক্তি কৃপণ

ছিল কিন্তু ইহার ন্যায় এমন জঘন্য কৃপণ কেহ কখনও দেখে কিম্বা শুনে নাই।

এইরূপ জঘন্য অবস্থায় সে প্রায় ৮০ বৎসর বাঁচিয়া ছিল। কি রোগে কিম্বা কিরূপে তাহার মৃত্যু হইল তাহা কেহ জানিতে পারে নাই, কারণ কেহ তাহার কুটীরে কখনও যাইত না এবং সে ব্যক্তিও কাহারও সহিত আলাপ ব্যবহার করিত না। দুই তিন দিবস ধরিয়া তাহার কুটীর বন্ধ দেখিয়া প্রতিবেশীদিগের সন্দেহ হওয়াতে, তাহারা পুলিশে সংবাদ দিল এবং রাজকীয় কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাহার মৃত দেহ দেখিতে পাইল। কৃপণ কত ধন রাখিয়া গিয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তিকে কত ধন দিয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত রাজপুরুষেরা অনুসন্ধান করাতে তাহার এক উইল বাহির হইল। উইলে লিখিত ছিল, যে মার্সাই নগরে জলের অভাব এবং সেই অভাবে সাধারণের বহু কষ্ট ভোগ করিতে হয়; সে নিজে একবার সেই কষ্ট ভোগ করিয়া দেখিয়াছে যে, তাহা সময় সময় অসহ্য হইয়া উঠে; কিন্তু বহু ধন না হইলেও সেই কষ্ট নিবারণের উপায় করা যাইতে পারে না। অতএব যদিও সে স্বভাবত কৃপণ নহে তথাপি সে কৃপণতা আচরণ অবলম্বন করিয়া নগরে জল আনিবার প্রণালী প্রস্তুতের নিমিত্ত যথেষ্ট ধন ব্যাঙ্কে জমা করিয়াছে, তাহার প্রার্থনা যে শাসনকর্ত্তারা ঐ ধন গ্রহণ করিয়া মার্সাই নগরে জল আনয়ন করিয়া সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত বিতরণ করিবেন। উইলের এই মর্ম্ম প্রচারিত হইবা মাত্রই, নগরে মহা আনন্দের এক কোলাহল পড়িয়া গেল। যে নাম এই দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত বাল বৃদ্ধ বনিতায় ঘৃণা সহকারে ভিন্ন কখন উচ্চারণ করে নাই, সেই নাম এক্ষণে ধন্য হইয়া উঠিল। যাহাকে লোকে পিশাচ ও নরাধমের অধম বলিয়া জ্ঞান করিত, সে এখন সকলের বিবেচনায় মহাত্মা এবং ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইল। যে ব্যক্তি জীবিত থাকিতে তাহার নিকট দিয়া কেহ হাঁটিত না, স্পর্শ করা দূরে থাকুক, যাহার বাতাস লাগিলে মানুষ আপনাকে অশুচি বিবেচনা করিত, এক্ষণে সেই ব্যক্তির মৃত দেহ দেখিবার নিমিত্ত নগরবাসীরা পালে পালে সেই ভগ্ন কুটীরের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। উত্তম উত্তম চিত্রকরেরা তাহার মরা মুখের ছবি অঙ্কিত করিয়া লইল এবং অবশেষে তাহার সমাধির দিবসে নগরের মাজিষ্ট্রেটদিগের আদেশ মতে নগরের প্রধান গির্জ্জাতে বহু সমারোহে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করা হইল এবং নগরের ব্যয়ে প্রকাশ্য স্থানে

তাঁহার এক প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া রাখা হইল। সেই মূর্ত্তি এখনও আছে।

ইহাকেই বলে মহাত্মা! কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং আত্মোৎসর্গ! অনেক মহাত্মা পরোপকারের নিমিত্ত অনেকরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ব্যক্তির ন্যায় সমস্ত জীবন ধরিয়া মানব জীবনের সমুদয় সুখ স্বচ্ছন্দ বর্জ্জন করা,—মনের উদ্দেশ্য মনের মধ্যে গোপন রাখিয়া, ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট ঘৃণা, অপমান এবং অপযশ সহ্য করা—সামান্য কার্য্য নহে। সকলে করিতে পারে না, এবং আর কেহ কখনও করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। যাহা হউক এই ব্যক্তি যে দাতার এক চরম আদর্শ, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

—o—
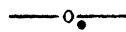
অপূর্ব্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ধূম্রযান অধ্যায়।

চতুর্থ দৃশ্য।

ডেকের এক কোণে কতকগুলি ছোট লোক ও নিম্ন শ্রেণীর যাত্রী বসিয়া ও শুইয়া রহিয়াছিল। সেই কৃত্রিম মেম সাহেব ও বাবুও তাহারই মধ্যে একখানি কাপড় পাতিয়া ব্যাগ ঠেশ দিয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন। এখন মেমের পোষাক ছাড়িয়া বাড়ীঘরে যে পোষাকে থাকেন, তাহাই পরিয়াছেন। চারিদিকে বদ মায়েস লোকেরা ঘিরিয়া বসিয়াছে, মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত মোটা রসিকতাও করিয়া ফেলিতেছে; আর তাঁহারা বিরক্ত হইতেছেন। যাহা হউক আমাকে পাইয়া মহিলার ভরসা হইল—একবারে সকল দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। আমি সসম্ভ্রমে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছি শুনিয়া নিকটের ভিড় একেবারে কমিয়া গেল তিনি বলিলেন "বাঁচলাম"। আমি তাঁহাকে ভাল জায়গায় বসাইবার জন্য সঙ্গে আনিলাম। তাহার সঙ্গের বাবুটি জিনিস পত্র গুছাইতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, আমরা সেই ডেকস্থিত বৃহৎ টেবিলের নিকটে কেদারায় বসিলাম। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

"আপনিও কি ঢাকায় যাইবেন ?"

"হাঁ"—

"বাবুটি কে ?"

"আমার বন্ধু।"

"তা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নাই ?"

"না।"

"ঢাকাতেই স্থিতি ?"

"না, নোয়াখালী যাইব।"

"বাবু আপনার সঙ্গে যাবেন ?"

"না, উনি ঢাকায় থাকিবেন, শুদ্ধ তাঁর অনুরোধেই আমি এ পথে আসিয়াছি।"

"কলিকাতায় বুঝি আপনারা একত্র ছিলেন ?"

"না, উনি হুগলী থাকেন, তবে চিঠি লিখিয়া আমরা দিন ঠিক করিয়াছি।"

"আপনি তবে কলিকাতায় থাকেন ?"

"হাঁ।"

"একাকিনী নোয়াখালী যাইতেছেন কেন ?"

"বিবাহ করিতে——"

আমার একটু হাসি পাইল, অতি কষ্টে হাসি নিবারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

"সেখানে পাত্রী—শ্রীবিষ্ণু—বর ঠিক আছে ?"

"আছে, টেলিগ্রাম পাইয়া যাইতেছি"।

"তিনি কলিকাতা আসিলেন না কেন ?"

"এই বেটীরাই পুরুষ, আর পুরুষ এদের কাছে হয়েছে মেয়ে মানুষ"—গম্ভীর নাদে এই কথা আমার পশ্চাৎ দেশ হইতে কথিত হইল। ফিরিয়া বিস্মিত হইলাম, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ; তাঁহার বক্ষে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কাঁদিতেছেন কেন ?" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শোক উথলিয়া উঠিল, বলিলেন, "বাবা বলিব কি এই মত এক ডাইনি আমার ছেলেকে পেয়েছে ; আর দেশে আসে না ; আমাকে কি, তার গর্ভ-ধারিণীকে এক পয়সা খরচ দেয় না। অতি কষ্টে তারে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলাম, তারই জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তিনি কি হইয়াছেন ?"

বৃদ্ধ ক্রোধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ভুত হইয়াছে, পেত্নী বিয়ে করেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি গেলে কি খরচ দেন না?" বৃদ্ধ কাঁদিয়া বলিলেন—"অনাহারে প্রাণ যায়, তাই কত কষ্টে গিয়াছিলাম, খরচ পত্র দেওয়া দূরের কথা, আমাকে গালাগালি দিয়া তাড়িয়ে দিলে,—আমি ভিক্ষা করিয়া রেল ভাড়া সংগ্রহ করিয়া তবে এই আসচি।"

আমার হাতে বেশী টাকা ছিল না; দুটি টাকা তাঁহার হাতে দিলাম, তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন,—এই সময়ে ষ্টিমারে আবার গোলযোগ উপস্থিত; খালাসীরা আবার সিকল ও দড়ি লইয়া দৌড়া দৌড়ি করিতে লাগিল—চাহিয়া দেখিলাম—ঢাকায় আসিয়াছি।

জলে স্থলে অধ্যায়।

ষ্টিমার থামিয়া ভৈরব রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। সকলেই যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। আমি সেই সময় নগরের বাহ্য শোভায় মুগ্ধ হইতেছিলাম।—নদী তীরস্থ অর্দ্ধ বৃত্তাকারে স্থাপিত হর্ম্ম্যরাজী চন্দ্রের প্রসন্ন জ্যোতিতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। পূর্ব্ব পরিচিতা রমণী আমার ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কার বাসায় যাইবেন?"—আমি বলিলাম, "যদি এখানে কোন পান্থশালা (হোটেল) থাকে, তবে কাহারও বাসায় যাইব না।" তিনি বলিলেন, "এখানে ভদ্রলোকে থাকিতে পারে, এরূপ কোন সাধারণ স্থান নাই।—আপনি আমার সঙ্গে চলুন"।—আমি কহিলাম "দেখা যাক্ কি হয়।"—ইহা বলিবার কারণ ছিল। কেন না সহর হইতে কোন লোক ষ্টিমার ঘাটে আমার জন্য অপেক্ষা করিবে, এরূপ কথা ছিল। আমার কলিকাতা-বাসী জনৈক বন্ধু তাঁহার ঢাকাস্থ এক আত্মীয় ব্যক্তিকে আমার বিষয় লিখিয়াছিলেন।

সকলেই ষ্টিমার হইতে তীরে অবতরণ করিল। আমরাও ধীরে ধীরে নামিলাম।—এমন সময় আমাদের পরিচিত সাহেব, কোথা হইতে আসিয়া সঙ্গিনীর কর ধারণ করিয়া কহিলেন "I can give you a lift, if you chose." বলা বাহুল্য, সাহেবের একখানি *Dog cart* অপেক্ষা করিতেছিল। সঙ্গিনী হাসিয়া "No thanks"—বলিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। সাহেব তাঁহাকে একখানি নামের কার্ড দিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময়, আর আমার সহিত কোন সম্ভাষণ করিলেন না। কেন না এখন তিনি বড় লোক, বত্রিশ

সিংহাসনের সিঁড়িতে পা দিয়াছেন। সঙ্গিনী বলিলেন, "সাহেব বড় ভদ্র লোক।"—আমি বলিলাম "সাহেব বড় পাজি"—ইহাতে তিনি একটু দুঃখিত হইলেন।

ইতিমধ্যে কেরাণী বাবু—একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া আনিলেন। সঙ্গিনী আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন,—আমি অস্বীকৃত হইলে, অগত্যা তিনি গাড়িতে উঠিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলেন। যাইবার সময় বাসার ঠিকানা বলিলেন, আর মাথা মুণ্ড কি বলিলেন—পাঠক মনে করিবেন সে সকল গ্রীক, বা দেব ভাষা; আমি বুঝিতে পারি নাই সুতরাং এখানে তাহা লিখিত হইল না।

একে একে সকলেই চলিয়া গেল—আমার মনে কেমন একটা ত্রাস হইল। "গেল"—এই ভাবটা বড়ই ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল। Edgar Allen Poe, সাহেব বলিয়াছেন "আর নাই" (Never more) ভাবটায় তাঁহার হৃৎকম্প হইত। Ellesmere নামে এক জন জর্ম্মান পণ্ডিত,—"হারাইল" (Verloren) কথাটা ভাবিতেই অস্থির হইতেন,—আর আমাদের সর্ব্ব পরিচিত জনসন্ সাহেবের "শেষ" (The last) কথাটা বড়ই ভীষণ বলিয়া বোধ হইত। যথার্থই, সময় বিশেষে এক একটা শব্দের ভাবে, শোক ত্রাস, বা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। লর্ড মেকলে মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডে নিমন্ত্রিত হন। স্কটলণ্ডবাসিরা সভা করিয়া তাঁহাকে একটি মূল্যবান দ্রব্য উপহার প্রদান করে, উপহার পাইয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে তিনি বলিতেছিলেন—"I shall treasure it, as long as I live; and after I am gone—এইখানে মহাপুরুষেরা স্বর কম্পিত হইল—প্রফুল্ল বদন ভয়ে জ্যোতি হীন হইল।—"gone"!—ইহার আঘাতে তিনি মর্ম্মাহত, ও ভীত হইলেন।

এই ছিল—নাই—গেল; কি ভয়ঙ্কর কথা—কি ভয়ঙ্কর ভাব; আমার মনে বড়ই ত্রাস হইল।—আমিও থাকিব না, যাইব; তখন আমার স্থানও শূন্য হইবে—কি ভয়ঙ্কর ভাব। পিতা একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া জপ তপ করিতেন,—বিদেশ হইতে আসিয়া দেখিলাম, সেই কাষ্ঠাসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। বাবা কোথায়?—"নাই," অর্থাৎ "গিয়াছেন;" এই গিয়াছেন শব্দ,—তৎসঙ্গে ঐ আসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে—ভাবটি কি ভয়ঙ্কর ভাব। ফ্রেবরস, ম্যাগাজিনের জন্মদাতা Dr. Majjin, একটি বিশ দিনের কন্যা

শোকে গৃহ শূন্যময় দেখিয়া যথার্থই বলিয়াছিলেন—T' was strange, that such a little thing, should leave a blank so large!

সকলেই গেল;—এত লোক যেখানে গোলমাল করিতেছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে শূন্য হইল;—সজীব বিশাল তরণী "এলিশ" যে, এইমাত্র ভীষণ বেগে গর্জ্জিয়া আসিয়াছিল, তাহার মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। এইমাত্র এত লোক তাহার বিশাল ক্রোড়ে কিলি-কিলি করিতেছিল, এখন তাহা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।—তাহারা কোথায়?—"গিয়াছে।"—কি ভয়ঙ্কর! বাস্তবিকই ভাবিয়া ভাবিয়া আমি ভীত হইতে ছিলাম; এমন সময় একটি ভদ্র লোকের আহ্বানে আমি চৈতন্য পাইলাম। পরিচয় হইলে বুঝিতে পারিলাম, তিনি আমারই জন্য আসিয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার সঙ্গে চলিলাম,—বাসা অনেক দূর নহে।

ঢাকা অধ্যায়।

১ম দৃশ্য।

বাসায় প্রবেশ করিলাম। বাড়ীটি বেশ প্রশস্ত দিব্য পরিস্কার এবং দ্বিতল। সঙ্গী আমাকে একেবারে উপরকার ঘরে লইয়া গেলেন। উপরে পাশা পাশি পাঁচটি ঘর। মাঝেরটি বড়,—সাজ সজ্জা সাহেবদের ড্রইং রুমের মত। কেদারা, সোফা, টেবিল প্রভৃতিতে পূর্ণ। ঘরে কেদারায় বসিয়া দুইটি স্ত্রীলোক ছিলেন। আমি প্রবেশ করিবা মাত্র একটি তাড়া তাড়ি উঠিয়া পাশের ঘরে পালাইলেন। অপরটি, সঙ্গী পরিচয় দিলে, উঠিয়া যথা বিহিত সাহেবি ধরণে অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে বসাইলেন। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকা হইয়াছে, টেবিলে বড় একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল।—এই স্ত্রীলোকটিই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেখিলাম, তাঁহার নিকট "(Nature)" একখানি বিলাতি কাগজ এবং সম্মুখে (Wake's Evolutions of Morality' নামক) একখানি বৃহৎ পুস্তকের প্রথম খণ্ড খোলা রহিয়াছে। মনে মনে বলিলাম— বাহাদুর মেয়ে বটে। যাহা হউক, এই সকল মূল্যবান জ্ঞানকোষ শুদ্ধ দেখাইবার উদ্দেশে খোলা হইয়াছিল, কি যথার্থই উহা ঐ অসাধারণ নারীর আয়ত্তাধীন,—তখন বুঝিতে পারিলাম না।

যিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, পলায়ন-পরায়ণা স্ত্রীলোকটি তাঁহারই স্ত্রী। গৃহ-স্বামিনী তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে

আমাকে কহিলেন, "ও কে এখনও পোষ মানাইতে পারি নাই।" মনে মনে ভাবিলাম—পোষা জীব, ঢের দেখা গিয়াছে। প্রকাশ্যে বলিলাম, "আপনার যত্নে শীঘ্রই উনি পোষ মানিবেন, চিন্তা কি ?" এই কথায় সকলেই আমরা হাসিলাম। আশ্চর্য্য যে, সেই অপোষা বন্য জীবটিও পাশের ঘর হইতে মাথা বাহির করিয়া দিয়া উচ্চ হাস্য করিল। এইবারে আমি কহিলাম,— "ভয় নাই অল্প দিনেই উনি সম্পূর্ণ পোষ মানিবেন"—আবার হাসি। গৃহ-স্বামিনীর এবারকার উচ্চ হাসির তরঙ্গে আমি কিছু উদ্বেলিত হইলাম। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি শেষে কিছু কাল পরে আপনি আসিয়া বসিলেন। কিন্তু লোল কটাক্ষ ও হাস্য ব্যতীত তাঁহার মুখে কথা শুনিতে পাইলাম না।

দশ বৎসর একত্র বাস করিলে যেরূপ আত্মীয়তা হয়, অল্প কালের মধ্যেই পরস্পর আমাদের মধ্যে ততোধিক সদ্ভাব সৃষ্ট হইল। ইহার জন্য তাঁহারাই (Credit) বাহবা পাইতে পারেন—আমি নই।—ফলত উন্নত সংসারের এ অমায়িকতা আমি হৃদয়ের সহিত প্রশংসা করি।—পবিত্রতার সহিত এ অমায়িকতার যেখানে মিলন, সেই স্বর্গ। এরূপ স্বর্গীয় ভাব যে উন্নত পরিবারে একেবারে বিরল, তাহা বলিতে পারি না।

অল্প কাল পরেই পাক প্রস্তুত হইল—আমরা সকলে মিলিয়া অর্থাৎ চারি জনে একত্র ভোজনে বসিলাম। আহার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই, যাহা হিন্দুর খাদ্য,—তাহাই পাচকে প্রস্তুত করিয়াছে। তবে বিশেষ এই, এখানে ঐ সকল খাদ্য প্লেটে, পেয়ালায় এবং টেবিলে স্থান পাইয়া সমধিক সম্মানিত হইয়াছে।

ইংরেজ ললনা, নবাগত বা প্রথম পরিচিত ভদ্র লোকের সহিত আহারে বসিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না ; এমন কি তাঁহারা উহার পূর্ব্বে কি পরে, একবার গোপনে উদর তোষণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু আমার সঙ্গিনীদের ভোজন প্রণালীতে বোধ হইল না, যে তাঁহারা তদ্রূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। ভোজন স্বাভাবিক ক্রিয়া তায় লজ্জা কি ?—ঐ কথায় কি উত্তর দেওয়া উচিত আমি জানি না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে এইমাত্র বলিতে পারি—স্বাভাবিক ক্রিয়া হইলেই যদি লজ্জা করিতে না হয়, তবে মানুষে আর বিড়াল কুকুরে, প্রভেদ কি ?

আমাদের আহার নিরাপদে নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহিত হইল। ভৃত্য তামাকু ও কুর্সি দিয়া গেল, বাবু তামাকু সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি একটা

চুরুট বাহির করিয়া তাহার সৎকার্য্য আরম্ভ করিলাম। গৃহ-স্বামিনী কহিলেন, "আমরা কেহ পান খাই না, যদি আপনার অভ্যাস থাকে, কাল উহার বন্দোবস্ত করিব, ঢাকা সহরে এ পল্লীতে পানের খিলি কিনিতে পাওয়া যায় না।" আমি বলিলাম "তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না।" তৎপর তিনি বলিলেন, "আপনার যদি কষ্ট বোধ হইয়া থাকে তবে শয়ন করিতে পারেন, ঘর দেখাইয়া দিই।"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কখন শয়ন করিবেন?" তিনি গম্ভীর ভাবে কহিলেন "ওঁরা এখনই শোবেন, আমি রোজ দুটো একটার আগে শুই না।"

"এত রাত কি করেন?"

"কেতাব টেতাব পড়ি।"

"আপনার স্বামী কোথায় গিয়াছেন?"

"গোল্লায়।"

এই সময় বাবুটি আমায় বলিলেন "তিনি বাড়ী গিয়াছেন, তাঁর মা বড় কাতর।" এইবারে বুঝিলাম যে গোল্লাটা পদার্থ কি!

কথাবার্ত্তায় এগারটা বাজিয়া গেল; স্বামী-স্ত্রী যুগল মূর্ত্তি আমাদের নিকট বিদায় লইলেন। গৃহস্বামিনী হাসিয়া কহিলেন, "এক জোড়া গেল, আর এক জোড়া রৈল।" আমি কহিলাম "দু জোড়ায় দু খণ্ড বলুন।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার মুখে অনেক সময় অসাবধানতার কথা বাহির হইয়া পড়ে, আপনি মাপ করিবেন।" আমি একটু গম্ভীর ভাবে কহিলাম, "অসাবধান কথার মাপ থাকিতে পারে, কিন্তু অসাবধান কাজের মাপ না থাকাই উচিত।" তিনি সেইরূপই হাসিয়া কহিলেন,—"অসাবধান কথারই বা নয় কেন?—দেখুন এই বইতেই লেখা আছে The moral turpitude lies as much in the motive as in the act." আমি বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলাম লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ও বলিয়াছিল—"The attempt and not the deed confounds us."

প্রায় দুইটার সময় আমরা শয়ন করিতে গেলাম। তিনি আমাকে শয়ন কক্ষ দেখাইয়া দিয়া আপনি নিজ কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন।

২য় দৃশ্য।

পর দিন সকলেরই উঠিতে একটু বিলম্ব হইল। প্রায় সাতটার সময় আমরা হাত মুখ ধুইয়া বসিলাম, ভৃত্য চা আনিয়া দিল। চা সেবন হইয়া

গেলে, গৃহ-স্বামিনী হারমোনিয়ম্ বাজাইয়া শুনাইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে "শেষের সে দিন মন" প্রভৃতি সঙ্গীত হইল।

বাহিরে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, মেঘের অন্তরালে সূর্য্য থাকাতে দিনটা একটু ঘোর ঘোর বলিয়া বোধ হইতেছিল। তথাপি আমি যতদূর পারি একবার ঢাকা সহরটা বেড়াইয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিলাম। গৃহ-স্বামিনী নিষেধ করিয়া বলিলেন 'বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইবার দরকার কি,—ঢাকায় দর্শনীয় কিছুই নাই। সহরটা অতি ছোট, যখন হয়, এক পাক ঘুরিয়া আসিলেই দেখা হইতে পারে। আহারান্তে বৈকালে গাড়ি করিয়া যাওয়া যাইবে"। মনে মনে ভাবিলাম, এ উৎপাত সঙ্গে যাইলে, বিশেষ গাড়িতে যাইলে, কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে পাইব না; সুতরাং তাঁহার কথা না শুনিয়া বহির্গত হইলাম। যে ভদ্র লোকটি আমাকে ষ্টিমার ঘাট হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তিনিই আমার সঙ্গে চলিলেন।

গত রজনীতে নির্ম্মল চন্দ্রালোকে ঢাকার বাহ্য শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অদ্য ঢাকা সহরের উপর ক্রমেই ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। সহরের ভিতরে একটিও ভাল বাড়ী নাই। আর অল্প বৃষ্টিতেই পথগুলির এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, যে চলা এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। বোধ হয় অতি হীন পল্লী গ্রামের রাস্তা ঘাটও ঢাকা সহর হইতে অনেক ভাল। অপ্রশস্ত কর্দ্দমিত পথ, তাহার দুপাশে পচা ময়লার স্তূপ, তাহা হইতে অবিরাম দুর্গন্ধ উদ্গত হইতেছে। ইহাই যথেষ্ট নহে—দুপাশের বাড়ী হইতে যত আবর্জ্জনা পথের উপরে যে ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, ঐ ভাবেই পথে পড়িয়া পচিতে থাকে। প্রথমেই সহরের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মনটা চটিয়া গেল। মিউনিসিপ্যালিটির প্রতি রাগ হইতে লাগিল এবং করদাতাদের উপর অশ্রদ্ধা হইতে লাগিল।

এই ভাবে বেশী দূর যাওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিল; সঙ্গী আমাকে দুইটি তিনটি ভদ্র লোকের বাসায় লইয়া যাইলেন। ইঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য এবং বেশী বেতনের কর্ম্মচারী; তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল, এবং ইহার পরেও ক্রমে ঢাকা ও বিক্রমপুর নিবাসী অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু দুজন এক জন ছাড়া, এখানকার প্রায় সকলেরই গম্ভীর ও শোকান্বিত বদন লক্ষিত হইল; প্রসন্ন বদনে মন খুলিয়া কেহই যেন আলাপ করিতে জানে না সুতরাং লোকগুলিকে বড় চাপা লোক বলিয়া আমার সংস্কার। একটা স্থানের সকলগুলি লোক কিছু অহঙ্কারী

বা আত্মম্ভরী হওয়া সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, সহরের কিয়দংশ আমার এইবারেই দেখা হইল, এবং সহরের বিজ্ঞ সমাজের প্রায় অধিকাংশ লোকের সহিতও সামান্য রকম আলাপ পরিচয় হইল। প্রায় বেলা বারটার সময় জল কর্দ্দমে সিক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম।

বেলা একটার সময় সুবিধা হইল। রৌদ্রে দিবা প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল; আমি আহারান্তে একখানি গাড়ী করিয়া স্কুল কলেজ এবং বিচারালয়গুলি দেখিতে যাইলাম। গ্রীষ্মাবকাশ জন্য স্কুল কলেজগুলি বন্ধ; এ কথা পথে মনে হইল সুতরাং শুদ্ধ কলেজ অট্টালিকাটি দেখিয়া বিচারালয়ে চলিলাম। কলেজ ও বিচারালয়ের প্রাঙ্গনগুলি দেখিতে সুন্দর। এবং ইহার নিকটবর্ত্তি একটি পথও প্রশস্ত এবং সুন্দর; ঢাকায় এমন আর একটিও নাই।

অনাবশ্যক বলিয়া কোন বিচারাগারেই প্রবেশ করিলাম না, কেবল বারান্দা দিয়া বেড়াইয়া অবশেষ জজ সাহেবের উকিলদের ঘরে বসিলাম; উকিলদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভাল লোক এবং সদালাপী। এইখানেই প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গেল। অদ্য ঢাকার জনসাধারণ সভার সাধারণ অধিবেশন,—অনেক লোক যাইবে, অনেক বক্তৃতা হইবে, সুতরাং উকিল বাবুদের সঙ্গে আমিও সভা দেখিতে ও বক্তৃতা শুনিতে চলিলাম।

এখানে অনেক বড় লোক আছেন, নবাব আছেন, রাজা আছেন, এবং জলের কল পর্য্যন্ত আছে; কিন্তু লজ্জার বিষয় এই একটি টাউন হল নাই। প্রকাশ্য সভা করিতে হইলেই সকলকে নাট্যশালায় যাইতে হয়। সে নাট্যশালারও অতি দুরবস্থা; বাঁশের বেড়া এবং তদুপরি দোচেলে মোড়া ঘর। ভিতরে কতগুলি অতি ময়লা কাঠের বেঞ্চ; নিমন্ত্রিত ভদ্র লোক এবং সদস্যগণকে এই বেঞ্চের উপর বসিতে হয়। একখানি কেদারা ছিল, কেবল সভাপতি মহাশয়ই তদুপরি রাম্‌বার দিয়া উচ্চ হইয়া বসিয়াছিলেন। সুতরাং এই বন্দোবস্ত দেখিয়াই আমার মনে ঘৃণা হইল। তাহার পর বাদানুবাদ ও বক্তৃতা —ভূতের কচ্‌কচি—বিক্রমপুরের খাল,—আর কোথাকার পুল,—জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য—আমার তাহাতে কিছুই স্বার্থ নাই, ভাল লাগিবে কেন? সুতরাং সভা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই ধীরে ধীরে উঠিয়া—বুড়ি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাইলাম। ঢাকার মধ্যে এই স্থান টুকু অতি মনোহর। এই স্থান টুকু না থাকিলে, বোধ হয় আমি এক দণ্ড ঢাকায় তিষ্ঠিতে পারিতাম না।

এইখানে সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিতে, ঢাকার প্রায় সকল বড় বড় লোকই

আসিয়া থাকেন। অদ্য পূর্ব্ব পরিচিত সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আমাকে দেখিয়াই সহাস্য বদনে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ঢাকা সহর আমার কেমন বোধ হইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে ছোট করিয়া তাঁহাতে আমাতে এইরূপ কথা হইতে লাগিল,—যথা।—

"আপনার সেই সঙ্গিনী কোথায়?"

"আপনি কি তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই?"।

"ভোলা আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হইবে।"

"আপনার তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ মত?"

"আমাদের দেশের *Bar Maid*দের সম্বন্ধে যেরূপ মত"।

"আপনি তবে তাঁহাকে ঘৃণা করেন?"

"সে কথা কি আবার বলিতে হইবে? আমি আপনা অপেক্ষা তাহাকে ভাল বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতেই গোয়ালন্দে পরিহাস করিয়াছিলাম। সে হিন্দু কুল-রমণী নহে।"

সাহেব যাহা বুঝিয়াছিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই, আপনাকে ধিক্কার দিলাম।

"হিন্দু কুল-রমণী সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

"হিন্দু রমণী অতি পবিত্রা; হিন্দু, কম্‌টি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যে দিন গঠিত মূর্ত্তি পূজা না করিয়া, উহাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে শিখিবে সেই দিন হিন্দু জাতির জাতীয় উত্থান হইবে।"—সাহেবের কথায় প্রীত হইলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া সময় রজনীতে পদক্ষেপ করিল—দিব্য জ্যোৎস্না। সাহেব আমাকে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেব বিবাহ করেন নাই, একক। বাড়ীতে মন খুলিয়া অনেক কথা কহিলেন, এবং অবশেষ আমি কোথায় আছি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথার উত্তর দিলে, হাসিয়া বলিলেন—"আপনার অদৃষ্ট ভাল, ঈশ্বর আপনার অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছেন, আপনার গৃহ-স্বামিনীকে আমি বেশ চিনি।"

সাহেবের ঢাকার ও কলিকাতার এত সংবাদ রাখেন, আর আমি সংবাদও রাখি না, কিছু বুঝিতেও পারি না;—আবার আপনাকে ধিক্কার দিলাম।

গত রজনীর ন্যায় আজিও আবার সেইখানে তাঁহারা বসিয়াছেন। আমি গৃহে আসিলে আত্মীয় জনের ন্যায় ভৎসনা করিয়া গৃহ-স্বামিনী আমাকে কহিলেন, "আপনি এরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইলে

পীড়িত হইয়া পড়িবেন।" বাস্তবিকই আমার একটু অসুখ বোধ হইতেছিল। গৃহ-স্বামিনী বাক্ চাতুর্য্যে অতি পটু—এক মুখে সহস্র কথা কহিতে পারেন; তাহার উপর তাঁহার বাক্য যন্ত্রণায় একরূপ অস্থির হইয়া পড়িলাম। অনেক আলাপের পর, তিনি আমার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাদানুবাদে আরম্ভ করিলেন—আমার একবারে অত মেয়ে জ্যেঠামী অসহ্য হইয়া উঠিল। কহিলাম,—"ধর্ম্ম, বাদানুবাদের জিনিষ নহে।"

গৃহ-স্বামিনী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। আর সোজা কথায় মূল সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, "পবিত্র ধর্ম্মের সহিত আহার ব্যবহার ও বস্ত্রের কোন সংশ্রব নাই; এমন উদার ধর্ম্ম আশ্রয় না করিলে, ভারতবাসীর কখনও মঙ্গল হইবে না।" বড় মাথা ধরিয়াছিল,—আমি তাঁহার নিকট হারি মানিলাম।

পরে রাত্র এগারটার সময় যথারীতি আহার করিয়া শয়ন করিলাম। গৃহ-স্বামিনীর নিদ্রাটা বড় কম—আর কথা কহা রোগটা বড় বেশী; তিনি আমার শিয়রে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। আর আমি চক্ষু মুদিয়া হুঁ-হুঁ-হুঁ করিতে করিতে অবশেষ ক্লান্ত হইয়া নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলাম।

ধর্ম্মের যাজনা।

* * * * And it may with truth be asserted that no description of Hinduism can be exhaustive which does not touch on almost every religious and philosophical idea that the world has ever known.

Starting from the Veda, Hinduism has ended in embracing something from all religions, and in presenting phases suited to all minds. It is all-tolerant, all-compliant, all-comprehensive, all-absorbing. It has its spiritual, and its material aspect, its esoteric and exoteric, its subjective and its objective, its rational and irrational, its pure and impure. It may be compared to a huge polygon, or

irregular multilateral figure. It has one side for the practical another for the severely moral, another for the devotional and imaginative, another for sensuous and sensual, and another for the philosophical and speculative. Those who rest in ceremonial observances find it all-sufficient; those who deny the efficacy of works, and make faith the one requsite, need not wander from its pale; those who are addicted to sensual objects may have their tastes gratified; those who delight in meditating on the nature of God and man, the relation of matter and spirit, the mystery of separate existence, and the origin of evil, may here indulge their love of speculation. And this capacity for almost endless expansion causes almost endless sectarian divisions even among the followers of any particular line of doctrine.

In unison with its variable character, and almost universal receptivity, the religious belief of the Hindus has really no succinct designation. Looking at it in its pantheistic aspect, we may call it Brahmanism; in its polytheistic development, Hinduism; but these are not names recognized by the natives.

Hinduism. Monier Williams.

আমরা হিন্দু-সন্তান আমরা আমাদের ধর্ম্মের বিশ্বব্যাপকতা ভাব বুঝিতে পারি না, কিন্তু দেখ এক জন বিদেশী খ্রীষ্টান ঐ ভাবটি কেমন সুন্দর বুঝিতে পারিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বলিলে, যেরূপ এক এক প্রকার স্বতন্ত্র ও বিশেষ পদার্থ বুঝা যায়, হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া তেমন একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ পদার্থ নাই। এই কথাই বঙ্কিম বাবু নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় বিশদরূপে বুঝাইয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম্মের এই বিশ্বব্যাপক ভাবক আমরাও নানা স্থানে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সূচনায় বলিয়াছি "বিশাল মহান্ আশ্রয় স্তরের নাম ধর্ম্ম।" বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছি;—

"ধর্ম্মের নানা ভাব, ধর্ম্মের নানা মূর্ত্তি। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সমগ্র ধর্ম্মের বিশাল বিশ্বোদর ভাব শ্রেষ্ঠ মানবেও ধারণা করিতে পারেন না। এই জন্য ধর্ম্মবিষয়ে, নানা দেশে নানা মত আছে; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভয়; ঈশ্বর ভয়, পরকাল ভয়, বা কর্ম্মফল ভয়, যাহার হৃদয়ে জীবন্ত নহে, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভক্তি। ভগবান ভক্তের; ভক্তিতেই ভগবান মিলেন। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—কর্ম্ম। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমনই ফল পায়—কঠোর কর্ত্তব্য সাধনই ধর্ম্ম যাজন। কেহ কেহ এই মতের বিপরীত বাদী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্মে বিরতিই—প্রকৃত ধর্ম্ম-চর্চ্চা। তবেই ধর্ম্মের প্রধান সাধন কিরূপ, এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যই বা কি,—ইত্যাদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে।

"ধর্ম্মের উপজীব্য—ভগবানের সেই জন্য নানা মূর্ত্তি হইয়াছে। উপনিষৎ একবার বলিতেছে—তিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' আর একবার বলিতেছে, 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।' তন্ত্র এক মুখে একই নিশ্বাসে একেবারে বলিতেছে, 'করাল বদনাং' অথচ 'স্মিতাননাং।' কোথাও শুনিবে,—তাঁহার দ্বিভুজ মুরলী-ধর সুবঙ্কিম্ নটবর বেশ,—কোথাও শুনিবে তিনি শর-কার্ম্মুক-ধারী বীরশ্রেষ্ঠ বীরাসনে উপবিষ্ট। বাইবলে বলে, তিনি কঠোর ন্যায়পর, অথচ দয়ার অগাধ সাগর। যীশুখ্রীষ্ট বলেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর; তন্ত্র বলেন, তিনি করুণাময়ী জগদম্বা। যাঁহারা বালক গোপালের সেবক, তাঁহারা ভগবানকে অপত্যভাবে ঘুম্ পাড়াইয়া পুঁছাইয়া দুগ্ধদানে সেবা করিতেছে, আবার বামাচারী শক্তিভক্ত, নরকপালে মহামাংস মদ্য দিয়া ভগবতীর মহাভোগের আয়োজন করিতেছে। সম্প্রদায় বিশেষের পূজার পদ্ধতির কথা শুনিলে সন্ত্রাসে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়, হৃৎপদ্ম কাঁপিতে থাকে, মন স্তব্ধ হয়;—আবার আর এক সম্প্রদায়ের পূজা পীঠের নিকটে গেলে, সুচ্ছন্দ আয়োজন দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হয়, পবিত্র বাদিত্রে শ্রবণ জুড়ায়, এবং সুগন্ধে অন্ধীভূত হইতে হয়।

"সনাতন ধর্ম্মের সার কথা এই যে, প্রকরণ পদ্ধতি—ধ্যান, ধারণা—আলম্বন, বিভাবনা—পৃথক হইলেও সকল শ্রেণীর ঐশ্বরিক সাধনাই ধর্ম্ম। দেশ, কাল, পাত্র—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা—প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রুচিভেদে—ধর্ম্মের তারতম্য হয় মাত্র। কোন ধর্ম্মের হিংসা করিতে নাই। যে, যে পথে

পার, ধর্ম্মের উজ্জ্বল, বিমল, বিমানব্যাপী পতাকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এই সকল সনাতন ধর্ম্মের সার কথা।"

বাঙ্গালির দুর্গোৎসব উপলক্ষ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, যে, "যে ভাবে মহাকাল এই বিশাল ধরণীপৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন," সেই ভাবে কালমাহাত্ম্যে সনাতন ধর্ম্মে "স্তরের উপর স্তর উঠিয়াছে।" এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, আমাদের উদ্ধৃত ইংরাজীতে প্রথমেই তাহা বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতেছেন, যাবতীয় ধর্ম্ম মত, এবং দর্শনতত্ত্ব অল্প স্বল্প না বুঝিলে, হিন্দুর ধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝা যায় না।"

এই কথাটিতে অনেক গোলের কথা উঠিতে পারে। যদি জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম এবং দর্শন মোটামুটি বুঝিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম বুঝিতে হয়, তাহা হইলে, আমরা হিন্দু-সন্তান প্রায় সকলেই ত মারা পরিলাম। আমরা জগতের ত কিছুই জানি না; সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্ম যে কি, তাহা ত আমাদের বুঝা হইল না!

এই বিষম সমস্যার তিন প্রকার মীমাংসা আছে। প্রথম কথা,—হিন্দুর ধর্ম্ম যে কিরূপ জিনিস, তাহা বুঝিতে না পার, নাই পারিলে, তাহাতে মারা পড়িবে কেন? আমাদের অন্ন পদার্থটি যে কি, তাহা যদি না বুঝি, তাহা হইলে আমরা মারা যাই কি? তা যাই না। তবে আমাদের ধর্ম্ম কিরূপ পদার্থ, তাহা না বুঝিলে, আমরা মারা যাইবে কেন? যেমন বিশেষ বিশেষ স্থলে ডাক্তার কবিরাজদের কথা শুনিলে, এবং সাধারণত পূর্ব্ব পুরুষদের প্রথা অনুসরণই করিলেই, অন্নপান বিষয়ে আমাদের মারা পড়িতে হয় না, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ স্থল ছাড়া সাধারণত ধর্ম্ম বিষয়েও পূর্ব্ব পুরুষদের প্রথা অনুসরণ করিলেই আমাদের চলে।

দ্বিতীয়ত, কেহই যে কিছু মাত্র বুঝি না, এমন নহে; অল্প বিস্তর সকলেই একটু আধটু বুঝি; যখন, যতটুকু বুঝি, তখন ততটুকুরই মত কার্য্য করিব, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ আরও অধিক বুঝিবার চেষ্টা করিব। কি বিষয়-কার্য্যে, কি জ্ঞান-শিক্ষায়, কি বিজ্ঞানে, কি ইতিহাসে—সকল বিষয়েই আমরা ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করি; তবে, কেবল ধর্ম্মচর্চ্চার বেলা, অন্যরূপ প্রথা অবলম্বনীয় মনে করিব কেন? এবং হতাশ হইবই বা কেন? যখন সামান্য অঙ্ক বিদ্যা বা পাটীগণিতের চরম বুঝিতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও পারেন না, তখন চরম বিদ্যা ধর্ম্মশিক্ষার চূড়ান্ত প্রাপ্তির জন্য বাতুলের

আশা করিব কেন? যতটুকু পথ দেখিতে পাইব, অগ্রসর হইব; যেখানে পথ না দেখিতে পাইব, দাঁড়াইয়া থাকিব; আলো জ্বালিতে পারিলে, বা আলোক ভিক্ষা পাইলে, আবার যতটুকু পথ দেখিতে পাইব, ততটুকুই অগ্রসর হইব। ইহাই চিরন্তন বুদ্ধি-বিবেকানুমোদিত প্রথা। এমন সর্ব্বকালের, সর্ব্বজনের অনুসরণীয় প্রথা পরিত্যাগ করিব কেন? সুতরাং আমরা হিন্দু সন্তান, হিন্দুর ধর্ম্ম বুঝি না, কি না, সম্পূর্ণ রূপে বুঝি না, বলিয়া আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণই নাই; তবে দিন দিন অধিকতররূপে বুঝিবার চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে বলিয়াছেন, 'জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমত এবং দর্শনতত্ত্ব স্বল্প স্বল্প না বুঝিলে হিন্দুর ধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝা যায় না।' কথাটি ঠিক, কিন্তু ওটি আধখানা কথা মাত্র। বাকি আধখানা হিন্দুর উক্তি;—হিন্দু ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলেই, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমত এবং দর্শনতত্ত্ব অল্প স্বল্প বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ যেমন একদিকে জগৎ বুঝিলে হিন্দুধর্ম্ম বুঝা যায়, সেইরূপ অন্যদিকে হিন্দুধর্ম্ম বুঝিলে, জগৎ বুঝা যায়। অহিন্দুর পক্ষে, বিশেষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পক্ষে, হয়ত জগৎ বুঝিয়া হিন্দুয়ানি বুঝা সুবিধাজনক হইবে; কেননা তিনি জগৎ বুঝিতে প্রথম হইতে অভ্যাস করিয়াছেন, এবং হয়ত জগতের অনেক জানেন, অথচ হিন্দু ধর্ম্মের কিছুই জানেন না। আর আমাদের হিন্দুর পক্ষে হিন্দুয়ানির সঙ্গে সঙ্গে জগৎ বুঝিবার চেষ্টা করাই বোধ হয়, সুবিধাজনক। কেননা আমরা মহামূর্খ হইলেও হিন্দুয়ানির একটু আধটু অবশ্যই বুঝি।

আমরা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছি, যে জীবনের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম লইয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম। কর্ম্ম সচরাচর তিনভাগেই বিভক্ত হইয়া থাকে। শারীরিক, মানসিক, এবং আধ্যাত্মিক। পানাহার, স্নানাচমনাদি শারীরিক কর্ম্ম; শ্রবণ স্মরণাদি মানসিক কর্ম্ম; উপাসনাদি আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। ইহার সকল কর্ম্মেই হিন্দুর ধর্ম্ম আছে। কোন বিষয়েই হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুকে যথেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দেয় না। ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝি না বলিয়াই আমরা যথেচ্ছাচারী হইতেছি এবং তাহার জন্য মহা দুর্ভোগও ভুগিতেছি।

ধর্ম্মের মূল সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা বলিতেছেন;——

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনা মাত্মন স্তুষ্টিরেব চ॥

মনু ২য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক।

অখিল বেদ, বেদজ্ঞদিগের (কৃত) স্মৃতি এবং শীল, সাধুদিগের আচার এবং আত্মতুষ্টি—(এই কয়টি) ধর্ম্মের মূল।

হারীত সংহিতা মতে—ব্রহ্মণ্য, দেবপিতৃভক্তি, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য, প্রশান্তি এই, তেরটি শীল।

আবার ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে,—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥

মনু ২য় অধ্যায় ১২ শ শ্লোক।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মতুষ্টি, কথিত হইয়াছে, এই চারিটি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ।

বেদ কি, তাহা আমরা বুঝি না। বেদ স্মৃতি মোটামুটি শাস্ত্র বলিয়া বুঝি। শাস্ত্র, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি—এই তিনটি তাহা হইলে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বা প্রমাণ। যদি কোস একটি কর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত, সদাচার-সঙ্গত, এবং আত্মতুষ্টি-জনক হয়, তাহা হইলে, তাহাই ধর্ম্ম।

আমরা হিন্দু-সন্তান হিন্দুর ধর্ম্ম যে কি, তাহা বুঝি না—এই অসার কথা লইয়া অনর্থক গণ্ডগোল না করিয়া, যদি ঐরূপ ত্রিবিধ লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মগুলির সাধ্য মত যাজনা করি, তাহা হইলেই আমাদের কর্ত্তব্য সাধন হয়।

শাস্ত্রকারেরা কেবল সাধারণ ভাবে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। বিশেষ করিয়া আবার দশ বিধ ধর্ম্ম বলিয়া দিয়াছেন;—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচ মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধী র্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং॥

মনু ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯২ শ্লোক।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, আত্মজ্ঞান, সত্যানুরাগ, এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

আমরা হিন্দু ধর্ম্মের সমগ্র ভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না বটে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ম্মগুলি যে কি কি, তাহা ত বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তবে এখন হিন্দু ধর্ম্ম কি, হিন্দু ধর্ম্ম কি, এই বলিয়া কেবল ধর্ম্মের লেখনা, ভাবণা বা বাচনা না করিয়া, একান্ত মনে, সাধ্যমত, ধর্ম্মের যাজনা করাই না আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য?

তোমরা যদি আর্য্য হও, আমরা অনার্য্য।

আমরা বড় পিট্‌পিটে জাতি। তোমরা দিল্‌দরিয়া। আমাদের কাছে লাখো বিচার। জাতি বিচার, খাদ্য বিচার, সম্পর্ক বিচার, স্থান বিচার, কাল-বিচার, স্ত্রী-পুরুষ বিচার, সধবা বিধবা বিচার—লাখো বিচার। তোমাদের কাছে কোন বালাই নাই। পেলেই হইল। তার স্থান নাই, কাল নাই, জাতি নাই, সম্পর্ক নাই, সধবা, বিধবা নাই; পাইলেই হইল; আর হইলেই হইল। অবারিত দ্বার; অকবাটিত ঘর। খোলা মন, ঢালা বিধি। অবাধ পন্থা; উদার পদ্ধতি।

প্রথমেই দেখ কি বিষম গোল; আমরা বলি ঋষি, মুনি, মনু, দেবতা প্রভৃতি হইতে আমাদের উৎপত্তি। তোমরা আপনারা বুঝিতেছ, সকলকে বুঝাইবার চেষ্টায় আছ—যে কীটাণু কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে রাক্ষস বানর হইতে তোমাদের উৎপত্তি। ধরিয়া লইলাম, যে প্রমাণ দুই দিকেই সমান। কোনটা সঙ্গত, কোনটা অসঙ্গত সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, যে পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিবার সময় উভয় জাতির কিরূপ প্রবৃত্তি ভেদ দেখ! গোড়াতেই যখন এত গণ্ডগোল, তখন তোমায় আমায় যে কুটুম্বিতা নাই, তাহা তুমি আর একবার করিয়া বলিতেছ?

আমাদের বাড়ী ঘর দেখ; তাহাতেও বিচার। কতকটা তার অন্তর্বাটী, কতকটা বহির্বাটী, আবার কতকটা ঠাকুর বাটী। তোমাদের এত সেত-কারসাজি নাই, একটানা ঘর—ড্রইংরুম্। তাহার এক দিকে কুঁড়ে কেদারায় অর্দ্ধ শয়ানা হইয়া, বুক-কাটা ঘাঘরা পরিয়া, মেম সাহেব জুতা বুনিতেছেন, অন্য দিকে নেলি নবেল পাঠ করিতেছে, পুষি তাহার ক্রোড়ে। সাহেব গবর্ণমেন্টের কড়া চিঠির উত্তর লিখিতেছেন। আর সকলের মাঝখানে সারমেয় অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে এক দিকের দন্ত বিকাশ করিয়া লেলিহান জিহ্বায় পড়িয়া আছে। কুকুর, বিড়াল, নর নারীর একরূপ সম পদবীতে সংস্থান আমরা কখনই করিয়া উঠিতে পারিব না। তাহাতেই ত স্পষ্ট কথা বলিতেছি—তোমরা যদি আর্য্য হও, আমরা কখন আর্য্য নহি।

খাদ্যের কথাই ধর। আমাদের, হিন্দুদের মহা পিট্‌পিটানি। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য খাইতে হইবে; ভিন্ন ভিন্ন মাসে, ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। বালকে একরূপ, যুবায় একরূপ, বৃদ্ধে অন্যরূপ। পুরুষে একরূপ, স্ত্রীতে অন্যরূপ। সধবার একরূপ,

বিধবার আর এক প্রকার। প্রতি বাড়ীতে পাঁচটা হেঁসেল; দশ প্রকার রন্ধন; কুড়ি রকম পাক। তোমাদের কিন্তু 'ব্রেড্ আণ্ড বীফ্'। বস্; বাঁদি রোশনাই। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ তৃপ্যতাং। ছেলে বুড়া—মেয়ে মর্দ্দ—বালিকা যুবতী—পাঁদরী দস্যু—সব সমান। খাদকের হিসাবে খাদ্যের কোন বিচারই নাই। খাদ্যের প্রকৃতি ধরিয়াও বিচার নাই। পনীরের কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া তাজি ঘোড়ার টেঙ্গরি,—যখন যাহা জুটিবে তাহাতেই প্রস্তুত। আহার অর্থ—জঠর-গহ্বর পূরণ। তা হাড়গোড়, কৃমি, কৃকলাস—একটা কিছু দিয়া হইলেই হইল। তাহাতেই বলিতেছি—তুমি সর্ব্বভুক্। আমরা পিট্‌পিটে। তুমি আর্য্য হইলে—আমরা আর্য্য নহি।

ধর, জাতির কথা। তোমরা এসকল কথা কিছু বুঝিবে না, তবু দুটা কথা বলিতে হইতেছে। আমরা মনে করি, যদি কসায়ের ছেলে পাদরি হয়, তাহা হইলে হয় ত, যীশুখ্রীষ্ট—স্বীয় শিষ্যগণকে রুটি বিভাগ করিয়া দিয়া সেই যে বলিয়াছিলেন, ইহা আমার শরীরের অংশ, মাংসখণ্ড জ্ঞান করিবে,—সে কেবল সেই রক্তমাংসের কথাই ভাবে। হয় ত সে প্রভুকে জবাই করিবার জন্যই ব্যগ্র থাকে; তোমরা অবশ্য এসকল কথা ভাব না, আমরা সংস্কার বশে, ভাবি। সঙ্গে সঙ্গে আরও ভাবি, যে তোমাদের দেশের এত কসাই, কামার, চামার, ছুতার এ দেশে যদি রাজপদ পাইয়া আসিতে না পারিত, তাহা হইলে হয় ত আমাদের এখনকার মত জীয়ন্তে দিবারাত্রি জবাই হইতে হইত না; দিবারাত্রি হাতুড়ির ঘায়ে ইস্পাতের পাত হইতে হইত না; আর বুকের উপর অনবরত দুমুখো করাতের হড়-হড়ানি, ঘর্ঘরানিতে, এত জ্বালা, যন্ত্রণা, রক্তপাত ও মর্ম্মচ্ছেদ হইত না।

তোমরা বল, বিবাহ একটা যোটনা। আমরা বলি, যোটনা দ্বারা সংস্কারই বিবাহের উদ্দেশ্য। আবার আমাদের সেই যোটনারই বা খট্‌কা কত। তাহাতে (১) জাতিবিচার; স্ত্রীপুরুষ এক জাতি হওয়া চাই। তাহার পর (২) বয়োবিচার; পুরুষ নারীর অপেক্ষা বড় হওয়া চাই, তাহার পর (৩) শরীর বিচার; নারী অনার্ত্তবা কুমারী হওয়া চাই। (৪) গোত্র বিচার; এক গোত্র হইলে চলিবে না। (৫) সম্পর্ক বিচার; পিতার ও মাতার সপিণ্ডা না হয়। (৬) এমন কি নামের পর্য্যন্ত বিচার; কন্যার নাম মায়ের নামে হইলে হইবে না। (৭) কাল বিচার। তাহার পর (৮) স্থান বিচার; সর্ব্বশেষ (৯) ক্রিয়া। সে এক অদ্ভুত কথা। ভাবি বংশধরগণের প্রাপ্তি কামনায়, আমরা ভূত পুরুষগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া, তবে বর্ত্তমানকে

গ্রহণ করি। আভ্যুদয়িক, কুশণ্ডিকা, গর্ভাধান তিনটি কার্য্যে—একটি বিবাহ। সোজা কথায় আমরা বিবাহের জন্য শ্রাদ্ধ করি; এমন বর্ব্বরতায়, তোমরা অবশ্য হাসিবে। তোমাদের পক্ষে হাসিবার কথাই বটে।

কেন না, বিবাহ আমাদের সংস্কার; তোমাদের কারবার। তোমরা খোঁজ কারবারের জন্য এক জন Partner বা অংশীদার; আমরা খুঁজি আমাদের সংস্কারের জন্য এক জন সহধর্ম্মিণী। কাজেই তোমাদের বিবাহে আমাদের মত সাত সতের মারপেঁচ কিছুই নাই। বায়ান্ন বৎসরের বর্ষীয়সী ত্রিকালীন বিধবা ছক্কড়ে যাইতে যাইতে ভাবিতেছেন; 'এই বয়সে একাকিনী, সংসার কি বিঘোর!' হঠাৎ সম্মুখের গাড়ির জানালা দিয়া দেখিলেন, ছোকরা গাড়োয়ান গাড়ি চালাইতেছে, বেশ; হাতল ধরিয়া ঝুঁকিয়া বাহির হইয়া কোচবক্সের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া গাড়োয়ানকে অতি কোমল স্বরে বলিলেন, Barky, will you marry me? 'বার্কি আমাকে ঘোটনা করিবি?' বার্কি চন্দ্র, ফিরিয়া চাহিল না; সেত আপনার কদর জানে। নিমেষ মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে একবার একটু তীব্র কশাঘাত করিয়া অমনই বলিল, why not? 'না করিমু ক্যান্!' বস্, চুক্তি শেষ। পথিপার্শ্বে গির্জ্জার নিকট গাড়ী থামিল। পাদরি উপস্থিত। বৃত্তান্ত অবগত। কারবারের অংশীদারেরা তাঁহার সমক্ষে স্বীকার। মন্ত্র;—

কন্যাযাত্র স্বয়ং কন্যা বরযাত্র বর।
আমি দিনু আশীর্ব্বাদ কর গিয়া ঘর।

প্রতুল সংসার। অতুল প্রণয়। সংবৎসর অতিবাহিত। বার্কি বিরক্ত।

ঘরেতে বিঘর হল, চলেনাক আর।
অফ্‌কোর্স ডাইবোর্স কথা কি আর তার?

তোমাদের যাতায়াত উভয়দিকেই মঙ্গলাদি সমাচার, আমাদের কেবল বিচারে বিচারে প্রাণগতিক হয় বিশেষ।

তোমাদের উপাসনা—জগদীশ্বরের সমীপে সাম্প্রদায়িক হাফ্‌আকড়ায়ের গান। মিল, অমিল বায়ান্নখানা গলায় উচ্চরবে একতানে চীৎকার। কথাটা কি? না, রোজ বরাদ্দের রুটি যেন আমরা সকলেই পাই। আমাদের,—জনে জনে নির্জ্জনে নিভৃতে নিরালয়ে নিরাবলম্ব ঈশ্বরে নিমজ্জন। তাহাতে প্রার্থনা কিছুই নাই। কেবল জীবাত্মার অণিমা এবং পরমাত্মার মহিমার যুগপৎ উপলব্ধি মাত্র। আবার ধর্ম্মে আমাদের অধিকারী ভেদ। তোমাদের ওরূপ বিচারই নাই; সকলের পক্ষেই কুমারীর ঘুঘু-সন্তান সমানে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা। আসল কথা—একরূপ বিকৃত সাম্যের উপর তোমার ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সংসার কারবার, বিবাহ ব্যতিক্রম, প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমার প্রবৃত্তি। আমাদের সমস্তই ভক্তিমূলক। আবার ভক্তির মূলে বৈষম্য। গোড়াতে তোমাতে আমাতে মিল নাই, আচার ব্যবহারে তোমাতে আমাতে মিল নাই, লক্ষ্য বিপরীত পথে, বিপরীত দিকে সুতরাং আমাতে তোমাতে

যে আর্য্য অনার্য্য ভেদ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। তোমার ভাষা বিজ্ঞানে যদি প্রমাণ হইয়া থাকে যে তুমি আর্য্য, তাহা হইলে আমার বুড়ো বিজ্ঞানে বলিতেছে, যে আমি কখন সে আর্য্য নহি। আমি যাহা আছি তাহাই ঠিক, আমি—

হিন্দু।

—o—

বাঙ্গালীর অদৃষ্টে বিধাতার লিপি।

অসিত পক্ষের নিশি দৃষ্টি নাহি চলিছে,
উত্তর হইতে বায়ু মৃদুভাবে বহিছে;
মুকতা ফলের মত গাছ হতে অবিরত
ভূতলে শিশির বিন্দু টুপ টুপ পড়িছে,
নিশাচর জন্তু সব করিছে বিকট রব,
আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে চারি দিকে ছুটিছে।

নিস্তব্ধ সাগর সম ধরাধাম শোভিছে;
মানব শয্যায় পড়ি, শ্রমদূর করিছে,—
কেহ বা পালঙ্ক পরে, দাস দাসী সেবা করে;
চক্ষে তার নাহি ঘুম ছটফট করিছে;
খড়ের বিছানা পাতি কেহ কাটাইছে, রাতি,
ঘুমে ঘোর অচেতন নাক জোর ডাকিছে।

এমন সময়,—
অথর্ব্ব বিধাতা বুড়া থরথর কাঁপিয়ে,
চুপাট করিয়া দেহে বনাতটি মুড়িয়ে,
বাঁ হাতে দোয়াত ধরে, ডানি হাতে লাঠি করে',
কঞ্চির কলম এক ডান কানে গুঁজিয়ে,
জাহ্নবীর তীরে তীরে, চলিলেন ধীরে ধীরে,
পবিত্র বাঙ্গালা দেশে কত কষ্ট সহিয়ে।

অদূরে ঢোলের বাদ্য শুনিবারে পাইল,
গুটি গুটি পা টি ফেলে সেইদিকে চলিল;
দেখিল সুন্দর বাড়ী, 'আনন্দের ছড়াছড়ি;
পূতি-গন্ধ অতি-ক্ষুদ্র সূতিগৃহে ঢুকিল,
আগুনের রাশি পেয়ে, হাতে পায়ে তাপ দিয়ে,
বাঙ্গালী শিশুর ভালে লিখিবারে বসিল।

"শিশুবেলা ধুলা গায়ে নানা খেলা খেলিবে,
পঞ্চম বৎসরে পড়ি হাতে খড়ি ধরিবে;
লয়ে বর্ণপরিচয় নিত্য যাবে বিদ্যালয়,
দশ বার খানি বই 'অ' চিনিতে ছিঁড়িবে;

বাঙ্গালা দু-তিন খান বই করে' সমাধান,
রাজ ভাষা—ইংরাজীর ফষ্ট বুক ধরিবে।

ইস্কুলে শিক্ষার গুণে জেঠামিতে পাকিবে,
সম্বৎসর অবহেলে ইয়ার্কিতে কাটিবে,
পরীক্ষার কাল এলে, সারা রাতি দীপ জ্বেলে
পড়িয়া, পরীক্ষা দিয়া প্রমোশন লইবে,
'কী' বুক মুখস্থ করে' আর চালাকীর জোরে,
প্রবেশিকা পরীক্ষার জয় লাভ করিবে।

তার পর মহানন্দে কলেজেতে ঢুকিবে,
কলেজী ফ্যাশনে চখে চসমাটি ধরিবে;
পেয়ে কলেজের পড়া মেজাজ হইবে কড়া,
দেখিলে পুতুল পূজা হাড়ে হাড়ে চটিবে,
বঙ্গভাষা মৃত ভাষা, বাঙ্গালী নিরেট চাষা,
সমাজের শত দোষ—মনমাঝে উদিবে।

এসময়ে বুদ্ধি তার পাকা হয়ে উঠিবে,
কতরূপে কত ভাবে কত কাজ সাধিবে,—
হাসিবে সে থিয়েটারে, যাইবে সে বেশ্যাগারে,
সন্ধ্যায় সাহার ঘরে বাহাবা সে লইবে,
ব্রহ্ম-উপাসনা ঘরে, যাইবে আহ্লাদ ভরে,
উইলসেনের সেবা সংগোপনে সারিবে।

পরীক্ষার কাল এলে দিন রাতি খাটিবে,
পাশ করিবার তরে, সারা রাতি জেগে মরে'
রোগে জীর্ণ কলেবরে গুলিখোর সাজিবে;
পাশ দিলে একবার, বিদ্যা পেকে যাবে তার,
পুস্তকের দিয়া ধার আর নাহি চলিবে।

বিএ পাশ হলে পরে, বিয়ে গোল উঠিবে,
চারিদিক হতে সদা কত লোক যুটিবে;
ইহা চাই, উহা চাই, চাই ভিন্ন কথা নাই,
শুনিয়া কন্যার বাপ আধা মরে, যাইবে;
কি করে উপায় নাই, কন্যা দান করা চাই,
জমিজমা বেচে শেষে কন্যাদান করিবে।

শিক্ষিতা স্বাধীনা নারী গৃহমাঝে ঢুকিবে,
ভৃত্যভাবে মন তার যোগাইতে হইবে;

যখন সে যাহা চাবে, তখনি তা দিতে হবে,
নাহি দিলে বিধুমুখী শতমুখী ঝাড়িবে।
সংসার পালন ভার, ঘাড়েতে পড়িবে তার,
ছুটিবে আকুল হয়ে কি উপায় করিবে।

চাকরীর তরে তবে ব্যতিব্যস্ত হইবে,
দিনরাতি ঘরে পরে সুপারিস খুজিবে;
কত দৌড়াদৌড়ি করে, কত সুপারিস ধরে,
সাহেব-অফিসে শেষে চাকরীটি পাইবে;
সে কাজে গাধার মত, খাটিবে সে অবিরত,
তবু সাহেবের লাথি ছাতি পেতে সহিবে।

অপমান নানা মতে অবিরত পাইবে,
তবু সে অধম কাজ কভু নাহি ছাড়িবে,
তবু তার ষোলআনা, রবে বাহ্য বাবু-আনা,
চলনে দ্বিখণ্ড হয়ে ধরাতল ফাটিবে;
বাসায় বাঙ্গালী বেশ, অফিসে সাহেবী ঠেশ,
বেশ দেখে সকলেই বেশ বেশ বলিবে।

বাক-পটুতায় অতি মজবুত হইবে,
পৃথিবী খুজিয়া হেন কোথাও না পাইবে;
কথায় সে শতবার, মাথা লবে বাদসার,
ভারতের সমুদ্ধার কতবার করিবে;
স্বর্গকে ইচ্ছার বলে, ডুবাবে সাগর জলে,
পাতালকে আকাশেতে তুলিবারে পারিবে।

অবশেষে অপঘাতে মৃত্যু তার ঘটিবে,—
সাহেবের পদাঘাতে পিলা তার ফাটিবে;
সাহেব ডাক্তার এসে, সে দেহ চিরিবে শেষে,
'প্লীহা রুগ্ন, স্বত ভগ্ন' মন্তব্য সে লিখিবে;
সাহেবের কাছে তবে, তাহার বিচার হবে,
স্বতঃসিদ্ধ 'ডিসমিস' সদ্য সদ্য ফলিবে।"

বাঙ্গালীর ভাগ্য-লিপি এইরূপে লিখিয়া,
উঠিল বিধাতা বুড়া দীর্ঘ হাই ছাড়িয়া,
লাঠিগাছি হাতে নিয়ে, গুটি গুটি পা ফেলিয়ে,
যেতে যেতে, শতবার যায় তবু পড়িয়া,
একেত প্রাচীন কায়, অতিশয় শীত তায়,
চলিল উত্তর মুখে আধ মরা হইয়া।

—o—
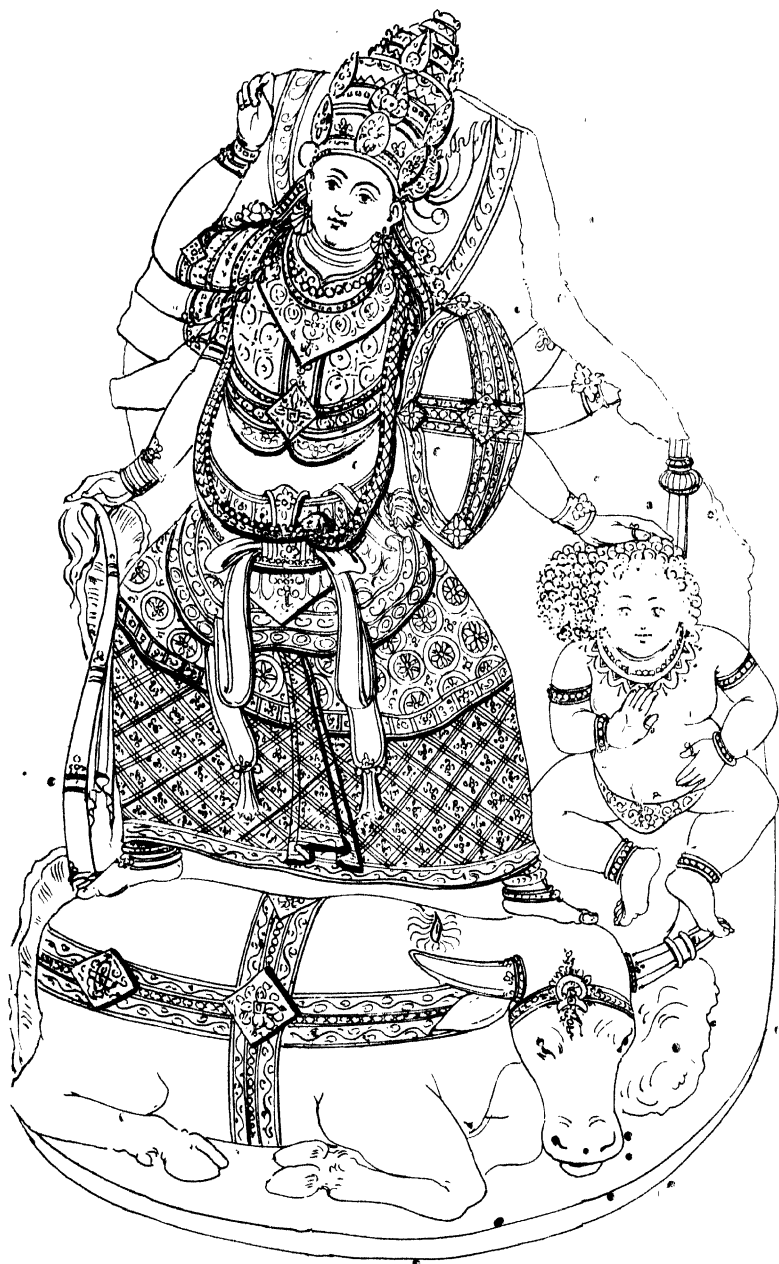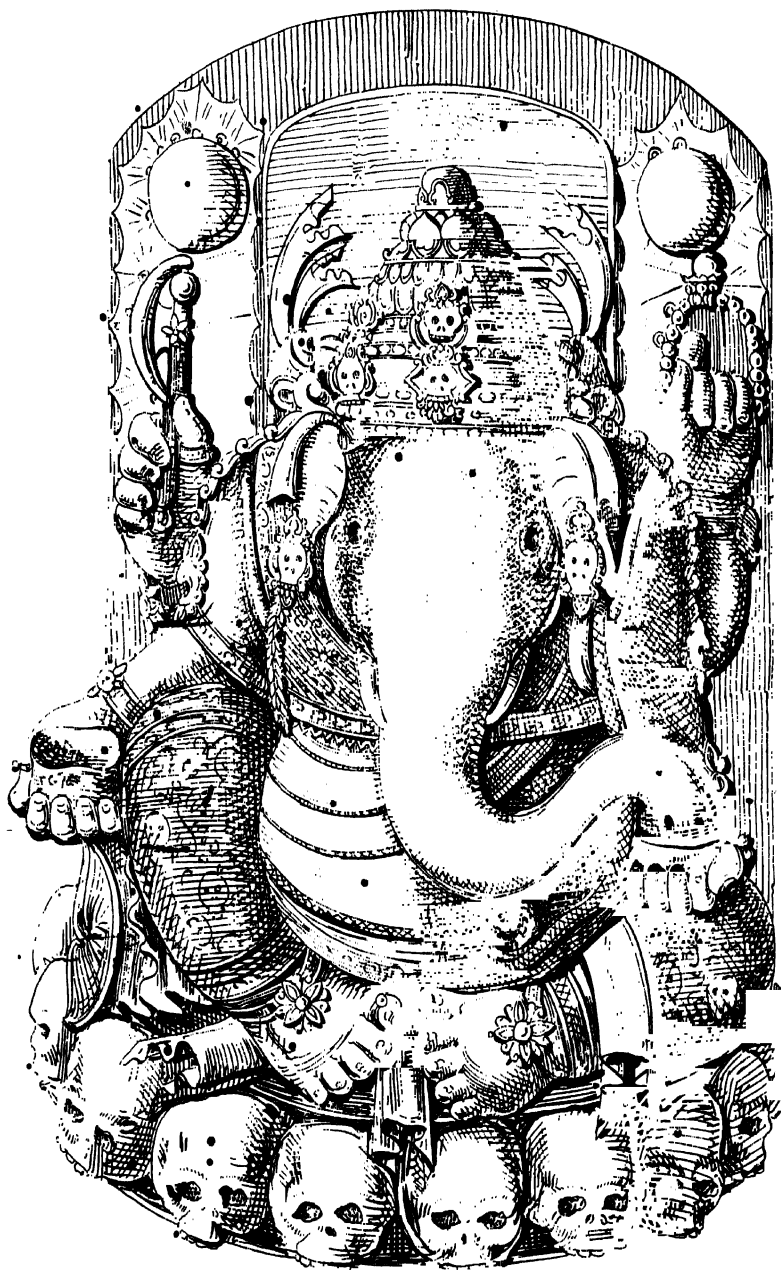
নবজীবন।

৩য় ভাগ } আশ্বিন ১২৯৩। { ৩য় সংখ্যা।

সে কালের দারোগার কাহিনী।

৩—মনোহর ঘোষ।

মনোহর ঘোষ জাতিতে গোয়ালা; একডালা পরাণপুর গ্রামে তাহার বাসস্থান ছিল। নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একডালা পরাণপুর, পূর্ব্বস্থলী,—যাহার অন্যতর নাম পূবধুল,—চুপি, কাঁকশিয়ালী, গুপিপুর, মেড়তলা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম মালারদানার ন্যায় পাশাপাশী এক ছত্রে ভাগীরথীর কূলে স্থিত। সকল গ্রামেই ভদ্র বিশিষ্ট লোকের বাস। পূবধুল গ্রামে পূবধুল থানা সংস্থাপিত ছিল; এবং এই গ্রাম বঙ্গ ভাষার প্রসিদ্ধ লেখক মৃত অক্ষর কুমার দত্তের জন্মস্থান। গঙ্গাপায়ে বঙ্গজ কায়স্থদিগের বাস অতি বিরল কিন্তু পূর্ব্বস্থলীতে এক ঘর বঙ্গজ কায়স্থ স্থাপিত ছিল এবং অক্ষয় বাবু সেই কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। চুপি গ্রামে খ্যাতনামা দেওয়ান মহাশয়দিগের বাস এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের ভক্তিরসের গীত এখনও আমাদিগের মধ্যে আদরণীয়। গুপিপুর মেড়তলাও এক বিগ্রহের স্থান বলিয়া ঐ অঞ্চলের লোকের নিকট পবিত্র স্বরূপে পরিগণিত। কাঁকশিয়ালীতে এক নীলকুটী ছিল। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামেই ব্যবসায়ী এবং শিল্পজীবী লোক বাস করিত এবং ইষ্টাকালয়েরও অভাব ছিল না। আমি যখন দেখিয়াছি, তখন ভাগীরথী নদীর প্রধান স্রোত বহুদূরে বেলপুকুর গ্রামের নীচে বহমান ছিল এবং পূর্ব্বস্থলী গ্রামের নিকট কেবল একটি ক্ষুদ্র খালের

ন্যায় গঙ্গায় জল প্রবাহিত হইত এবং তাহা দিয়া শুষ্ককালে নৌকায় গমনাগমন করা কঠিন হইত। কিন্তু শুনিয়াছি যে, এক্ষণে সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

মনোহরের পিতার নাম আমি অবগত নহি। তাহার শরীরের অবয়ব কিঞ্চিৎ পরে বিবৃত করিব।

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে স্থান এবং সময়ের প্রভেদে বস্তু মাত্রেরই ফলাফলের বিভিন্নতা হয়। উদ্ভিদ জগতে দেখা যায় যে, উপযুক্ত স্থানে এবং উচিত কালে বৃক্ষরোপিত না হইলে নিকৃষ্ট ফলোৎপাদিত হয়। শ্রীহট্ট হইতে কমলা লেবুর বৃক্ষ আনিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিলে সহস্র যত্নেও সেইরূপ মিষ্ট এবং সুরস ফল হয় না; অধিক হইলেও অম্লময় নারেঙ্গা হইয়া যায়। মানব মণ্ডলীর মধ্যেও সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য দেশ কালের বৈষম্য নিবন্ধন নরোত্তম কিম্বা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। বঙ্গ দেশের ইতিহাসাভিজ্ঞ মহাশয়েরা জানেন যে লর্ড ক্লাইব্ যদি খ্রিষ্টীয় আঠার শতাব্দির প্রথম ভাগে জন্ম গ্রহণ না করিয়া উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে জন্মিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দশা অতি শোচনীয় হইত। বাল্য কালে চৌর্য্যবৃত্তিতে ক্লাইবের দৃঢ় অনুরাগ দেখিয়া উপায়ান্তর অভাবে তাঁহার বান্ধবেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিকসমিতির অধীনে এক কেরাণীগিরী উপলক্ষ করিয়া কিন্তু বাস্তবিক ওলাউঠা রোগে কিম্বা হিংস্রক পশ্বাদির মুখে মরিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে ঐ পাপ বিদায় করিয়া দেয়। সেই পাপ ভারতভূমে পদার্পণ করিয়া কিয়ৎকালের মধ্যে ফরাসীসদিগকে পরাজয় করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, কৃত্রিম লিপি দ্বারা উমিচাঁদকে প্রতারণা করিল এবং অবশেষে কয়েক জন রাজদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, পলাশীতে এক ছায়া যুদ্ধ দেখাইয়া, বালক সেরাজদ্দৌলার হস্ত হইতে বঙ্গাদি প্রদেশ ইংরাজ বণিকদিগের করে চিরকালের জন্য প্রদান করিল। সেই যে ব্যক্তিকে পাপ বিবেচনায় তাহার পিতা মাতা মারিবার জন্য গ্রীষ্ম প্রধান দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল, সে কয়েক বৎসর পরে গৌরবের মুকুট শিরে ধারণ করিয়া জন্মভূমি প্রত্যাগমন করিল, স্বদেশের রাজার নিকট আদৃত হইল, উপাধি পাইল এবং সর্ব্বলোকের নিকট সম্মানিত হইল। ধনের কথা বলিবার আবশ্যক নাই, উপরন্তু সেই ক্লাইব্ চিরস্মরণীয় ভাবে ইংরাজের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। যে কলুষিত প্রকৃতি দোষে ক্লাইব্ বাল্য-

কালে সহাধ্যায়িদিগের পুস্তক ও খাদ্য দ্রব্য, ও প্রতিবাসীর বাগিচার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বৃক্ষের মুল্যবান ফল, অপহরণ করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা জ্ঞান করিতে পারে নাই, অধিক বয়সে সেই প্রকৃতি প্রভাবে, অনুকূল অবস্থা সহকারে নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বল বালকের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পাপ কিম্বা অধর্ম্মাচরণ বলিয়া বিবেচনা করিবে কেন?

কিন্তু এই পাপক্ষেত্রে ক্লাইব্ একাকী নহে। সেকেন্দর সা, *—যাঁহাকে ইংরাজি ভাষায় বীরপ্রবর আলেকাজণ্ডর বলে, —তৈমুর লং, জঙ্গিশ খাঁ, মহম্মদ গজনী, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদায় খ্যাত্যাপন্ন দিগ্‌বিজয়ী যোদ্ধাগণের একই মনোবৃত্তি এবং একই কার্য্যপ্রণালী। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগবেদের বঙ্গানুবাদ করিয়া যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা সত্য যুগে হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করিতেন। যদি তাহাই সত্য হয়,

---

* সেকেন্দর সার নিকট একজন দস্যুদলের নেতা ধৃত হইয়া আসিলে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে দস্যু উত্তর করিল যে "আমি এমন কোন্ কার্য্য করিয়াছি যাহা আপনি করেন নাই। আমার ন্যায় আপনারও পর দ্রব্য অপহরণ করা ব্যবসা। আমি অল্প বিস্তর ধন চুরি করি, আপনি রাজার ভাণ্ডার লুঠিয়া থাকেন। আমি একটি গৃহস্থের বাড়ী আক্রমণ করি, আপনি রাজ্য দেশ ছারখার করেন। আমি শতাবধি লোক সমভিব্যহারে দস্যুবৃত্তি পরিচালন করি কিন্তু আপনি লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা লইয়া দেশ অধিকার করেন। আমি আমার অভীষ্টসাধনার্থ কখনও কখনও দুই এক জন মানুষকে আঘাত কিম্বা বধ করিয়াছি, আপনার প্রত্যেক যুদ্ধে সহস্রাধিক মনুষ্য অশ্ব, হস্তী, প্রভৃতিকে আপনি যমালয়ে প্রেরণ করেন। আমার কার্য্যে কদাচিৎ কখনও একখানা গৃহ দগ্ধ হয়, আপনি শত শত নগর এবং জনপদ উচ্ছন্নে দিয়াছেন! আমি কেবল আমার পেটের দায়ে এই দুর্ব্বৃত্তি করিতে বাধিত হইয়াছি কিন্তু আপনার সে ওজর নাই, কারণ আপনি রাজার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমার যেমন জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের অভাব আপনার তেমনই সকল সম্পূর্ণ ছিল। রাজ্য ধন সকলই প্রচুর। তথাপি আপনি পরদ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারেন নাই। অতএব আমাতে আর আপনাতে কেবল লঘু গুরু প্রভেদ। আমার শিরশ্ছেদ করিলে যদি আমার পাপের উচিত দণ্ড হয়, তবে আপনাকে সহস্র খণ্ডে ছেদন না করিলে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না"। কথিত আছে যে এই উচিত বক্তা দস্যুকে সেকেণ্ডর সা মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে, আমার গরিব মনোহর দ্বাপরে আবির্ভূত হইলে, দ্বিতীয় জরাসন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত।

মনোহরকে পরমেশ্বর বল, বীর্য্য এবং সাহস দান করিতে কৃপণতা করেন নাই এবং জটিল বুদ্ধিও তাহার কম্ ছিল না। তাহার বল ও কুস্তি বিদ্যা সম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি, যে সে চিত হইয়া শুইয়া থাকিত এবং তাহার গলার উপরে এক খণ্ড বাঁশ দিয়া বাঁশের দুই প্রান্তে দুই জন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপিয়া বসিলেও মনোহর মৃত্তিকার উপরে হস্ত পদের ভর করিয়া বাঁশ সমেত সেই দুই জন মনুষ্যকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিত। মনোহর লাঠির ভর করিয়া সাধারণ উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিতে ক্লেশ বোধ করিত না। প্রাতঃ-কাল হইতে সন্ধার মধ্যে ২০ ক্রোশ গ্রাম্য রাস্তা হাটিতে পারিত। লাঠিয়ালি, সিন্ধু চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, নৌকার ডাকাইতি—ইহার সকল কার্য্যেই সে পরিপক্ক ছিল। অতি শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সে এমন প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি প্রকাশ করিত, যে তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে তাহাদের নেতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। কথিত আছে যে তেহট্ট গ্রামে এক ধনাঢ্য কলুর বাড়িতে নয়না মানিকা নামক দুই জন প্রসিদ্ধ ডাকাইতের দলের সহিত মনো-হর ডাকাইতি করিতে গিয়া অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়। কলুর ইষ্টকালয় বাড়ী ছিল এবং পুরজন ছাতের উপর উঠিয়া এমন ভাবে সেই স্থান হইতে ইট ও ঝামা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, যে দস্যুদিগের বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়ান অতি কঠিন হইয়া উঠিল। নয়না প্রভৃতি প্রস্থানের পরামর্শ স্থির করিল, কিন্তু মনোহর তাহা অতি লজ্জাকর কার্য্য বিবেচনা করিয়া বাহির বাড়ীর একটা ঘরের কাষ্ঠের কবাট ও ঝাঁপ খুলিয়া, রোমীর সেনারা পূর্ব্ব কালে দুর্গ আক্রমণ করার সময় যেমন স্বীয় স্বীয় ঢাল দ্বারা তাহাদের মস্তক এবং শরীর আচ্ছাদন করিয়া যাইত, মনোহরও সেই রূপ এই কবাট এবং ঝাঁপ দ্বারা শরীর এবং মস্তকাবৃত করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পরামর্শ-দিল। মনোহরের সঙ্গীগণ তাহার কথামত কার্য্য করিয়া অনায়াসে স্বকার্য্য, সাধন করিল। মনোহর কখনও রোমীয় ইতিহাস পাঠ করে নাই কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেই স্বভাবত তাহার মনে নিক্ষিপ্ত ইট প্রস্তরাদির আঘাত রক্ষার জন্য এই রূপ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। দক্ষিণে কালনার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে মৃজাপুরের খাল হইতে উত্তর গোটপাড়া এবং অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত গঙ্গার তট মনোহরের কার্য্য ক্ষেত্র ছিল; এই স্থানের মধ্যে সুবিধা মতে

নৌকা আসিলে নৌকাওয়ালাদের রক্ষা ছিল না। কয়েক বার কৃষ্ণনগরের সাহেব দিগের মেস কোর্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা ও জজ ব্রাউন সাহেবেরও দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা মনোহর ভাগীরথীর ধারে আক্রমণ করিয়া অনেক টাকার মাল অপহরণ করে। কিন্তু মনোহর তাহার নিজ থানায় অর্থাৎ পূব্‌ধুল থানার এলাকাস্থিত গ্রাম সকলে কদাচিৎ চুরি ডাকাইতি করিত, কৃষ্ণনগর জেলার অধীন স্থানেই তাহার কার্য্য স্থল ছিল। কারণ থানা তাহার বাস স্থানের অতি নিকট থাকাতে, পূব্‌ধুলের পুলিস আমলার অধিকারের মধ্যে চৌর্য্য-বৃত্তি পরিচালন করিলে সর্ব্বদা তাহারা বিরক্ত করিবে বলিয়া, সে তাহাতে ক্ষান্ত থাকিত, এবং ইহাও শুনা হইয়াছে যে উক্ত পুলিস কর্ম্মচারীগণের সহিত মনোহরের এরূপ গোপনীয় বন্দোবস্ত ছিল, যে পূব্‌ধুলের থানার মধ্যে শান্তি ভঙ্গ না হইলে, তাহারা মনোহরের অন্য কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিবে না। পূব্‌ধুলের নিকটবর্ত্তী কয়েক খানা গ্রামে মনোহরের অসীম আধিপত্য ছিল এবং অধিবাসীগণের মধ্যে অল্প ব্যক্তি ছিল, যে মনোহরকে ভয় না করিয়া কার্য্য করিতে পারিত। কাঁকসিয়ালীর বাজারে অন্যান্য গোয়ালিনীর সঙ্গে মনোহরের ভগিনী ও স্ত্রী দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইত, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মনোহরের পসরা বিক্রীত না হইলে, ক্রেতারা অন্যের দধি দুগ্ধের প্রতি হস্তার্পণ করিতে পারিত না। গ্রামের মধ্যেও মনোহর যখন যাহার নিকট কিছু চাহিত, কিম্বা যাহাকে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিত, সে তাহা না দিলে কিম্বা করিলে অচিরাৎ তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইত। মনোহরের পিতামহীর মৃত্যু হইলে পরে সে সমারোহ পূর্ব্বক তাহার শ্রাদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বস্থলী, চুপি প্রভৃতির কাঁসারীর নিকট প্রচুর পরিমাণে তৈজস, বস্ত্র-বিক্রেতার নিকট বস্ত্রাদি, ময়রার নিকট চিড়া, এইরূপ সমুদয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ভিক্ষা চাহিল। এই ভিক্ষা বলি রাজার নিকট বামন দেবের ভিক্ষার ন্যায়। না দিলে ও নয় এবং দিতে হইলেও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিতে হয়। মনোহর পিতামহীর শ্রাদ্ধের ভিক্ষা চাহিয়াছে লোকে তাহা না দিয়া কেমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? তুমি আজি ১০ টাকার দ্রব্য দিলে না, কল্য তোমার সে ১০০ টাকার ক্ষতি করিবে। বিশেষ মনোহরের বিরুদ্ধে রাজ দরবারেও প্রতিকার পাওয়া দুঃসাধ্য, কারণ সহসা কোনও ব্যক্তি মনোহরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস করিবে না। এমতাবস্থায় কেহই মনোহরকে তাহার ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করিতে

পারিল না এবং এই রূপে সে তাহার পিতামহীর শ্রাদ্ধ কার্য্য অনায়াসে তাহার ইচ্ছানুযায়ীরূপে সম্পন্ন করিল। চৌর্য্য বৃত্তি পরিচালনে মনোহরের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মায়াদয়ার উদ্ভব হইত না এবং যে সকল ঘটনায় প্রাণ বধ করার আবশ্যক না থাকিত, তাহাতেও প্রাণ নষ্ট করা তাহার নিকট আনন্দ জনক কার্য্য বলিয়া বোধ হইত। তাহার এক দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন।

মনোহর ধৃত হইলে পরে নবদ্বীপের একজন অতি প্রধান অধ্যাপক মনোহরের দুর্ব্বৃত্ততার দৃষ্টান্ত আমার নিকট ব্যক্ত করেন; ইহা তাঁহার চক্ষের উপরে ঘটিয়াছিল। তিনি যে প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমিও পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে সেই প্রণালীতে তাহা বিবৃত করিব। "আমি প্রতি বৎসর ৺ শারদীয় পূজার কয়েক দিবস পূর্ব্বে বার্ষিক বৃত্তি আহরণের নিমিত্ত শিষ্য সেবকের নিকট যাইয়া থাকি। আমি যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরও দুই মাল্লার একখানা ছোট নৌকায় একজন শিষ্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন ভাণ্ডারী লইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রার নিমিত্ত প্রাতঃকালে নবদ্বীপের ঘাট হইতে যাত্রা করি। মধ্যাহ্ন সময়ে কাঁকসিয়ালীর বাজারে উঠিয়া রন্ধনাদি করিয়া সেই দিবসের জন্য এক প্রকার আহারের কার্য্য শেষ করিলাম; রাত্রিতে পাক না করিয়া জলযোগের অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া মাঝিকে যতদূর সাধ্য অগ্রসর হইতে আদেশ করিলাম। অল্পকালের মধ্যেই রোকনপুরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম কিন্তু তখন আমার পাচক ব্রাহ্মণ বলিল যে, 'আমি একটা কথা মহাশয়কে জ্ঞাত করিতে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, শুনিয়া এখান হইতে অধিকদূর যাওয়া না যাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। কাঁকশিয়ালির বাজারে আমার সহিত মনোহর ঘোষের দেখা হয় এবং আমাকে নূতন লোক দেখিয়া আমরা কে কোথায় যাইতেছি, তাহার তথ্য জানিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মনোহর আমাকে চিনে না, কিন্তু আমি তাহাকে চিনি এবং সেই নিমিত্ত আমি তাহাকে আমাদের পরিচয় দিলাম না। লক্ষণ বড় ভাল নয়, বিশেষ পূজার সময় নির্জ্জন স্থানে এই বেটার হস্তে পড়িলে আমাদের মঙ্গল নাই।' এই কথা শুনিবাত্র আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ কোন গ্রামের মধ্যে যাইয়া কোনও ব্যক্তির আশ্রয় লইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। ভাবিলাম, যে অনতি দূরে বহিরগাছীর গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাড়িতে যাইয়া

আমি ও আমার সমভিব্যহারী সকলে অতিথি হইয়া রাত্রি কালটা অতিবাহিত করিব। বহিরগাছীর গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কৃষ্ণ নগরের রাজার গুরু বংশ; বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী। বাড়িতে ইষ্টকালয় আছে এবং রোকন পুরের বাজারও তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে। বাজারে উঠিয়া এক দোকানে শুনিলাম যে, গুরু ভট্টাচার্য্যদিগের এক জন যাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল এবং যাঁহার বাড়িতে যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তিনি কিছু কাল পূর্ব্বে এই বাজার হইয়া নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়াছেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এবং বাজারে অপেক্ষা করিলে আমরা তাঁহার সঙ্গে বহিরগাছী যাইতে পারিব। আমি বাজারে অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম যে আমাদের পশ্চাতে এক খানা যাত্রা ওয়ালার নৌকা আসিয়া সেই বাজার ধরিল। তাহারাও মুরসিদাবাদ অঞ্চলে পূজার সময় এক জনের বাড়িতে যাত্রা করিতে যাইতেছে। এবং তাহাদের মধ্যে কয়েক জন কিছু দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সেই দোকানে উপস্থিত হওয়াতে, কথায় কথায় আমি যে বিভীষিকা দেখিয়াছি, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়া অদ্য আর অধিক দূরে যাইতে নিষেধ করিয়া, কল্য প্রাতে দুই নৌকা একত্রে যাওনের প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু হতভাগারা আমার কথা গ্রহণ করিল না; বলিল যে তাহারা অনেকগুলি লোক নৌকায় আছে, ১০। ৫ জন ডাকাইতে তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না। ক্ষণেক পরে দেখিলাম, যে যাত্রাওয়ালারা নৌকা খুলিয়া বেহালা নামক চর বহিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু সেই সময় গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রখর থাকায় বিশেষ বড় নৌকা এবং প্রচুর সংখ্যক মাল্লার অভাবে ধীর গতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। এদিকে প্রদোষ সময় উপস্থিত হইল এবং আমি যে ব্যক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম, তিনি আসিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে আশ্বাস প্রদান করত বাজারে তদীয় যে কিছু আবশ্যকীয় কার্য্য ছিল, তাহা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কেবল মাত্র অন্ধকার হইয়াছে এমন সময় আমাদের কর্ণে বহুদূরে চরের দিক হইতে একটা ভয়ানক শোর গোলের শব্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার পাচক ব্রাহ্মণ অমনি বলিয়া উঠিল যে "ঐ গো শুনুন মহাশয় পাপিষ্ঠ বেটা বুঝি কি না কি করিল"। আমি স্তম্ভিত হইলাম। বাজারে যে দুই চারি খানা দোকান ছিল, তাহার দোকানিরা শশব্যস্তে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, স্ব স্ব গ্রামে প্রস্থান করিল এবং আমার গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে "এক্ষণে

শীঘ্র চলুন, ইহা ভাবিয়া আপনি কি করিবেন, মধ্যে মধ্যে এইরূপ কারখানা হইয়াই থাকে।” পর দিবস প্রাতে সেই বেহালার চর বহিয়া যাইতে রোকণপুর হইতে প্রায় ১৷৷০ ক্রোশ ব্যবধান একস্থানে আসিয়া দেখিলাম, যে, একখানা চড়ন্দার পান্সিনৌকা একটা ঝোপের ধারে জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে; আমার মাঝি কহিল যে ইহা সেই যাত্রাওয়ালাদিগের নৌকা, কোন সন্দেহ নাই। চড়ার উপরেও একটা ভগ্ন পেটারা ও কয়েক-খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। নৌকার যাত্রিদিগের কাহারও কোন চিহ্ন কিম্বা অনুসন্ধান পাইলাম না। তাহাদের মধ্যে কেহ পলায়ন করিতে পারিয়াছিল, কি সকলেই সেই দুরাত্মার হস্তে যমভবনে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। আমার পাচক বলিল, যে নৌকার কেহই বাঁচে নাই। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, যে অসম্ভব; কারণ নৌকার মধ্যে কয়েকটি বালক ছিল, তাহাদিগকেও কি মারিয়াছে? পাচক মাথা নাড়িয়া কহিল যে, আপনি ও বেটার চরিত্রের কথা জানেন না, তাহার নিকট কাহারও অব্যাহতি নাই।”

মনোহরের আর এক গুরুতর দোষ ছিল; তাহার রিরংসা অতি প্রবল ছিল। এই অধম প্রবৃত্তির সন্তোষের নিমিত্ত তাহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিলনা। অধিক কি বলিব, বাঞ্ছিত পাত্রী সহজে সম্মত না হইলে, মনোহর তাহার গৃহ প্রবেশ করিয়া বলাৎকার করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। লাঞ্ছিত ব্যক্তিরা ভীরু স্বভাব বশত বিশেষ জাতি যাওয়ার এবং লজ্জার ভয়ে ও পর্য্যাপ্ত সাক্ষী সাবুদ না পাওয়ার সম্ভাবনায়, গায়ের ঝাল গায়ে মরিতে দিত। প্রতিকারের অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া, কেবল পরমেশ্বরকে তাহাদিগকে এই পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে ডাকিত।

মনোহরের বিলক্ষণ ভাগ্যবল ছিল; কারণ তাহার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি এমন দুই পুলিশ থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া যদৃচ্ছারূপে দুষ্কার্য্য করিতে কৃতকার্য্য হইত? কৃষ্ণনগরের হাকিমেরাও মনোহরের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন এবং মণ্ট্রেসর সাহেব একজন অতি তেজস্বী ও তীক্ষ্ণ মাজিষ্ট্রেট ছিলেন,—তিনিও এই দুরাত্মাকে ফাঁদে ফেলিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও মনোরথ সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। জজ ব্রাউন সাহেবের দ্রব্যাদির নৌকা লুঠ করার পর হইতে তাঁহারও মনোহরের উপর কোপ

ছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে দণ্ডনীয় করার উপায়াভাবে কেবল উপলক্ষের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এইরূপে কি অধিবাসী, কি পুলিস আমলা, কি হাকিম, মনোহর সকলেরই বিরক্তি-ভাজন হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় সে সকলকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া গাত্রে ফুঁ দিয়া বেড়াইত। প্রথমে আমি মনোহর সম্বন্ধে এই সকল কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, ইহার মধ্যে অনেক রঞ্জিত বৃত্তান্ত বলিয়া সন্দেহ করিতাম, কিন্তু পশ্চাতে আমার এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, প্রত্যুত তখন ভাবিলাম, যে আমি মনোহরের সমুদয় দুশ্চরিত্রের কথা শুনিতে পাই নাই।

পূজার সময় আমার থানায় যে দুই নৌকার ডাকাইতি হইল, তাহাও মনোহরের কার্য্য বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল এবং রামকুমার প্রভৃতি অনেকে মনোহরকে কোন কৌশলে এবং এই দুই ঘটনার উপলক্ষে ধরিয়া আনিয়া প্রচুররূপে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিতে বারম্বার পরামর্শ দিল, যে তাহা হইলে মনোহর কিছু কালের নিমিত্ত ক্ষান্ত থাকিবে; কিন্তু আমি নূতন কর্ম্মচারী এমন যথেচ্ছাচারী অন্যায় কার্য্য করিতে আমার সাহস হইল না। তাহা দেখিয়া আমার পরামর্শদাতারা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিল, যে এমন ভীত হইয়া কার্য্য করিলে আমি কখনই ভালরূপে দারোগাগিরী করিতে পারিব না।

যাহা হউক এইরূপে রাস পূর্ণিমার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাসপর্ব্বে শান্তিপুরে যেমন রঙ্গ তামাসা এবং বহু লোকের সমাগম হয়, নবদ্বীপেও এই পূর্ণিমায় পটপূজা উপলক্ষে সেইরূপ সমারোহ হইয়া থাকে। নবদ্বীপের পট-পূজা অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার। নামে পট-পূজা কিন্তু বাস্তবিক ইহা নানাবিধ প্রতিমার পূজা। দশভুজা, বিন্ধ্যবাসিনী, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হয়। নদীয়া, বুইচপাড়া ও তের্ঘরির প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই এক এক খানি করিয়া প্রতিমা হয়। পটপূজা কোন ব্যক্তি কিম্বা গৃহস্থ বিশেষের খাস পূজা নহে, প্রত্যেক পল্লীতে বারোইয়ারি-স্বরূপ এই পূজা হয়, এবং ইহাতে বড় ছোট সকল অধিবাসিগণেরই উৎসাহ থাকে। আমার পাড়ার প্রতিমা শ্রেষ্ঠ হইবে বলিয়া সকলেরই ইচ্ছা এবং যত্ন থাকে, এবং বস্তুত সকল প্রতিমাই সুগঠিত এবং সুসজ্জিত হয়। কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কুমার কারিকরেরা অতি প্রসিদ্ধ, এবং

স্ত্রীপুরুষ অনেকে ডাকের সাজ প্রস্তুত করার কার্য্যে অতিশয় নিপুণ। আমি শুনিয়াছি যে টোলের অধ্যাপক অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও সখ্ করিয়া প্রতিমার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। সুতরাং অন্য স্থানে লোকে যাহা বহুব্যয়ে সমাধা করিতে পারে না, তাহা নবদ্বীপ অধিবাসীগণ স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা অনায়াসে অতি সুন্দররূপে সম্পাদন করে। পট-পূজার প্রতিমাগুলি অন্যস্থানের প্রতিমা অপেক্ষা অধিক উচ্চ এবং অনেক পুত্তলি সমবেত; কিন্তু তথাপি ঐ গুলির এক বিশিষ্ট গুণ আছে যে, প্রতিমাগুলি অত্যন্ত হালকা এমন কি, ৫।৬ জন মজুরে তাহা স্কন্ধে করিয়া নাচাইতে পারে।

নবদ্বীপের পট-পূজা দেখিতে বিশেষ প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন অনেক দূর হইতে লোক আইসে। কেবল তামাসা দেখিবার নিমিত্ত নহে, এই উপলক্ষে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় পবিত্র নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করার মানসেও বহু লোকের সমাগম হয়। অনেকে আবার নৌকায় আসিত এবং এই পুণ্যস্থানে ত্রিরাত্র বাস করিয়া বিসর্জ্জনান্তে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইত। এই পর্ব্ব দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরের বারাঙ্গনারা অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত হইয়া নৌকাযোগে আসিত এবং তাহাদের অলঙ্কারের প্রতি দস্যুদিগের বিশেষ প্রলোভন জন্মিত। ইতিপূর্ব্বে বেশ্যারা নবদ্বীপের ঘাটে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে চলিয়া যাইত কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ মনোহর ইহাদিগের নৌকা আক্রমণ করাতে, তাহারা বিসর্জ্জনের পরক্ষণেই নৌকা খুলিয়া কৃষ্ণনগর গমন করিত; এবং থাকিবার আবশ্যক হইলে রাত্রিকালে নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে আসিয়া বাস করিত। দারোগাও সেই কারণে ঘাটের চৌকিদার দ্বারা যাত্রিদিগকে সময়শিরে নৌকা লইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেন।

এতাদৃশ সময়ে, পটপূজার বিসর্জ্জনের দিন উপস্থিত হইল। যে সকল স্থানে বহু প্রতিমা হয়, তাহার সর্ব্বত্রই বিসর্জ্জনের দিবস কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে দর্শকদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সমুদয় প্রতিমা আনিয়া একত্রিত করা হয় এবং ইহাকে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রতিমার আড়ঙ্গ কহে। পট-পূজার প্রতিমার আড়ঙ্গ নবদ্বীপের পোড়া-মা তলা, কাঁসারী শড়ক প্রভৃতি স্থানের রাস্তায় বেলা ২॥০ প্রহরের সময় আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যায়। বলিবার আবশ্যক নাই, যে

এই আড়ঙ্গ দেখিতে অধিক ভীড় হয় এবং শান্তি রক্ষার নিমিত্ত পুলিশ কর্ম্মচারিরা তথায় উপস্থিত থাকেন। আমি সেই চিরপ্রথা অনুসারে আমার চারিজন বরকন্দাজ ও কতকগুলি চৌকিদার লইয়া আড়ঙ্গে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে কখনও এই তামাসা দেখি নাই। শান্তিরক্ষার প্রতি আমার যত না দৃষ্টি ছিল, তদপেক্ষা প্রতিমার গঠন ও কারুকার্য্য দেখিতে আমার অধিক মনোযোগ হইল।

এমন সময় আমার সঙ্গী একজন চৌকিদার বলিয়া উঠিল যে " এই দেখুন মনোহর যাইতেছে " এবং পথের যে ধারে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহার বিপরীত দিকে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সে একজনকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ একজন বরকন্দাজ দ্বারা তাহাকে ডাকিয়া আনাইলাম। মনোহর আসিয়া আমাকে নতশিরে দণ্ডবৎ করিল। দেখিলাম, তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; বোধ হয়, আরও সুখ সচ্ছন্দের অবস্থায় তাহা গৌরবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। দেহ মধ্যম ছন্দ, কিন্তু গঠনে প্রচুর বলের আকর দৃষ্ট হইল। অতি প্রশস্ত বক্ষস্থল; পুষ্ট বাহু যুগল; কোমর চিকন; উরু ও তন্নিম্নস্থ অঙ্গদ্বয়ও বলের লক্ষণ বিশিষ্ট; গলদেশ মোটা ও খাটো যাহাকে পারসী ভাষার " কোতা গর্দ্দান " বলে। চক্ষু ছোট, পিট্ পিট্ করিয়া তাকায় এবং আমার বোধ হইল তাহা কিঞ্চিৎ ধূসরবর্ণ কিন্তু চক্ষু ভিন্ন মুখের অন্য কোন অঙ্গ নিন্দনীয় নহে। হঠাৎ দেখিলে মনোহরকে শ্রীযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহার কলুষিত অন্তরের প্রতিভা মুখে বিলক্ষণ ব্যক্ত হইত। কথা কহিতে দেখিলাম, যে তাহার দন্তে মিশির কালিমা আছে এবং উপর পাটির মধ্যস্থিত দন্ত দুইটির প্রত্যেক দন্তে পাশা খেলার পাষ্টিতে যেরূপ গোল ছক্ কাটা থাকে, সেইরূপ এক একটী ছক কাটা রহিয়াছে। পরিধানে একখানা ঢাকাই ধুতি, গায়ে চাদর এবং পায়ে নাগোরা জুতা। তখন ইংরাজী জুতার অধিক চলন ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মনোহরের পায়ে স্প্রিংওয়ালা জুতা দেখিতাম। মনোহরের পরন পরিচ্ছেদে এবং ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইল যে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হওয়া তাহার সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল এবং প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াও অনেকের ভ্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যাটা চুলে ধরা পড়িত; কারণ গোয়ালাদিগের সাধারণ প্রথানুযায়ী তাহার চুল গুচ্ছাকার ছিল।

যে পর্য্যন্ত আমি মনোহরকে চক্ষে দেখি নাই, সে পর্য্যন্ত আমি মনে মনে একটা কিম্ভূত কিমাকার ব্যক্তি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম এবং আরও স্থির করিয়া রাখিয়া রাখিরাছিলাম, যে তাহার সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ হইলে, আমি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিব। কিন্তু তাহাকে দেখিবা মাত্র আমার মনের সেই ভাব দৃঢ় রহিল না; মনে হইল, যে এমন সুপরিচ্ছদ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হঠাৎ বিনা কারণে গালিগালাজ করা কিম্বা অপ্রিয় বাক্য বলা, আমার পক্ষে ভদ্র ব্যবহার হইবে না; অতএব আমি তাহাকে মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করিয়া আমার থানার এলাকার মধ্যে দৌরাত্ম্য না করিতে অনুরোধ করিলাম; তাহাতে সে মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উত্তর করিল, যে তাহার শত্রুরা আমার নিকট তাহার নিন্দা করিয়াছে, সে কোন্ কালে ঘি খাইয়াছিল, তাহার গন্ধ এখনও তাহার হাতে আছে, ফলে সে এখন কোন কুকর্ম্ম করে না। এইরূপ অল্প কয়েকটি কথা কহিয়া সে পুনরায় আমাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। মনোহরকে আমি সহজে ছাড়িয়া দিলাম দেখিয়া, আমার পারিষদগণ আমার প্রতি যারপর নাই বিরক্ত হইল। তাহারা কহিল, যে মনোহর ভাল মানুষের যম এবং তাহার প্রতি আমার এইরূপ শান্ত ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই সে অদ্য রাত্রে; না হয় শীঘ্র, পুনরায় আমাকে কষ্টে ফেলিতে ত্রুটি করিবে না। আমি তাহাদের কথার কোনও উত্তর না দিয়া নবদ্বীপের পুরাতন গঞ্জের ঘাটে যাত্রীদিগের নৌকা সকলের রক্ষার জন্য ঘাটের চৌকীদারকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক থানায় প্রত্যাগমন করিলাম। পথে ভাবিলাম যে অদ্য এবং আর কয়েক রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ রোঁদ পাহারা দিতে আরম্ভ করিব। কিন্তু থানায় সন্ধ্যার পরে পদার্পণ করিবা মাত্রই শুনিলাম, যে বাজারের একটি বেশ্যা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং সেই ঘটনার তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সমাধা করিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে, আমার বাঞ্ছিত চৌকী পাহারা দেওয়া আর সে রাত্রিতে ঘটিয়া উঠিল না। অধিক রাত্রিতে শয়ন করাতে শীঘ্রই অঘোর নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ অবিচ্ছিন্নরূপে নিদ্রা যাইতে পারিলাম না, কারণ শেষ রাত্রিতে আন্দাজ ৩টার সময় আমার শয়ন কক্ষের বাতায়নে কয়েকটি লাঠির আঘাতের শব্দ শুনিয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জিজ্ঞাসা করায় আঘাতকারী কহিল যে সে পুরাতন গঞ্জের চৌকীদার, ঘাটে একটা গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে আমাকে অবগত

করিতে আসিয়াছে। "গোলমাল" ভিন্ন সে আর কোন কথা খুলিয়া না বলাতে, আমার অনুভব হইল যে পুরাতন গঞ্জ পল্লীতেই অনেক যাত্রী আসিয়া বাস করে এবং বোধ হয় তাহাদের আপনাদের মধ্যে কোন বিবাদ হেতু গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া, বিশেষ আমার নিদ্রার তরুণ অবস্থা কাজেই আমি আর তথ্য না লইয়া, থানা হইতে এক জন বরকন্দাজ লইয়া যাইতে চৌকীদারকে আদেশ করিয়া, পুনরায় নিদ্রায় বিহ্বল হইলাম। প্রাতে থানায় যাইয়া যে সংবাদ শুনিলাম, তাহাতে আমি এককালে বুদ্ধি হারা হইলাম। শুনিলাম, যে ঘাট হইতে সন্ধ্যার পরে সকল যাত্রির নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল, কেবল তিন চারি থানা মাল বোঝাই নৌকা ঘাটে ছিল, এবং তাহার সকল নৌকার চড়ন্দার ও অধিকাংশ মাঝি মাল্লা গ্রামের মধ্যে পরিচিত বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে যাইয়া শয়ন করিয়াছিল। এইরূপে কোনও নৌকা জনশূন্য এবং কোনও নৌকায় দুই একজন মাত্র মনুষ্য ছিল। ইহার মধ্যে এক নৌকা জাহাজের তলার পুরাতন তামার চাদরের চালান লইয়া কলিকাতা হইতে ডাঁইহাট মেটিয়ারি গ্রামে যাইতে ছিল। নৌকায় কেবল তিন জন মাল্লা শয়ন করিয়াছিল। দস্যুরা তাহাতে আরোহণ করিয়া রশি কাটিয়া গঙ্গার মধ্যভাগে যাইবার পরে, মাল্লারা বুঝিতে পারিয়া গোলযোগ উপস্থিত করাতে, ডাকাইতেরা তাহাদের সকলকে খুব প্রহার করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া গঙ্গার উত্তর পারে নৌকা লাগাইয়া, ১৪ টা তামার চাদরের বস্তা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। মাল্লা তিন জন সন্তরণ করিয়া পুরাতন গঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হয় এবং প্রাতে ওপার হইতে নৌকা খানা আনয়ন করে। আমি এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত দিবস মনোদুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রহিলাম, এবং লজ্জায় কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলাম না, এবং রামকুমার ও অন্যান্য চৌকীদারের ধিক্কারের আশঙ্কায় আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, আপন কক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। কিন্তু এমন অবস্থায় পুলিশ আমলা কতক্ষণ লুক্কায়িত থাকিতে পারে? ঝটিতি ইহার কিছু বিহিত বিধান করা আবশ্যক দেখিয়া বৈকালে পরামর্শের জন্য তাহাদের সকলকে আহ্বান করিলাম। মন্ত্রণার উপসংহারে স্থিরীকৃত হইল, যে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে আমার মনে যে কণ্টক ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমার পরম শত্রু নিপাতের জন্য পুলিস আমলার প্রচলিত ব্যবহারানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আমিও দেখিলাম, যে মনোহর যে চরিত্রের মনুষ্য, তাহাতে তাহার প্রতি তদ্রূপ কঠিন ব্যবহার না করিলে, আমাদের নিস্তার নাই; তথাপি আমি আমার পরামর্শদাতাদিগের একটি প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। তাহা এই যে, অপহৃত তামার পাতের ন্যায় আরও অনেক তামার চাদর নৌকায় আছে; তাহার কয়েক খানা তামা লইয়া মনোহরের বাড়ীর কোন স্থানে রাত্রিকালে গোপনে রাখিয়া দিবাভাগে তাহা বাহির করিতে পারিলে, তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে আমাদের কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। এই প্রস্তাব ভিন্ন আমি রামকুমার চৌকীদারের অন্যান্য সকল কথা গ্রহণ করিলাম। যদিও মনোহরকে এই ডাঁকাইতি করিতে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী চক্ষে দেখে নাই এবং নৌকায় যে তিনজন নাবিককে মনোহর প্রহার করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহারাও কোন্ ব্যক্তি মনোহর চেনে না, তথাপি থানার প্রথম রির্পোটে তাহার নাম ব্যক্ত থাকা আবশ্যক বিবেচনায়, আমি ঘটনা স্থলের চৌকীদারের নিকট, এই মর্ম্মে এক এজাহার লইলাম, যে সে মনোহরকে নৌকা আক্রমণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। চৌকীদারের এই এজাহার ভিত্তি করিয়া আমি শান্তিপুরের ডিপুটী বাবুর ও কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া মনোহরকে ধৃত করিবার উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম, যে চরমে মনোহরকে সম্পূর্ণরূপে অপরাধী করিতে না পারিলেও, যদি তাহাকে আমি থানায় আনিয়া কিঞ্চিৎ প্রহার দিয়া শান্তিপুর কিম্বা কৃষ্ণনগর প্রেরণ করিতে পারি, তাহা হইলেও আমার মনস্কামনা অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইবে; কারণ আমি জানিতাম যে ঈশ্বর বাবু এবং মণ্ট্রেশর সাহেব উভয়েই এমন কৌশলী এবং দুষ্ট দমন পক্ষে এমন উদ্যমশীল, যে মনোহর একবার এই উপলক্ষে তাহাদের হস্তে অর্পিত হইলে, শীঘ্র অব্যাহতি পাইবে না এবং আর কিছু না হইলেও দীর্ঘকাল হাজতে ক্লেশ পাইবে এবং তাহা হইলে আমরা অন্তত সেই কাল পর্য্যন্ত শান্তিভোগ করিতে পারিব এবং মনোহরও কিছু শিক্ষা পাইয়া আসিবে।

এই রূপ অবধারণ করিয়া অনুন ৫০ জন উৎকৃষ্ট চৌকিদার লইয়া ঘটনার তৃতীয় রাত্রিতে, রাত্রি অনুমান তিন প্রহরের সময়, মনোহরকে ধৃত করিতে থানা হইতে যাত্রা করিলাম। নৈশ গগনের তিমিরাচ্ছাদন দূরীভূত হওয়ায় প্রভাতের চিহ্ন কেবল মাত্র দেখা যায়, এমন সময় আমরা মনোহরের গ্রামের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রহরী স্বরূপে আমায় পালকির পার্শ্বে

যে এক জন বরকন্দাজ যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, যে "দেখুন মহাশয় সম্মুখস্থিত পথের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে একটা শৃগাল যাইতেছে, দেখিয়া প্রণাম করুন নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।" ইংরাজি পড়িয়া যাত্রার শুভাশুভ চিহ্ন সকল অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়ালিাম, তথাপি মনুষ্যের মনে স্বকাম সিদ্ধির জন্য স্বভাবত এমনই আকিঞ্চন এবং আগ্রহ, যে "মঙ্গল হইবে" বাক্য কর্ণ কুহরে প্রবেশ করা মাত্রই আমি উঠিয়া বসিলাম এবং পালকির শাশির মধ্যে দিয়া দৃষ্টি করাতে, যথার্থই একটা শৃগাল আমাদের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। "বামে শব শিবা নারী" ইত্যাদি বচনটা মনে পড়িল, কিন্তু শৃগালকে প্রণাম করিলাম না, কেবল বরকন্দাজকে বলিলাম, "দেখা যাইবে কেমন মঙ্গল হয়।" ক্ষণেক পরেই বেহারা আমাকে একটা বাড়ীতে নামাইয়া দিল। যে কিঞ্চিৎ আলোক বিকশিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলাম, যে বাড়ীতে তিন চারি খানা অনুচ্চ ছোট চালা ঘর এবং চতুর্দ্দিক জঙ্গলে আবৃত; উঠানের মধ্য খানে একটা ঢেঁকি স্থাপিত রহিয়াছে। ইতি মধ্যে রামকুমার চৌকিদার আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, যে এই মনোহরের বাড়ী কিন্তু সে কোন্ ঘরে শয়ন করে, তাহা আমি জানি না। সেই সংবাদ আমরা এক জন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট অবগত হইলাম। অমনি সকলে লম্ফ দিয়া সেই ঘরের দিকে ধাবমান হইয়া উচ্চ স্বরে "খোল্ খোল্" বলিয়া দ্বারের কবাটে লাথি ও ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিল। মনোহর নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতে ছিল এবং তাহার মস্তকে যে এই বিপদ পড়িবে তাহা সে মনেও ভাবে নাই, ভাবিলে বোধ হয়, আমরা বাড়ীতে তাহার দেখা পাইতাম না। মনোহর শশব্যস্তে দ্বার খুলিবামাত্র কতক গুলি চৌকিদার একত্রে, ঝড়ের বেগে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মনোহরকে কেহ চুলে, কেহ হস্তে, কেহ পদ দেশে ধরিয়া প্রহার করিতে করিতে শূন্য ভাবে তাহাকে উঠানে আনিয়া ফেলিল, কিন্তু প্রহার থামিল না। তাহার লম্বা চুলে ধরিয়া মাটির মধ্যে তাহাকে কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরাইতে লাগিল এবং যাহার যে ইচ্ছা সে সেইরূপ তাহার শরীরে আঘাত করিল। আমি বোধ করি যে আমরা মনোহরকে নিদ্রিত অবস্থায় এবং অপ্রস্তুত ভাবে পাইয়াছিলাম বলিয়াই চৌকিদারেরা তাহাকে এই রূপ লাঞ্ছনা করিতে ক্ষমবান হইয়াছিল, নচেৎ তাহার হস্তে লাঠী থাকিলে এবং অনাবৃত স্থান পাইলে মনোহর আমাদিগকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাইতে

পারিত। যাহা হউক, আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইলাম। আমার বোধ হইল, যে আর কিছুক্ষণ তাহার উপরে এই রূপ নির্দ্দয় আঘাত করিলে, তাহার প্রাণে বাঁচা কঠিন হইবে সুতরাং হিতে বিপরীত হইয়া উঠিবে। এই বিবেচনায় আমি আমার সঙ্গীগণকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলাম কিন্তু তাহারা সকলে এক মুখে বলিয়া উঠিল যে "আমরা আপনার কথা শুনিব না। মনোহরকে মারিয়া আমরা ফাঁসী যাইব। ও ব্যাটা আমাদের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ না পাইয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না। উহাকে আমরা কখনও পাই নাই, আজ ভাগ্য বলে পাইয়াছি, কখনও ছাড়িব না।" আমি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে অবশেষে ক্ষান্ত করিতে পারিলাম।

এই সময় মনোহরের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল তাহার মস্তকের সুন্দর লম্বা কেশ ও পরিধানের নূতন বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, সমস্ত শরীর ধূলী লুণ্ঠিত, প্রহারের আঘাতে অনেক স্থানের চর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, রক্তও পড়িতেছে এবং ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত এক গণ্ডূষ জল অতি কষ্টে চাহিতে পারিল। এই দুরাবস্থায়ও তাহাকে অবশেষে উঠানের মধ্যস্থিত ঢেকির সঙ্গে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়া অপহৃত দ্রব্য সমস্তের অনুসন্ধানে তাহার ঘর বাড়ী বিচয়ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং পূর্ব্ব স্থলীর থানায় রীতি মত সংবাদ দিয়া সহায়তার নিমিত্ত যাচঞা করিয়া পাঠাইলাম। আমরা মনোহরের গৃহ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে অন্বেষণ করিয়া মালের কোনও ঠিকানা পাইলাম না। কেনই বা পাইব? মনোহর এমন আনাড়িপক্ক চোর নহে, যে সে তাহার অপহৃত দ্রব্য সমস্ত ঘটনার অল্প কাল মধ্যে তাহার নিজ গৃহে কিম্বা গৃহের নিকট কোনও স্থানে রাখিবে। আমি অনভিজ্ঞ দারোগা, মনোহরের খানাতল্লাসী করিয়াছিলাম, অন্য এক জন কর্ম্মক্ষম পুলিস আমলা হইলে, সে কখনই এই রূপ বৃথা খানাতল্লাসী করা আবশ্যক বিবেচনা করিত না। বিফল খানাতল্লাসী করিয়া কত ক্ষণ পরে আমি পুনরায় যে স্থানে মনোহর বন্দী ছিল, সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম যে পূর্ব্বস্থলী থানার জমাদার আমার প্রেরিত সংবাদ মতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই জমাদার এক জন আদর্শ পূর্ব্ব পুলিস আমলা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীর্ঘ কায়, স্থূলাকায় খোট্টা। গৌর বর্ণ, আকার্ণ ব্যাপ্ত গুম্ফ,

এবং তদুপযুক্ত গালপাট্টা। পায়ে নাগরা জুতা, পরিধানে আঁটা কাছা বিশিষ্ট নব ধৌত পাইড়দার ধুতি, গায়ে খোট্টাই আঙ্গরাখা এবং মস্তকে একটি কাপড়ের শাদা টুপি। দীর্ঘ কাল যাবৎ বঙ্গ দেশে আসিয়া প্রথমে দ্বারবান্ পরে থানায় বরকন্দাজ এবং অবশেষে জমাদার হইয়া আধো আরো বাঙ্গালা ভাষা কহিতে শিখিয়াছে, কিন্তু দন্ত্য সয়ের উচিত উচ্চারণ রহিয়া গিয়াছে। গরিব দুঃখীর, বিশেষ ভদ্র লোকের যম, কিন্তু মনোহরের ন্যায় দুগ্ধ-প্রদ চোর ডাকাইত তাহার স্নেহের পাত্র। পুলিষের কার্য্যে মূর্খ হইলেও ধনোপার্জ্জন বিদ্যায় সুপণ্ডিত। দুই চারি কথায় আমাকে সম্বোধন করিয়া জমাদার মনোহরের নিকট গমন করিল এবং মনোহর যে ঢেঁকিতে বাঁধা ছিল, তাহার ধুলা এক জন চৌকিদারের বস্ত্র দ্বারা পরিস্কার করত, মনোহরের পার্শ্বে ঢেকির উপরে উপবিষ্ট হইল। মনোহরের অবস্থা দেখিয়া মনোহরকে শুনাইয়া অনেক আক্ষেপ করিবার পরে, মনোহর সম্বন্ধে সে যাহা বলিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, মনোহর মন্দ চরিত্রের মানুষ নহে এবং পুব্ধুলের থানায় তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ করে নাই। জমাদারের বিশ্বাস এই যে, মনোহর ডাকাইতি করিয়া থাকিলে সে তাহা গোপন করিবে না, অতএব তাহার বন্ধন মোচন করিতে জমাদার অনুরোধ করিল। কিন্তু আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করাতে, সে বিরক্ত হইয়া, আমি ছোকরা দারোগা, পুলিসের কার্য্য জানি না, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

জমাদার চলিয়া যাওয়ার পর ক্ষণেই রামকুমার চৌকিদার আমাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া অনতিদূরে এক নির্জ্জন স্থানে এক অর্দ্ধ বয়স্ক মনুষ্যের নিকট উপস্থিত করিল এবং বলিল যে "এই ব্যক্তির নাম হলধর ঘোষ, মনোহরের মাতুল, আপনি যদি অভয় প্রদান করেন এবং বলেন, যে ইহাকে রক্ষা করিবেন, তাহা হইলে সে এই ডাকাইতির সমুদায় বৃত্তান্ত আপনার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিবে।" অমৃতে কাহার অরুচি? আমি তৎক্ষণাৎ হলধরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলাম; যে যদি সে অপহৃত মালের সন্ধান করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহতি দিব। হলধর আমার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যক্ত করিল যে;—

"পট পূজার বিসর্জ্জন দেখিতে যাইয়া মনোহর নবদ্বীপের ঘাটে কৃষ্ণনগরের বেশ্যাদিগের দুই তিন খানা নৌকা দেখিয়াছিল এবং তাহা লুট করি-

বার অভিলাষে নিজগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমি (হলধর) এবং অন্য ৮ ব্যক্তিকে সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধ রাত্রের পরে, সকলে গঙ্গার কাছাড়ের ছায়া অবলম্বন করিয়া, লোকে দেখিতে না পায় এমন ভাবে, পুরাতন গঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, যে সকল নৌকা আক্রমণ করার নিমিত্ত তাহারা আশা করিয়া আসিয়াছিল, তাহার এক খানাও সেইস্থানে নাই; তাহাতে মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সম্মুখস্থ প্রথম বোঝাই নৌকায় প্রবেশ করিল এবং নাবিকদিগকে মধ্যগঙ্গায় ফেলিয়া ওপারে যাইয়া, তামার বস্তা সকল নৌকা হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু বস্তাগুলি অতিশয় ভারী দুইজন বলবান মনুষ্য না হইলে একটি বস্তা নাড়িতে পারিবে না দেখিয়া মনোহর নৌকা হইতে চরে নামিল এবং তথায় ইতস্তত করিয়া অল্পদূরে এক খানা ধীবরের খালি নৌকা দেখিয়া, তাহা বোঝাই নৌকার সন্নিধানে আনয়ন করত, তাহাতে ১৪ খানা বস্তা ও একটা বৈটা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্বস্থলী গ্রামাভিমুখে চালাইতে লাগিল। কিন্তু বাঞ্ছিত স্থানে পৌহুঁছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে রাত্রিশেষ হওয়ার লক্ষণ দেখিয়া, নদীর ধারে চরের উপরে এক জঙ্গলাবৃত নিভৃত স্থানে আমরা অনেক কষ্টে অপহৃত বস্তগুলি উঠাইয়া গোপন করিয়া রাখিলাম এবং খালি নৌকায় আমাদের গ্রামের নিকট উত্তরণ করিয়া নৌকা খানা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলাম। পর দিবস সন্ধ্যার পর, মনোহর তাহার একজন পরিচিত ব্যক্তির নৌকা সংগ্রহ করিয়া, পুনরায় আমাদের সকলকে লইয়া সেই গোপনীয় স্থান হইতে অপহৃত বস্তাগুলি নৌকায় উঠাইয়া পূর্ব্বস্থলীর এক ঘাটে উপস্থিত হইল এবং তথা হইতে আমরা দুই দুই জনে এক একটা বস্তা মাথায় করিয়া, গোপাল পোদ্দার নামক একজন স্বুবর্ণবণিকের বাটীতে পৌছাইয়া দিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম। গোপাল পোদ্দার মনোহরের "থাঙ্গিদার"। মনোহর যখন যে খানে যাহা অপহরণ করে তাহা গোপাল পোদ্দারের নিকট লইয়া যায় এবং গোপাল তাহার বিনিময়ে মনোহরকে নির্দ্ধারিত হারে টাকা দেয়। আমরা গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে মাল উঠাইয়া দিয়াছি কিন্তু কে তাহা লইয়া কি করিয়াছে, কিম্বা কোন্ স্থানে রাখিয়াছে, তাহা আমি এক্ষণে নিশ্চয় বলিতে পারি না, আপনি সেই বাড়ীতে তল্লাস করিলেই পাইতে পারিবেন" ভিন্ন গ্রাম হইতে পটপূজার তামাসা দেখিতে আমাদের তিনজন কুটুম্ব আসিয়াছিল তাহারাও আমাদের সঙ্গে ডাকাইতি করিতে গিয়াছিল এবং মনোহরের

নিকট অপহৃত মালের অংশ পাওয়ার লোভে তাহারা এখনও মনোহরের বাড়ীতে আছে, তাহাদিগকে আমার সম্মুখে আনিলে, তাহাদের দ্বারা আমি একরর করাইয়া দিতে পারিব কিন্তু আমার নিজের কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে দিব না।”

মনোহরের বাড়ীর অন্য এক ঘরে প্রথমেই চৌকীদারেরা দুই ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদিগকে হলধরের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র তাহারা স্বচ্ছন্দে হলধরের বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্ত দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে লিখাইয়া দিল, কিন্তু বলিল যে, তাহারা গোপাল পোদ্দারের বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারিবে না, কারণ তাহারা পূর্ব্বে কখনও পূর্ব্বস্থলীতে আসে নাই, সুতরাং পথ ঘাট চিনে না। এমতাবস্থায় হলধর নিজেই গোপাল পোদ্দারের বাড়ী দেখাইয়া দিতে আমাদের সঙ্গে চলিল।

মনোহর যে স্থানে আবদ্ধ ছিল, সেইস্থানে তাহাকে ও তাহার কুটুম্ব দ্বয়কে উচিত প্রহরীর জেম্মায় রাখিয়া, আমরা সকলে গোপাল পোদ্দারের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। মনোহরের বাড়ী হইতে গোপাল পোদ্দারের বাড়ী যাইতে পূর্ব্বস্থলীর থানার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। সেইখানে দেখিলাম, যে পথের ধারে থানার দারোগা একটি রূপা বান্ধান হুকা হাতে করিয়া কয়েক জন লোক সঙ্গে (বোধ হয়, আমাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া) আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্ত তিনি অনেক আকিঞ্চন করিলেন কিন্তু আমি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আমার লক্ষিত স্থানাভিমুখে ধাবমান হইলাম।

থানা হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে হলধর একটি বাড়ীর সম্মুখে আমাদিগকে আনিয়া তাহা গোপাল পোদ্দারের বাড়ী বলিয়া দেখাইয়া দিল। দেখিলাম, ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী; বাহিরে একটি একতালা ঘরে বস্ত্রের একখানি দোকান আছে। অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। চতুর্দ্দিকে দ্বিতল চক মিলান কোঠা, নিম্ন তালার সম্মুখে এক উচ্চ প্রশস্ত দৌড়দার রোয়াক এবং সমস্ত উঠান টালীদ্বারা আচ্ছাদিত। উচ্চ শ্রেণীর একজন গৃহস্থের বাড়ী বোধ হইল। এমন বিত্তশালী ব্যক্তি চোরা মালের কারবারে লিপ্ত থাকিবে, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলামনা; প্রত্যুত ইহাও ভাবিলাম, যে হয়ত এই ঘৃণিত ব্যবসাই গোপালের ধনের

মূল। যাহা হউক মনে বড়ই সন্দেহ হইল।' কিন্তু যে স্থলে একজন চোর তাহার নাম উচ্চারণ করিয়াছে এবং সেই কথায় আমি তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি, তখন দেখিলাম যে আইন অনুসারে তাহার খানাতল্লাশী না করিলে আর উপায় নাই।

আমি প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কয়েকবার গোপাল পোদ্দারের নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিলাম। কিন্তু কাহারও কোন উত্তর পাইলাম না। বাড়ী জনশূন্য বোধ হইল। অতএব অল্পক্ষণ বিলম্ব করিয়া গ্রামের তিন জন প্রজা আনাইয়া আমি গোপাল পোদ্দারের খানাতল্লাসী করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিবেচনা করিলাম, যে এই কার্য্যে আমার সঙ্গী সকলকে অনুমতি করিলে গৃহস্থিত অনেক মূল্যবান দ্রব্যের অপচয় হইবে, অতএব সকলকেই উঠান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া কেবল জমাদার ও ছিক্ক চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া, আমি প্রথমে নিম্ন তালার কুঠরী সমস্ত পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে যে ঘরে প্রবেশ করিলাম, তাহাতে দেখিলাম যে ঘরের অর্দ্ধখণ্ড ব্যাপিয়া প্রায় ছাদ পর্য্যন্ত খড়ের পোয়াল স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং অপর পার্শ্বের এক কোণে কয়েকটি স্ত্রীলোক একত্রে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা দৃষ্টে স্ত্রীলোককে সম্মান করিতে শিখিয়াছিলাম। স্ত্রীলোক, বিশেষ এমন শঙ্কাযুক্ত অবস্থায় স্ত্রীলোক গুলিকে দেখিয়া আমি এককালে দ্রব হইয়া পড়িলাম এবং তাহাদের শঙ্কা দূর করিবার মানসে আমি তাহাদিগকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া করুণ বাক্যে বলিলাম, যে আমি কেবল চোরা দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি স্ত্রীলোক কিম্বা নির্দোষ মনুষ্যের প্রতি অত্যাচার করিতে আসি নাই, অতএব তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউন, তাঁহাদিগের প্রতি কাহাকেও কোন কুব্যবহার করিতে, এমন কি এই ঘরের মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিব না। এইরূপ বক্তৃতা ঝাড়িয়া, আমি ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং কবাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সকলকে তাহার মধ্যে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলাম। আমি যেমন বর্ব্বর, তেমনই নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিলাম। বেণের মেয়েরা যে সেই স্থানে চোরা মালের প্রহরী স্বরূপে বসিয়া আছে, তাহা আমার "শিক্ষা বিভ্রাটের" ফলে, মনে উদয় হইল না। অবলা নারী দেখিয়া কেবল তাহাদের মঙ্গল কামনাতেই আমার চিত্ত ব্যাপৃত রহিল; প্রতিকূল চিন্তা কিম্বা

সন্দেহ আসিয়া প্রবেশ করিতে তাহাতে স্থান পাইল না। এক্ষণে তাই ভাবি, যে যদি তখন রামকুমার কিম্বা ছিরু চৌকিদার সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে সেই দিবস আমার নাক কাণ রাখিয়া আসিতে হইত।

এইরূপে আমি নীচের সকল ঘর অন্বেষণ করিয়া কোন স্থানে আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলাম না। হতাশ চিত্তে ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে পাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া আলোক-শূন্য একটা প্রাচীরের গায়ে একটা ছোট দ্বার দেখিলাম। আমার সঙ্গী ছিরু চৌকিদার তাহা হস্ত দ্বারা ঠেলিয়া খোলাতে তন্মধ্যে একটা অন্ধকার চোরকুঠারী আবিষ্কৃত হইল। ছিরু এই কুঠারীর মধ্যে তাহার হস্তস্থিত একটা শড়কী চালাইয়া দেওয়াতে "মারিও না আমি বাহিরে যাইতেছি" বলিয়া এক ক্ষুদ্রকায় মনুষ্য বাহির হইয়া লম্ফ দিয়া ভূমিতে নামিল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে গোপাল পোদ্দার বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আমি তাহার দক্ষিণ হস্তখানা ধরিলাম, ধরিয়া বোধ হইল যে তাহার শোণিত জ্বর বিকার গ্রস্ত রোগীর শিরার রক্তের ন্যায় দ্রুত বেগে বহিতেছে এবং গাত্রের চর্ম্মও সেই রূপ উত্তপ্ত এবং আতঙ্কে শরীর কম্পিত হইতেছে। আমি তাহাকে প্রহার করিব না বলিয়া অভয় প্রদান করত বাহিরে আসিলাম। গোপাল পোদ্দার হ্রস্বচ্ছন্দ মনুষ্য, ফুট গৌর বর্ণ তাহার হস্ত পদের গঠন সুন্দর এবং মুখশ্রীও উত্তম। যদিও কৃশ তথাপি তাহার অস্থি ও শিরা সকল অদৃশ্য। বয়স চল্লিসের উর্দ্ধ নহে। সাহাস্য বদন। এমন ঘোর বিপদের সময়ও সে হাস্য বদনে আমার প্রশ্ন সমস্তের উত্তর দিয়াছিল। জিজ্ঞাসা মতে কহিল, যে সে আমাদের আগমনে ভয়ে চোর কুঠরীর মধ্যে পলাইয়া রহিয়াছিল। কিন্তু অপহৃত মাল সম্বন্ধে সে এমন কথা মুক্ত কণ্ঠে অস্বীকার করিল না, যে তাহার গৃহে নাই। সে যে কয়েকটি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। তাহা এই যে "আমার ঘরে ত অনেক প্রকার দ্রব্য আছে, তল্লাস করিয়া দেখুন, যদি তাহার মধ্যে আপনার কোন জিনিস হয়, তবে আর আমার বলিবার কি আছে?" চোরা মাল নাই বলিয়া সে মুখ তুলিয়া আমাকে বলিতে পারিল না। পোদ্দারের কথার ভাবে আমার কিঞ্চিৎ আশার উদয় হইল এবং দ্বিতলের কক্ষ গুলি দৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। সেখানেও যাহা দেখিলাম, তাহাতে গোপাল পোদ্দার ও তাহার

পরিজনের উপর আমার শ্রদ্ধার আধিক্য হইল। সকল ঘরের দ্রব্য জাত সুন্দর রূপে সজ্জিত। কাষ্ঠের এবং ধাতুর তৈজস সমস্ত মার্জ্জিত এবং ঝক্ ঝক্ করিতেছে। যেখানে যে দ্রব্য রাখা উচিত, তাহা সেই স্থানে রাখা হইয়াছে এবং কোনও ঘরে কোনও অপবিত্র জিনিস নাই। এক ঘরেও এক জোড়া বিনামা দেখিতে পাইলাম না; বোধ করি, তাহা অপবিত্র বলিয়া ঘরে স্থান পায় নাই। গোপালের শয়ন কক্ষের প্রবেশ দ্বারের উপরে প্রভু নিতাই চৈতন্যের এক পট এবং তাহার নিম্নে হরিনামের মালায় কারু কার্য্য শোভিত সাটিনের একটি কুথলী ঝুলিতেছে। এই সকল দেখিয়া বোধ করিলাম যে পোদ্দারেরা পরম বৈষ্ণব। সকল ঘর বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোন ঘরেই আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলাম না। তাহাতে মনোভঙ্গ হইয়া নীচে আসিলাম এবং একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া গোপাল যে চোর কুঠরী হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে ছিরু চৌকিদারকে উঠাইয়াদিলাম। সেখানেও কিছু পাওয়া গেল না। অবশেষে হিতান্ত হতাশ হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে করিতে রান্না ঘরের পার্শ্বে একটা অন্ধকার ঘর দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সেই ঘরে ঐ এক দ্বার ভিন্ন অন্য দ্বার কিম্বা বাতায়ন ছিল না। ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার। আমাদের হস্তে প্রদীপ না থাকিলে বোধ করি তাহার মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি ভালরূপে দেখিতে পাইতাম না। প্রদীপের আলোতে দেখিলাম যে এক প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানা তক্তা হেলাইয়া রাখা হইয়াছে। আমরা দুই জনে সেই তক্তার নিকট দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে ছিলাম; ছিরু অন্যমনস্কে তাহার হস্তের শড়কীর মাথা এক স্থানে দুই তক্তার মধ্যস্থিত ছিদ্রের ভিতর চালাইয়া দেওয়াতে তাহা কিঞ্চিৎদূর যাইয়া একটা দ্রব্যে ঠেকিয়া ঝন্ করিয়া উঠিল। ছিরু অমনি আমার হস্তে প্রদীপ দিয়া, একখানা তক্তা টানিয়া অপসারিত করিল এবং তাহার মধ্যে তক্তা দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েকটা বস্তা উপর্যুপরি সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ উভয়ে আহ্লাদ ভরে "পেয়েছি, পেয়েছি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঠিক সেই একই সময়ে রামকুমার চৌকিদার ঐরূপ শব্দে চীৎকার করিয়া আর এক ঘর হইতে আমাদের নিকট ধাবমান হইতেছিল। রামকুমারের লাম্পট্য দোষ ছিল, সে বেনেদের স্ত্রীলোকেরা

সুন্দরী শুনিয়া, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া অবশেষে আমি যে ঘরে স্ত্রীলোকদিগকে রাখিয়া কবাট বন্ধ করিয়া আসিয়াছিলাম, সেই ঘরে "মাল" আছে বলিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। কুরুচির ভাষায় সুন্দরী স্ত্রীলোককে "মাল" বলিয়া উক্ত হয়। রামকুমার মাল দেখিবার জন্য সজোরে কবাট ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র স্ত্রীলোকেরা তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রাসে জড়সড় হইয়া কক্ষ মধ্যস্থিত খড়ের পোয়ালের স্তূপের উপর পড়িয়া গেল এবং তাহাতে আল্‌গা পোয়ালগুলি শর্ শর্ শব্দ করিয়া স্থানভ্রষ্ট হওয়াতে, তাহার মধ্যে আমার আবিষ্কৃত বস্তার ন্যায় কয়েকটা বস্তা ব্যক্ত হইল। আমাদের বাঞ্ছিত দুর্ল্লভ "মাল" দেখিয়া রামকুমার নৃত্য করিতে করিতে আমার নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে উপস্থিত হইল এবং আমার সংবাদও অবগত হইয়া, আহ্লাদে মত্ত হইয়া আমাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। প্রাঙ্গনের চৌকিদারেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কেহ আবিষ্কৃত দ্রব্যের ঘরে কেহ রামকুমারের ঘরে, প্রবেশ করিয়া দুই তিন জনে এক একটা বস্তা টানিয়া রোয়াকে আনিল এবং সেই থান হইতে উঠানে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উঠানের শানের উপর প্রত্যেক বস্তার আঘাতে ঝন্ করিয়া শব্দ হইল এবং সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ৫০ জন চৌকিদারের উল্লাসোত্তেজিত কণ্ঠ হইতে এককালে এক একটা জয়ধ্বনি উঠিল। এমন এক বার নহে। রামে এক, রামে দুই, রামে তিন করিয়া চৌদ্দ খানা বস্তার চৌদ্দটা ঝনাৎ শব্দে মিলিত হইয়া চৌদ্দ বার জয়ধ্বনি গগনে উঠিল। গগনে উঠিল, পোদ্দারের ইষ্টক নির্ম্মিত চারি চক ভেদ করিয়া গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া ধাবমান হইল। অধিবাসীরা প্রথমে ত্রাস যুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে চোরা মাল ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া তাহাদের মনে আনন্দোদ্ভব হইল। ক্রমে দুই এক জন করিয়া এত অধিক লোক উপস্থিত হইল যে, অবশেষে প্রাঙ্গনে তাহাদের স্থানাভাব হইয়া পড়িল। কিন্তু কি দর্শক, কি আমার সঙ্গী চৌকিদার, সকলই আহ্লাদে প্রফুল্ল। বিশেষ রামকুমার চৌকিদার। সে ইহার মধ্যে কি প্রকারে বলিতে পারি না, এক ছিলাম গাঁজা টানিয়া আসিয়া, আমাকে বলপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে উঠাইয়া মুখে "ওমা দিগম্বরী নাচো গো" গীত গাইতে গাইতে সকল চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া অপহৃত বস্তাগুলি কয়েক বার প্রদক্ষিণ করিল।

এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কাহারও ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয় নাই, কিন্তু নৃত্যের পরক্ষণেই সকলের পেটের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল এবং আমি তাহা শুনিয়া আহারীয় দ্রব্যের জন্য রামকুমারের হস্তে চারি টাকা প্রদান করিলাম। সে টাকা লইয়া বাজারে গেল কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বাজারের কয়েকজন দোকানদারদার সমভিব্যহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানাইল যে, মনোহরকে ধৃত করাতে এবং গোপাল পেদ্দারের বাড়ীতে চোরা মাল বাহির হওয়াতে বাজারের দোকানী পসারীরা অত্যন্ত উপকার বোধ করিয়াছে, অতএব আমি অনুমতি করিলে, তাহারা কৃতজ্ঞচিত্তে বিনা মূল্যে আমার সঙ্গীগণকে জলখাবার দিতে প্রস্তুত আছে। আমি সম্মত হইলাম এরং চৌকিদারেরা সকলে আহার করিতে গমন করিল। তখন আমি গোপাল পোদ্দারের জবাব লিপি বদ্ধ করিলাম। সে কহিল ডাকাইতির কথা সে কিছুই অবগত নহে, কিন্তু মনোহর এই চৌদ্দটা বস্তা বিক্রয় করাতে, সে তাহার মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিয়াছে। ইহার পরক্ষণেই পূর্ব্বস্থলীর থানার সেই জমাদার পুনরায় আমার নিকট আসিয়া আমাকে এক নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া লইয়া বলিল যে "আপনি ত আপনার কার্য্য বেশ হাসিল করিয়াছেন, মনোহরকে ধরিয়াছেন এবং মালও বাহির করিয়াছেন, এখন ইচ্ছা করিলে কিছু টাকাও পাইতে পারেন। আপনি যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে এই সকল বস্তাগুলি গোপালের বাড়ীর মধ্যে পান নাই তাহার পিছাড়ার বাগিচার মধ্যে পাইয়াছেন, তাহা হইলে গোপালের পুত্র আপনাকে দুই হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছে"। ইহা শুনিয়া আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করা উচিত বিবেচনা করিলাম না। —

চৌকিদারেরা আহার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে শুনিলাম যে, আমাদের আহ্লাদের গোলমালের সময় হলধর পলায়ন করিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলাম যে, হলধর কর্ত্তৃকই আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি অধিকন্তু তাহাকে নিষ্কৃতি দিব বলিয়া আমি তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম এবং আবশ্যক হইলে যখন ইচ্ছা তাহাকে ধৃত করিতে পারিব, এমনাবস্থায় আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কার্য্য না করিরা নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলাম।

তিনখানা শকটে বস্তাগুলি উঠাইয়া এবং মনোহর ও তাহার দুইজন সঙ্গী ও গোপাল পোদ্দারকে লইয়া আমরা সকলে নবদ্বীপাভিমুখে

যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বস্থলীর থানার সম্মুখে আসিয়া শুনিলাম যে দারোগা এবং তাহার অধীনস্থ আমলারা কেহ থানায় নাই; বোধ করি, তাহারা থানার নিকট হইতে অন্য জেলার দারোগা আসিয়া চোরা মাল ধরিয়া লইয়া যাওয়াতে লজ্জা বিবেচনা করিয়া আমার সহিত দেখা করিল না। পথিমধ্যে দেখিলাম যে গ্রামের অধিবাসীগণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অনেকে বিশেষ ব্রাহ্মণেরা আমার মস্তকে যজ্ঞোপবীত ছোঁয়াইয়া আশীর্ব্বাদে করিলেন এবং সকলে বলিল "যেন ঢোড়া না হয়, এই দুরাত্মারা গ্রামে যেন আর ফিরিয়া আসিতে না পারে"। ইহাতেই প্রতীয়মান হইল যে মনোহরের দৌরাত্মে গ্রামস্থ সকল লোক জ্বালাতন হইয়াছিল; নচেৎ সে ধৃত হওয়াতে সর্ব্বজনের মনে কেন অসীম আহ্লাদ হইবে এবং সে ফিরিয়া আসিতে না পারে তাহার নিমিত্ত কেনই বা সকলে এমন আকিঞ্চন প্রকাশ করিবে?

অতঃপর আমরা দিবা অবসান সময় নবদ্বীপ পৌহুছিলাম। সেস্থানেও মনোহরকে দেখিবার নিমিত্ত দুই দিবস পর্য্যন্ত বহু জনতা হইয়াছিল। নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি, খ্যাতনামা ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব, রত্ন বিশেষ কিন্তু স্বল্পায়ু গোলোক নাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অধ্যাপক মহাশয়েরা, যাঁহারা কখনও থানার ত্রিসীমায় আইসেন নাই, তাঁহারাও সেই দিবস মনোহর ও গোপাল পোদ্দারকে দেখিবার নিমিত্ত থানায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।

তদনন্তর উচিত সময়ে দস্যুগণ অপহৃত দ্রব্য সহিত শান্তিপুর এবং অবশেষে দাওরার বিচারের নিমিত্ত কৃষ্ণনগর প্রেরিত হইল। জজ ব্রাউন সাহেব মনোহরকে চির নির্ব্বাসনের ও তাহার দুই জন সঙ্গীকে চৌদ্দ চৌদ্দ বৎসরের ও গোপাল পোদ্দারকে দশবৎসরের কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং সদর নেজামত আদালতেও সেই দণ্ডাজ্ঞা স্থির রহিল। এই রূপে নবদ্বীপ অঞ্চলের শান্তির কণ্টক নির্ম্মূল হইল এবং আমার তিন শত টাকা পুরস্কার ও পঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি ও সদর থানায় বদলি হইল।

কিন্তু মনোহরের কীর্ত্তি এখনও সমাপ্ত হইল না। আরও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে।

সদর নিজামতের হুকুম আসার পর রীত্যনুসারে মনোহর আলিপুরের জেলখানায় প্রেরিত হয় ও তথা হইতে কয়েক মাস পরে ৫০ | ৬০ জন

পঞ্জাবী ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দায়মালী কয়েদির সঙ্গে, নির্ব্বাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মদেশের থায়েটমিউ নগরে ক্ল্যারিসা নামক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্র মধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কারাবাসীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক বিপ্লব উপস্থিত করে এবং জাহাজের কাপ্তান ও অন্যান্য সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া বধ করে; কেবল জাহাজ চালাইবার নিমিত্ত কয়েকজন দেশী খালাসীর প্রাণ রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে ভিন্ন রাজার রাজ্যে জাহাজ চালাইতে আদেশ করে। কিন্তু বিদ্রোহীদিগের দুর্ভাগ্যবশত এক রণতরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, সেই মানওয়ারের কাপ্তেন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া অকয়েব্ বন্দরে লইয়া যায় এবং তথায় মনোহর প্রভৃতির বিচার হইয়া ফাঁসী হয়।

নির্ব্বোধের উক্তি।

বুদ্ধিমন্ত লোকেই বরাবর লিখিয়া আসিতেছেন। পড়িতেও বুদ্ধিমন্ত লোকেই পড়িয়া থাকেন। আমি কিন্তু নির্ব্বোধ, অথচ দুটা কথা লিখিবার সাধও বিলক্ষণ হইয়াছে। বুদ্ধিমন্ত পাঠক সম্প্রদায় "নবজীবনের" কল্যাণে এই এক নূতন রস পাইয়াও ইহার আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবেন, এমন ত বিশ্বাস হয় না। অতএব, লেখা যাউক।

ইংরেজের আমলদারি যত বাড়িতেছে, বুদ্ধিমন্ত লোকের সংখ্যা ততই কিম্বা তাহা অপেক্ষা বেশী বেশী বাড়িতেছে। সুতরাং এখন লেখক এবং বাচকের এত বাড়াবাড়ি। দেশের পক্ষে ইহা প্রকাণ্ড লাভ, সুতরাং প্রকাণ্ড সৌভাগ্যের বিষয়। বলা বাহুল্য যে, নূতন লেখক হইলেই, নূতন কথাও লিখিতে হয়, নচেৎ লিখিয়া কাজ কি? আবার, ইহাও নিশ্চয় যে বুদ্ধিমন্ত লোকে কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না; সেইজন্য কাগজ কলমের সুবিধা পাইলেই লেখে, নহিলে খালিখালি বকে। ফলে, একটা না একটা চাই—হয় বাচকতা, নয় লেখকতা। সিদ্ধান্ত হইল এই যে, ক্রমে ক্রমে বিস্তর নূতন কথার আবিষ্কার এবং আলোচনা হইতেছে। এই লাভ, এই সৌভাগ্য।

এই নবজীবনেরই প্রবন্ধে, এবং তাহা ছাড়া এখনকার এক শ আট দর্শনে এবং অন্যান্য পুস্তক পুস্তিকাতে অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন যে, সংসারে

নির্জলা ভাল কিম্বা নির্জলা মন্দ কোন কিছু হয় না, হইবার যো নাই। খেজুর রসে নেশা, পাকা কলায় শ্লেষ্মা বৃদ্ধি, উপন্যাসে ভগবগ্দীতা, এমনই একটা না একটা বিঘটন ঘটিবেই ঘটিবে। সুতরাং বুদ্ধিমন্ত লেখকদের গুণে নিত্য নূতন নূতন কথার আবিষ্কার এবং আলোচনার বাহুল্য প্রযুক্ত যে নূতন এক বিঘটন ঘটিবার সূত্রপাত হইয়াছে, ইহাতে অবাক্ হইলে চলিবে কেন? বিঘটন এই যে নূতন কথার বাড়াবাড়িতে পুরাণ কথা অনেকগুলা লোপ পাইয়াছে, এবং ক্রমেই লোপ পাইতেছে। তাহাতে ক্ষতি কি? বলিয়া যদি আপনি বাঁকিয়া বসেন, তাহা হইলে আমি পারিব না। স্পষ্টই বলিতেছি, আপনার যেমন বুদ্ধি আছে আমার তেমন নাই। সুতরাং আপনাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া একটি কথাও বুঝাইয়া দিব, এমন সাধ্য আমার নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে আমার মত লোকের কিছু ক্ষতি হইতেছে, কিছু কষ্ট হইতেছে এবং আপনাদের দলে না কি সকল লোকেই নাম লেখাইতে ব্যগ্র, কাজে কাজেই আমাকে এক ঘরিয়া হইবার ভাবনাও ভাবিতে হইতেছে।

আপনি বলিতে পারেন যে, তুমিও কেন এই দলে ভর্ত্তি হও না। তদুত্তরে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি পারিয়া উঠিতেছি না। এত নূতন কথা, আমার দুর্ব্বল পেটে হজম হয় না। নূতন নূতন আবিষ্কারের এতই বেগ, যে আমি দৌড়িয়াও কুলাইতে পারিতেছি না। হাঁপাইয়া গেলাম, আর দৌড়িবার সামর্থ্যও নাই। এখন একটু বিশ্রাম করিতে না পাইলে, একটু র ঠ করিয়া, রহিয়া, বসিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে না পাইলে, একেবারে প্রাণান্ত। এই গেল নিজের গরজের কথা। পরের গরজেও একটা কথা বলিতে পারি। সকল পুরাণ কথা লোপ পাওয়া কি ভাল? আলোচনা না রাখিলেই ভুলিয়া যাইতে হয়; ভুলে যাহা চাপা পড়িল, তাহাই ত লোপ পাইল। আর যদি একবার ভুলিয়া গিয়া আবার সেই পুরাণ কথাই নূতন বলিয়া আবিষ্কার করিতে হয়, তাহা হইলে ত বুদ্ধি বাড়িতেছে, একথা বলা চলিবে না; বুদ্ধির নাগর-দোলা ঘুরিতেছে বলাই কর্ত্তব্য হইবে। কেমন, ঠিক না? তাহা যদি সত্য হয়, তবে শরীর নষ্ট করিয়া, অর্থ নষ্ট করিয়া, বেদম পাক খাইয়া মরা অপেক্ষা এক জায়গায় নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই ত ভাল। মনে করুন, নূতন আনকোরা লক্ষ কথা আপনারা বাহির করিলেন। ইত্যবসরে

দিনে আলো হয়, রাত্রে অন্ধকার হয়, এই পুরাণ কথাটা অবহেলায় ভুলিয়া গেলেন। আবার, কিছু কাল পরে মাথা ঘামাইয়া, যুক্তি দেখাইয়া, বিজ্ঞান খাটাইয়া বিচার পূর্ব্বক আপনারা সেই পুরাণ সিদ্ধান্তটিই খাড়া করিলেন। এটা ত পণ্ডশ্রম হইবে। এমন পণ্ডশ্রম ত অনেক বিষয়েই হইবার সম্ভাবনা। তাই ভাবিতেছি যে, বুদ্ধিমন্ত লোকের দল বাড়িয়া অর্থাৎ নূতন লেখা এবং নূতন বলা বাড়িয়া উঠাতে আমাদের মত নির্ব্বোধ লোকের কষ্ট এবং ক্ষতি হইতেছে। এদিকে প্রকৃত পক্ষে না কি আমাদের দেশে নির্ব্বোধের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং দেশের ক্ষতিও হইতেছে। ভাবিতেছি এই কথা। অদ্য মুখ ফুটিয়া বলিতেও হইল।

আত্মরক্ষার বৃত্তি আপন শরীর মাত্র বাঁচাইয়া ক্ষান্ত হইতে চায় না। আত্মীয় স্বজনকে না বাঁচাইতে পারিলে, এ বৃত্তির পরিতোষ হয় না। নির্ব্বোধে নির্ব্বোধে—বুদ্ধিমন্তের সঙ্গে বুদ্ধিমন্তেরও বটে—এক প্রকার আত্মীয়তা,—কেমন একটা প্রাণের টান—জন্মিয়া থাকে। সেই অনুরোধে আমি বুদ্ধিমন্ত, দলের সঙ্গে একটু বিরোধ করিতে, একটা এস্‌-পার-কি-ওস্‌-পার করিতে, উদ্যত হইয়াছি। সেইজন্য যাহা বলিব, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিব না।

প্রায়ই বুদ্ধিমন্ত হইলেই নির্ব্বোধের শত্রু হয়। শত্রুতার কারণ অনেকগুলি। এক ত বুদ্ধিমন্ত লোকের লেখা কিম্বা বলা কথায় নির্ব্বোধের মনের শান্তি এবং "স্বস্তি" নষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধি থাকিলে কেহ কলম এবং জিহ্বা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। উপদেশ দিবেই দিবে। তবেই শত্রু হইল। তাহার পর দেখুন, আমার বুদ্ধি নাই কিম্বা কম বুদ্ধি, এমন কথা স্বীকার করিবার লোক একেবারে দেখা যায় না বলিলেই হয়। ফলে এই হইয়াছে, যে আমাদের দলের অনেক লোক ভাঙ্গিয়া গিয়া অপর দলে প্রবেশ করিয়াছে। ইহারাই আবার নামজাদা, যেহেতু বুদ্ধি বিষেয়ে প্রবলরূপে আপন স্বত্ব স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা বেশী বেশী চেঁচান এবং আঁচড়ান নিতান্ত আবশ্যক মনে করে। তাহাতে আমাদের আরও অনিষ্ট। কিন্তু গোড়ায় দোষ, সেই মূল বুদ্ধিমন্তগণেরই। মনে করিলেই বুদ্ধিমন্ত হওয়া যায়, এ স্বাধীনতার ভাব ত তাঁহারাই প্রচার করিয়াছেন। যদি বলেন, গিলটির ভয়ে কি সোণার কারবার বন্ধ করিতে হইবে? আমি বলি,

করিতে হয়, তাহাও করুন, নহিলে গরীব খরিদদার যে মারা যায়। বস্তুগত্যা, গিল্‌টির দৌরাত্ম্যে খাটি সোণার কারবারই বন্ধ হয় এবং হইতেছে। খাটি সোণায় লোকের বিশ্বাস হয় না, লাভের মধ্যে গিল্‌টি মাল খুব চড়া দরে বিক্রী হয়। যদি সোণার আদর বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে গিল্‌টির আমদানী যাহাতে অসম্ভব হয়, অগ্রে এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত। ইহাতে স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্যে অন্য যাহার উপকার হয় হউক, আমাদের মত লোকের সর্ব্বনাশ হয় মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে বাটপাড়েও প্রশ্রয় পায়। স্বাধীন বাণিজ্য কেন, স্বাধীন কিছুই ভাল নয়। স্বাধীনতার কথা মুখে আনাই দোষ।

আর স্বাধীনতাই বা কি? কিসেরই বা স্বাধীনতা? তাহা ত বুঝিতে পারি না। আপনি বুদ্ধিমন্ত তাহা স্বীকার করি; বিদ্যাতেও আপনি দিগ্‌গজ বিশেষ; কিন্তু নিয়ত প্রকাণ্ড কথার আলোচনায় আপনি ব্যাপৃত থাকায় একটু আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, আপনাকে আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন, এই একটু দোষ। আপনার মনে নাই বলিয়া আপনার পরিচয় আমি দিলাম, মিলাইয়া দেখিবেন, ঠিক পরিচয় হইল কি না!

প্রবোধ।

বুঝি বা ভাঙ্গিল, আজি আশার স্বপন,
বুঝি বা বুঝিনু আজি মোহের ছলন।
হায় এত দিন
ভাঙ্গা প্রাণে, ভাঙ্গা মনে
ঘোর মোহ আবরণে
ছিলাম শ্রীহীন!

—

আশার ছলনে মুগ্ধ ও রে মূঢ় মন!
আত্ম অনাদর তোর কিসের কারণ?
ভাল বেসে, কাছে এসে,
মধুর মধুর হেসে,

করে নাই তোরে কেউ মিষ্ট সম্ভাষণ,
তার তরে পেয়েছ কি এতই বেদন?
কেঁদে কেঁদে কাটাইলি সাধের জনম!
চিন্তার ছুরিতে তুই ছিঁড়িলি মরম!
অনাদরে অভিমানে,
বিষাদ-বিষণ্ণ প্রাণে,
কাটা'লি রে যৌবনের উৎসবের দিন!
আপনার ভ্রমে তুই আপনি শ্রীহীন!

—

কয়টা দিনের তরে
অভিমান কার'পরে?

কে কাহার সাধে মান ?
কে কাহার তোষে প্রাণ ?
কে কাহার সুখে হাসে ?
কে কাহার দুঃখে ভাসে ?
কে কাহারে ভাল বাসে
আপনা ভুলিয়া ?—
আপনা ভুলিয়া কিম্বা আপন ভাবিয়া ?

———

ছি ছি মন বড় ভ্রম
করেছ রে আজনম !
আদর, যতন, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা
স্বার্থের সে নামন্তরে, মোহের পিপাসা।
সাধিতে আপন স্বার্থ,
খুঁজিতে আপন অর্থ,
কিনিতে আপন নাম,
বুঝিতে আপন মান,
সকলেই আসিয়াছে,
সকলেই ঘুরিরিতেছে,
সকলেই ঘুরিবে রে আপনার কাজে,
স্বার্থের বিপণি-পূর্ণ ভব হাট মাঝে।
আপনা ভুলিয়া কেবা
তোর পানে চা'বে ?
আপনার স্বার্থ কেবা হেলায় হা'রাবে ?

———

ঐ দেখ্ চেয়ে দেখ্ হাটের ভিতরে,
সাজান দোকান শ্রেণী
শোভে থরে থরে।
হেথা মান, হোথা যশ,
হেথা সুখ, হোথা রস,
হেথা হাসি, ভালবাসা,
হোথা প্রেম,—প্রেম আশা,
এখানে আদর যত্ন,
ওখানে বন্ধুত্ব রত্ন;
যেখানে সেখানে চা'বে,
যা খুজিবে, তাই পা'বে ; ;
কিসের অভাব বল আছে ভব হাটে ?
সুচতুর ক্রেতা হ'লে কোনটা না জোটে ?
এমন মজার হাটে, সস্তার বাজারে
ধিক্ না পারিলি
"কেনা বেচা" করিবারে !

———

না———না———না ;
এ হাটের "কেনা বেচা" বড়ই কঠিন,
এ হাটের মেকি সাচা বুঝিতে পারি না,
দালালির দাম হেথা বড়ই সঙ্গীন,
সকলের ভাগ্যে তাহা জুটিয়া উঠে না।
কাজ নাই নাম যশে,—
জড়িত সে হিংসাদ্বেষে ;
কাজ নাই ধনমদে,
কাজ নাই উচ্চ পদে,—
অহঙ্কার ভিন্ন তার নাহি কিছু সার।
কাজ নাই ভালবাসা—
মনুষ্যের ভালবাসা স্বার্থের বিকার।
কাজ নাই অভিলাষে,
কাজ নাই উচ্চ আশে,
জীবনে আশার তৃষা মিটেছে কাহার ?

———

বড় সাধ করে হৃদে
যৌবনের ভ্রম মদে,
রচেছিনু মনে মনে আশার মন্দির ;

তৃপ্তির প্রতিমা তা'তে
না পারিনু প্রতিষ্ঠিতে,
শূন্য পড়ে রহিল রে আশার কুটীর!
হতাশ পবন তায়
রয়ে রয়ে বয়ে যায়—
শন্ শন্ স্বনে।
আঁধার কোটরে রয়ে,
আঁধারে আড়ষ্ট হয়ে
পরাণ পেচক কাঁদে বিকট নিস্বনে।
নয়ন সলিল দিয়ে
হৃদয় প্রাঙ্গন ধুয়ে,
মর্ম্মতন্ত্রী জড়াইয়ে
রচেছিনু মঞ্জু কুঞ্জবন।
রাগভরে দুলে দুলে
প্রভাত প্রসূন তুলে,
ধুয়ে তারে অশ্রুজলে
গেঁথেছিনু মালা সুচিকণ।
গাঁথিয়ে সে চারুমালা
সাজা'নু মরম কুঞ্জ;
হৃদয় শোণিত দিয়ে
রচিলাম সিংহাসন;
যতনে স্থাপিনু তাহা মর্ম্ম কুঞ্জবনে।
কেহ কি বুঝিলে গো—হেন আয়োজন
কিসের কারণে?
হৃদয়ের রাজ্যধন,
হৃদয়ের সিংহাসন
ভালবাসা করে গো করিতে অর্পণ।

দিন গেল মাস গেল,
কত বর্ষ গেল এল;
কাল বহে সর্ সর্,
আয়ু ঝরে ঝর্ ঝর্;
হৃদয়ের সিংহাসন,
মরমের কুঞ্জবন
শূন্য পড়ে আছে।
এক বিন্দু ভাল বাসা
না মিলে কাহারো কাছে।
সমস্ত পরাণ জান,
সমস্ত হৃদয় খান,
হাতে করে' করে'।
ঘুরিলাম বাজারে বাজারে;
এক বিন্দু ভালবাসা
না মিলিল কোন খানে,
এত বড় হাটের মাঝারে।
মরমের বলিদানে,
হৃদয়ের বিসর্জ্জনে
ভালবাসা পাওয়া যায় ভবের বাজারে,
মোহের প্রলাপ ইহা—যৌবন বিকারে।

আয় মন, আয় প্রাণ, আয় রে হৃদয়!
চল চল যাই ঐ প্রান্তরের ধারে;
ত্যজিয়া এ কোলাহল,
চল চল যাই চল,
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা নির্জন প্রান্তরে।
ঐ খানে পূরিবে রে এ শূন্য হৃদয়,
প্রকৃতির অযাচিত প্রেমে,
মন ভাঙ্গা বিহঙ্গের গানে,
পথহারা সান্ধ্য সমীরণে।

এইখানে দগ্ধ প্রাণ দাঁড়া রে দাঁড়া রে!
না হয় বসিগে চল ঐ তরু মূলে,

না হয় পশিগে চল শৈলের গহ্বরে,
অথবা ভ্রমিগে চল নির্ঝরের কূলে।
রচেছিলি যেই সিংহাসন,
হৃদয়ের শোণিত জমায়ে,
বেঁধে ছিলি যেই কুঞ্জবন
মরমের তন্ত্রীগুলি লয়ে ;
সে সব ছিঁড়িয়া ফেল দূরে,
ভেসে যা'ক্ নির্ঝরের নীরে !

অবশ্য লাগিবে তাহে মরমে আঘাত,
অবশ্য হৃদয়ে তাহে হবে রক্তপাত ;
সে ব্যথা শীতল হবে——
সে জ্বালা নিবিয়ে যাবে,
নির্ঝরের ঝর ঝর রবে,
মন ভাঙ্গা বিহঙ্গের গানে,
সন্ধ্যাকালে হুতাশের তানে।

--§•§--

নূতন দিল্লীর বিবরণ।

১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে উত্তর পশ্চিম দেশ দর্শনে বহির্গত হইয়া, কাশী, প্রয়াগ কাণপুর দর্শনান্তে ২৯শে আশ্বিন প্রাতে দিল্লীতে উপনীত হই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে পুরাণ দিল্লী এবং সাহজাহানাবাদ (নূতন দিল্লী) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে নূতন দিল্লীতে শেষ হইয়াছে ; আমরাও নূতন দিল্লীতে অবরোহণ করি ; এই স্থলে সংক্ষেপে নূতন দিল্লীর বিবরণ বিবৃত হইল।

মোগল সম্রাটেরা আগ্রাতে বাস করিতেন, আগ্রাই তাঁহাদের রাজধানী ছিল ; সাহজাহানও আগরাতেই রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। খৃঃ ১৬২৮ অব্দে তিনি মোগল সম্রাটের সিংহাসনে অধিকার করিয়াই আগ্রা হইতে রাজধানী স্থানান্তরে লইবার মানস করেন। আগ্রার প্রচণ্ড গ্রীষ্মাতপই রাজধানী পরিবর্ত্তনের কারণ বলিতে হইবে। এই সময়ে টানাপাখার ব্যবহার ছিল না, মৃত্তিকাভ্যন্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে জল সেক করিয়া বাস করা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যজনের সাহায্যই গ্রীষ্ম নিবারণের উপায় ছিল। ১৬৮৬ সম্বতে (১৬২৯ খৃঃ অব্দে) সাহ জাহান যমুনা নদীর তটে, বালুকা ক্ষেত্রের মধ্যস্থ পার্ব্বত্য ভূমির উপর নূতন রাজধানী স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন এবং সমাধা হইলে সাহজাহানাবাদ নাম দিয়া পুরাণ দিল্লী হইতে প্রজা আনিয়া বসতি করান ; এই হইতে দিল্লী পুনরায় ভারতের রাজধানী হইল।

নূতন দিল্লী (সাহ জাহানাবাদ) রেলবর্ত্মের গণনানুসারে কলিকাতা হইতে (পশ্চিমোত্তরে যমুনা নদীর তীরে) ৯৫৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা চতুর্দ্দিগে সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রস্তর এবং ইষ্টক দ্বারা দৃঢ় মতে প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত সুসজ্জ বৃহৎ সাতটি দ্বার আছে। ঐ সকল দ্বারের নাম, লাহোর দ্বার, তুর্কোমান দ্বার, আজমির দ্বার, দিল্লী দ্বার, মোহর দ্বার, কাবুল দ্বার, এবং কাশ্মীর দ্বার। এতদ্ভিন্ন যমুনার দিকে রাজঘাট দ্বার, এবং কলিকাতা দ্বার নামে আরও দুইটি দ্বার আছে, এই শেষোক্ত দ্বারের নিকট পূর্ব্ব ভারতবর্ষের রেলপথের শেষ হইয়াছে। লোকালয়, রাজভবন, চান্দনিচক প্রভৃতি সকলই এই প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী।

স্নান আহারান্তে বিশ্রামের পর আমরা সাহজাহানের কীর্ত্তি দেখিতে বহির্গত হইলাম। দেওয়ানিয়া আম, দেওয়ানিয়া খাস—প্রখ্যাত সাহজাহানের কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমানে আছে, উহা সকলই অন্তর্দুর্গের মধ্যস্থ, পাশ ভিন্ন তথায় যাইবার উপায় নাই। সৈন্য সংক্রান্ত কর্ম্মচারি হইতে আমরা পাশ লইয়া গেলাম। অন্তর্দুর্গ অথবা সাহজাহানের প্রাসাদটি একটি ক্ষুদ্র নগর বলিয়া বোধ হইত, ইহার ১॥ মাইল পরিধি। ইহার প্রাচীর ৫।৬ ফিট চওড়া এবং ৩০ ফিট উচ্চ। পূর্ব্বে প্রাচীর বেষ্টন করিয়া প্রশস্ত এবং গভীর পরিখা ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার শুষ্কাবস্থা; অন্তর্দুর্গে যাইতে নহবত খানার নীচে হইয়া যাইতে হয়। উপরে নহবতখানা নীচে প্রবেশ দ্বার; এখন আর নহবত খানাতে নহবত বাজে না। পূর্ব্বে যেখানে সুমধুর বাদ্য হইত, তাহার পরিবর্ত্তে এখন তথায় সৈন্য সংক্রান্ত আড্‌জুটাণ্টের আপিশ হইয়াছে। প্রবেশদ্বারেই জনৈক গোরা প্রহরী আমাদিগের নিকট হইতে পাশ লইয়া যাইতে পথ দিল; আমরা প্রথমে দেওয়ানিয়া আম নামা সুবৃহৎ দরবারমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। আগরা দুর্গস্থ আম দরবার গৃহ হইতে দিল্লীস্থ আম গৃহ বৃহৎ। দিল্লীর আম, দরবারমন্দির তিন দিকে খোলা, চারি শ্রেণী সারিসারি স্তম্ভের উপরে ছাদ। অধিকাংশই রক্তবর্ণ চিক্কণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই দরবার গৃহেই সুপ্রসিদ্ধ তক্ত তাউস (ময়ূরাসন) স্থাপিত ছিল। ময়ূরাসন সাহজাহানের দ্বারা প্রস্তুত এবং অদ্বিতীয় আসন। প্রাচীন ভ্রামকেরা এই রূপে ময়ূরাসনের বর্ণনা করিয়াছেন;—

দুইটি কৃত্রিম ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে বলিয়া ময়ূরাসন নাম

হইয়াছে। নীলকান্ত মণি, মরকত মণি, পদ্মরাগমণি, মুক্তা এবং অন্যান্য মূল্যবান্ রত্ন দ্বারা অতি সুন্দর মতে ময়ূরমূর্ত্তি গঠন হইয়াছে। উজ্জ্বলমণি সকল যথাস্থানে বিন্যস্ত হওয়াতে যেন চাকচিক্য বিশিষ্ট জীবিত ময়ূর বোধ হয়। আসন খানি ৬ ফিট লম্বা ৪ ফিট প্রশস্ত। সুবর্ণ নির্ম্মিত নিরেট অথচ স্থূল ৬টি পায়ার উপর আসন খানি অবস্থিত। ঐ ৬টি পায়াতে মণি মুক্তা, হীরকের নানাবিধ কাজ। আসনের উপর ১২টি স্তম্ভের স্বর্ণ চন্দ্রাতপ, স্তম্ভ সকল মণি মুক্তাতে জড়িত এবং চন্দ্রাতপে মুক্তার ঝালর। ময়ুর মূর্ত্তি দ্বয়ের মধ্যে শুক পক্ষীর একটি প্রতিমূর্ত্তি। তাহা সমুদয়ই মরকতমণি দ্বারা নির্ম্মিত। আসনের দুই পার্শ্বে মুক্তার ঝালরবিশিষ্ট হীরকখচিত স্বর্ণ ডাণ্ডাযুক্ত লাল মখমলের ছাতা শোভা পাইত। মোগল সম্রাটেরা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যাধিকার করিয়া যে লুট করিয়াছেন এবং করদ রাজা ও আমির ওমরা হইতে যে নজর পাইয়াছেন, সেই সকল মণিমুক্তা হীরক দ্বারা ময়ুরাসন নির্ম্মিত হয়। তাৎ-কালিক জহরিগণ ইহার ৬ কোটি টাকা মূল্য বিবেচনা করিয়াছেন।

নাদের সাহ কর্ত্তৃক ময়ুরাসন অপহৃত হইয়া ভগ্ন হইয়াছে। যে বেদীর উপর ময়ুরাসন স্থাপিত ছিল, তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। বেদীর পশ্চাৎ, বাম এবং দক্ষিণের প্রাচীরে নানাবর্ণের সুচিক্কণ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা ফলফুল এবং পক্ষি মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে; তাহা দেখিতে অতি মনোহর ও উজ্জ্বল। পরমেশ্বর প্রকৃত বস্তুর স্রষ্টা, তাঁহার সৃষ্টিকৌশলের চমৎকারিতা অনেকেই অনুভব করিতে অশক্ত; ইহাতেই একটি প্রকৃত পক্ষী দেখিয়া আমরা তত আহ্লাদিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হই না, কিন্তু সামান্য মনুষ্য তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের কথঞ্চিৎ প্রতিকৃতি করিতে শিখিয়াছে, ইহা ভাবিয়াই আমরা আহ্লাদিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হই, এবং প্রতিকৃতিকর্ত্তাকে প্রশংসা করি। এই আমদরবার গৃহে মধ্যাহ্নকালে সাজাহান বাদসাহ উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য দেখিতেন, প্রার্থনা পত্র লইতেন ও সেই সকলের উপর আজ্ঞা দিতেন। সময় সময় বিশেষ দরবার উপলক্ষে রাজগণের সহিত বাদসাহের এই মন্দিরে দেখা হইত। আম দরবার অট্টালিকা দেখিয়া দেওয়ানি খাস নামা অট্টালিকাতে প্রবেশ করিলাম। উহা আমদরবার গৃহ হইতে আয়-তনে ক্ষুদ্র কিন্তু উহা উত্তম শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং উহাতে বহু কারু কার্য্য আছে। উহাতে যে সমস্ত প্রশস্ত প্রস্তর ছিল তাহার কিয়দংশ অপহৃত হইয়াছে, সেই স্থানে সামান্য প্রস্তর বসান হইয়াছে।

ইহার পর, স্নানাগার, চিত্রশালিকা (তসবির খানা) এবং মতিমহল দেখিলাম। স্নানাগার শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি উপাদেয় পদার্থ; ইহাতে শ্বেত প্রস্তরের তিনটি কুণ্ড আছে, পর্য্যায়ক্রমে তাহাতে শীতল, কবোষ্ণ, এবং উষ্ণ জল রক্ষিত হইত। আভ্যন্তরিক নল দ্বারা আশ্চর্য্য কৌশলে যমুনা হইতে জল যাইয়া স্নানাগারের কুণ্ড পূর্ণ হইত এবং প্রতিদিন অধঃসন্তাপে কুণ্ডস্থ জল উষ্ণ হইত। আমরা অবগত হইয়াছি, এই কার্য্যে এক-শত মণ কাষ্ঠ প্রতিদিন জ্বালান হইত। এই অন্তদুর্গে আরও ৩।৪টি অট্টালিকা দেখিলাম। কিন্তু তাহা ইউরোপীয় কার্য্যকারকের অধিকারে রহিয়াছে এবং অন্যান্য বহুতর অট্টালিকা সিপাহি বিদ্রোহের পর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

সাহ জাহান নিজের সুখ সচ্ছন্দতার জন্য আগ্রা হইতে দিল্লীতে রাজধানী আনিলেন। দেওয়ানিয়া আম, দেওয়ানিয়া খাস ও তাজমহল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। ময়ূরাসন নামে অদ্বিতীয় আসন বানাইলেন কিন্তু সাধারণের হিতকর বিদ্যালয়, পান্থনিবাস, প্রভৃতি কিছুই নির্ম্মাণ করেন নাই। ভুবন বিখ্যাত কোহিনুর নামা হীরকও সাহজাহান প্রাপ্ত হন। তাহা বহু হস্তান্তর হইয়া এই ক্ষণে অতল জলধি সকল পার হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছে এবং শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর মুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কোহিনুর সম্বন্ধে নানাবিধ অলীক গল্প আছে, কেহ কেহ কহেন, পুরাণোক্ত স্যমন্তক মণিই কোহিনুর। বাস্তবিক তাহা নহে।

কোহিনুর হীরা গোলকণ্ডার খনিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সাহজাহান দাক্ষিণাত্য হইতে উহা দিল্লীতে আনেন। আদিতে উহার পরিমাণ ৮০০ রতি ছিল। সাহ জাহান উক্ত হীরা কাটিয়া শোভাসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বিনিস দেশীয় হর্ত্তেন্‌শিও বোর্গিওনামা জনৈক মণিকারকে দেন। মণিকার যে প্রকারে উহা কর্ত্তন করে, তাহাতে উহার শোভা বৃদ্ধি না হইয়া কেবল পরিমাণে অনেক কমিয়া ২৭৯ রতি হয়। ইহাতে সাহজাহান উক্ত মণিকারের দশহাজার টাকা দণ্ড করেন। সাহজাহানের পরিবার হইতে এই মণি মুশেদ দেশে নীত হয়। তথা হইতে কাবুলের অধিপতি সংগ্রহ করেন। ক্রমে উহা পঞ্জাবকেশরী রণজিতের হস্তগত হয়, এখন উহা ইংরাজ কেশরীর সম্পত্তি। ভারত গবর্ণ-মেণ্ট এই মণি সিংহের ন্যায় উপার্জ্জন করেন নাই।

অন্তর্দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আমরা সুপ্রসিদ্ধ জুম্মামসজিদ দেখিতে

গেলাম, ইহা অতি বৃহৎ, তাজমহলের নিম্নেই ইহার স্থান। দিল্লীতে ইহা হইতে উচ্চ অট্টালিকা আর নাই। সম ভূমি হইতে এক উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর মোসলমান রীত্যনুসারে বেদী বানাইয়া তাহার উপর হইতে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ হইয়াছে। অন্যান্য মসজিদের ন্যায় এই মস্‌জিদও পূর্ব্ব দ্বারী। দক্ষিণ, পূর্ব্ব, উত্তর; তিন দিকে তিনটি বৃহত্তোরণ আছে; এসকলের দ্বারা মসজেদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। আমরা যখন জুম্মা মসজিদে যাই, তখন পূর্ব্ব দ্বার বন্দ ছিল, উত্তরের দ্বার দিয়া আমরা মস্‌জিদপ্রাঙ্গণে উপনীত হই। মস্‌জিদ এবং তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ, ১৪০০ শত বর্গ ফুট ভূমি ব্যাপিয়া আছে। মস্‌জিদটি উত্তর দক্ষিণে ২০১ ফুট লম্বা; পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৩০ ফুট প্রশস্ত। মস্‌জিদের সমুদয় ভাগ শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত নহে। তিনটি চূড়া শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহার উপর গিলটি করা তামার চূড়া শোভা পাইতেছে। মস্‌জিদের দুই পার্শ্বে দুইটি মেজিনা (১) আছে; ইহার প্রত্যেকটি ১৩০ ফুট উচ্চ। মস্‌জিদের মধ্যে ২ হাজার ও প্রাঙ্গণে ২০ হাজার লোক একত্র নমাজ পড়িতে পারে। দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাহজাহান বাদসাহ এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে উহার চতুর্গুণ ব্যয়েও এতাদৃশ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে, রাজমন্ত্রী রোসনউদ্দোলার মস্‌জিদ। এই শেষোক্ত মস্‌জিদের অলিন্দে উপবেশন করিয়া নাদের সাহ আপন সাক্ষাতে দিল্লীর বহু প্রজার শিরশ্ছেদন করেন। নূতন দিল্লীতে সাহজাহান এক কোটি টাকা ব্যয়ে সলিমার নামা বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ৪র্থ বৎসরে বাগান আরম্ভ হইয়া ত্রয়োদশবর্ষে সমাধা হয়; এক্ষণে বাগানের কিছুই নাই। সিপাহি বিদ্রোহে দিল্লী নগর সম্পূর্ণ মতে শ্রীভ্রষ্ট, ও ধনীগণ দরিদ্র হইয়াছেন; অনেকে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। দিল্লীর আমির ওমরাদের পূর্ব্বাবস্থা নাই। দিল্লী নগর ৩৬ পল্লীতে বিভক্ত, তাহার মধ্যে চান্দনিচক, দেখার উপযুক্ত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দীপান্বিতা অমাবস্যাতে প্রতি গৃহ, প্রতি দোকান আলোক দ্বারা শোভিত হয়; ইহাকে দেউলি কহে। ত্রয়োদশীর দিন হইতে দেউলি আরম্ভ হয়; এই ত্রয়োদশীকে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ধন ত্রয়োদশী কহে।

(১) যে স্থান হইতে আজান দেওয়া হয়, তাহাকে মেজিনা কহে। মস্‌জিদে নমাজ পাঠের পূর্ব্বে ডাক নমাজ পড়িয়া সকলকে সংবাদ দেওয়াকে আজান কহে।

সৌভাগ্য ক্রমে ধন ত্রয়োদশীর দিন আমরা দিল্লীতে ছিলাম; ধন ত্রয়োদশীর পূর্ব্ব দিন হইতে দোকান সকল পরিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হয়; ধন ত্রয়োদশীর দিন বৈকালে দোকান সকলে পণ্য দ্রব্য নেত্রানন্দ-প্রদ প্রণালীতে সাজাইয়া, দোকানদারগণ দ্রব্যবিক্রয়ের আশাতে বসিয়া থাকে। দেশীয় রীত্যনুসারে ধন ত্রয়োদশীর দিন বৈকালে বহু দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। বেলা অপরাহ্ণ তিনটার সময় হইতে নাগরিক লোকেরা উত্তম পরিচ্ছদ ও বেশ ভূষাতে ভূষিত হইয়া, কেহবা অশ্বারোহণে, কেহ অশ্বযানে, কেহ নরযানে, কেহ বা পাদচারে বাজারে আসেন। কোন কোন প্রগল্‌ভপৌঢ়া কুল-কামিনীও এ সুখে বঞ্চিত হন না; তাঁহারা রথারোহণে ধন ত্রয়োদশীর বাজারশোভা দেখিতে আসেন। দিল্লীস্থ চম্পক-বরণা, সর্ব্বাভরণভূষিতা, বহু মূল্য পরিচ্ছদে আবৃতা, এক বেণীধারিণী, পূর্ণযৌবনা বাই (নর্ত্তকী) সকল বয়েলিতে (গরুর উত্তম যান) আরোহণ করিয়া বাজারে আসিয়া বাজারের শোভা বর্দ্ধন এবং দর্শন করেন। যাঁহারা ধন ত্রয়োদশীর দিন বাজারে আসেন, তাঁহারা কোন না কোন দ্রব্য ক্রয় করন। খালি হাতে ঘরে ফিরিয়া যান না।

নূতন দিল্লীর (সাজাহানাবাদের) দিল্লী-দরওয়াজার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রস্তরময় প্রকাণ্ড হস্তীমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল এবং এক হস্তীর উপরে চিতোরের রাজপুত রাজা প্রসিদ্ধ জয়মলের, অপরটির উপর তাঁহার ভ্রাতার প্রতিমূর্ত্তি ছিল এবং তাঁহাদিগের মাতার প্রতিমূর্ত্তিও ছিল। আকবার সাহ চিতোর জয় করিয়া ইহাঁদিগের সাহস ও বিক্রম প্রভৃতি জ্ঞাপনার্থ হস্তীবাহনস্থ রাজপুত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া আগ্রার দুর্গের পূর্ব্ব অথবা যমুনা দ্বারের নিকট স্থাপন করেন। তথা হইতে সাহজাহান উহা উঠাইয়া নূতন দিল্লীতে আনিয়া দিল্লী দরওয়াজাতে স্থাপন করেন। গোঁড়া মোসলমান্ আওরঙ্গজেব্ শাহ ঐ মূর্ত্তি দৃষ্টে পৌত্তলিকতার ভাব মনে উদয় হয় বলিয়া, ঐ মূর্ত্তি দ্বয় দিল্লী-দ্বার হইতে উঠাইয়া স্থানান্তর করেন, এক্ষণে উহা নূতন দিল্লী বাগানের দ্বারপথে বিদ্যমান আছে।

সাহ জাহানাবাদ সাহার সময়ে তাঁহার দরবারের আমির ওমরা সকলেই প্রভুর দেখা দেখি উত্তম উত্তম অট্টালিকা সকল প্রস্তুত করিয়া নূতন দিল্লীর সমধিক শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সাহ জাহানের পর আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে, অট্টালিকা প্রভৃতি দ্বারা সাহাজানাবাদের শোভা বর্দ্ধন হয় নাই। আওরঙ্গজেব স্বতন্ত্র ধরণের ব্যক্তি ছিলেন; তিনি পিতাকে কারারুদ্ধ করেন,

তাঁহার ভ্রাতৃব্যবহার অতি নিকৃষ্ট; তিনি পুত্রকেও বিশ্বাস করেন নাই। রাজ্যবৃদ্ধির লালসাতে সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন; তিনি গোঁড়া মোসলমান হইয়া রাজকার্য্যে নানারূপ ভুল করিতেন এবং তাহাতে বহু ব্যক্তির জীবন নষ্ট করিয়াছেন। লোকে সুখী হইবার জন্য পুত্রাকাঙ্ক্ষা করে, সাহাজাহানও তাহাই করিয়াছিলেন। যে সাহাজাহান তাজমহল নির্ম্মাণ করেন, যিনি নূতন দিল্লী পত্তন দিয়া তাহাতে দেওয়ানিয়া আম, দেওয়ানিয়া খাস প্রস্তুত করেন, যিনি ভারতে অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন—যিনি ময়ূরাসন নির্ম্মাণ করেন, তিনিই পুত্র দ্বারা রাজচ্যুত হইয়া বন্দী হন, এবং জীবনের অবশিষ্ট ভাগ বন্দীভাবে অতিবাহিত করেন। অহো! অদৃষ্ট!

কাশীমবাজার রাজবংশ।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম বিকাশ সময়ে—বঙ্গদেশের মধ্যে যে কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্ব স্ব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চতুরতায়—ইংরাজ গবর্ণরদিগের প্রসাদ ভাজন হইয়া অতুল বিত্তসম্পন্ন হইয়াছিলেন ও অশেষ রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের বংশাবলী আজিও ধনে, মানে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্য সম্পাদনে, অনেক স্থলে—বঙ্গ সমাজের মুখপাত্র ও শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। উল্লিখিত বনিয়াদি বংশ সমূহের মধ্যে ভূকৈলাসের রাজবংশ, শোভাবাজারের রাজপরিবার—পাইকপাড়া ও কাশীমবাজার রাজবংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মহারাজা নবকৃষ্ণ হইতে শোভাবাজার রাজবংশ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল হইতে যথাক্রমে—পাইকপাড়া ও ভূকৈলাস রাজবংশ—ও বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দী হইতে সুপ্রসিদ্ধ কাশীমবাজার রাজপরিবারের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রস্তাবে শেষোক্ত রাজবংশের আদিপুরুষ, সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর সময় হইতে—বর্ত্তমানে, তাঁহার প্রপৌত্রবধূ স্বনামখ্যাতা প্রাতঃস্মরণীয়া, —মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময় পর্য্যন্ত—উক্ত রাজপরিবারের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিব। *

---

* ঐতিহাসিক মূল-ভিত্তির উপর, জনশ্রুতি ও প্রচলিত গল্পাদি ও গবর্ণমেণ্টের Record প্রভৃতির সহায়ে এই প্রবন্ধের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে।

কাশীমবাজার—বহুকাল হইতেই বাঙ্গলার মধ্যে এক প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত। বাঙ্গলার নবাবদিগের, প্রিয় রাজধানী মুরশীদাবাদ হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুই ক্রোশ। বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রধান আবাসস্থান ছিল বলিয়া কাশীমবাজার বহুকাল হইতেই বাঙ্গলার ইতিহাসে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই স্থানেই—বাণিজ্যজীবী ইংরাজ, প্রথম রেশমের কুঠী খুলিয়া অশেষ বিত্ত ও বলসম্পন্ন হয়েন। বস্তুত ভারতের, ইংরাজ-রাজত্বের ইতিহাস হইতে—নানা কারণে কাশীমবাজারের নাম বিযুক্ত করা নিতান্ত অসম্ভব।

মালদহ ও রাজমহল, বাণিজ্যের বাজারে শ্রেষ্ঠতা হারাইলে, কাশীম-বাজার গিয়া সেই স্থান অধিকার করে। কাশীমবাজারের "কুত্নী"—হস্তিদন্ত নির্ম্মিত নানাবিধ কারুকার্য্যময় সূক্ষ্মশিল্পাদি—অত্যুৎকৃষ্ট কোরা ও সুপরিস্কৃত রেশমী কাপড়,—অতি সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র—তৎকালে ইউরোপের বাজারে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল। বিলাতে ও ইউরোপের অন্যান্য প্রধান বাণিজ্যস্থলে—ভারতীয় রেশম, অতি উচ্চদরে বিক্রীত হইত। তখনকার দেশীয় সূক্ষ্মশিল্প, আজকালকার ন্যায় অবনতি প্রাপ্ত হয় নাই—সুতরাং দেশেবিদেশে তাহা উচ্চদরে বিক্রীত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছিল। কাশীমবাজারে ইংরাজের কুঠীছাড়া—ফরাসীদিগেরও একটি কুঠি ছিল—কাশীমবাজারের অনতিদূরে কালিকাপুরে দিনেমারদিগেরও একটি কুঠী ছিল—কিন্তু কোন কুঠীই ইংরাজের কুঠীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে নাই। কলিকাতাপ্রতিষ্ঠাতা, সুপ্রসিদ্ধ জব চার্ণক সাহেব যখন কাশীমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন তখন (১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে) দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড বাঙ্গলার বাণিজ্যে কুঠীতে খাটান হয়*। এই কাশিমবাজারে, কোম্পানী রেশমের কারখানা নির্ম্মাণ করিতে—বিলাত হইতে বহুব্যয়ে এক কল আনয়ন করেন। মালদহ, রামপুর-বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে, সেই সময়ে গুটীপোকার বহুবিস্তৃত চাষ হইত। প্রজারা কোম্পানীর নিকট হইতে টাকা দাদন লইয়া, চাষ করিয়া কোম্পানীকে কখনও বা গুটি, কখনও বা, অপরিস্কৃত সূত্র আনিয়া দিত। বলা বাহুল্য যে, এই ব্যবসায়ে অনেকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এই সময়ে বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাশীমবাজারের

* Reports on the Trades in the East Indies.

বাহ্যিক অবস্থা অতিসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল—কান্তবাবুর সময়ে, কাশীম-বাজারে গৃহসংখ্যা এত অধিক ছিল যে, ছাদে ছাদে বেড়াইয়া সহর পর্য্যটন করা যাইত। এক সময়ে, কাশীমবাজারের জলবায়ু স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে ইংরাজ পাড়িত সৈন্যদিগকে এই স্থলে বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য পাঠাইতেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা মূল প্রবন্ধের অনুসরণ করিব।

রাধাকৃষ্ণ নন্দী নামক একজন মধ্যবিত্তাপন্ন গৃহস্থের ঔরসে, সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর জন্ম হয়। রাধাকৃষ্ণের ঊর্দ্ধতন দুই তিন পুরুষ হইতেই ইহাঁ দিগের রেশমের "কুত্নী" ও সুপারির ব্যবসা চলিয়া আসিতেছিল। ইহাঁদের এই সময়ে অবস্থা যদিও স্বচ্ছন্দ ছিল না, তথাপি অন্নবস্ত্রের ক্লেশ তাঁহারা কখনও ভোগ করেন নাই। রাধাকৃষ্ণ নিজে খুব ভাল ঘুড়ী উড়াইতে পারিতেন বলিয়া লোকে উহাঁকে "খলিফা" উপাধি দিয়াছিল। ইহাঁর পুত্র কৃষ্ণকান্ত নন্দী বাল্যকালে, বাঙ্গলা, পারসী, ও তৎকালীন আবশ্যকীয় সামান্যরূপ ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষা ততদূর উচ্চদরের না হইলেও, স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভাবলে তিনি শীঘ্রই সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

জনশ্রুতি যে, কান্তবাবুর প্রায় দুই হাজার ইংরাজি শব্দ কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি উত্তমরূপে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে, ও বাঙ্গলায় হিসাবাদি রাখিতে পারিতেন। এই সকল বিষয়ে দক্ষতার জন্য তিনি কাশীমবাজারে ইংরাজের কুঠীতে মহুরীর পদে নিযুক্ত হইলেন। রেশমের কাজ বেশ ভাল রকম বুঝিয়া শীঘ্রই তাঁহার পদোন্নতি হইল। তিনি কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গলার ভাবী শাসনকর্ত্তা ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই কাশীমবাজারের কুঠীতে রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখনও বাঙ্গলায় দুর্দ্দান্ত প্রতাপ সেরাজ রাজত্ব করিতেছেন—পলাসীর যুদ্ধ তখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে নিহিত ছিল। যাহা হউক, এই কুঠী হইতেই এই সময়ে হেষ্টিংসের সহিত কান্তবাবুর প্রথম পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে আরম্ভ হইল।

যে সূত্র অবলম্বনে নবাব কলিকাতায় ইংরাজদিগের উচ্ছেদব্রতে ব্রতী হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। নবাব পূর্ব্ব হইতেই কাশীমবাজারের কুঠী হস্তগত করিবার জন্য সচেষ্ট

ছিলেন—এক্ষণে অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে তিনি কলিকাতাভিমুখে যাইবার সময়—কাশীমবাজারের কুঠীর ধ্বংশ-সাধন করিতে সংকল্প করিয়া সসৈন্যে কুঠী আক্রমণ করিলেন।

উচ্ছ্বলিত অর্ণবপ্রবাহের ন্যায় সেই নবাবসেনার গতিরোধ করা দূরে থাক্, কুঠিয়াল সাহেবেরা সহজেই নবাবের কর্ম্মচারিদিগের হস্তে বন্দী হইলেন। এই বন্দীর মধ্যে কুঠীর তৎকালীন প্রধান কর্ম্মচারি, রেসিডেণ্ট পদাভিষিক্ত হেষ্টিংস সাহেবও ছিলেন।

নবাবের আজ্ঞাক্রমে, রেসিডেণ্টের সহিত বন্দীগণ মুরশীদাবাদ কারাগারে প্রেরিত হইলেন। নবাবও সসৈন্যে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতা হইতে ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিয়া, কলিকাতার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "আলিনগর" আখ্যা দিয়া, দেওয়ান মাণিকচাঁদের হস্তে কলিকাতার শাসনভার অর্পণ করিয়া, বিজয়ী নবাব সসৈন্যে, সদর্পে মুরশীদাবাদ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সুচতুর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ওয়ারেণ হেষ্টিংসও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া নানাবিধ কৌশলাবলম্বনে প্রহরীদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া সরিয়া পড়িলেন। কেহই তাঁহার পলায়ন-বার্ত্তা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। প্রহরীর হস্ত হইতে ও কারাগারের ক্লেশ হইতে হেষ্টিংস যদিও আপাতত মুক্তিলাভ করিলেন, তথাপি নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি কাশামবাজারে বাস করিতে পারিলেন না। হেষ্টিংস তখন নিতান্ত বিপদগ্রস্ত—সুতরাং ছদ্মবেশে কাশীমবাজারের কোন গোপনীয় স্থলে লুকাইয়া থাকিতে বাসনা করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই কান্তবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। কৃষ্ণকান্ত ছদ্মবেশী হেষ্টিংসকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার রক্ষার উপায় বিধান করিতে সচেষ্ট হইলেন। নবাব হেষ্টিংসের পলায়নবার্ত্তা শুনিয়া অতিশয় রুষ্ট হইয়া কয়েকজন সুদক্ষ অশ্বারোহী, খাস-বরদার, ও বরকন্দাজ তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছেন, তাহারা কাশীমবাজারের ও মুরশীদাবাদের নিকটস্থ সমস্ত স্থান তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। এ প্রকার ঘটনাস্থলে, কোন প্রকাশ্য গদিতে, বা অন্য কোন স্থলে লুক্কায়িত থাকিলে তিনি যে অব্যাহতি পাইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আর এরূপ স্থলে কেহ যে নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয়প্রদান করিতে সাহসী হইবে না, তাহাও তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। সমস্ত ঘটনা তিনি হেষ্টিংসকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার

বিপদের গুরুত্ব তাঁহাকে বুঝাইলেন। হেষ্টিংস কৃষ্ণকান্তকে তাঁহার জীবন রক্ষার্থ অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে বলিলেন—কান্তবাবু অন্য উপায় না দেখিয়া নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, ভাবী বিপদাশঙ্কাকে মনে স্থান না দিয়া, প্রভুকে গুপ্তভাবে নিজালয়ে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হেষ্টিংস এইরূপে অসম্ভাবিত উপায়ে জীবনলাভ করিয়া ছদ্মবেশে কৃষ্ণকান্ত নন্দীর আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেস্থলেও অধিক দিন নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, কান্তবাবু তাঁহাকে তদপেক্ষা কোন নিরাপদ স্থানে রাখিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু মুরশীদাবাদে সেইরূপ নিরাপদ স্থান কোথায়? তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে হেষ্টিংসকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিতে দৃঢ় মনোরথ হইলেন। কোন কিস্তির নৌকায় বাঙ্গালীর বেশধারী হেষ্টিংস নিরাপদে ও অব্যাহতরূপে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। যদি পথিমধ্যে ধরা পড়িতেন, তাহা হইলে নবাবের কর্ম্মচারিদিগের হস্তে তাঁহারা অশেষ লাঞ্ছনা ও পরিশেষে অতিশয় শোচনীয় শাস্তিভোগ করিতে হইত। জগদীশ্বরের কৃপায় এ সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উভয়েরই নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রু পূর্ণ হইল। হেষ্টিংস রুদ্ধকণ্ঠে কম্পিতস্বরে কৃষ্ণকান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কান্তবাবু তোমার এ উপকার হেষ্টিংস জীবন থাকিতে ভুলিবে না। এই লও আমার স্বহস্ত লিখিত নিদর্শনপত্র, ইহাই তোমাকে আমার নিকট পরিচিত করাইয়া দিবে।" প্রভু ও বিশ্বস্ত ভৃত্য তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন। তখনকার সাহেবেরা আজ কালকার মত ক্ষুদ্র নবাব ছিলেন না। দেশীয়দিগের সহিত অসঙ্কুচিত ভাবে মিশিলে যে তাঁহাদিগের মানের লাঘব হইবে, ইহা তাঁহাদিগের মনে আদৌ স্থান পাইত না। বলা বাহুল্য যে এই বিপদের সময়ে হেষ্টিংস কান্তবাবুর নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কোন অংশই অসম্পূর্ণ রাখেন নাই।

পলাশী যুদ্ধের পর, বাঙ্গলার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই হেষ্টিংস সাহেবেরও অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বাঙ্গলার কোমল মৃত্তিকায়, যবনের রক্ত পতাকার পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ সিংহের সিংহ চিহ্নিত পতাকা তর তর রবে উড়িতে আরম্ভ করিল। কোম্পানী ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা এখন আর সামান্য সওদাগর মাত্র নহেন; তাঁহারাই এক্ষণে দেশের প্রকৃত শাসন কর্ত্তা। মীরজাফর বাঙ্গলার মসনদে বসিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি কতক গুলি উচ্চ

পদস্থ কর্ম্মচারির হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। এই ক্রীড়া পুত্তলীকে চালন করিবার জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস নিজামতের দরবারে কোম্পানীর এজেণ্ট স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর তিনি ১৭৬১ খৃঃ অব্দে কলিকাতা কৌন্সিলের মেম্বর পদে নিযুক্ত হন; পরে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বিলাতে গমন করেন ও তথা হইতে মান্দ্রাজ কৌন্সিলের দ্বিতীয় সদস্য রূপে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে কাটিয়ার সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার পদে বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসেন। বাঙ্গলায় আসিয়াই হেষ্টিংস কান্ত বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহার স্বহস্ত লিখিত নিদর্শন, ও অনুরোধ পত্রিকা কান্ত বাবুর নিকট পাইলেন ও কৃতজ্ঞতার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে তাঁহার মুচ্ছুদ্দি পদে (Banian) নিযুক্ত করিলেন।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময়ে মুচ্ছুদ্দীরাই গবর্ণরের অধিকাংশ খাস কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। কেবল রাজকীয় কোন কার্য্যের ভার লইতেন না। মুচ্ছুদ্দিরা গবর্ণরের সহায়তায়, তাঁহার জন্য বেনামী করিয়া (নিজ নামে বা বেনামে) বড় বড় ফারম বা জমীদারির ইজারা করিয়া লইতেন। ইহাতে তাঁহাদের অতিশয় অর্থাগম হইত। গবর্ণরের গোপনীয় কার্য্য সমুদায় প্রায় ইহাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হইত। গবর্ণরেরা এই সমস্ত মুচ্ছুদ্দিদিগের কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া, কখন কখন তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে সাধারণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, বা অন্য কোন উপায়ে, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত ও পরিতুষ্ট করিতেন। কাউন্সিলের মেম্বর হইতে গবর্ণর সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই এক একটি মুচ্ছুদ্দী রাখিতেন। জেলার কর্ত্তারাও ফাঁক যাইতেন না। এই সময়ে কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারীই, তাঁহাদের বিধানানুসারে প্রকাশ্যভাবে বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের এই সমস্ত বেনিয়ানেরা, উচ্চ কর্ম্মচারীদের সহায়তায় ও যত্নে নিজ নামে লবণের ফারম খুলিতেন বা অন্যান্য প্রকার বাণিজ্যদ্রব্য একচেটিয়া করিয়া লইতেন। উর্ব্বরা, ও শস্যশালিনী জমীদারিগুলিও, তাঁহারা উপরোক্ত উপায়ে স্ব স্ব ক্ষমতাভুক্ত করিয়া লইতেন। তবে বাণিজ্যের ও জমীদারি লাভের অধিকাংশ তাঁহাদের প্রভুকে দিতেন। এই প্রকার উপায়াবলম্বনে কোম্পানীর চক্ষে ধূলি দিয়া উভয় পক্ষই সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িতেন। এক কথায়, ইহাঁরাই গবর্ণরের খাস দেওয়ান স্বরূপ ছিলেন।

রাজ্য সংক্রান্ত নিয়ামক বিধিগুলি (Regulating Acts) বিধিবদ্ধ হইলেই,

বিলাত হইতে তিন জন নূতন সভ্য নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। হেষ্টিংস ডাইরেক্টর ও পার্লেমেণ্টের আদেশে ভারতীয় ইংরাজাধিকার সমূহের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। মন্ত্রীসভার সভ্যগণের পরামর্শ মতে তিনি সমস্ত রাজকার্য্য সমাধা করিবেন, ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ছিল।

এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বাঙ্গলার শাসনকার্য্যসম্বন্ধে আরও কতকগুলি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। বাঙ্গলায় তখন "ডবল্ গবর্ণমেণ্ট" প্রচলিত ছিল। ইংরাজ রাজ্য রক্ষা করিতেন—মুসলমান নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা রাজ্যশাসন ও রাজস্ব আদায় করিতেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাঁরাই বাঙ্গলার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। মীর জাফরের সময়ে মহারাজা নন্দকুমার বাঙ্গলার নায়েব সুবাদার নিযুক্ত হন। নন্দ কুমারের পর মহম্মদ রেজা খাঁ সেই পদে বিরাজ করিতেছিলেন। রেজা খাঁই তখন প্রকৃত নবাব; নবাব কেবল ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। প্রজাকুল নানাকারণে সেই মুসলমান নায়েবের হস্তে অত্যাচারগ্রস্ত হইতেছিল। কাহার কাছেই বা তাহারা সেই সমস্ত অত্যাচারের অভিযোগ করিবে? কাহার এমত দুইটা মাথা আছে, যে রেজা খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে? কাজেই বাঙ্গালী প্রজা নীরবে, বিনা বাক্যব্যয়ে, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া, জীবন কাটাইতেছিল। হেষ্টিস্ গবর্ণর জেনারেল হইয়া 'ডবল গবর্ণমেণ্ট' উঠাইয়া দিয়া রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিলেন। তাঁহার প্রাপ্য বেতন তিন লক্ষ টাকা, মণিবেগম, রাজা গুরুদাস, ও রাজা রাজবল্লভকে ভাগ করিয়া দিয়া, হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে নবাব সরকারে নিযুক্ত করিলেন। মণিবেগম নবাবের রক্ষক—রাজা গুরুদাস নবাবের দেওয়ান,—ও রাজা রাজবল্লভ; খাল্‌সার রায়রায়েঁর পদে নিযুক্ত হইলেন। হেষ্টিংস এই প্রকারে নিজ হস্তে সমস্ত ক্ষমতা প্রকারান্তরে সংযত করিয়া ডবল গবর্ণমেণ্টের মূলে সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করিলেন।

বাঙ্গলার গবর্ণরীর সময় হইতে, গবর্ণর জেনারেল হওয়ার সময় পর্য্যন্ত, হেষ্টিংস কান্তবাবুর অবস্থা সম্পূর্ণ উন্নত করিয়া দেন। কান্তবাবু কতকগুলি জমীদারী পরিদর্শনের ও সেই গুলির সুশৃঙ্খলা-সাধনের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথম প্রথম জমীদারীর কার্য্য ভাল বুঝিতেন না বটে কিন্তু, অবশেষে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সহায়তায় এই সমস্ত কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কান্তবাবুকে, জমীদারীর কার্য্য সমূহ সম্বন্ধে সাহায্য করিবার

জন্য, সেই সময় কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আজও সেই বাটী লালা বাবুদের বাটী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

কান্ত বাবু উত্তমরূপ লেখা পড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু তিনি অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে প্রথম প্রথম সহায় অবলম্বন করিয়া তিনি জমিদারী ও অন্যান্য কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু কিয়ৎকাল কার্য্য করার পর, তিনি এই সমস্ত কর্ম্মে তাঁহার উপদেশকের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। হেষ্টিংস যখন ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া নানাবিধ নূতন বন্দোবস্ত প্রণয়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। এই সময়ে কান্ত বাবুর কার্য্য দক্ষতার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, তিনি তাঁহাকে কতকগুলি লাভকর জমীদারি ও ফারম ইজারা করাইয়া দিলেন। এই সকল ইজারার আয়ে, তাঁহার বিলক্ষণ ধনাগম হইতে লাগিল। এই সময়ে কৃষ্ণকান্ত নন্দী ধনে, মানে, পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। হেষ্টিংস তাঁহাকে কলিকাতার, অন্যান্য ধনীদিগের ন্যায়, এক প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে পরামর্শ দেন—কিন্তু কান্ত বাবু—মুরশীদাবাদ ভুলিতে পারিলেন না। যে কাশামবাজার অবলম্বন করিয়া তিনি আজি এতাদৃশ সম্মানিত হইলেন, সেইস্থানে বাস করিবার বাসনা সংযত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি কাশীমবাজারে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

হেষ্টিংশ যে সমস্ত জমীদারি কৃষ্ণকান্ত বাবুকে ইজারা করাইয়া দেন, তন্মধ্যে, স্বনামখ্যাতা রাণী ভবানীর "বাহার বন্দ" পরগণাই প্রধান। বাহার বন্দ পরগণা রঙ্গপুর জেলার মধ্যস্থিত। এই পরগণা, অতিশয় লাভ-জনক ও অতি বিস্তৃত জমীদারি। হেষ্টিংস্ জবরদস্তিতে এই জমীদারি, রাণী ভবানীর সরকার হইতে লইয়া কান্ত বাবুকে প্রদান করেন। এই বহুলাভকর জমীদারি আজও তাঁহার উত্তরাধিকারিণী মহারাণী স্বর্ণময়ী ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন।

এই জমীদারির অধিকারী পরীবর্ত্তন লইয়া মহা গণ্ড গোল হয়। সে সকল কথা আগামীবারে থাকিবে।

হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা।

যবদ্বীপ।

ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে লিখিত আছে, যে রাজর্ষি তুগ্র দ্বীপবাসী শত্রুদিগকে দমন করিবার জন্য স্বপুত্র ভুজ্যুকে সসৈন্যে নৌকা-যোগে সমুদ্রে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে বণিকদিগের সমুদ্র-যাত্রার উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় সমুদ্রযাত্রার নিষেধ নাই, তবে উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের তৃতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে যে পিতৃশ্রাদ্ধে জটিল ও মুণ্ড ব্রহ্মচারী, বহু যাজনশীল ব্রাহ্মণ, সমুদ্রযায়ী প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিবে না। রামায়ণের কিস্কিন্ধা কাণ্ডের চত্বারিংশ সর্গে লিখিত আছে যে সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধার্থে কপিদিগকে যবদ্বীপ যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। (১)

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ সমুদ্রপথে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন ও জাপানে যাইতেন। বৌদ্ধ প্রচারকদিগের সহবাসে প্রাচীন মার্গাবিলম্বীরা সনাতন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে সমুদ্রাযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অনুমান হয়। শাক্যমুনির পূর্ব্বেও যতিধর্ম্ম এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু শাক্যের সময় হইতে যতিধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। এই কারণেই যখন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইল, তখনই যতিধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ কমণ্ডলু ধারণ ও দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইল। বৃহন্নারদীয়ের রচয়িতা স্বজাতির পায়ে মহাশৃঙ্খল বাঁধিবার চেষ্টা পাইয়া-ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হন নাই। কহ্লণ কৃত রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে লিখিত আছে যে কাশ্মীরাধিপতি মিহিরকুল, সসৈন্য সিংহলে গিয়া সিংহলেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন।

সিংহলের ইতিহাসে মিহিরকুলের যুদ্ধযাত্রার প্রমাণ নাই, কিন্তু উত্তর সিংহলে দ্রাবিড় দেশীয় তামিলদিগের উপদ্রবের অনেক প্রমাণ আছে। দ্রাবিড়ান্তর্গত পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যের অধিপতিরা বারম্বার উত্তর সিংহল আক্রমণ করিয়াছিলেন; এখনও উত্তর সিংহলে জাফ্‌না বা যল্লনপট্টনম্ নামে খ্যাত প্রদেশ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহা মান্দ্রাজ প্রদেশের অংশ। সেখানে সেই তামিলভাষী কৃষ্ণকায় নর নারী ও সেই শিব মন্দির।

---

(১) যত্নবন্তোযবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
সুবর্ণরূপকং দ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতং।

হিন্দুরা যে বাণিজ্যাদি উপলক্ষে যবদ্বীপে যাইতেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন যবদ্বীপ ইংরেজাধিকৃত ছিল, তখন সর স্টাম্ফোর্ড রাফ্‌ল্‌স্ ঐ দ্বীপের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। তিনি প্রচুর গবেষণা করিয়া ঐ দ্বীপের ইতিহাস্ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে যবদ্বীপে হিন্দু বণিকেরা যাতায়াত করিত; তাহারাই দ্বীপবাসীদিগকে সভ্য করিয়াছিল। পরে ঐ দ্বীপে হিন্দু-সম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। (১) রাফল্‌স্ সাহেব ও ওলন্দাজ পুরাবৃত্ত-কারগণ যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহণ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১। যবদ্বীপবাসীরা এক্ষণে মুসলমান, কিন্তু উক্ত দ্বীপের অনেকাংশে হিন্দু দেব মন্দির ও হিন্দুদেব দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। স্থানান্তরে কোন কোন মূর্ত্তির প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। সিঙ্গাসান্ জনপদে গণেশের যে পাষাণময়ী মূর্ত্তি আছে তাহা নরকপালা-সনারূঢ়। মূর্ত্তির নাম বিতারগান অর্থাৎ গণদেব। (২)

সেই লম্বোদর গজানন দেখিয়া গণেশের মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য দেবের মূর্ত্তি বলিয়া প্রতীত হয় না। দুর্গার দশভূজা মূর্ত্তি নানা স্থানে আছে। কোন কোন মূর্ত্তির কয়েকটা হস্তভগ্ন হইয়াছে। কিন্তু অনেক মূর্ত্তির সমুদায় হস্ত বিদ্যমান আছে। দুর্গার সিংহ বাহিনী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না; প্রায় সর্ব্ব স্থলেই দেবী মহিষারূঢ়া হইয়া মহিষাসুরের কেশাকর্ষণ করিতেছেন, দেখা যায়। স্থানে স্থানে চতুরানন ও শূলপাণির মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। চতুর্ভুজ মূর্ত্তিরও অভাব নাই। কিন্তু শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের চিহ্ন বিলুপ্ত প্রায় হওয়ায় তাহা বিষ্ণু মূর্ত্তি কি না নিরূপণ করা সুকঠিন। ব্রহ্মানন, বরোবোদো,

---

(১ But though there can be little doubt that Java very early emerged from barbarism and rose to a great commercial prosperity, to determine the precise time at which these events took place is perhaps impossible; and to approach the solution of the question would involve an inquiry that will be better reserved till we come to treat of its languages, institutions, and antiquities. If in consideration of these topics it should be made to appear that in very remote ages these regions were civilised from Western India, and that an extensive Hiudu Empire once existed on Java, it will be reasonable to infer a commercial intercourse still earlier than the communication of laws and improvements.

Sir Stamford Raffles's History of Java. (1817) I.199.

(২) কাবী ভাষায় অকারস্থলে আকারের প্রয়োগ অনেক আছে।

প্রাহু, কেদেরি, সিংঙ্গসারী ও সুকু এই কয়েক স্থানেই দেব মূর্ত্তির অধিক সংখ্যা।

২। যবদ্বীপের পূর্ব্বে বালীদ্বীপ। ঐ দ্বীপ এক্ষণে যবদ্বীপের ন্যায় ওলন্দাজাধিকৃত, কিন্তু যৎকালে ইংরেজগণ ওলন্দাজদিগকে তাড়াইয়া যবদ্বীপ অধিকার করেন, তখন বালীদ্বীপ স্বাধীন ছিল। বালীদ্বীপ বাসীরা ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব, যম (দালম্), সাগর প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর উপাসনা করে। তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও চণ্ডাল এই পাঁচবর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের দুই শ্রেণী আছে। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাঁহারা আমিষ ভোজন করেন না। কিম্বদন্তী এই যে যবদ্বীপে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি অত্যাচার হইতে লাগিল। এই কারণে তাঁহাদের অনেকে বালীদ্বীপে গিয়া বাস করিলেন। দেশ ভেদে অবশ্যই আচার ভেদ হইয়াছে, কিন্তু ভারতের হিন্দুয়ানী ও বালির হিন্দুয়ানীতে যে ভেদ হইয়াছে কোন বাঙ্গালীই তাহা জানেন না। বলিতে কি, আমাদের সদৃশ মুখ-সর্ব্বস্ব জাতি পৃথিবীতে নাই। যদি আমাদের যথার্থ জ্ঞান তৃষ্ণা জন্মিত, তাহা হইলে যবদ্বীপে কিরূপে হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু ধর্ম্ম বিস্তৃত হইল, আমরা ঐ দ্বীপদ্বয়ে গিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতাম। পর জাতির ইতিহাস জানিতে আমাদের যতদূর কৌতুহল স্বজাতির ইতিহাস এবং স্বজাতির গৌরবের কথা জানিতে আমাদের তাদৃশ কৌতূহল নাই।

৩। যবদ্বীপের ভাষায় সংস্কৃত মূলক অনেক শব্দ আছে। তথাকার সাহিত্য কাবী ভাষায় লিখিত। এই ভাষার প্রায় ত্রিচতুর্থাংশ শব্দ সংস্কৃত মূলক। প্রাকৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া ও মহারাষ্ট্রী ভাষার সহিত সংস্কৃতের যেরূপ সম্বন্ধ, যবের কাবী ভাষার সহিত সংস্কৃতের সেইরূপ সম্বন্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যবদ্বীপের বর্ণমালায় মূল সংস্কৃত বর্ণমালা, কিন্তু তাহাতে খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ণ, থ, ধ, ফ, ভ, শ, ও ষ, এই কয়েকটি অক্ষর নাই। (১) অক্ষরগুলিকে অক্সার বলে, তাহা নাগরাক্ষরের বিকৃতি মাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। নাগরাক্ষরের লিপি কেবল ব্রম্বাননের একটি মন্দিরের প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে। সেই লিপিটি নিম্নে প্রকটিত হইল।

"বহুমান পুরশ্চকার তস্যঅ সর্ব্বধন"।

---

(১) রাফ্‌ল্‌স্ বলেন "শ" যবদ্বীপের বর্ণমালায় আছে, "ষ" ও "স" নাই; কিন্তু ইহা তাঁহার ভুল বোধ হয়। তিনি পালির বর্ণমালা সম্বন্ধেও ঐরূপ ভুল করিয়াছেন। দন্ত্য সকার মাত্র উভয় বর্ণমালায় আছে।

এক হইতে দশ পর্য্যন্ত কাবী ভাষার সংখ্যা বাচক শব্দ এই রূপ ;—এক, দুই, ত্রি, চাতোর, পঞ্চ, সৎ, সপ্ত, অষ্ট, নাব, দাস,। কাবী ভাষার কয়েকটি সাধারণ শব্দ বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহিত নিম্নে লিখিত হইল ;—

কাবী	বাঙ্গালা	কাবী	বাঙ্গালা
মনুস	মনুষ্য	নিদ্রা	নিদ্রা
ইস্ত্রি	স্ত্রী	সেত	শ্বেত
পিত	পিতা	কাল, কৃস্ন	কাল, কৃষ্ণ
মাত	মাতা	অগ্নি, ব্রাম, গেনি	অগ্নি
মস্তাক	মস্তক	জলানিদ্দি	জল
গ্রান	নাক, ঘ্রাণেন্দ্রিয়	সেলা	শিলা
কেস	কেশ	সুকার, ব্রাহস	শূকর, বরাহ
দান্তি	দন্ত	এণ্ড্যা	অণ্ড, ডিম্ব
পাদ	পাদ, পা	পক্ষি	পক্ষী
রাহ, লুদির	রক্ত, রুধির	সুরিয়, রদিতিয়া	সূর্য্য, আদিত্য
দিন	দিন	চন্দ্র	চন্দ্র
রাত্রি	রাত্রি	তার	তারা

(৪) যবদ্বীপের সাহিত্য কাবী ভাষায় লিখিত। ইহার প্রধান গ্রন্থ “ব্রাত যুদ” (ভারত যুদ্ধ)। এই গ্রন্থ মহাভারতোক্ত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধোপাখ্যানের রূপান্তর মাত্র। উপাখ্যান ভাগের মর্ম্ম এই যে হস্তিনায় রাজমহিষী ভীষ্মকে প্রসব করিয়া লোকান্তর গতা হইলে হস্তিনা-রাজ শান্তনু বিরাট রাজ পরাশরের নিকট এই, প্রস্তাব করেন, যে, বিরাট মহিষী শিশু ভীষ্মকে স্তন্য দিয়া পালন করিবেন। ইহাতে পরাশর ক্রোধান্বিত হইয়া শান্তনুর সহিত যুদ্ধ করেন; পরে দেবর্ষি নারদ মধ্যস্থ হইয়া সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। শান্তনু পরাশরকে রাজ্য দান করিলেন। পরাশরের পুত্র ব্যাস প্রৌঢ় হইলে, পরাশর তাঁহাকে রাজ্য দিয়া বানপ্রস্থ হইলেন; অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসের তিন পুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, মধ্যম পাণ্ডু, কনিষ্ঠ বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, পাণ্ডু বক্রশির, এবং বিদুর খঞ্জ ছিলেন। ব্যাস বানপ্রস্থ হইলে, পাণ্ডু রাজা হইলেন; পরে কিয়ৎকাল রাজ্য ভোগ করিয়া পাঁচ পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পুত্রদের নাম ধর্ম্মবংশ, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। পুত্রেরা বালক ছিল; এজন্য ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের অনুমতি লইয়া

রাজ্যভার লইলেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আপন পুত্র সুযোধনকে রাজ্য দিলেন; কিন্তু পাণ্ডবদিগকে একেবারে বঞ্চিত করা বড় অধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে অমৃত নামে বন প্রদেশে রাজ্য সংস্থাপন করিবার অনুমতি দিলেন, এবং বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া নগর নির্ম্মাণ জন্য ১০০০ মনুষ্য তাহাদের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। কিয়ৎ কাল পরে পাণ্ডবগণ হস্তিনা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাইবার মানসে কৃষ্ণকে মধ্যস্থ বা দূত নিযুক্ত করিয়া হস্তিনায় পাঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য-কার্য্য নিষ্ফল হইল। পরিশেষে কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবে মহাযুদ্ধ হইল। পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিলেন। যবদ্বীপ বাসীগণ বলিয়া থাকেন যে হস্তিনা (অস্তিন) এবং কুরুক্ষেত্র (কুরুক্সেত্র) যবদ্বীপে। পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে মহাভারতীয় উপাখ্যানে ও ব্রাত-যুদে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে; বিশেষত পরাশর (পুলসার) ঋষিকে বিরাটের রাজপদে অধিরূঢ় মনে করিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রাতযুদ কাব্যের অধিকাংশে ধর্ম্মবংশ (দের্মবংস) নামে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোন কোন স্থলে যুধিষ্ঠির (যুদিষ্টির) নামে বর্ণিত হইয়াছেন। দুর্যোধন স্থানে স্থানে স্বনামে উক্ত; কিন্তু অনেক স্থলে সুযোধন নামে অভিহিত। কৃষ্ণ (ক্রেস্ন) দেবাবতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কোন কোন নাম অতিশয় বিকৃত হইয়াছে। সুম্বদ্র যে সুভদ্রা ইহা শীঘ্র বুঝা যায় না; কিন্তু তিনি যখন কৃষ্ণের ভগিনী, অর্জুনের ভার্য্যা এবং অভিমন্যুর মাতা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামার বীরত্বের বর্ণনাতো আছেই, কিন্তু উত্তরা, শিখণ্ডি, ঘটোৎকচ, প্রভৃতির উল্লেখ থাকায় প্রতীত হইতেছে, যে কাব্যের রচয়িতার মহাভারতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

যবদ্বীপে হিন্দুজাতির সমাগমের প্রমাণ বাল্মীকি এবং রাফল্‌স্‌ হইতে সংগ্রহ করিলাম। উক্ত প্রমাণ প্রচুর এবং অখণ্ডনীয়। ভারতবর্ষীয় নাবিকগণ যে পাসিফিক্‌ মহাসাগরে যাইতেন, তদ্বিষয়েও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। মেষ্টার জন্‌ ক্রফোর্ড বলেন, যে পোলিনেসিয় দ্বীপপুঞ্জের ভাষায় প্রভূত সংস্কৃত মূলক শব্দ আছে (৫)। ইহাতে বোধ হয় যে, যব-

(৫) There is a large infusion of Sanskrit in all the Polynesian tongues....The Sanskrit is a more essential, necessary, and copious portion of the insular languages than Arabic....It exists in a state of as great purity as the articulation and al-

দ্বীপেরও পূর্ব্বতর ঘোর জলনিধিতে হিন্দুদিগের পোত বিচরণ করিত। যে হিন্দুরা এক্ষণে পদ্মা ও মেঘনা দেখিয়া ভয় পায়, ঐ সাগরবিহারী হিন্দুরা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ! একথা মনে করিলে, আমাদের ঘোরতর বিস্ময় ও আত্ম-গ্লানি জন্মে; কেবল বৃহন্নারদীয়ের শাসনে এই দুর্দ্দশা ঘটে নাই। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে যে দিন কুতবউদ্দিন অধিরূঢ় হইলেন, সেদিন অবধিই আমাদের সাহস, পৌরুষ ও সত্যানুরাগ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, এবং আমরা অধঃপাতে যাইতে লাগিলাম।

পূজার গল্প।

বিজয়কৃষ্ণের বয়স বাইশ বৎসর; বাড়ী বীরভূমির গোপালপুরে, রূপবান্; গুণবান্; বিদ্বান্। ছয় মাসের ঊর্দ্ধ হইল, এক সপ্তাহ মধ্যেই পিতা মাতা উভয়েরই বিয়োগ হইয়াছে। শরতের শশধরের উপর পাতলা মেঘের আবরণের মত বিজয়ের মুখের উপর একখানি ছায়া আছে; ডান চক্ষুর ডান কোণে, বাম চক্ষুর বাম কোণে একটু যেন জল-ভরা, জল-ভরা; নাসিকার দুই দিকে দুই চোখের দুই কোণে একটু যেন কালি-ভরা কালি-ভরা।

রথের পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়াছেন। মনে করিয়াছিলেন, পিতৃকৃত্যে বেশী খরচ পত্র হইয়াছে, তাহাতে কালাশৌচ, এবার দুর্গোৎসব করিবেন না। সে কথা রহিল না। অনাহূত গ্রাম্য সমিতির সকলেই বলিল, 'মহামায়াকে আনিতেই হইবে। তবে সংকল্প রত্নমালার নামে করিলেই চলিবে।'

রত্নমালা বিজয়কৃষ্ণের ভগিনী। বাসর-বিধবা। বয়স বিংশতি বৎসর। বিজয় কৃষ্ণের বৃহৎ পরিবার। কুটুম্ব, কুটুম্বিনীতে, দাস, দাসী, কৃষাণ, কুপোষ্যে, দুই বেলায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ এক শত পাতা পড়ে। রত্নমালা মাতা দুর্গমণি জীবিত থাকিতেই এই বৃহৎ পরিবারের সহকর্ত্রী ছিলেন। এখন এক কর্ত্রী। বেঁটে খেটে, কর্ম্মিষ্ঠা, মুখরা, পবিত্রা।

---

phabets of the Archipelago would admit, nearly unmixed with any modern dialect of which it is a part; and apparently in a state of original purity....It is pure and abundant as each dialect of the same tongue is improved, and ra e and corrupt as the language is popular.

History of the Indian Archipelago by John Crawford F. R. S. Vol: II, chap., V.

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "রত্নমালা এবার তোমার নামে সংকল্প হইবে।"

রত্ন। কিসের সংকল্প দাদা?

বিজয়। দুর্গোৎসবের সংকল্প। আমাদের যে কালাশৌচ।

রত্ন। দাদা, আমারত সংকল্পও নাই, বিকল্পও নাই; আমার যে মহা-অশৌচ। আমি যে উচ্ছব নিয়ে আছি, তাই ভাল; আমার আবার দুর্গোৎসব কেন?

বিজয়। কেন, তোমার পূজা হইলে ক্ষতি কি?

রত্ন। ক্ষতি নাই? মহা ক্ষতি। আমার ঠাকুর, আমি বরণ করিব না, বরণ ডালা ছোঁব না,—অমন অর্দ্ধেক পূজা আমি করি না। মহিষের উপর আমার মত ঠেঁটী পরা ঠাকুর আনিতে পার,—আমার নামে সংকল্প হইবে।

বিজয়। তোমার সকল কথা সকল সময় বুঝিতে পারি না বোন্।

রত্ন। তবে তুমি কি লেখা পড়া শিখিলে দাদা? আবার এখন ধর্ম্ম কথা কও। আপনার মায়ের পেটের বহিনের মর্ম্ম কথাই বুঝিলে না, তবে আবার কি রকম ধর্ম্ম কথা কও?

বিজয়। আমি অত ভাবি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমার নামে সংকল্প হইবে, তোমার আহ্লাদ হইবে।

রত্ন। তা, তোমার আর মুখ ফিরাইয়া কাজ কি? তুমি যা মনে করিয়াছ, তাই হইবে। আমার এখনই আহ্লাদ হইতেছে। আমার নামেই সংকল্প হইবে; তবে রামজীবন পুরের আশ্বিনের কিস্তির টাকাটা আমায় রাখিতে হইবে; আমি অষ্টমীর ভোগে দিব।

বিজয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তাহাই হইবে।"

রামজীবনপুর রত্নমালার স্বামী ত্যক্ত সম্পত্তি। তিন মাস অন্তর ইজারদার নব্বই টাকা করিয়া আনিয়া রত্নমালাকে দিত। রত্নমালা রসীদ দিয়া টাকাগুলি গণিয়া সিন্দুকে তুলিতেন। ইজারদারকে আহারাদি করাইয়া তাহারই হস্তে প্রতিবার, আশী পঁচাশী টাকা আপন শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিতেন। বলিয়া দিতেন, বড় গিন্নীর এই, মেজো গিন্নীর এই, আমার দেখন-হাসির এই, (রত্নমালা নিজে সেজো বউ, আর ছোট বউ—তাঁর দেখন-হাসি); আমার গাঁট-ছড়ার এই; আর এই চারি টাকা—এইখান হইতেই সন্দেশ লইয়া যাইবে। গোপালপুরের আধাছানার সন্দেশ, সে অঞ্চলে বড় প্রসিদ্ধ।

সদ্য বিধবা রত্নমালা বিবাহের পর দিন শ্বশুরালয়ে ক্রন্দনের রোলের মধ্যে নীতা হইয়া, বিধবা ননদের অঞ্চলের সহিত আপনার অঞ্চলের গ্রন্থি দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই তোমায় আমায় গাঁটছড়ার বন্ধন হইল।' সেই অবধি তিনি তাঁহাকে 'আমার গাঁট্‌-ছড়া' বলেন।

আজি মহাষ্টমী। গোপালপুরের বাঁড়ুয্যেদের পূজার মত পূজা। সপ্তমীর ভোজের ভাঁড়ে ও শালপাতে দিঘীর পাড়ে পর্ব্বতাকার হইয়াছে। কাকগুলা এঁটোপাতের ভাত খাইতেছে, কি ছড়াইতেছে, তাহা বুঝা যায় না। কুক্কুরগুলা কলহ কোলাহল করিতে করিতে, কাকেদের উপর গিয়া পড়িতেছে; তাহার দুই চারিটা লাফাইয়া লাফাইয়া সরিয়া যাইতেছে; দুই চারিটা বা একখানা পাখা তুলিয়া, একটু উচু হইয়া, একটু উড়িয়া বসিতেছে।

রত্নমালা অতি প্রত্যুষে স্নানাহ্নিক করিয়াছেন। পরিধানে হুবরাজ-পুরের মট্‌কা। ঘাড়ে বেড় দিয়া কোমরে গোঁজা। লম্বিত কেশের নীচে একটি গ্রন্থি আছে। কতকগুলি কেশ কাণের উপর ফুলো ফুলো; কাণ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রত্নমালা আজি সর্ব্বত্র। যেখানে নৈবেদ্য হইতেছে, সেখানে প্রতি নৈবেদ্যের খুরী মিলাইয়া দেখিতেছেন। গঙ্গাজলের ভার আসিল নিজেই নামাইয়া লইলেন। ঠাকুর ঘরে রাখিয়া আসিলেন। গোয়ালবাড়ীর ছাই গাদার পার্শ্বে মাছ কোটা হইতেছে। তিনি অল্‌কীকে বলিলেন, 'ঐ ঝুড়িটা তোল্; তাহার ভিতর হইতে একরাশি কোটা মাছ বাহির হইল। গুল্‌কীকে বলিলেন, 'ঐ ছাই গাদায় কি?' গুল্‌কী ছাই গুলা সরাইল। দুইটা রুয়ের মূড়া বাহির হইল। রত্নমালা যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, "তোরাত তের জনেই চোর হইলি?"

ও দিকে অষ্টকুমারীর সাজ সজ্জা হইতেছে। আট জন সধবা নাপিতানী আটজন কুমারীকে আল্‌তা পরাইয়া দিয়াছে। এখন আট জন সধবা কুটুম্বিনী তাহাদিগের কেশ বিন্যাস করিয়া দিল। গন্ধ তৈলের গন্ধে সে স্থল আমো দিত। রত্নমালা সেইখানে যাইবা মাত্র, তাহারা ঢুপ্ ঢাপ্ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রত্নমালা এ দিকে বড় মুখরা; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহা-কেও আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন না।

পূর্ব্ব হইতেই সকলে শুনিয়াছিল, যে রত্নমালা অষ্টকুমারীর পূজা করিবেন না। তিনি নাকি তাঁহার গাঁটছড়ার কাছে বলিয়াছিলেন, "এ জন্মে এই জন্ম-কুমারী, আমি আবার কুমারী পূজা করিব?"

যাহাই হোক, কথাটা বিজয়কৃষ্ণের কাণে গিয়াছিল। যখন রন্ধনশালার দাওয়ায় রত্নমালা ভোগ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, তখন তাঁহার দেখা পাইয়া বিজয় বলিলেন, "রত্নমালা! তুমি নাকি অষ্টকুমারীর পূজা করিবে না?"

রত্ন। দাদা আমারই কে পূজা করে, তাহারই স্থির নাই, আমি আবার আটটা ছুঁড়ীর পা পূজা করিতে যাইব?

বিজয়। আমাদের পুরুষ পুরুষের প্রথা আজি তুমি মানিবে না?

রত্ন। তোমাদের প্রথা, তোমরা মানিও। এবার ত তোমার গোপালপুরের বাঁড়ুয্যেদের পূজা নয়। আমাদের হরিপুরের পূজা; আমরা গঙ্গাজলই বুঝি।

হরিপুরে রত্নমালার শ্বশুরগোষ্ঠী মধ্যে যে বাড়ীতে পূজা হইত, তাহারা বড় কৃপণ; সে পূজা সত্য সত্যই গঙ্গাজল বিল্বদলের বটে।

বিজয়কৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা, সে কথা এখন থাকুক, তোমার পূজা যে অঙ্গহীন হইবে, তাহার কি?"

রত্ন। তা হয় হবে, আমারই হবে; অধর্ম্ম হয়, আমারই হবে। ছুঁড়ী কয়টা বাড়ীতে আসিয়াই আমার পায় হাত দিয়া একবারে প্রণাম করিয়াছে। আলতা পরিয়া একবার করিয়াছে। চুল বাঁধিবার পর, এই মাত্র প্রণাম করিল। আমি ও গুলাকে পূজা করিতে, প্রণাম করিতে পারিব না।

বিজয় অর্দ্ধস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এতদূর হইতে মেয়ে গুলিকে আনান গেল, এখন কি করা যায়?"

প্রৌঢ়া ঠাকুরাণীদিদি পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; বলিলেন, "তা রত্ন মন্দ কি বলিতেছে? সমানে সমানে নমস্কার হয়ত পাল্‌টা পালটি চলে; পায়ে ধরিয়া প্রণাম করার পালটা পালটি চলে না ভাই।"

বিজয় রত্নমালার দিকে পিছন ফিরিয়া, অল্প মৃদুস্বরে উত্তরচ্ছলে বলিলেন, "তা ঠানদি তোমরা যার পা পূজা কর, তাকেই আবার পায়ে ধরাও, মনে করিলে, তোমরা সকলই পার।" ঠাকুরাণী দিদি একটু হাসিলেন মাত্র। ঠাকুর দাদার বড় স্ত্রৈণ বলিয়া সুখ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল।

রত্ন। তা, ঠানদির হয়ে আমিই বলি, তোমরাও একজনের পা পূজা করিয়া, আবার তাকেই পায়ে ধরাও। ওটা কেবল আমাদের এক-চেটে নয়।

বিজয়। তোমাকে ঠান্‌দির হয়ে উত্তর করিতে কে সাধিল?—কৈ ঠান্‌দিদি! আমরা কখন পূজনীয়ার পূজা লই কি?

রত্ন। লও বৈ কি? এই দুই বৎসর না যাইতে তুমিই লইবে।

বিজয়। তাকি কখন হয়?

রত্ন। নিতেই হবে। ঠান্‌দিদি তুমি সাক্ষী রহিলে।

ঠাকুরাণীদিদি বলিলেন, "এমন ভাই বোন্ কি কেউ কোথাও দেখিয়াছে? পিটে পিটে কিন্তু, এখনও সেই ছেলে বেলার মত তেমনই ঝগড়া।"

পূর্ব্বতন প্রথা অনুসারে গোপালপুরের বাঁড়ুয্যে বাড়ী অষ্টমীতে অষ্টকুমারীর পূজা হয়। প্রত্যেককে মটরা চেলী, সোঁসাজ সিন্দুর-চুপড়ি ও সোণার কঙ্কণ দিতে হয়। সেবার কুমারীর পূজা হইল না। তবে যথারীতি অলঙ্কার বস্ত্রাদি দেওয়া হইল।

ছয়টি কুমারী গ্রামেরই। দুইটিকে দূরবর্ত্তী ভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক যত্ন করিয়া রত্নমালা আনাইয়া ছিলেন। গ্রামের গুলি বস্ত্রাদি লইয়া আহার করিয়া আপন আপন বাড়ীতে চলিয়া গেল। অপর দুইটি পূজার কয়দিনের জন্য রহিল।

একটির বয়স দশ, একটির একাদশ। ছোটটির সীঁথে সাজন্ত চুল; কপাল জোড়া ভুরু। কিন্তু চক্ষু চঞ্চল। দাঁতগুলি ছোট ছোট, ঠোঁট পাতলা পাতলা—কিন্তু কথায় খুব্ ঠক্ ঠকে। কল কল হাসে; থর থর হাঁটে; হাত নাড়িয়া কথা কয়। আর চারিদিকে চাহিতে থাকে। তাহার নাম বিজলী।

বড়টির ঘাড়টি একটু বাঁকান, একটু নোয়ান। চোখ দুটি ভাসা ভাসা; দৃষ্টি স্থির; গতি ধীর; অল্প পুরুপুরু ঠোঁটে, পাতলা পাতলা হাসি মাখান; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। যে হাসি উঠেও না, গড়ায়ও না; ঐ মাখানই থাকে। নাম কোমলা।

বিজলী কোমলা আর পাঁচজন কুটুম্বকন্যার সঙ্গে বড় ঘরে পানের সজ্জায় রহিল।

ধুনা পোড়ানর বাজনা উঠিল। কুণ্ডলীকৃত মার্জ্জনী মস্তকে আসীনা সধবা বিধবায় পূজার উঠান পরিপূর্ণ হইল। জুম্বো জুম্বো, কাল কাল, ব্রাহ্মণ যুবকেরা সারির মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। নারীগণের হস্তে মৃত্তিকার তাল দিতেছে। হাতে মাথায় মালসী বসাইতেছে। জ্বলন্ত কুলের কাষ্ঠ দিতেছে। ধূনা দিতেছে। দশ বিশটা মালসী একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের চণ্ডীমূর্ত্তিও যেন একরূপ জ্বলন্ত হাসি হাসিতে লাগিল। সকলেই ধূনা পোড়াইল। রত্নমালা সে দিকেই আসিলেন না। তখন অন্তর বাড়ীতে কেহ নাই বলিলেই চলে; কেবল রত্নমালা বিজলীকে আর কোমলাকে বাহিরে যাইতে দেন নাই। বিজলী বলিল, "কেন দিদি এখন বাহিরে যাইব না?" রত্নমালা বলিলেন, "এখন ওখানে গেলে, পুড়িয়া যাইবি যে ছুঁড়ি।" বিজলী বলিল "তোমাদের বাড়ী এমন?" কোমলা শুধুই হাসিল।

ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হয় হয়, এমন সময় বিজয় রত্নমালার কাছে, দক্ষিণা ও পান লইতে আসিলেন। রত্ন অঞ্চল হইতে দক্ষিণার টাকা দিলেন। আর বলিলেন, "চল, ঐ বড় ঘরের পাঁড়িতে চল।" সেইখানে আসিয়া বলিলেন; "দে লো দাদাকে পান বাহির করিয়া দে।" বিজলী তাড়াতাড়ি কতকগুলা পান আনিয়া 'এই নেও' বলিয়া বিজয়ের হস্তে দিতে লাগিল। বিজয় বলিলেন, "এই মেয়েটি বেশ চট্‌পটে।" কোমলা থালে করিয়া কতকগুলি পান আনিয়া বিজয়ের সম্মুখে ধীরে রাখিয়া দিল। বিজয় কোমলার দিকে একবার দেখিয়া আবার বিজলীর দিকে চাহিলেন। বিজলী বলিল "আরও পান দিব?" বিজয় "এখন আর না" বলিয়া চলিয়া গেলেন। রত্নমালা বলিল, "বুঝেছি! ইহার পর চাই।—যে টুকু বুঝিতে বাকি রহিল, আর বৎসর বুঝিব।"

সেই আর বৎসর আসিল। বিজয়কৃষ্ণের সংকল্পের প্রথম পূজা। তেমনই মহাষ্টমী সুপ্রভাত। তেমনই করিয়া সুপাল সিং দেহড়ির খাটিয়ায় সঙের শিরের মত কাত হইয়া ঝিমাইতেছে। তেমনই করিয়া সোণাসিং, রূপাসিং রোয়াকে পা-চারি করিতেছে। তেমনই করিয়া রত্নমালা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। কথাই ছিল, কুমারীরা আর বৎসর বিনা অর্চ্চনায় গিয়াছিল, এবার তাহারাই আসিবে। গ্রামের, ভিন্ন গ্রামের সকলেই আসিয়াছে।

বিজলী কোমলা, তেমনই বড় ঘরে পানের সজ্জায় আছে। বিজলীর দশে একাদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে ; বিশেষ বিভেদ লক্ষিত হইতেছে না। সেই চল চল লোচন ; কল কল হাস ; থর থর গতি ; আর ঠক্‌ঠকে কথা বার্ত্তা। কিন্তু কোমলার এই এক বৎসরে বড়ই বিভেদ হইয়াছে। সমস্ত শরীরের উপর তারুণ্যের একটি লাবণ্যময়ী ছায়া পড়িয়াছে। ঘোলাটে ঘোলাটে জোৎস্নায়, সন্ধ্যার সময়ে ভূরি কুসুমিতা যূথিকা-লতা যেমন দেখায়, তেমনই দেখাইতেছে।

অষ্ট কুমারীর অর্চ্চনা হইতে লাগিল। কুমারীগুলি একদিকে সারি দিয়া আপন আপন আসনে বসিল। সম্মুখে সুপুরুষ পূজার্থী বিজয়কৃষ্ণ। পরিধান রক্ত পট্টবস্ত্র। রক্ত পট্টবস্ত্রের উত্তরী যোগপাটার মত করিয়া বুকে বাঁধা। বিজয়কৃষ্ণ একবার কুমারীগুলিকে দেখিতে লাগিলেন। ছোট একটি ছয় বৎসরের মেয়ে ; সেও এমন সময় আপনার গুরুত্ব বুঝিয়াছে। গম্ভীর মুখে স্থিরদৃষ্টিতে বসিয়া আছে। আর একটি তাহার চেয়ে একটু বড় ; তাহার ঝাপ্‌টা চুটিতে একটু ডাগর ডাগর ফাঁস দেওয়া। সে নত হইয়া বসিয়া আছে ; সেই ফাঁসগুলি দুল দুল দুলিতেছে। সেও গম্ভীর। তাহার অপেক্ষা একটি বড় মেয়ের কাণ দুটি করবীর পুষ্পের মত ; তাহাতে সবুজ দুল। সে টিপিটিপি হাসিতেছে। বিজলী গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল ; কিন্তু চক্ষু একবার পুরোহিতের দিকে, একবার প্রতিমার দিকে, একবার সম্মুখস্থ সিঁদুর চুপড়ির দিকে ; বিজয়ের চক্ষুর দিকে চক্ষু পড়িতেই হাসিয়া ফেলিল। ঘাড় ফিরাইয়া কোমলাকে অস্ফুটস্বরে বলিল "হাতীতে কলাগাছ খাইতে ভাল বাসে, তাই গণেশ কলাবৌকে বিয়ে করিয়াছে, নয় ভাই?" কোমলা ভ্রূকুটি করিয়া অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল "মেয়েদের খাবার জন্য পুরুষেরা বিবাহ করে বুঝি?" বিজলী বলিল "তা নয় ত কি জন্য করে?"

বিজয়কৃষ্ণ ততক্ষণ দশভুজার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার পর বিজলীর মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন। বিজলী সে দৃষ্টি সহিল না— মুখ ফিরাইয়া পুনরুক্তি করিয়া কোমলাকে মৃদুস্বরে বলিল, "খাবার জন্যই ত বিবাহ করে।"

বিজয় একে একে সকল কুমারীগুলির পাদ পূজা করিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। পরে একে একে ছয়টি বালিকার দক্ষিণ হস্তে কঙ্কণ পরাইয়া দিলেন। বিজলী বামহস্ত বাড়াইয়া দিল ; বিজয় কঙ্কণ-গাছটি সেই হস্তেই পরাইলেন। সকলে বলিল, "ও কি হইল, বাম হাতে পরাইলে কেন?" বিজয় তখন খুলিতে

গেলেন। তাহারাই আবার নিষেধ করিল। "বলিল পরাইয়াছ আর খুলিও না।" কেহ কেহ বলিল ; "তা এক হাতে হলেই হলো।" মুরুব্বিরা বলিল, "তাও কি কখন হয়? ওঁদের কৌলিকপ্রথা রাখিবেন না?" বিজয় যেন কত কুকর্ম্মই করিয়াছেন। একটু হতভম্ব হইয়া, আর যে একগাছি কঙ্কণ ছিল, তাহাই বিজলীর দক্ষিণহস্তে পরাইয়া দিলেন। বিজলী মনে মনে বলিল "বেশত আমার দুহাতে দুগাছি হইল।" কিন্তু কোমলার হাতে কি দেওয়া হইবে? ভিতর চণ্ডীমণ্ডপে রত্নমালা ছিলেন, বিজয় তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "যদি থাকে ত সিন্দুক হইতে একগাছি কঙ্কণ লইয়া এসো।" রত্নমালা চকিতের মধ্যে একগাছি বড় কঙ্কণ আনিয়া বিজয়ের হাতে দিয়া বলিল. "এই লও, এ মায়ের কঙ্কণ, বৌ এলে পরিবার কথা।" বিজয় বলিলেন, "মা কিছু বলিয়াছিলেন কি?" রত্ন বলিল—"না তিনি আর বলিলেন কৈ? বাবার তেমন হওয়ার পর, যে ছয় দিন বিছানায় ছিলেন, কোন কথাই ত কন নাই।" বলিতে বলিতে রত্নমালা চক্ষে অঞ্চল দিলেন। বিজয়ও বাষ্পাকুল লোচনে কঙ্কণগাছি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন। "হোক, মায়ের কঙ্কণ আর কাহারও পরিয়া কাজ নাই, মাই পরুক।" বলিয়া কোমলার দক্ষিণহস্তে সেই বৃহৎ কঙ্কণ পরাইয়া দিলেন। দিয়া একবার মহাশক্তির মুখের পানে চাহিলেন। বিজলী, অমনই কোমলার কাণে কাণে বলিল, "তোর ত বেশ ছেলে! যেমন দুর্গার ছেলের মত, নয়?" কোমলা বলিল, "তা বেশই ত।" বিজয় কুমারী-পূজা শেষ করিয়া সর্ব্বশেষ প্রণাম, কোমলার পদতলের কাছে করিলেন।

রত্নমালা বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুরাণী-দিদীকে ডাকিয়া বলিল, "যে টুকু বাকি ছিল, বুঝিয়াছি। এখন দিদি তোমার আমার হাত যশ।"

পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন কুটুম্ব-কন্যারা একে একে বিদায় লইতে লাগিল। রত্নমালা খিড়্‌কী-পথের উপর কাহাকেও গোরুর গাড়ীতে, কাহাকেও পালকীতে হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিতে লাগিলেন। গাড়ীর মধ্যে পালকীর ভিতরে হাঁড়ী ভরিয়া সন্দেশ দিলেন। গাড়োয়ান বেহারাদের ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলপান লাড়ু দিলেন। বিজয় একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিজলী তাঁহার দিকে গিয়া বলিল, "আমরা চলিলাম।" বিজয় বলিলেন "এসো।" কোমলাও বিজলীর সঙ্গে গিয়াছিল; কিছুই বলিতে পারিল

না। কেবল নখে নখ খুঁটিয়া চলিয়া আসিল। বিজয় রত্নমালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাকে খাবার দিয়াছ?" রত্নমালা বলিল; "দিয়াছি, সকলকেই দিয়াছি, মাকে দিয়াছি, মার বৌকেও দিয়াছি।" বিজয় বলিলেন, "মায়ের আবার বৌ কোথা হতে হইল!" রত্নমালা বলিলেন,—"না বিয়িয়ে কানায়ের মা হইতে পারিল। আর বিজলীর ঠাকুরণ হতে পারিবে না? কাল যে, ওরা দুজনে 'বৌ ঠাকুরণ' পাতাইয়াছে—আমার, দুখানা নূতন কস্তাপেড়ে সাড়ী গেছে, আর পাঁচ সিকা গেছে, তোমায় কিন্তু দিতে হবে দাদা।'

বিজলী মাসীর সঙ্গে পালকীতে উঠিয়াছিল। বলিল, "তা তোমাদের কাপড় তোমরা লও, এই আমার খানি লও,—ঠাকুরণ! তোর খানি দেত লা।—আর পাঁচ সিকা সন্দেশের দিয়ে ছিলে, তা সন্দেশ ত নাই, এই হাঁড়ীর সন্দেশ লও।" রত্নমালা বলিলেন, "আমি আমার দাদার কাছে দাম চাহিতেছি, তা তোমার, এর মধ্যে, এত মাথা ব্যথা পড়িল কেন? এত ব্যথার ব্যথী এত দিন কোথায় ছিলি?" বিজলী বলিল, "ব্যথার জন্যে নয়,—আমাদের জন্যে ত এত খোঁটা! তা তোমাদের কাপড় লও না কেন?" রত্নমালা বলিলেন—"ফাল্গুন মাসে এসো দিদি—সব কাপড় চোপড় বুঝিয়া লইব।"

বিজলী। ফাল্গুন মাসে কি গা?

রত্নমালা। দাদার বিয়ে।

বিজলী। কোথায় বিয়া হইবে?

রত্নমালা। তোমাদেরই গ্রামে।

পালকি চলিয়াছে। বিজলী মাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসী কোথায় বিবাহ হবে গা?" মাসী বলিল "আমাদের গ্রামে ওঁদের ঘর, আর কৈ? তোমার বাপেরাইত এঁদের পালটি ঘর। বিয়ে হয় ত,তোমার সঙ্গেই হইবে।" তখন বিজয় কর্ত্তৃক বাম হাতে কঙ্কণ পরান, হঠাৎ বিজলীর মনে পড়িল। সেই কঙ্কণের দিকে দেখিল; মনে হইল, এখনই বুঝি বিজয় কঙ্কণ পরাইল। পার্শ্বে প্রতিমা আছে মনে করিয়া, সেই দিকে মুখ ফিরাইল। দেখিল, দূরে দিঘীর পাড়ে কলা বাগানে হাতীতে কলা গাছ ভাঙ্গিতেছে। ইচ্ছা হইল, মাসীকে জিজ্ঞাসা করে, 'যে, পুরুষে কি খাবার জন্য বিবাহ করে?' মুখ ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিল না। বুক হইতে মাথার দিকে কেমন এক রূপ ঝাঁঝের মত ছুটিতে লাগিল। হাতী একটা আস্ত কলাগাছ শুঁড়ে জড়াইয়া লইয়া সেই দিকেই আসিতেছে। একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল। হুম্মা হুম্মা করিতে করিতে পালকি দৌড়িতে লাগিল।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। মনোরম প্রভাত। ঝিরি ঝিরি বায়ু বহিতেছে। ধীরি ধীরি গাছের নীচের দিকের পাতা গুলি দুলিতেছে। বিজয়কৃষ্ণের বাটীর সম্মুখস্থ বকুল গাছে দুইটা দৈয়াল অতি প্রত্যুষ হইতে তিন ঘণ্টা সমানে আখড়াই তান করতপ করিতেছে। তোমরা

জান, কাহার জন্য তাহারা এই গান করে? আর কে তাহাদের এই আখ্‌ড়া ঘরে তালিম দেয়?

বিজয়ের বহির্বাটিতে বৈঠকখানার কেবল গোমস্তা আর একজন খানসামা অগাধ নিদ্রাভিভূত; ছেলে বুড়া আর কেহ নাই। দেহুড়িতে চারিজন দরওয়ান শুইয়া আছে। বাহিরের বাড়ী যেন পালান বাড়ী। গাড়ু গুলা স্থান ভ্রষ্ট; গামছা গুলা সিঁড়ির উপর; আর চুণে হলুদে সমস্তই বিকৃত। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিজয়কৃষ্ণ দলবলে বিবাহ করিতে গিয়াছেন।

ঠাকুরাণীদিদি অর্দ্ধশয়ানা; তাঁহার পার্শ্বে মেঝেতে বসিয়া রত্নমালা চুল কুলাইতেছেন। গোছা গোছা চুল খুলিয়া আসিতেছে, তাহাই বাম হাতে জড় করিতেছেন।

রত্ন। তা যাই হোক দিদি, আজি বেহারারা বাড়ীর মধ্যে পাল্কী লইয়া আসিলে, তুমি আমাকে ধরিয়া রাখিও—আমি সকলের সাক্ষাতে নাচিয়া না ফেলি।

ঠাকুরাণী। তা আহ্লাদের দিন নাচিলেই বা।

রত্ন। ছি! লজ্জা করে যে!

ঠাকুরাণী। লজ্জা করিলে আর নাচিতে পারিবে কেন?

রত্ন। যদি আহ্লাদে লজ্জা করিতে ভুলিয়া যাই।

ঠাকুরাণী। নাচিবে।

রত্ন। তা হবে না দিদি! তুমি আমার কোমর ধরিও।

ঠাকুরাণী। তার জন্য আর ভাবনা কেন?

রত্ন। ঠাকুরাণী দিদি—মা মরে অবধি, আমার আর কিছুতেই সোয়াস্তি নাই। কিসে দাদার মনের মত বৌ আনিয়া ঘরে তুলিব, আমার অষ্ট-প্রহর সেই ভাবনাই ছিল। এ দুবৎসর আমার আর ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই নাই। একে নিকটে দাদাদের ঘর জুটে না, তার পর, কি পছন্দ কি অপছন্দ তা ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারি নাই, যে একটু খরখর আনিব, না মাটো মাটো আনিব? এইজন্য দুই রকমই জুটাইয়া ছিলাম।

ঠকুরাণী দিদি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন "তোমাকে যখন অত ভাল বাসে, তখন খর নইলে ওর মন উঠিবে কেন, বোন্?"

রত্ন হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "তোমাসা এখন থাক্। আমি মায়ের পেটের বোন্, আমায়ত ভাল বাসিবেই। আমার সঙ্গে যেমন নিত্য বিবাদ, পরের মেয়ে ঘরে এনে, তেমনই নিত্য কলহ, দাদার ভাল লাগিবে কি?"

ঠাকুরাণী দিদি এবার গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মস্তকের উপর দেওয়ালে কাত্যায়নীর চিত্র ছিল। সেই দিকে হস্ত তুলিয়া বলিলেন; "জগদম্বা করুন, আমি এই প্রাতঃবাক্যে বলিতেছি, তোমাদের ভাই বোনে যেমন বিবাদ, তেমনই বিবাদ বিজয় বিজলীতে যেন চিরদিনই থাকে।"

তখন দুই জনেই সজলচক্ষে স্নানার্থ গমন করিলেন। যাইবার সময় উত্তর দ্বারী ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ওলো কোম্‌লা মাসী! ওঠ না; তুমি বৌ বেটাকে বরণ করিবে, তোমার আর ঘুমান কেন?" কোমলা হাসি-মাখান মুখে বাহিরে আসিল। কোমলার ললাটের সিন্দুরবিন্দু বসন্তের শাল্মলীর মত রগ্ রগ্ করিতেছে। কোমলার বিবাহ হইয়াছে। ছয় মাস পূর্ব্বে যাহা লাবণ্যের ছায়া দেখিয়াছিলাম, এখন সেই লাবণ্যই এক ফোঁটা সিন্দুরের গুণে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

একটু বেলা হইলেই মহা কোলাহল হইতে লাগিল। চূণ-হরিদ্রাক্ত বস্ত্রে বরযাত্র সকল দলে দলে আসিয়া অঙ্গন পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। এখানেও কে কোথা হইতে গামলা গামলা চুণে-হলুদ আনিয়া উপস্থিত। মোটা মোটা বালা হাতে, বড় বড় লাঠি কাঁধে, সর্দ্দার সকল আসিতে লাগিল, সকলেরই মুখে একই কথা, "খাইয়েছে খুব্, মশা বড়।" তাহার পর চারি দল রোসনচৌকির বাদ্য ধ্বনির সঙ্গে পঞ্চাশজন বেহারার বিকট আওয়াজ। তাই শুনা যাইতেছে, আর কিছুই শুনা যায় না। দুইজন ঝি শুদ্ধ, আটজন বেহারার কাঁধে একখানা পালকী ভিতর বাড়ীতে উপস্থিত। জল ঢালিয়া পিছল করিয়াছে। চুণে হলুদে উঠান লাল করিয়াছে; তাহার উপর লাল কাপড় পাতিল। সেই কাপড়ের উপর পয়সা ছড়াইল। সিকি ছড়াইল, টাকা ছড়াইলে তবে, বেহারারা পালকী নামাইল। কোমলা কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া ঠাকুর বাড়ীতে প্রণাম করিতে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে প্রণাম করিয়া আসিয়া কন্যা বরকে প্রণাম করিবেন, এই প্রথা। বিজয় বড় ঘরের রোয়াকে পশ্চিমাস্যে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুরাণী দিদি কন্যাকে হাঁটাইয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইলেন; গাঁটছড়ার একদিক কন্যার গলায় বেড় দিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। অপর দিকটি বিজয়কে ধরিতে বলিলেন। কন্যা ধীরে ধীরে বিজয়ের পদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। রত্নমালা বলিল "কেমন দাদা! তোমরা যাকে প্রণাম কর, তার প্রণাম লওত?" বিজয় ঘাড় নত করিয়া বলিলেন "তোমার মনে এতটা ছিল, বুঝিতে পারি নাই।" ঠাকুরাণীদিদি বলিলেন, "আর আমার মনে কতটা আছে, তা জান কি? ইহার পালটা পায়ে ধরা যে দিন হবে; সেই দিন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" সাক্ষী রমণীবৃন্দ ঝঙ্কারে হুলু দিয়া উঠিল। বাহিরে সানাই বাজিল;—

"হাসি পায় হে পায়,—ধরা দিন—পড়্‌লে মনে।"

জয় জগদম্বে।

"উঠ উঠ পুরবাসি উঠ নিদ্রা ত্যজি সবে
ত্রিভুবন ভয়-হরা ভবানী এলেন ভবে।"

শুন রে আনন্দ ধ্বনি শুন সর্ব্বজনে।
উঠিছে ভারত হতে, উঠিছে গগনে।

জিনিয়া বিজয় রোল বাজিতেছে ঢাক ঢোল
বাজিতেছে শঙ্খ ঘণ্টা বিপুল উৎসবে
চতুর্দ্দিক নিনাদিত জয় জয় রবে।

শুভদিন সুপ্রভাত অতি চমৎকার,
আর্য্যধাম হতে যেন গিয়াছে আঁধার
সুখের সুবর্ণভাতি তাড়ায়াছে কালরাতি,
হাসিতেছে চরাচর উৎফুল্ল আননে,
জগৎ জেগেছে যেন নবীন জীবনে।

ধূপ ধূনা পুষ্প আর চন্দনের গন্ধ
সুধীর সমীর লয়ে চলে মন্দ মন্দ ;
মনোহর পরিমল, সুবাসিত ধরাতল,
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমে আকুলিত হয়ে,
স্বর্গীয় সৌরভ বহে নরের আলয়ে।

কিবা ভাগ্যধর ধনী কিবা দুঃখী দীন,
সংসারের গৃহী কিবা কিবা উদাসীন,
সর্ব্ববিধ জনরাজি উল্লাসে সজীব আজি,
উথলে সবার হৃদে উৎসাহ উচ্ছ্বাস,
সবার বদনে আজি হর্ষের বিকাশ॥

পথের কাঙ্গাল, যার ভরসা ভিক্ষায়,
দিনান্তে উদরে অন্ন পায় কিনা পায়,
যাহার চক্ষের জল, বক্ষে ঝরে অবিরল,
তারো দেখ, নাই আজি বিমর্ষ বদন,
ভুলেছে উৎসবে পড়ি ভাগ্যের পীড়ন।

যুবক যুবতী কত বাল বালাগণ
হর্ষফুল্ল দেখ সবে হয়েছে কেমন !
অধরে না হাসি ধরে, নতুন বসন পরে,
কেহ কেহ অলঙ্কার ধরি অঙ্গোপরে
আনন্দে চলিয়া যায় গলিয়া আদরে।

বসেছে বন্ধুর মেলা কতই আমোদ,
করিছে আলাপ কিবা হৃদয়-বিনোদ।
উঠিছে হাসির রোল, ছুটিছে কতই বোল,
বসায়েছে যেন সবে প্রমোদের হাট
অবাধে দিয়াছে খুলি মনের কবাট।

স্ববৃত্তি সাধনে যারা জীবন কাটায়,
অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে শোণিত শুকায়,
পর ইচ্ছাধীন হয়ে, সদাতন থাকে ভয়ে,
আজ কিন্তু দেখ এরা পেয়ে অবকাশ,
পুলক পাথারে ভাসে ছাড়িয়া নিশ্বাস।

কুল লক্ষ্মী সতী কত বহু দিন পরে,
প্রাণ হতে প্রিয়ধন পতি পেয়ে ঘরে,
ডুবিয়াছে একেবারে, প্রেমানন্দ পারাবারে,
ভুলিয়াছে আপনারে পতির সোহাগে,
মিলনের সুখ স্বর্গ ভুঞ্জে অনুরাগে।

অগণ্য বিপণি দেখ কিবা সুশোভন,
সজ্জিত বিবিধ দ্রব্যে নয়ন রঞ্জন।
বিকি কিনি অবিরত, মনোহর দ্রব্য কত
কিনিয়া লতেছে লোক যার যাহা সাদ,
বিক্রেতার অর্থলাভ, ক্রেতার আহ্লাদ।

মহাদিন, মহোৎসব, বিশাল ব্যাপার ;
নভোভেদী কোলাহল উঠে অনিবার ;
ভারত আনন্দময়, সুখের লহরি বয়,
বিশ্বব্যাপী আমোদের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস
যেমন উৎসাহ তায় তেমনি উল্লাস।

কে যেন সোণার কাটি ভারতের গায়
ছুঁয়াইয়া প্রাণ দান করিল তাহায়,
কিম্বা যেন যাদুকর কুহকে করিয়া ভর,
মোহকর ইন্দ্রজালে ভারত বেড়িল,
সঞ্জীবনী মন্ত্র কিম্বা কেহ বা পড়িল!

—নহে এই ভাগ্যোদয় যন্ত্র মন্ত্র বলে,
করে নাই কেহ ইহা কুহক কৌশলে ;
আদ্যাশক্তি পরাৎপরা, নিখিলের ভয়হরা,

পরমা প্রকৃতি যিনি পূজিতা জগতে,
অবতীর্ণা সেই দেবী আজি রে ভারতে।

তাই এই শুভ দিনে মহামহোৎসব,
তাই এই সজীবতা, আনন্দ উদ্ভব ;
তাই সবে উল্লাসিত, স্থানে স্থানে নৃত্যগীত,
তাই এ সাহারা আজি বৈজয়ন্তোপম,
শ্মশান ভারত তাই শোভে স্বর্গ সম।

অনাদ্যা, আনন্দময়ী, অখিল ঈশ্বরী,
এলেন ভারতে আজি সবে কৃপা করি ;
ভবলোক আলোকিত, নরনারী পুলকিত,
ভুবন হাসিছে কিবা কনক কিরণে,
বিকশিত হৃদিপদ্ম দৃশ্য দরশনে।

পূজ রে শঙ্করী শিবা শিব-বিধায়িনী,
পূজ সবে মহাশক্তি শক্তিপ্রদায়িনী ;
পূজ রে চরণ তাঁর, হয় রে ইচ্ছায় যাঁর,
সৃজন পালন আর, বিশ্বের বিনাশ,
অসীমা মহিমা যাঁর জগতে প্রকাশ।

অসুর নিধনে যিনি ভীষণা ললনা,
ভক্তেরে অভয়-প্রদা প্রসন্ন-বদনা ;
কভু রণরঙ্গিনী, কভু শিবসঙ্গিনী
ত্রিলোক-ত্রাসিনী কভু ত্রিশূল-ধারিণী।
অপরূপ রূপে কভু ভুবনমোহিনী।

পূজ সেই বিশ্বরূপা বিশ্বের জননী,
দুরিত-হারিণী দেবী, দুর্গতি-দলনী ;
সচন্দন পুষ্পদল, বিল্বদল, গঙ্গাজল,
দেহ পদে ভক্তি ভরে কি ফল বিলম্বে ?
এক স্বরে ডাক, জয় জয় জগদম্বে !

—০:০:০—

নবজীবন।

৩য় ভাগ। } কার্ত্তিক ১২৯৩। { ৪র্থ সংখ্যা।

সে কালের দারোগার কাহিনী।

৪র্থ ভাগ—নীলকুঠী।

প্রস্তাবনা।

আমি এই প্রবন্ধে যে প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম নব্য পাঠকদিগের তাহা সুন্দররূপে বুঝিবার জন্য ভূমিকা স্বরূপে সে কালের নীলকরদিগের চরিত্রের এবং কার্য্য প্রণালীর সংক্ষেপ বিবরণ আবশ্যক।

বঙ্গের প্রায় সকল প্রদেশেই নীল জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলাই পূর্ব্বে নীলের গৌরবের স্থান ছিল। নীল উত্তম এবং অধিক পরিমাণে হয় বলিয়া ঐ সকল স্থানে সাহেবদিগের অনেক কুঠী স্থাপিত ছিল এবং বিস্তর টাকাও ব্যয় হইত। সাহেবেরা যে প্রণালীতে নীল প্রস্তুত করিতেন, তাহাতে কোনও একজন সাহেবের নিজের টাকা দ্বারা কুঠী কিম্বা কনসারণ খুলিতে সাধ্য হইত না। অল্প কিম্বা অধিক সংখ্যায় কয়েকটি কুঠী এক অধিকারস্থ হইলেই, তাহাকে কনসারণ বলিত, এবং কনসারণ স্থাপনা করিতে না পারিলেও কার্য্যের সুবিধা হইত না। এইক্ষণে যেমন বহু সাহেব একত্রিত হইয়া আসাম ও কাছাড় প্রভৃতি দেশে চা বাগিচা খুলিতেছেন, পূর্ব্বেও সেই প্রণালীতে কয়েক জন সাহেবে এক এক কোম্পানী গঠিত করিয়া নীলের কনসারণ স্থাপন করিতেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ওয়াটসন কোম্পানি অধিক ধনী ও ব্যাপক ছিল। কৃষ্ণনগর জেলায় প্রায় সমস্ত স্থানেই ইহাঁদের কুঠী ছিল। যদি কেহ,

এই প্রদেশের বিমানে উঠিয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের স্ত্রীলোকে চটের উপরে বড়ি দিলে যেরূপ দৃশ্য হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবে কৃষ্ণনগর জেলার মাটির উপরে নীলকুঠীগুলি দৃষ্ট হইত। যাঁহারা বাবু দীনবন্ধু মিত্রের নীল-দর্পণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নীলকর সাহেবদের চরিত্রের কেবল দোষের ভাগই জানিতে পারিয়াছেন। ঐ পুস্তকের লিখিত বিবরণ সমস্ত যে নিতান্ত অমূলক তাহা আমি বলিতে পারি না। ইহা নিশ্চয়, যে নাটকের প্রয়োজনীয় অত্যুক্তি সকল বাদ দিলে দীনবন্ধু বাবুর পুস্তকে অনেক সত্য বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে নীলকর সাহেবদিগের চরিত্রে কোনও প্রশংসার বিষয় ছিল না এবং সকল নীলকরই মিত্রজার বর্ণিত সাহেবের ন্যায় পামর এবং অত্যাচারী ছিলেন, তাহা নহে। নীলকর সাহেবদিগের যেমন দোষ ছিল, তেমন পক্ষান্তরে অনেক গুণও ছিল এবং তাঁহাদের প্রাধান্যের সময় তাঁহারা দেশের অনেক উপকারও করিয়াছিলেন। অনেক নীলকর যেমন নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিল, তেমন অনেকে খুব দয়াশাল এবং ধর্ম্ম-ভীত ছিলেন। আমি নাটক কিম্বা কবিতা লিখিতেছি না, সাদা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য; অতএব আমি পক্ষপাত না করিয়া নীলকর সাহেবদিগের দোষ ও গুণ সমভাবে বিবৃত করিতে বাধ্য এবং তাহা করিতেও সাধ্যমতে চেষ্টা করিব।

"নীলকরের দৌরাত্ম্য" বলিয়া আমাদের মধ্যে যে চিরপ্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা ঘটিবার দুইটি মূল কারণ ছিল। ঐ দুইটি কারণ দূর করা অসাধ্য না হইলেও নীলের ব্যবসার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এমন কঠিন কার্য্য ছিল, যে তাহা প্রায় অসাধ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহার প্রথম কারণ এই যে, ধানের ভূমিতেই নীল উত্তম জন্মে এবং ভূমি যত উৎকৃষ্ট হয়, নীলও সেই পরিমাণে অধিক উৎকৃষ্ট হয়। বিশেষত নীলের ও ধানের চাষ একই সময়ে সম্পাদিত হয়। কিন্তু কৃষকেরা ধানের চাষেরই অধিক পক্ষপাতী; নীলের চাষ করিতে সহজে ইচ্ছা করে না। কারণ ধানে প্রজার সম্বৎসরের আহার, গরুর খোরাক এবং অন্যান্য অনেক প্রকার উপকার হয় কিন্তু তাহারা নীলকর সাহেবদিগের নিকট নীলের গাছের জন্য যে মূল্য পাইত, তাহাতে তাহাদের তত্তুল্য লাভ হইত না। বিশেষ সাহেবেরা যত কম মূল্যে প্রজার দ্বারা নীল জন্মাইয়া লইতে

পারিতেন, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন। ধানের ন্যায় নীলের বাজার দর ছিল না। সাহেবেরা যে এক দর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই হারে চিরকাল ধরিয়া, জন্মা অজন্মার তারতম্য বিবেচনা না করিয়া, প্রজাদিগের নিকট নীলের গাছ লইতেন, এবং সেই হারও প্রজাদিগের ইচ্ছামতে স্থিরীকৃত হয় নাই, সাহেবদিগের ইচ্ছামতে স্থির হইয়াছিল, এবং ইহাতে কৃষকদের কখনও লাভ না হইয়া বরং বৎসর বৎসর সাহেবের নিকট তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। অধিকন্তু প্রজাদিগের উত্তম জমি সকলে নীলকরেরা তাহাদিগকে নীল ভিন্ন অন্য কিছু বপন করিতে দিতেন না সুতরাং নীলের প্রতি প্রজার সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং পারগপক্ষে তাহারা নীলের চাষ করিতে ইচ্ছা করিত না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নীল এবং ধান একই সময়ে কর্ত্তন করিতে হয় কিন্তু অগ্রে নীল কর্ত্তন করিয়া তাহা কুঠীতে দাখিল না করিলে, কুঠীর লোকে প্রজাদিগকে তাহাদের স্বীয় ধানে হস্তক্ষেপণ করিতে দিত না, ইহাতে প্রজার অনেক বিরক্তি বোধ হইত এবং ক্ষতি হওয়ারও আশঙ্কা থাকিত।

ধানের জমিতে নীলের ন্যায় পাটও জন্মিয়া থাকে এবং এক্ষণে আমাদের অনেক প্রদেশে প্রজারা ধানের চাষ পরিত্যাগ করিয়া পাটের চাষে প্রবৃত্ত হয়; কারণ কোনও কোনও বৎসর ধান অপেক্ষা পাটে তাহারা অধিক লাভ করে। নীলকর সাহেবেরা যদি সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া যাহাতে প্রজার লাভ হয়, এমন কোনও বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে কখনও নীলের দুর্গতি হইত না বরং প্রজারা নীল করিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া সাহেবেরা কেবল প্রজাকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কিসে প্রজা বাধ্য করিতে পারেন, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। মফঃস্বলে আসিয়া সাহেব দেখিলেন, যে জমিদার হইতে পারিলেই প্রজার প্রতি যথেচ্ছা কার্য্য করা যাইতে পারে; অতএব কুঠীর এবং কনসারণের এলাকাস্থিত ভূমির অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জমিদারী ক্রয় করা সহজে এবং সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না দেখিয়া অন্তত ইজারা ও পত্তনী লওয়ার চেষ্টা করিতেন। ইংরাজদের চরিত্রের এক মহৎ গুণ এই যে, যখন কোন কার্য্য করিতে তাহারা সংকল্প করেন, তখন যে যে উপায় অবলম্বন করিলে তাহা সংসাধিত হইতে পারে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। সহস্র ব্যাঘাত উপ

স্থিত হইলেও, তাহা পরাজয় করিতে উদ্যত হন। টাকার আবশ্যক হইলে তাহা জলবৎ ঢালিতে পারেন।

প্রজাদিগের উপরে প্রভুত্ব করিবার নিমিত্ত সাহেবেরা জমিদারের নিকট হইতে বাহুল্য জমায় এবং বিস্তর সেলামী দিয়া ইজারা এবং পত্তনী লইয়া ভূম্যধিকারী হইলেন। কাজেই সে কালের মূর্খ প্রজারা সাহেব তাহাদের জমিদার হইয়াছে দেখিয়া ভয়ে সাহেবের বাধ্য হইয়া পড়িল। শুদ্ধ জমিদার হওয়ার বাসনায় নীলকরেরা বাহুল্য ধনক্ষয় করিয়া ভূমি সংগ্রহ করিত না। নীল করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য; ভূম্যধিকারী না হইলে প্রজা বাধ্য করিতে পারে না এবং প্রজা বাধ্য না হইলেও নীল চাষের সুবিধা হয় না বলিয়াই তাঁহারা জমিদার হইতেন। কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ নীলের চাষ করিতে প্রজাদিগকে বাধ্য করা ভিন্ন, প্রজার প্রতি অন্য রূপ অত্যাচার করা সাহেবদিগের মূল অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু কাল সহকারে, নীলকরদিগের প্রভুত্ব যতই গাঢ় হইতে লাগিল, ততই অন্যান্য বিষয়ে প্রজাদিগের উপরে দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইল। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন নীলকরের এত অধিক প্রভুত্ব হইয়াছিল, যে নীলকরের প্রজা নীলকর সাহেবের অনুমতি ভিন্ন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিতে কিম্বা সাক্ষ্য দিতে পারিত না। পুলিশের কর্ম্মচারীরাও নীলকর সাহেবের বিনা অভিপ্রায়ে তাঁহার অধিকারের ভিতর কোন দোষী ব্যক্তি ধৃত করিতে পারিত না। ইহার এক বিশেষ কারণ এই ছিল যে প্রত্যেক কনসারণে যে সকল সাহেব মেনেজর অর্থাৎ অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেন, তাঁহারা প্রায়ই কলিকাতার সদাগর সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং জেলার হাকিমেরা তাঁহাদের কথার উপরে স্বভাবত বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাদিগকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই সকল মেনেজর যে অকারণ প্রজাদিগের কিম্বা নিকটবর্ত্তী ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি অহিতাচরণ কিম্বা অযথা ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা হাকিমদিগের মনে সম্ভবপর বোধ হইত না।

বাস্তবিকও জেমস্ ফরলং প্রভৃতি সাহেবের ন্যায় অনেক মেনেজর উচ্চ দরের সাহেব ছিলেন। ইহারা সদ্বংশজাত, সৎচরিত্রান্বিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; কোন বিষয়ে সিবিলিয়ন হাকিমদিগের ন্যূন ছিলেন না। অনেক

নীলকর অত্যন্ত দাতা ছিলেন এবং তাঁহাদের দাতব্যতার গুণে জেলার আদালত ফৌজদারীর আমলাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। সেকালে আমলাদিগের হস্তেই আছেলে মামলা অর্থাৎ অর্থী প্রত্যর্থীদিগের শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। কাজেই আমলা মহাশয়দিগকে খুসি রাখিতে পারিলে অনেক সময় মোকদ্দমায় জয়লাভ করা বড় কঠিন কার্য্য ছিল না। নীলকর সাহেবদিগের দান শক্তির একটি দৃষ্টান্ত দেখিলেই, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা কিরূপে সরকারী আমলাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতেন।

ওয়াটসন কোম্পানির শিকারপুর কনসারণের এক জন মেনেজর ছিলেন। তাঁহার নাম আমার এক্ষণে স্মরণ নাই। তিনি দাতা, ভোক্তা এবং অতি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান সাহেব বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং এই কনসারণের অনেক শ্রীবৃদ্ধিও করিয়াছিলেন। শিকারপুরের কুঠি থানা করিমপুরের এলাকাভুক্ত ছিল এবং সেই সময়ে সেই থানায় এক জন ব্রাহ্মণ দারোগা ছিলেন এবং তিনি যে কোন কারণে হউক, ঐ সাহেবের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। কিছু কাল পরে, দারোগা করিমপুর হইতে কৃষ্ণনগরের সদর থানায় বদলী হইয়াছিলেন। পূজার সময় কুঠির নীল প্রস্তুত হওয়ার পরে, সাহেব কলিকাতা যাইতে কৃষ্ণনগরের ঘাটে পিনেস লাগাইয়া জেলার সাহেবদগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে কয়েক দিবস অবস্থিতি কিরিতেছিলেন। সাহেব কৃষ্ণনগর আসিয়াছেন শুনিয়া, দারোগা তাঁহাকে সেলাম করিতে গেলেন। দারোগা সাহেবের নিকট কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। সাহেব তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং অনেক দিন যাবৎ তাঁহার সহিত দেখা শুনা হয় নাই বলিয়া তিনি কেবল মিত্র ভাবে সাহেবকে অভিবাদন করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব কত ক্ষণ তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া কোর্ত্তার জেবের মধ্যে হাত দিয়া এক খানা বেঙ্ক নোট টানিয়া আনিয়া দারোগার হস্তে গুঁজিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে "দারোগা আমি এক্ষণ কলিকাতায় যাইতেছি, অধিক দিতে পারিলাম না, ফিরিয়া যাইবার সময় তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আরও কিছু দিয়া যাইব।" দারোগা উত্তর করিলেন, যে তিনি কিছু পাইবার মানসে আসেন নাই; সাহেব তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, সেই জন্য তিনি কৃষ্ণনগর আসিয়াছেন শুনিয়া, শুদ্ধ সেলাম করিতে আসিয়াছেন। এই কথা বলিয়া দারোগা নোট খানা ফেরত দিলেন কিন্তু সাহেব তাহা গ্রহণ না করিয়া পুন-

রায় দারোগাকে তাহা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। নোট খানা কত টাকা মূল্যের নোট তাহা সাহেবও বলিয়া দেন নাই এবং দারোগাও তখন খুলিয়া পাঠ করিয়া দেখিলেন না। কিন্তু থানায় পৌঁছিয়া নোট খানা দারোগা বাক্সে বন্ধ করিবার সময় দেখিলেন, যে তাহা এক হাজার টাকার নোট। দারোগার মনে হইল, যে সাহেব নিঃসন্দেহ ভুল ক্রমে তাঁহাকে এই নোট খানা দিয়াছেন, অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ সাহেবকে তাহা ফেরত দেওয়ার নিমিত্ত পিনেসে প্রত্যাগমন করিলেন। সাহেব দারোগাকে দেখিয়া ভাবিলেন যে দারোগা বুঝি কম টাকা পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়াছে। কিন্তু দারোগা যখন যথার্থ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন, তখন সাহেব হাসিয়া বলিলেন "দেখ, দারোগা আমার জেবে এক খানা হাজার আর এক খানা এক শত টাকার নোট ছিল, আমি তোমাকে এক শত টাকার নোট খানা দেওয়ার মানসে সেই খানা ভাবিয়া এই হাজার টাকার নোট খানা টানিয়া বাহির করিয়াছিলাম, তোমার কপালে হাজার টাকার নোট উঠিয়াছে, তুমি তাহা রাখ, আমি আর তাহা ফেরত লইব না। এই টাকা যদি আমার হইত তবে খোদা তাহা কখনও আমার হাতে তাহা উঠাইয়া দিতেন না। খোদা তোমাকে দিয়াছেন, অতএব তুমি তাহা লইয়া যাও।" বলিয়া সাহেব কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া কামরার ভিতর হইতে দারোগাকে চলিয়া যাইতে বারম্বার আদেশ করাতে দারোগা তাহা লইয়া থানায় আসিলেন। এখন, পাঠক বলুন দেখি যে জগতে এমন পাষণ্ড কে আছে যে, এই সাহেবের উপকার না করে?

আমি এই শিকারপুর কনসারণের আর একটি ঘটনার কথা পাঠকদিগকে বলিব। সকলেই জানেন, যে শীত কালে জেলার হাকিমেরা মফঃসল পরিভ্রমণ এবং পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনেক আমলাও যাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা সকলেই পথ খরচ বাবত গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু কিছু ভাতা পাইতেন কিন্তু অনেক স্থানে আমলাদের এই টাকা ব্যয় না হইয়া বরং উপরন্তু বিলক্ষণ লাভ হইত। কারণ যখন যে নীলকুঠির কিম্বা জমিদারের অধিকারে সাহেবের তাম্বু পড়িত সেই নীলকর এবং জমিদার আমলাদিগকে কেহ সিধা কেহ খোরাকি বাবতে টাকা দিতেন। হাকিমেরাও নীলকর সাহেবদিগের কুঠিতে যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং জমিদারেরা সওগাদ ভেট দিলে, তাহা গ্রহণ করিতেন,

কারণ সাধারণত এই সকল খোরাকি ও ভেট ঘুস বলিয়া বিবেচিত ছিল না। দাতাদিগের সঙ্গতি এবং দান শীলতা অনুসারে শিধা ও ভেটের তারতম্য হইত। শিকারপুরের এলাকায় আমলা মহাশয়েরা অনেক সুখ ভোগ করিতে পাইতেন। দুধে ঘৃতে আহার পরিপাটী হইত এবং তদতিরিক্ত প্রত্যেক আমলার পদ বিবেচনায় প্রতি বৎসর কুঠির সাহেবের নিকট তাঁহারা উপহার স্বরূপে টাকাও পাইতেন। আমলারা যে শিধা এবং খোরাকি পাইত তাহা হাকিম সাহেবদিগের অগোচর ছিল না কিন্তু বোধ হয়, পারিতোষিকের বিষয় সকলে জানিতেন না। সে যাহা হউক, সময় সময় কিন্তু হাকিমদিগের মধ্যে কখনও এমন কড়া অপক্ষপাতী সাহেব আসিতেন, যে তিনি স্বয়ং তো কোন নীল কুঠিতে যাইতেনই না, উপরন্তু আমলারাও কাহারও নিকট শিধা কিম্বা খোরাকি না লইতে পারে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। এই রূপ এক জন কড়া সাহেব একবার কৃষ্ণ নগরের মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পরিভ্রমণে বাহির হইয়া আমলাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে তাহারা কাহারও নিকট খোরাকি কিম্বা টাকা লইলে কর্ম্মচ্যুত ও কয়েদ হইবে। অধিকন্তু তিনি প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হইয়া ভূম্যধিকারীর এবং নীল কুঠির কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিতেন, যে তাহারা আমলাদিগকে খোরাকি দিলে, তিনি তাহাদিকে এবং তাহাদের মণিবকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিবেন। সুতরাং অনেক স্থানে আমলারা নিজ নিজ প্রাপ্ত ভাতার টাকা ব্যয় করিয়া স্বীয় স্বীয় খোরাকি নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব শিকারপুর পৌছছিলেন। সে স্থানেও তিনি নীলকরের কর্ম্মচারিদিগকে ডাকিয়া এই রূপ সতর্ক করাতে, তাহারা কহিল যে, আবহমান কাল তাহারা আমলাদিগকে খোরাকি দিয়া আসিয়াছে। শিধা এবং খোরাকি দেওয়ার প্রথা বঙ্গ দেশের সামাজিক ভদ্রতার একটি নিয়ম, ইহা নীলকর সাহেবেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক দিয়া থাকেন, ঘুস বলিয়া দেন না। বিশেষ হাকিমের আমলারা দেশীয় ভদ্র লোক, তাঁহারা বৎসরের মধ্যে কেবল একবার মাত্র শিকারপুর আসিয়া থাকেন, তদুপলক্ষে তাঁহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলে, ভদ্রতার ত্রুটি এবং নীলকর সাহেবদিগের মহা লজ্জা হয়। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সকল বিনয় বাক্যের প্রতি কিছু মাত্র কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার হুকুম মতে কার্য্য করিতে পুনরায় আদেশ করিলেন। নীলকর সাহেবও নিজে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ

করিলেন, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া খোরাকি দিতে নিষেধ করিলেন। এই সকল আলোচনা প্রাতঃকালে হয়। কিঞ্চিৎ বেলা হইলে আমলারা দোকানে এবং বাজারে আহারের দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন কিন্তু কোনও দোকানদার কিম্বা বিক্রেতা আমুলাদিগের নিকট মূল্য লইয়া কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে স্বীকার করিলেন না। মাজিষ্ট্রেটের খানসামাও বাজারে ঐরূপ এক পয়সার জিনিস পাইল না। সাহেবদিগের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিলাতী আহারীয় দ্রব্য থাকে. তাহা দ্বারাই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন রূপ দিনপাত হইল, কিন্তু উপায়হীন আমলারা সমস্ত দিন উপবাস করিলেন। এই ঘটনার কথা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাজারে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে দোকানদারেরা তাঁহার আমলাদের নিকট জিনিস-বিক্রয় না করিলে, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। ঘোষণা প্রচারিত হওয়া মাত্রই, সকল দোকানদার দোকান বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল এবং বাজারও লোক শূন্য হইল। ইহার কারণ বুঝিতে কাহার ও কোন কষ্ট হইবে না। শিকারপুর অঞ্চল সমুদয়ই ওয়াটসন কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত। মেনেজর সাহেবের অনভিপ্রায়ে কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, করিলে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাহার প্রতিকার করিতে শীঘ্র পারেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব মেনেজার সাহেবের অনুরোধ রক্ষা না করাতে, মেনেজর ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত দোকানদারদিগকে এইরূপ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই নিষেধের ফলে আমলাদিগের সমস্ত দিন রাত্র অনাহারে কাল যাপন করিতে হইয়াছিল। প র দিবস প্রাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব লজ্জিত হইয়া প্রধান আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমরা যাহা ভাল জান, তাহা কর. আমার কর্ণে যেন কোন কথা আইসে না। আসিলও না; আমলারা সেই দিবস সুখ স্বচ্ছন্দে উদর ভরিয়া উপবাসের পারণ করিলেন এবং শিকারপুর হইতে উঠিয়া যাইবার সময় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়া গেলেন।

ইংরাজের রাজ্যে প্রজারা খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য করিয়া নীলকরের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল। এমন প্রভুত্ব কে কবে করিতে পারিয়াছিল? এবং সেই প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য নীলকরেরা যে প্রাণপণ করিবে, তাহাই বা বিচিত্র কি?

কলিকাতায় সাহেব সদাগরদিগের অনেক বড় বড় বাড়ী আছে কিন্তু

কৃষ্ণনগর জেলার স্থানে স্থানে নীলকর সাহেবদিগের ভবন দেখিলে চমৎকার বোধ হইত। মোল্লাহাটী, খালবোয়ালীয়া, নিশ্চিন্দিপুর শিকারপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি কনসারণের মেনেজারদিগের ভবন এবং কৃষ্ণনগরে তাঁহাদের ক্লব হাউস নামক বাড়ী এক এক রাজ অট্টালিকা বিশেষ ছিল। অনেক গৃহ নানা রঙ্গের প্রস্তর মণ্ডিত এবং নানাবিধ বহুমূল্য বিলাতি সাজ সরঞ্জমে সুসজ্জিত ছিল। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক কুঠীতে অধিক মূল্যের তাজী ঘোড়া ও হস্তী পালে পালে থাকিত। নিজাবাদের নিমিত্ত মহিষ ও বলদ অসংখ্য ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে সাহেবদিগের নিমিত্ত প্রত্যহ রুটী ও অন্যান্য আহারের সামগ্রী ও ডাকের পত্র লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত নীলকরদিগের নিজের স্বতন্ত্র ডাক স্থাপিত ছিল এবং শীত কালে কোনও কোনও কুঠীতে ঘোড়দৌড়ের তামাসা হইত। ফলে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। সুখ সচ্ছন্দতার জন্য নীলকরেরা টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাঁরা অতিথি সেবা করিতেও বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন। কলিকাতা হইতে কোন সাহেব কিম্বা জেলার হাকিমেরা কুঠীতে উপস্থিত হইলে, আহারের ঘটার কথা বলিবার আবশ্যক নাই,—দেশীয় কোন আমলা কিম্বা ভদ্রলোক গেলেও, কুঠীর কর্ম্মচারীদিগের বাসাতেও খুব আদর অপেক্ষা পাইতেন। এখনকার ন্যায় তখন নেটিব ডাক্তার ছিল না, বৎসরে বৎসরে কেবল দুই চারিজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মেডিকেল কালেজ হইতে বাহির হইতেন কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত হইতেন, সুতরাং দেশে ডাক্তারের অনাটন ছিল। অনেক কুঠীতে কুঠীর কর্ম্মচারী এবং প্রজাদিগের জন্য নীলকরেরা ডাক্তারী ঔষধ পত্র রাখিয়া লোকের উপকার করিতেন।

প্রজাদিগের প্রতি নীলকরেরা নিজে তাঁহাদের নিজের স্বার্থের জন্য যে কিছু দৌরাত্ম করিতেন কিন্তু অন্য কাহাকেও প্রজাদিগের উপরে তাঁহারা হস্তক্ষেপণ করিতে দিতেন না। এমন কি পুলিশ আমলারাও নীলকরের প্রজার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। তদ্ভিন্ন কুঠীর সুবিধার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং যদিও প্রজাদিগের নিকট চাঁদা তুলিয়া কিম্বা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাঁহারা এই সকল রাস্তা দিয়াছিলেন তথাপি ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে কেবল নীলকর সাহেবদিগের উদ্যোগে এবং যত্নে তাহা হইয়াছিল।

আমি জানি এক বৎসর কলিকাতা সহরে ময়লার গাড়ী টানিবার জন্য কয়েক ব্যক্তি বনগ্রাম অঞ্চলে ধর্ম্মের ষাঁড় ধরিয়া লইয়া যাইতে আসে। সকলেই জানেন যে পল্লীগ্রামে এই সকল ষাঁড়ের দ্বারা গৃহস্থদিগের বিনা মূল্যে গোবৎসোৎপাদন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং তজ্জন্য তাহারা ঐ সকল বৃষকে অবাধে তাহাদের শস্য খাইতে দেয়। কলিকাতার চাপরাশিরা ষাঁড় ধরিতে আসিয়াছে দেখিয়া প্রজারা প্রতিবাদ করে। কিন্তু তাহারা এই নিষেধ না শুনাতে প্রজারা মোল্লাহাটী কুঠীর লারিমোর নামক বড় সাহেবের নিকট নালিশ করে। লারমোর সাহেব তৎক্ষণাৎ চাপরাশি-দিগের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে বারণ করিলেন কিন্তু তাহারা ক্ষান্ত না হওয়াতে, সাহেব বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া কৃষ্ণনগরের ও কলিকাতার উভয় স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখিয়া ষাঁড় ধরা বারণ করিয়া দিলেন। এইরূপ কার্য্য করিতে আমাদের দেশীয় কোন জমিদারের কিম্বা অন্য ব্যক্তির সাধ্য হইত না। কার্য্যটি অতি তুচ্ছ বটে তথাপি ইহার দ্বারা নীলকরেরা দেখাইলেন যে তুচ্ছ কিম্বা গুরু হউক, প্রজার হিত সাধনে তাঁহারা সর্ব্বদা সমভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং এই জন্যই হাকিম সাহেবদিগের নিকট কেবল লারমোর সাহেব নহেন, নীলকর সাহেবেরা সাধারণত প্রজাবন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমি একবার মাজিষ্ট্রেট এলিয়ট সাহেবের নিকট লারমোর সাহেবের এক কার্য্য সম্বন্ধে নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "দারোগা! লারমোর তো রায়তের বন্ধু বলিয়াই প্রসিদ্ধ"।

অনেকের সংস্কার আছে যে, হাকিম সাহেবেরা তাঁহাদের আপন জাতি ভাই বলিয়া অনেক সময়ে নীলকর সাহেব সম্বন্ধে পক্ষপাত করিতেন কিন্তু বাস্তবিক এই প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমি অনেক বয়োধিক এবং নব্য মাজিষ্ট্রেটের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছি এবং ক্রমান্বয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষ্ণনগরের সদর থানার দারোগী করাতে জেলার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত অকপটে আমার কথোপকথন হইত। তাহাতে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া ছিলাম যে আসল কথা তাহা নহে। হাকিমেরা নীলকরের যথার্থ ভিতরের আচরণ জানিতে পারিতেন না; তাঁহাদের বাহিরের কার্য্য দেখিয়া হাকিম সাহেবেরা ভুলিয়া যাইতেন, এবং একবার এক জনের প্রতি ভাল জ্ঞান হইলে, পরে তাহার সহস্র নিন্দা উঠিলেও

বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের নিকট নীলকরদিগের খাতির ও সম্মান সংস্থাপিত হয় এবং নীল বিদ্রোহিতার প্রাক্‌কালে তাঁহাদের এত অধিক গৌরব হইয়াছিল, যে হালিডে সাহেব বঙ্গদেশের প্রথম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়া কৃষ্ণনগর জেলার নীলকরদিগের নিমন্ত্রণ মতে, তাঁহাদের কুঠী সমস্ত পরিদর্শনের অছিলায়, অনেক কুঠীতে ভোজ খাইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। আমাদের রাজপুরুষেরা কেহ কেহ নীলকরদিগকে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং নীলকরের নিকট সুখ্যাতি পাওয়ার নিমিত্ত তাঁহাদের কত যত্ন ছিল, তাহা হালিডে সাহেবের এই পরিভ্রমণ সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই প্রকাশ পাইবে। লাট সাহেব মোল্লাহাটীর কুঠীতে ভোজ ও পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া খাল বোয়ালিয়া কুঠীতে যাত্রা করিলেন। সাহেবেরা সকলে যাত্রা করার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে চা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পানীয় ও আহারীয় দ্রব্য দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া কেহ গজ পৃষ্ঠে কেহ বাজী পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু সঙ্গী গরিব চাপরাশিগণ সেইরূপ সুখভোগ করিতে পারে নাই। প্রভুর যাত্রার আয়োজনে তাহারা কিছু মাত্র আহার করিতে অবকাশ পায় নাই এবং পদব্রজে হাতী ঘোড়ার সঙ্গে প্রাণপণে তাহাদিগকে ধাবমান হইতে হইয়াছিল। পথ ও ভয়ানক ছিল। মাঠের রাস্তায় রৌদ্রের উত্তাপে পদাতিকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিকটে একটা ইক্ষুক্ষেত্র দেখিতে পাইয়া, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দুই খান ইক্ষু ভাঙ্গিয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার প্রতি লারমোর সাহেবের দৃষ্টি পড়িল। অমনি সেই প্রজাবন্ধু নীলকর নীলবন্ধু গবর্ণরকে দেখাইয়া দিলেন যে "ঐ দেখুন আপনার চাপরাশি আমার গরিব প্রজার শস্য অপচয় করিতেছে।" আর যাবি কোথায়? গবর্ণর সাহেব তাঁহার অপক্ষপাতিত্ব এবং সুবিচার দেখাইবার নিমিত্ত চাপরাশিকে ডাকিয়া অব্যবহিত গ্রামে উপস্থিত হইবা-মাত্র দুই কুড়ি বেত্রাঘাত খাইতে হুকুম দিলেন এবং চাপরাশিকে তৎক্ষণাৎ তাহা গা পাতিয়া লইতে হইল। বর্ব্বর প্রজারা অবাক হইয়া নীলকরের এই অসাধারণ প্রভুত্ব দেখিতে লাগিল। তাহারা জানে, যে পথিকেরা ইক্ষুক্ষেত্র হইতে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক আধ গাছা ইক্ষু ভাঙ্গিয়া থাকে এবং এদেশে তাহা দোষ বলিয়া কেহ বিবেচনা করে না; অতএব অমন

নিরপরাধের এবং অধিক হইলও এই তুচ্ছ অপরাধের, নিমিত্ত নীলকরের খাতিরে খোদ লাট সাহেব যখন তাহার নিজের ভৃত্যকে এমন গুরুতর শাস্তি দিলেন, তখন অন্য পর কা কথা,—ইংরাজ রাজ্যে নীলকর যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে। লারমোর সাহেবের এই কৌশল-মাখা কার্য্যে প্রজা সাধারণের নিকট নীলকরের অসীম ক্ষমতা জারি হইল, এবং পক্ষান্তরে সাহেব মহলে হালিডে সাহেবের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

নীলদর্পণে দেশায় স্ত্রীলোকের প্রতি নীলকর সাহেবের দৌরাত্মের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অমূলক। আমি অনেক অনুসন্ধানেও ঐ কথার কোন ভিত্তি পাই নাই, তবে সাহেবদিগেরও রক্তমাংসের শরীর; রিপু প্রাবল্য হইতে যে তাঁহারা এককালে বর্জ্জিত তাহা নহে কিন্তু আমি যতদূর দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে বুনা প্রভৃতি নীচ জাতীয়া নষ্টা স্ত্রীলোকদিগের এবং বারাঙ্গনার সঙ্গে ভিন্ন অপবাদ শুনি নাই এবং তাহাতেও সাহেবেরা টাকা বিতরণ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের সম্মতি মতে লিপ্ত হইতেন। আমি কৃষ্ণনগরে যে বাড়ীতে বাস করিতাম সেই কোঠা একজন নীলকর তাহার বুনা উপপত্নীকে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া বানাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহা ভাড়া দিয়া এই স্ত্রীলোকটি মাসে মাসে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিত। আমি কোনও স্থানে বল প্রকাশের দৃষ্টান্ত দেখিতে কিম্বা শুনিতে পাই নাই।

পুরাতন দিল্লী।

পর দিন অতি প্রত্যূষে, পুরাতন দিল্লী দেখিতে অশ্বযানারোহণে গমন করিলাম। অরুণোদয় কালে দলে দলে হিন্দু স্ত্রী লোক ও পুরুষেরা যমুনায় স্নানার্থ যাইতেছেন, এবং স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন; পুরুষেরা স্তব পাঠ, স্ত্রীলোকেরা অব্যক্ত স্বরে যমুনার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। কিন্তু দীর্ঘকাল এই ভাব থাকিল না। সহসা বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহাজানাবাদের দক্ষিণ হইতে দুই মাইল পথ আসিয়া একটি ভগ্ন দুর্গ দেখিতে পাইলাম, আমাদের কোচম্যান কহিল, ইহাই যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ। গাড়ি হইতে অবরোহণ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সমুদয় দেখিলাম; এক জন দর্শক দেখাইতে লাগিল। যাহা দেখিলাম তাহাতে মন

বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইল এবং রঘু বংশের যোড়শ সর্গোক্ত অযোধ্যার দুরবস্থা বর্ণনা মনে হইল। মহাভারতীয় সভাপর্ব্বোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ণনা স্মরণ করিয়া আরও সন্তপ্ত হইলাম। কি ধন, কি মান, কি অদ্বিতীয় মহাবল যোদ্ধার শৌর্য্য, কি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ললনার অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য, কি অপূর্ব্ব অট্টালিকা, কি বহু জন সমাকীর্ণ ধন-সম্পত্তি-শালী নগর, ইহার কেহই কালের করাল গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পায় না। এক ইন্দ্রপ্রস্থই এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইন্দ্র প্রস্থের ভগ্নাবশেষও মহদ্ভাব ব্যঞ্জক। পাদ্রি হিবর সাহেব ইন্দ্র প্রস্থের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বলিয়াছেন "লণ্ডন নগর ধ্বংস হইলে ইহার তুল্য হইবে না।" ইন্দ্র প্রস্থের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের বাহিরে নিগমবোধ ঘাট বলিয়া একটি ঘাট আছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তির পর এই ঘাটে অবভৃথ স্নান করিয়াছিলেন। (১) যদি মোসলমান বাদসাহেরা হিন্দু কীর্ত্তি লোপের চেষ্টা না পাইতেন তাহা হইলে, এখন আমরা ইন্দ্রপ্রস্থে কোন না কোন হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইতাম। দুর্ভাগ্য বশত হুমায়ুন সাহা দিল্লী অধিকার করিয়া পুরাণাকিল্লা অর্থাৎ পাণ্ডব দুর্গের জীর্ণ সংস্কার করিয়া উহার একেবারে রূপান্তর করেন, এবং ইন্দ্র প্রস্থের পরিবর্ত্তে "দিনপানা" নাম দেন। ইহাতেই মহাভারতোক্ত ইন্দ্র প্রস্থের অট্টালিকা এক কালে অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু স্থানের অনন্যতা লোপ হয় নাই। যদিচ হুমায়ুন সাহা ইন্দ্রপ্রস্থের দিনপানা নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু গোঁড়া মোসলমান ব্যতীত অন্যকেহ দিনপানা নাম ব্যবহার করে নাই, সাধারণ লোকে ইন্দ্রপ্রস্থ অথবা পুরাণ কিল্লা কহিত। সের সাহাও সেরগড় নাম রাখিয়াছিলেন কিন্তু সেরগড় নামে ঐ স্থান খ্যাত করিতে সমর্থ হন নাই। পুরাণা কিল্লাস্থ "কিল্লাকোনা," মন্দির হুমায়ুন সাহার কীর্ত্তি (২) এই অট্টালিকা অতিসুন্দর ও মনোজ্ঞ ছিল। সের মণ্ডিল অন্যতর অট্টালিকা। ইহা সের সাহার প্রস্তুতি; তিন মহল্লা। হুমায়ূন শাহ রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া উহা পুস্তকালয় করিয়াছিলেন।

---

(১) অশ্বমেধ যজ্ঞ হস্তিনাপুরে হইয়াছিল। ইহা মহাভারত পাঠে জানা যায়। অতএব রাজসূয় যজ্ঞ সমাধান্তে নিগমবোধ ঘাটে যুধিষ্ঠির স্নান করিয়াছিলেন, সম্ভবপর। সোমবারে অমাবস্যা হইলে নিগমবোধ ঘাটে পুণ্য কামনায় বহু লোক স্নান করে, এবং মেলাও হইয়া থাকে।

(২) কিল্লাকোনা নামক অট্টালিকা হুমায়ুন সাহ আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি সমাধা করিতে পারে নাই। সের সাহা সমাধা করেন।

সেরসাহ স্বনাম বিখ্যাত সেরগড় নামা নগর নির্ম্মাণ করেন। হুমায়ুন টোম হইতে ফিরোজসার কোতিলা পর্য্যন্ত দুই ক্রোশ লম্বা ছিল। উহার চারি দিকে সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। আকারে বর্ত্তমান সাহ জাহানা বাদের দ্বিগুণ পরিমিত। এক্ষণে সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থা, কেবল কাবুলি দরওয়াজা বর্ত্তমান। সেরসার পুত্র সলিম সা এই স্থানে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন তাহার নাম সলিম গড়, ইহা যমুনা মধ্যস্থ। দুর্গটি ক্ষুদ্র। হুমায়ূন সাহার কর্ণে সলিম গড় নামটি ভাল লাগিত না, তিনি নুরগাড় নাম রাখিয়াছিলেন। সাধারণে সলিমগড়ই কহিত, বাদশাহার সাক্ষাতে বাধ্য হইয়া লোকজন নুরগড় বলিত। জাঁহাঙ্গির সাহ, একটি সেতু দ্বারা ভূমির সহিত উহা সংলগ্ন করেন। সাহজাহান কর্ত্তৃক দৃঢ়তর দুর্গ নির্ম্মাণ হইবার পর সলিমগড় সাহজাদা প্রখ্যাত রাজ কয়েদির বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হইত। পুরাণা কিল্লা (ইন্দ্র প্রস্থ) হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া যমুনার পশ্চিম তীরে হুমায়ুন সাঁহ বাদসাহার সমাধি মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। হুমায়ুন পত্নী হামিদা বানু বেগম কর্ত্তৃক আপন পতির সম্মানার্থ ১৫৫৪ খৃং অব্দ হইতে ১৫৭০ অব্দ পর্য্যন্ত ১৬ বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়। সমাধি মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমির পরিমাণ ৩০ বর্গ গজ। অট্টালিকা প্রাঙ্গনে প্রবেশ দ্বার সামান্য নহে; প্রবেশ দ্বার পশ্চিম দিকে। সমাধি মন্দিরের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ এই তিন দিকে পুষ্পোদ্যান আছে, পূর্ব্ব দিকে যমুনা নদী। বালুকাময় লালরঙ্গের প্রস্তর দ্বারা সমাধি মন্দির নির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে শ্বেত প্রস্তরের কাজও আছে। মন্দিরের চূড়া (গুম্বেজ সকল) শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত; দূর হইতে অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই সমাধি মন্দিরের সহ তাজমহলের তুলনা করিলে হুমায়ুন সাহার সময় হইতে সাহ জাহানের সময়ে স্থাপত্য বিদ্যার কত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সহজে বুঝা যায়। সেকন্দরাতে আকবর সাহ বাদ সাহের সমাধি মন্দির দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। আকবরের সমাধি মন্দিরের গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র ধরণের, এবং হুমায়ুন টোমের গঠন প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাজ মহলের গঠন প্রণালী হইতে নিকৃষ্ট। হুমায়ুন টোমের মধ্যকক্ষে স্বয়ং বাদসাহ, উত্তর কক্ষে হামিদাবানু বেগম, অনন্ত নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। এই সমাধি মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরের বারেন্দার নিম্নে মোগল রাজবংশের যুবরাজ, বেগম, সাজাদা সাজাদীগণের সমাধি হই-

য়াছে। ইহাকে মোগল রাজবংশের অন্তিম সাক্ষাতের এবং বিশ্রামের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দারা (বদবক্ত দারা), ফরক্সিয়ার, জাঁহাদার সাহা—ইহাঁরাও হুমায়ুন টোমে শয়ান আছেন। মন্দিরের কক্ষ সকল সুচিকণ লালরঙ্গের মূল্যবান্ খণ্ড খণ্ড প্রস্তর এবং সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত ছিল। প্রদর্শক আমাদিগকে কহিল, মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কিছু পূর্ব্বে ভরতপুরের মহারাজা সূর্য্যমল ঝাট, সুবর্ণাদি বহু মূল্য দ্রব্য সকল বল ক্রমে অপহরণ করিয়া লইয়াছেন। কালের কি কুটিল গতি? যে মোগল সম্রাট বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া সুদূর দাক্ষিণাত্যে আপন অধিকার বিস্তার করেন সেই মোগল সম্রাটের বংশধর দিল্লির সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়াও সাহজাহানাবাদ হইতে নিকটবর্ত্তী হুমায়ুন টোমের আক্রমণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহকালে যে ঘটনা হইয়াছে, তাহারা নিমিত্ত এই হুমায়ুন টোম, লোকের মনে আরও জাগরূক রহিয়াছে এবং ইতিহাসেও হুমায়ুন টোম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সাহজাদাগণ দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহিত ইহাতে আইসেন এবং দেউড়ির উপরিস্থ উচ্চ কামরাতে আত্ম রক্ষার্থ পলায়ন করিয়া দ্বারবন্দ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধৃত করণ সম্বন্ধে হড্‌সন সাহেবের উক্তির সার ভাগের অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইল। হড্‌সনের উক্তি এই ' রাজবংশের দূর শাখা সম্ভূত জনৈক সামান্য মনুষ্য এবং এক চক্ষুহীন মৌলবি রজবালিকে, আমি যে সাহাজাদাগণকে ধৃত করিতে আসিয়াছি তাহা বলিতে পাঠাই। দুই ঘণ্টা বাক্‌কলহের পর সাজাদাগণ উপস্থিত হইয়া, গবর্ণমেণ্ট কি তাহাদের প্রাণ রক্ষার আদেশ দিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করেন। আমি দৃঢ়রূপে অস্বীকার করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রহরীর জেম্মাতে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করি। তাঁহার পর আমি অবশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য সহিত টোমের মধ্যে যাই এবং ৬ | ৭ হাজার চাকর, অনুগত লোক দেখিতে পাই, আমি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ত্যাগ করিবার হুকুম দেই, এবং তাহারা অবিলম্বে আমার হুকুম মান্য করিয়া ৫ শত তলয়ার, ততোধিক বন্দুক, অশ্ব, বলদ, রথ গোপনীয় স্থান হইতে আনিয়া উপস্থিত করে। আমি অস্ত্র সকল ও পশু সকল সিজিল মিছিল করিয়া অস্ত্রধারী প্রহরীর জেম্মাতে রাখিয়া আমার ধৃত সাজাদাগণের অভিমুখে যাত্রা করি, যখন একটা জনপ্রবাহ একত্র হইয়া ধৃত সাজাদাদের প্রহরীগণের অভিমুখে আসিতে ছিল, তখনই আমি পৌঁছি এবং অশ্বারোহণে তাহাদের মধ্যে

প্রবেশ করিয়া উক্ত জনসমূহকে সম্বোধন করিয়া কহি, 'ইহারা কসাই, সহায়হীন স্ত্রী ও বালক বালিকাকে পশুর ন্যায় হত্যা করিয়াছে, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন।' ইহা কহিয়া আমার লোকের নিকট হইতে বন্দুক গ্রহণ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক একের পর অন্যকে গুলি করিলাম এবং তাহাদের মৃতদেহ দিল্লীতে আনিয়া প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়া তাহাদের দোষের পরিচয় দিলাম।"

হুমায়ূন টোম হইতে কুতব রাস্তা পর্য্যন্ত একটি উত্তম সড়ক আছে; তাহার উভয় পার্শ্বেই সমাধি মন্দির, প্রাচীন দিল্লীর মুসলমানেরা ইহাকে মানিকতলা কহিত। এইস্থানে ৩ হাজার ধার্ম্মিক ব্যক্তির সমাধি হইয়াছে। সড়কের দক্ষিণ অর্থাৎ উত্তর পার্শ্বে অসংখ্য সমাধি মন্দির আছে; তাহার অধিকাংশই ভগ্নাবস্থাতে আছে। এইস্থানের দৃশ্য মনে করিলেও অনন্ত ঔদাস্য ভাব জন্মে। কত মহাত্মা, কত বীর পুরুষ, কত ধর্ম্মাত্মা এইস্থানে অনন্ত নিদ্রাতে অভিভূত রহিয়াছেন, সহজে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। যাহা হউক এখন দক্ষিণ পার্শ্বের বর্ণনাতে ক্ষান্ত হইয়া সড়কের বামদিগের কতিপয় সমাধি মন্দিরের বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা সড়কে গাড়ি রাখিয়া, অবতরণ করিবা মাত্র ২। ৪ জন মুসলমান বালক আমাদের পথ প্রদর্শক হইল। আমরা যেস্থানে উপস্থিত হইলাম, সাধারণত সেস্থানকে নিজামউদ্দিন কহে। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কবর আছে,—এজন্য এস্থানের নিজামউদ্দিন নাম হইয়াছে। এই স্থানে নিজামউদ্দিন আউলিয়া, কবিবর চসেরো, জাহাঙ্গির সাহা, সাজাদি জাহানারা, আহম্মদ সাহা—প্রভৃতির কবর আছে। প্রথমেই নিজামউদ্দিন আউলিয়ার বাউলি, তাহার তীরে নিজামউদ্দিনের কবর। নিজামের সমাধি মন্দির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রস্তুত হইয়াছে। মধ্যের প্রকোষ্ঠ প্রাচীন, সুদৃশ্য বারেন্দা পরে যোগ করা হইয়াছে, এবং মন্দিরের চূড়া আকবর সাহের রাজ্যকালে ইমাম উদ্দিন হোসেন প্রস্তুত করেন, এবং সমুদায় মন্দির সাহজাহান বাদসাহ কর্ত্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে।

নিজামউদ্দিন আজমীরের প্রসিদ্ধ ফকির মএনুদ্দিনের শিষ্য, কুতবউদ্দিনের অনুশিষ্য ছিলেন। নিজাম উদ্দিন পারস্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আইসেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে মুনি ঋষির তুল্য মান্য করিত। সম্ভবত প্রথম বয়সে ডাকাইত ছিলেন, ইহা তাঁহার স্তাবকেরাও স্বীকার

করে। ভারতবর্ষীয় মুসলমান ঠগেরা, তাঁহাকে ভারতবর্ষে ঠগী প্রথা প্রচলন কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, এবং তীর্থ জ্ঞানে তাঁহার সমাধি মন্দির দর্শন করে। ১৩০৩ অব্দে মোগল সৈন্য মধ্যে হঠাৎ ভয় প্রদর্শন করাতে নিজাম উদ্দিনের জহরা (ক্ষমতা) প্রচার হইয়া পড়ে। শ্লিম্যান সাহেব বিবেচনা করেন, নিজাম উদ্দিন রাত্রিযোগে আপন সঙ্গীদিগের সাহায্যে এইরূপ ভয় উৎপাদন করিয়াছিল। সম্রাট হইতেও নিজাম উদ্দিনের অধিক খরচ পত্র ছিল। অথচ প্রকাশ্যে কোন আয় ছিল না। তোগলক সাহ, সর্ব্বদাই নিজাম উদ্দিনের গুপ্ত অপরাধের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিতেন ও ভয় প্রদর্শন করিতেন।

নিজাম উদ্দিনের সমাধি মন্দিরের পশ্চাতে একটি বাউলি (কূপ) আছে। তাহা চতুষ্কোণ; তিন দিকে খাড়া ভাবে পাথরের গাঁথনি। অন্য দিকে প্রশস্ত সোপান, তাহার দ্বারা তীর হইতে জলে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে এই বাউলি, খোদিত হয়। উহা ৬০ ফিট লম্বা, ৩০ ফুট প্রশস্ত, ৭০ গজ গভীর, তাহার ৪০ গজ পর্য্যন্ত জল আছে। এই স্থান পার্ব্বত্য ভূমি এবং সমুদ্র হইতে ৮০০ ফুট উচ্চ, সুতরাং উহা ৭০ ফুট গভীর পক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ১০।১২ বৎসর বয়স্ক বালকেরা ইহার তীর হইতে ঝাঁপ দিয়া বাউলিতে পতিত হইয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করে এবং দুই চারি আনা বকশিশ লয়। নিজাম উদ্দিনের কবরের সন্নিকটে এবং সেই প্রাঙ্গণে কবিবর চসেরোর সমাধি মন্দির বর্ত্তমান আছে। ১৩৫০ অব্দে উহার নির্ম্মাণ হয়। কবিবর আপন বন্ধু ধর্ম্মাত্মার পার্শ্বে এক প্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। দিল্লীতে কবিশ্রেষ্ঠ চসেরোর এবং বীরভূমে কেন্দ-বিল্ব গ্রামে জয়দেবের সমাধি মন্দির দেখিতে পাই। হিন্দু মোসলমানের মধ্যে অন্য কোন কবির এরূপ মন্দির ভারতবর্ষে আর দেখিতে পাই না। মধুর কবিতা রচন দ্বারা কবিবর ভারতীয় তোতা পাখি এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই স্থানে সম্রাট জাহাঙ্গির সাহার ও সম্রাট মহম্মদ সাহার সমাধি মন্দির বিরাজ করিতেছে। যাঁহারা দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া শত শত মনুষ্যের জীবন মৃত্যুর কর্ত্তা ছিলেন, এবং যাঁহাদের ইঙ্গিতে শত শত মনুষ্য ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়া যমালয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিত, আজ তাঁহারাও অনাথের ন্যায় মৃত্তিকার নীচে অনন্ত নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের ভৃত্য, তাঁহাদের প্রজা হইতে আজ তাঁহারা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ

নহেন। ইহ সংসারে যিনি ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। সমাধি মন্দিরের নশ্বর চাকচিক্যে কি সম্রাটের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে? যাহা হউক জাহাঙ্গিরের সমাধি মন্দির হুমায়ুন টোম এবং শেকন্দরাস্থিত আকবরের সমাধি মন্দির হইতে আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে কারুকার্য্যের চমৎকারিতা আছে। পাদরি হিবর সাহেব কহেন, "শ্বেত প্রস্তরের উপর যে সকল ফুল কাটা হইয়াছে তাহা সুদৃশ্য, এবং উত্তম রুচি সম্পন্ন, ইটালী দেশীয় সাধারণ শিল্পীরা এতরূপ কারিগরি দেখাইতে পারে না।"

এই স্থানে সাহ জাহানের কন্যা জেহানারা বেগমের সমাধি হইয়াছে। যখন নিষ্ঠুর আরঙ্গজেব রাজ্য লোভে আপন পিতা সাহ জাহানকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বন্দী করেন, তখন জেহানারার যৌবন কাল; তথাপি তিনি সুখ বিলাসের আশা পরিত্যাগ করিয়া পিতার সেবাতে নিযুক্ত হন। অতি নম্র ভাষাতে তাঁহার কবরের শ্বেত প্রস্তর খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিজক খোদিত আছে।

নশ্বর ফকির জেহানারা বেগম, সাহ জাহানের কন্যা এবং পবিত্রশিষ্য। ১০৯৪

নিজাম উদ্দিন হইতে আমরা পুরাণা দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে দিল্লীর প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষেপত আলোচনা করা যাইতেছে। দিল্লীর প্রাচীন ইতিহাস ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত, যাহা কিছু আছে তাহাও সংক্ষিপ্ত এবং পরস্পর বিরোধী। পূর্ব্বে * বলা হইয়াছে যুধিষ্ঠিরের সময়েই কৃষ্ণাত্মজ বজ্র, অর্জ্জুন কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন; তাহার পর যদুবংশীয়গণ কত দিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। যদু বংশীয়গণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া দেশাধিকার ও নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করা অনুমান হয়, এবং ইহাতেই যদুবংশীয়গণ ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করিয়া যাওয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বজ্রের পর হইতে বিক্রমাদিত্যের সময় পর্য্যন্ত ইন্দ্র প্রস্থের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। পৌরাণিকেরা এই কালে মগধের রাজগণকে রাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এবং হস্তিনা পুরী গঙ্গা কর্তৃক বিলুপ্তা হইলে যুধিষ্ঠিরের বংশধরগণ কৌশাম্বী নগরীতে বসতি করেন লিখিয়াছেন। আলেকজাণ্ডর যখন ভারতবর্ষে আসেন তখনও দিল্লীর কোন উল্লেখ নাই। মিগাস্থিনিস এবং এরিয়ানের বর্ণনাতে দিল্লীর প্রসঙ্গ নাই।

* বিগত ভাদ্র মাসের নবজীবন দেখ।

বৌদ্ধ গ্রন্থেও দিল্লীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব বজ্রের কি তাঁহার সন্তানাদির সময় হইতেই ইন্দ্রপ্রস্থের হীন দশা হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে যুধিষ্ঠির বংশজ ক্ষেমক রাজা পর্য্যন্ত বর্ণন আছে। ক্ষেমকের পর এই বংশের লোপ হইয়াছে (১)। রাজাবলী গ্রন্থকার বিষ্ণু পুরাণের অতিরিক্ত অর্থাৎ ক্ষেমকের পর ইন্দ্রপ্রস্থের রাজাগণের বর্ণন করিয়াছেন (২)। রাজাবলী মতে যুধিষ্ঠির বংশের শেষ রাজা ক্ষেমক আপন মন্ত্রী কর্তৃক নিহত হন। তাহার পর মন্ত্রী বংশীয় ১৪ জন পাণ্ডবদিগের রাজ্য ভোগ করেন। ইহার পর গৌতম বংশীয়গণ তদনন্তর ময়ূরবংশীয়গণ ইন্দ্র প্রস্থে রাজা হন। ময়ূর বংশের শেষ রাজার নাম রাজপাল, ইনি কুমায়ুন দেশের অধিপতি শকাদিত্য (৩) কর্তৃক পরাস্ত হন। বিক্রমাদিত্য আবার শকাদিত্যকে জয় করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সাজাহান বাদসাহের রাজ্যকালে খড়্গ রায় নামা জনৈক ভাট দিল্লীর যে বিবরণ লিখেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন; কলির তিন হাজার বৎসরে পাণ্ডু বংশীয় নীলাঘ পতি ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেন, রঘু বংশীয় শঙ্খ ধ্বজ নীলাঘপতিকে জয় করেন, এবং বিক্রমাদিত্য শঙ্খ ধ্বজকে জয় করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করেন। রাজাবলীর ও খড়্গ রায়ের বর্ণনায় ঠিক ঐক্য না হইলেও বিক্রমাদিত্য যে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করেন, ইহা উভয়ের লিখাতেই প্রমাণ হইতেছে। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে তুয়ারবংশীয় অনঙ্গপালদিগের অধিকার সময় পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থ কাহার শাসনাধীনে ছিল এবং জন পদ কি জঙ্গল ছিল, তাহার সুস্পষ্ট ইতিহাস দুর্ল্লভ। ধাব রাজ

---

(১) ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্ব্বংশো রাজর্ষি সৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্সতে কলৌ।

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ২১ অধ্যায়।

(২) রাজাবলী গ্রন্থকার ক্ষেমক প্রভৃতিকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা কহেন। পুরাণে উক্ত আছে যদু বংশীয় বজ্র ইন্দ্র প্রস্থে রাজা হন এবং ক্ষেমকের পূর্ব্ব পুরুষ হস্তিনাতে ছিলেন এবং হস্তিনা পুরী গঙ্গাগর্ভে পতিতা হইলে যুধিষ্ঠিরান্বয় নিচক্ষু কৌশাম্বীতে বাস করেন। অতএব বোধ হইতেছে যদু বংশীয়গণ ইন্দ্র প্রস্থ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইলে পাণ্ডব বংশীয়েরা ইন্দ্র প্রস্থ অধিকার করিয়াছিলেন।

(৩) শকেরা তুর্কিস্থানের পূর্ব্ব অংশে ওক্সস ও জগ্জর্ত্তিস নদীর অন্তর্বর্ত্তী স্থানে বাস করিত। গ্রীক গ্রন্থে ইহাদের নাম সকি। বর্ত্তমান পারসিক ভাষাতে সক শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ইহাদিগকে জয় করিয়া বিক্রমাদিত্য শকারি উপাধি গ্রহণ করেন।

কর্ত্তৃক স্থাপিত লৌহ স্তম্ভ খোদিত কবিতাত্রয়ের মর্ম্মে ইহা জানা যায়, ধাব নামা জনৈক রাজা প্রতীক দেশবাসী শত্রুগণকে এবং সিন্ধু ও বাহ্লীকদিগকে জয় করিয়া বিষ্ণুভুজ নামা লৌহ স্তম্ভ স্থাপন করেন। পুরাবৃত্ত সন্ধানকারী পণ্ডিতেরা অনুমান করেন খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে উক্ত স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। অতএব এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে উক্ত স্তম্ভ স্থাপন কালে ইন্দ্রপ্রস্থ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির আবাস ভূমি ছিল না, ধাব নামা জনৈক রাজার অধিকৃত জনপদ ছিল। এবং ধাব কর্ত্তৃক বিক্রমাদিত্যের অধিকার চ্যুত হইয়াছিল।

ধাব রাজার অধিকারের পর, তুয়ারদিগের অধিকার পর্য্যন্ত ইতিহাস অপ্রাপ্য। ধাব রাজার পরেই তুয়ার বংশীয়গণ কর্ত্তৃক নূতন ইন্দ্রপ্রস্থ (পুরাণা দিল্লী) অধিকারের ইতিহাস পাইতেছি। তুয়ার বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যদুকুলের শাখা; কিন্তু কবিচাঁদ বরদাই তুয়ারদিগকে পাণ্ডুবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। তুয়ার শাখা রাজপুতদিগের প্রসিদ্ধ ৩৬ শাখার অন্তর্গত। যেস্থলে চর্ম্মন্বতী (চম্বল নদী,) যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ তীরে তুয়ার গড় নামক স্থান, এবং জয়পুরের অন্তর্গত পত্তন তুয়ারবতী, তুয়ার বংশীয় রাজপুত্রদিগের অধিকৃত স্থান। কর্ণেল টড কহেন ইহাদিগের ইতিহাস অপ্রাপ্য। ৮২৯ সম্বতে (৭৭২ খৃঃ অব্দে) বিলন দেব (কেহ কেহ বলবান দেবও কহেন) নামা তুয়ারবংশীয় জনৈক ধনী ঠাকুর, ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করেন। তৎকালে ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাচীন গৌরব কিছুই ছিলনা, সুতরাং অঙ্গহীন বলা যাইত, ইহাতেই বিলন দেব অনঙ্গ পাল উপাধি ধারণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ পালনে প্রবৃত্ত হন। বিলন দেব হইতে তদ্বংশীয় ১৯ জন রাজা সকলেই অনঙ্গ পাল উপাধি ধারণ করিয়া ৪০০ শত বৎসর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। ঊনবিংশ অনঙ্গ পালের সময় চৌহান বংশীয় বিশাল দেব (১) একবার ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে রাজাগণ দেশাধিকার করিয়া জিত রাজাকেই জিত দেশে রাখিতেন, জয়ী রাজা কেবল কর পাইতেন। এই নিয়মানুসারে ১৯ ঊনবিংশ অনঙ্গ পাল ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন চ্যুত হন নাই। ঊনবিংশ অনঙ্গপাল অপুত্রক

---

(১) ফিরোজ লাট বা অশোক স্তম্ভে বিশাল দেবের বিজক খোদিত আছে। ১২২০ সম্বতে উক্ত বিজক অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত বিশালের রাজ্য বিস্তার হইয়াছিল।

ছিলেন ; তাঁহার কেবল মাত্র দুই কন্যা ছিল। তাহার এক কন্যা আজমিরাধিপতি, চৌহান (১) বংশীয় সোমেশ্বর রাজাকে, দ্বিতীয় কন্যা কনোজাধিপতি রাঠোর বংশীয় (২) বিজয়পালকে অর্পণ করেন। শেষ অনঙ্গপালের সোমেশ্বর হইতে, পৃথ্বীরাজ নামা, এবং বিজয় পাল হইতে, জয়চন্দ্র নামা দৌহিত্র জন্মে। অপুত্রক উনবিংশ অনঙ্গপালের ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে ৮ বৎসর বয়সে পৃথ্বীরাজ অধিরোহণ করেন। ইহাতেই জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীরাজের ক্রমশ বিবাদের সূত্রপাত হয়। রাঠোর এবং চৌহান চিরদিনই শত্রুতাতে বদ্ধ ; অহি নকুলে যেমন সম্বন্ধ, রাঠোর চৌহানেও সেইরূপ সম্বন্ধ। জয়চাঁদ এবং পৃথ্বীরাজ এক মাতামহের দৌহিত্র হইলে কি হয়, শত্রুতাতে না করিতে পারে, এমন কিছুই নাই। পৃথ্বীরাজ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ, জয়চাঁদ রাঠোর কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয়াধম। এই জয়চাঁদই ভারতের স্বাধীনতা নষ্টের মূল। পৃথ্বীরাজের সহিত ক্রমাগত বিবাদ করিয়া নিজে হীনবল হন, উভয় পক্ষের বলক্ষয় হয়, তাহাতে রাঠোরাধম জয়চাঁদ যবন সেনাপতিকে ভারতে আহ্বান করিয়া আনেন, এবং পৃথ্বীরাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এই যুদ্ধে রাঠোর, চৌহান উভয়ের অতিরিক্ত পরিমাণে বলক্ষয় হয়, সহজেই যবনেরা পৃথ্বীরাজকে জয় করিয়া ভারত অধিকার করে।

বিলন দেব ৮২৯ সম্বতে যমুনা তীরস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করেন। তখনও ইন্দ্রপ্রস্থ সমৃদ্ধশালী নগর হয় নাই। ৯১৫ খৃঃ অব্দে মসৌদি ভারতবর্ষে আসেন। তিনি দিল্লী বা ইন্দ্রপ্রস্থের কোন উল্লেখ করেন নাই। গিজনীর মহম্মদের লুটপাটে মথুরার উল্লেখ আছে ; দিল্লীর কি ইন্দ্রপ্রস্থের উল্লেখ নাই। আবুরেহান ১০৪১ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে বাস করেন। তাঁহার

---

(১) রাজপুত ইতিহাসানুসারে চৌহানেরা অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে বিশ্বামিত্র ঋষি আবুনামক পর্ব্বত শিখরে ক্ষত্রিয় উৎপাদন নিমিত্ত যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে মার মার শব্দে এক বীর পুরুষের জন্ম হয় ; তাহার নাম প্রমার। বিক্রমাদিত্য প্রমার বংশীয়। যজ্ঞোৎপন্ন দ্বিতীয় পুরুষের নাম চালুক অথবা শোলাঙ্কিণ তৃতীয় পুরুষের নাম পরিহার। চতুর্থ পুরুষের নাম চতুর্ভুজ চাহুমান। চাহুমান শব্দের অপভ্রংশে চৌহান শব্দ হইয়াছে।

(২) রাঠোর রাজপুতেরা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলাচার্য্যগণ কহেন, পার্লিপুরের রাজা যুবনাশ্ব ইহাঁদের কুলপতি। অন্যেরা কহেন, রাঠোরগণ ইন্দ্রের পৃষ্ঠোদ্ভব। পৃষ্ঠ শব্দের অপরাভিধান রাঠ ; তন্নিমিত্ত এই বংশের রাঠোর নাম হইয়াছে। ৫২৬ সম্বতে নয়ন পাল রাঠোর কান্যকুব্জ অধিকার করেন।

ভূগোলে ইন্দ্রপ্রস্থের উল্লেখ নাই। ১১১০ সম্বতে (১০৫২ খৃঃ) দ্বিতীয় অনঙ্গপাল যমুনা তীর হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর, পুরাণা দিল্লীতে (যেস্থানে লৌহ স্তম্ভ আছে) আনয়ন করেন। তদবধি এইস্থানের ইন্দ্রপ্রস্থ নাম হয়, কনোজের রাঠোর দিগের ভয়ে এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

কাশীম বাজারের রাজবংশ।

২।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ বাহারবন্দ পরগণা রাণীভবানীর সরকার হইতে জবরদস্তিতে লইয়া কান্ত বাবুকে প্রদান করেন। হেষ্টিংসের, রাণী ভবাণীর সম্বন্ধে, এই প্রকার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ, আমরা কেবল মহারাজা নন্দকুমারের হেংষ্টিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রেই দেখিতে পাই। মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ্চ যে অভিযোগপত্র, কলিকাতা কৌন্সিলের নিকট গবর্ণরের অন্যায় কার্য্য সমূহের প্রতিবাদ করিয়া, প্রদান করেন, তাহার শেষভাগে, তিনি হেষ্টিংসের এই প্রকার অন্যায় দানের কথা লইয়া তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য হেষ্টিংস এই অভিযোগের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই।

রাজস্বের সুশৃঙ্খলা সংসাধনার্থ—জমী বিলি সম্বন্ধে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের এই আজ্ঞা প্রচারিত হইল, যে সাধারণ লোকের মধ্যে এক লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের অধিক কেহ কোন জমী রাখিতে পারিবেন না। এবং কোন বেনিয়ান, পেস্কার ও কালেক্টরের লোকে বা অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা এই প্রকার লাভকর জমী ইজারা লইতে পারিবেন না। ডাইরেক্টর দের বিশেষ আজ্ঞায় চালিত হইয়া, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল এই প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হেষ্টিংসই প্রথমে ইহা উল্লঙ্ঘন করেন। তিনি স্বেচ্ছায়, ও নিজ চেষ্টায়, নিজ বেনিয়ান কান্তবাবুকে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা আয়ের জমীদারি ইজারা দেওয়ান।

কৃতজ্ঞ হেষ্টিংস, কান্তবাবুর উপকারের প্রতিশোধ দিতে এই উপায় অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন। কেবল ডাইরেক্টরেরা যে তাঁহার এই প্রকার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন তাহা নহে—

পরিশেষে পার্লেমেণ্টে তাঁহার নামে এই সম্বন্ধে একটি অভিযোগ উপস্থিত হয়। যে সকল অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তিনি পার্লেমেণ্টের সম্মুখে অপরাধীরূপে দণ্ডায়মান হন, তন্মধ্যে কান্তবাবুকে এই প্রকার অন্যায়রূপে জমীদারী দেওয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সকলের মধ্যে পঞ্চদশ অভিযোগ।

এই সমস্ত কার্য্য ছাড়া হেষ্টিংস সাহেব কান্তবাবুকে আর একটি সরকারী চাকরী দিয়াছিলেন। এ পদের কোন বেতন ছিল কিনা তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বেতন থাকাই সম্পূর্ণ সম্ভব। কান্তবাবু হেষ্টিংসের নিয়োগানুসারে, কোম্পানীর ধর্ম্মাধিকরণ সমূহে কোন মোকদ্দমায় জাতিঘটিত কোন কূটতর্ক উঠিলে, তৎসমুদায়ের বিচার করিয়া দিতেন।

কান্তবাবুকে হেষ্টিংস কতদূর ভাল বাসিতেন তাহার প্রমাণ পাঠক এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট পাইয়াছেন এক্ষণে আর একটি প্রধান ঘটনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া উপরোক্ত বিষয়ের যাথার্থতা আরও অধিকরূপে সপ্রমাণ করিব।

মহারাজা নন্দকুমার যে সময়ে কলিকাতা কৌন্সিলের সম্মুখে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, সেই সময়ে অভিযোগোক্ত দুই একটি বিষয়ের প্রমাণ জন্য গবর্ণরের দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী ও বাবু কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। মহারাজা নন্দকুমার গবর্ণরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনিয়া ছিলেন তাহার অধিকাংশই যে সত্য, ও তাঁহাদের যাথার্থ্য প্রমাণ হইলে হেষ্টিংসের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, তাহা তিনি বুঝিতেন। কলিকাতা কৌন্সিল হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির বিচার করিতে বসিলে, হেষ্টিংস ধরা পড়িবার ভয়ে অনেকস্থলে, যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া মন্ত্রী সভা ভাঙ্গিয়া দিতেন বা ক্রোধবশে সভাগৃহ ত্যাগ

---

* "The said Governor General did permit and suffer his own Banian or principal black steward, named Kanta Babu, to hold farms in different Purgonas or to be security for farms to the amount of thirteen lacs of Rs. per annum; and that after enjoying the whole of these farms, for two years, he was permitted by said Warren Hastings to relinquish two of them which were unproductive." (Charge XV) Articles of Charge against Warren Hastings, formed by the Impeachment Committee.

করিতেন। হেষ্টিংস সাহেব মনিবেগমকে নবাবের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী রূপে নিযুক্ত করিবার সময় আড়াই লক্ষ টাকা উৎকোচ লইয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়ান কান্তবাবু এই বিষয় জানিতেন। এসম্বন্ধে কোন কথা কান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হওয়ায় কলিকাতা বোর্ড, কান্তবাবুকে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য একখানি সমন পাঠাইয়া দেন। হেষ্টিংস সেই সভার সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সমন পাঠাইবার পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধ মনে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা তাঁহার উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে বিচার করিবেন—ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। মহারাজা নন্দকুমার যে সমস্ত প্রমাণ দাখিল করিয়াছিলেন তাহার যাথার্থ্য প্রমাণ হইলেই হেষ্টিংস প্রকৃতরূপে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন, এইজন্য তিনি কৌন্সিলের প্রতি কার্য্যেই বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌন্সিলের সভ্য সংখ্যা তাঁহাপেক্ষা অধিক হওয়ায় তিনি অনেকস্থলে সভা ভঙ্গ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। কিন্তু কৌন্সিলের মেম্বরেরা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা হেষ্টিংসের অবর্ত্তমানে আপনাদের মধ্য হইতে, একজনকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করিয়া হেষ্টিংসের দোষানুসন্ধানে ও অপরাধ প্রমাণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিবস কান্তবাবুকে হেষ্টিংসের মণিবেগমের লিখিত পত্রের কোন অংশ প্রমাণ করিবার জন্য আবশ্যক হইলে, কাউন্সিল তাঁহাকে এক সমন প্রেরণ করেন। কান্তবাবু হেষ্টিংসের সহায়তায় ও পরামর্শে সে সমন অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি সমনের উত্তর যাহা পাঠাইয়া ছিলেন—আমরা অবিকল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি আপনাদের প্রেরিত অনুজ্ঞাপত্র পাইয়া, আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করিতেছি। পত্র পাঠে জানিয়াছি, যে আমাকে অবিলম্বে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করা হইয়াছে। গবর্ণর সাহেব কিন্তু আমায় বলিয়াছেন—যে তিনি চলিয়া আসাতে, প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রী সভা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এ প্রকার ঘটনাস্থলে—আমার উপস্থিতির কোন প্রয়োজনই নাই। এই কারণে আমি আপনাদের আজ্ঞা পালনে বিরত হইলাম।" •

বোধ হয় এই পত্র যদি হেষ্টিংসের সহায়তায় লিখিত না হইয়া, অন্য

• Bengal Revenue Consultations—14th March 1775.

কোন ব্যক্তির সহায়তায় ও বিভিন্ন ঘটনাস্থলে লিখিত হইত, তাহা হইলে, কান্ত বাবুর অতিশয় গুরুদণ্ড হইত। যখন, বাঙ্গালার গবর্ণর তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান সহায়, তখন তিনি যে এই প্রকার অসমসাহসিকতার সহিত, বোর্ডের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

যাহা হউক কলিকাতা বোর্ড কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পর দুই তিন দিন সভার অধিবেশনে, কান্ত বাবুকে সভায় উপস্থিত করাইবার জন্য হেষ্টিংসের সহিত,—বোর্ডের অন্যান্য মেম্বরগণের অতিশয় তর্ক বিতর্ক ও রেষারেষি চলিতে লাগিল। বোর্ডের সভ্যেরা—কান্ত বাবুর এই প্রকার অসমসাহসিকতা দেখিয়া আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। এ অপমান কেবল তাঁহাদের নহে, কোম্পানীর, ও স্বয়ং ইংলণ্ডাধিপেরও ইহাতে অপমান করা হইয়াছে। কোম্পানীর কার্য্য সমূহের সুবন্দোবস্ত দ্বারা রাজ্যমধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য, এবং হেষ্টিংসকে রাজকার্য্য বিষয়ে আবশ্যকীয় মন্ত্রণা দান জন্য তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই প্রকৃত গর্ব্ব, প্রকৃত সম্মান গবর্ণরের প্রিয়পাত্র একজন সামান্য কর্ম্মচারির দ্বারা আহত হইল, ইহা তাঁহাদের সহ্য হইল না। অনেক তর্ক বিতর্কের পর কৌন্সিলের মতই প্রবল হইল, তাঁহারা কান্তবাবুকে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করাইলেন। মন্‌সন সাহেব দ্বিভাষীর দ্বারা কান্তবাবুর নিম্নলিখিত কৈফিয়ত গ্রহণ করিলেন।

প্র। আপনি ১৩ই সোমবার, বোর্ডের নিকট হইতে একখানি সমন পাইয়াছিলেন কিনা ? ঐ সমনে আপনার বোর্ডের সম্মুখে হাজিরা দিবার আদেশ ছিল কিনা ?

কান্তবাবু। হাঁ আমি সেই শমন পাইয়াছিলাম

প্র। তবে আপনার হাজির না হইবার কারণ কি ?

উ। সমন পাইবার সময় আমি গবর্ণর সাহেবের কাছে ছিলাম—তিনি সমনের কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমায় বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিলেন।

প্র। আপনি কি জানেন না যে, এই রাজ্যের শাসনভার কৌন্সিলের ক্ষমতার উপর ন্যস্ত।

উ। আমরা দেশীলোক—বাঙ্গালী, গবর্ণরের আজ্ঞাকেই প্রথমে আমরা

* Bengal Secret Consultations. 20th March 1775.

বর হুকুম বলিয়া মান্য করি, তার পর কৌন্সিলের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি।

প্র। গবর্ণর যদি আপনাকে বোর্ডের আজ্ঞা অমান্য করিতে উপদেশ না দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আপনি বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে অন্যথা করিতেন না?

উ। হাঁ এরূপস্থলে আমি নিশ্চয়ই বোর্ডের আজ্ঞা পালন করিতাম।

প্র। ১৪ ই (মঙ্গলবারে) তারিখে বোর্ডঅব রেবিনিউএর সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আপনি আর একখানি শমন পাইয়াছিলেন কিনা?

উ। হাঁ পাইয়াছিলাম।

প্র। আপনার সে আদেশ পালন না করিবার কারণ কি?

উ। আমি পূর্ব্বেই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

প্র। ১৭ই শুক্রবার পুনরায় "বোর্ড অব্ রেবিনিউ"এর সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য সমন পাইয়াছিলেন কিনা?

উ। আমি শুক্রবার কোন প্রকার সমন পাই নাই। শনিবার এক খানি সমন প্রথম সভায় উপস্থিত হইবার জন্য পাইয়াছিলাম। আমি সম্মর সাহেবকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলাম, যে আগামী প্রথম সভার দিনে আমি বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইব। উক্ত দিবস প্রাতে আমি সম্মর সাহেবের কাছে গেলাম, সাহেব বলিলেন যে সে দিবস সভা হইবে না। সম্মর সাহেব, প্রথম সভার অধিবেশনের দিন পুনরায় আসিতে বলিলেন।

প্র। অদ্য এখানে উপস্থিত হইবার জন্য কোন আজ্ঞা পত্র আপনি পাইয়াছেন কি না?

উ। আজ আমি কোন লিখিত আজ্ঞা পাই নাই; একটি হরকরা আমার বাটীতে গিয়া বলিয়া আসিয়াছিল; সেই সংবাদ পাইয়া আমি অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

প্র। সেই পিয়ন কোথা হইতে আসিয়াছিল; তাহা আপনি জানেন কি না?

উ। আমি সেই হরকরাকে দেখি নাই। আমার লোকের মুখে শুনিলাম যে এক জন হরকরা আসিয়া বোর্ডে উপস্থিত হইবার জন্য বলিয়া গিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া আমি অদ্য উপস্থিত হইয়াছি।*

* Vide Bengal Secret Consultations of the Governor General in Council.

এই প্রকারে জোবানবন্দি শেষ হইলে ক্লেবরিং সাহেব প্রস্তাব করিলেন * "আমার প্রধান ইচ্ছা এই যে গবর্ণর জেনারেল তাঁহার নিজের ও সেই সঙ্গে বোর্ডের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য কান্ত বাবুকে তাঁহার এই গুরুতর অপরাধের জন্য কোন প্রকার কঠিন শাস্তি দেন।" গবর্ণর জেনারেল তাহার উত্তরে বলিলেন "কান্ত বাবু গবর্ণরের দেওয়ান বলিয়া, কলিকাতার লোকে, তাঁহাকে এক জন উচ্চপদস্থ লোক বলিয়া জানে ও সম্মান করিয়া থাকে। তিনি কলিকাতার অধিবাসী নহেন এবং অতিশয় সৎবংশ জাত। এক জন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী বলিয়া দেশের সকলেই তাঁহাকে জানে ও আজ পর্য্যন্তও, এ সম্বন্ধে তাঁহার উপর কেহ কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পারে নাই। আরও আমার কর্ম্মচারি বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মানুসারে কান্ত বাবু সুপ্রীমকোর্টের সীমা নিবিষ্ট; আপনাদের সীমা বহির্ভূত।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর ক্লেবরিং সাহেব প্রস্তাব করিলেন—"কান্ত বাবুকে শাস্তি দিবার প্রস্তাব করাতে, গবর্ণর সাহেব, শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমায় ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—যে কান্তকে তিনি নিজের জীবন দিয়া রক্ষা করিবেন। এইজন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি—"গবর্ণর অতিশয় সামান্য অপরাধের জন্য প্রতিদিবস, শত শত হিন্দুকে যে শাস্তি দিয়া থাকেন—আমি অদ্য কান্তবাবুর জন্য সেই প্রকার শাস্তির বিধান কামনা করিব। আমি কান্ত বাবুকে তাহাদের ন্যায়—তুড়ুম (Stocks) পরাইতে ইচ্ছা করি।" † হেষ্টিংস এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি

---

* এই সময় কলিকাতা কৌন্সিলে, ক্লেবরিং, মনসন, ফ্রান্সিস ও বারওয়েল, নামক ৪ জন সদস্য ছিলেন।

† ইংরাজ রাজত্বের প্রথম বিকাশ সময়ে অপরাধীদের বড় মজার শাস্তি হইত। হেষ্টিংসের সময়ে গড়ের মাঠে কেহ মল মূত্র ত্যাগ করিলে, তাহাকে গবর্ণরের আদেশানুসারে তুড়ুম লাগান হইত। তখন মিউনিসিপালিটি ছিল না, নগরের স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য এই প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইত। একথা হেষ্টিংস নিজ মুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তখন চুরি করিলে প্রায়ই প্রাণ দণ্ড হইত। পার্ব্বতী নামে একটি বেশ্যা একবার অপহৃত দ্রব্য ঘরে রাখিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে আট দিন কারাগারে রাখিয়া নয় দিনের দিন বাহির করিয়া বড় বাজারের চৌমাথায় লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করা হইল ও সর্ব্বশেষে এক টাকা জরিমানা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আরও অনেক প্রকার নূতন ধরণের শাস্তি ছিল, এ স্থলে সে সমস্ত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক।

উথাপন করিলেন—তিনি বলিলেন—এপ্রকার শাস্তিদ্বারা কান্ত বাবুর অক্ষত সম্মান চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যাইবে ও তিনি লোকের চক্ষে, হেয় ও অপমানিত হইবেন।” সে দিবস একথার কোন শেষ হইল না। হেষ্টিংসের আপত্তিতে সেই দিবস তৎক্ষণাৎ সভা ভঙ্গ করা হইল। উল্লিখিত ঘটনা হইতে বিশেষ প্রতিপন্ন হইবে যে হেষ্টিংস, কান্ত বাবুকে বড় ভাল বাসিতেন ও বিশেষ প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তখনকার কালে বোর্ডের ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার পথ ছিল না। হেষ্টিংস সহায় না থাকিলে, এই জন্য কান্ত বাবুকে অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইতে হইত।

রাজনৈতিক জগতে, কান্ত বাবু যেমন যথেষ্ট খ্যাতি, ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন,—দয়া, দাক্ষণ্য ও মনুষ্যতায়ও সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণতা লাভ হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে তিনি এমন এক গৌরবের কার্য্য করিয়াছিলেন যে বঙ্গবাসী, সেই জন্য চিরকাল তাঁহার স্মৃতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে পোষণ করিবে। চিরকালই তাঁহাকে জাতীয় গৌরব স্থল বলিয়া বিবেচনা করিবে। বাঙ্গালীর হৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ কোমলতা, উচ্চতা ও সহানুভূতি, প্রভৃতি সমস্ত গুণেই তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। পাঠক নিম্নে তাহার পরিচয় পাইবেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন চেৎ সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিবার উদ্দেশে বারাণসীতে গমন করেন, তখন কৃষ্ণ কান্ত নন্দীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের গমনের কিয়দ্দিবস পরেই বিদ্রোহ উপস্থিত হইল—রাজা চেৎসিংহ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। রাজ্য মধ্যে সুতরাং ভীষণ অরাজকতা ও গোলমাল উপস্থিত হইল। ধাবমান ইংরাজ সৈন্য নাগরিকগণের ঘর দ্বার লুঠ পাট করিতে লাগিল। কেই বা তাহাদিগকে নিরস্ত করে—কেই বা নাগরিকদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করে? হেষ্টিংস যখন রাজ প্রসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন ইংরাজের সেনা আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। তাহারা রাজ ভাণ্ডার, ও রাণীদিগের বহু মূল্য রত্নালঙ্কারাদি লুণ্ঠন ও অপহরণ করিতে মনস্থ করিল। দলে দলে বিশৃঙ্খল সেনা উচ্ছলিত অর্ণব প্রবাহের ন্যায় রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। অসূর্য্যম্পশ্যা রাজরাণীগণ সামান্য সৈনিকদিগের অত্যাচারের বস্তু হইবে, হিন্দুরমণী যবনের দ্বারা পীড়িতা ও অপমানিতা হইবেন,—হিন্দুর প্রধানতীর্থ বারাণসীতেই এই বীভৎস কাণ্ডের সূচনা হইবে—ইহা কান্ত বাবুর সহ্য হইল না। সৈন্যগণ যতক্ষণ

বহির্বাটীতে লুণ্ঠনাদি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণ কান্ত বাবু কিছুই বলেন নাই। যখন দেখিলেন, উচ্ছৃঙ্খল সেনাগণ, সজোরে, সশস্ত্রে অন্তঃপুরের দ্বারাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে এক ভীষণ ঝটিকা বহিল। তিনি হৃদয়ে শত গুণ বল পাইলেন, সদর্পে সরোষে তড়িদ্বেগে অন্তঃপুরের দ্বারস্থ হইলেন। দুই হস্তে বাহির দিক হইতে সবলে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। দুই হস্ত বিস্তার করিয়া সেই দ্বার মুখে দাঁড়াইয়া, নিজ জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বাক্য দ্বারা সৈনিকগণকে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। উন্মত্ত সৈন্যগণ তাঁহার কথা শুনিবে কেন? তাহারা বলপূর্ব্বক দ্বার প্রবেশের চেষ্টা করিল—কান্তবাবু এই সময়ে কৌশল করিয়া হেষ্টিংসের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—হেষ্টিংস কান্তবাবুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না—তাঁহার আদেশে সৈন্যগণ দ্বারত্যাগ করিয়া ভিন্ন দিকে গমন করিল—কান্তবাবু নিজের জীবনের সহিত, রাজ পরিবারস্থ হিন্দুরমণীগণের, স্ত্রী-সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজ্ঞীরা বাঙ্গালীর এই অমানুষিক মহত্বের কথা স্থির কর্ণে শুনিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার স্রোত বহিতে লাগিল। কান্তবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবা মাত্র, রাণীরা তাঁহাদের উদ্ধার কর্ত্তাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রবীণ অন্তঃপুর রক্ষক রাণীদিগের ইচ্ছানুসারে কান্তবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কান্তবাবু বলিলেন যদিও রাণীরা এক্ষণে বিপদমুক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা নিরাপদ নহেন। একে কোম্পাণীর সৈন্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে আবার তাহারা লুণ্ঠনে বাধা পাইয়াছে, বিলম্বে তাহাদের দ্বারা নূতন প্রকারের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইবার অসম্ভাবনাই বা কি? আমি রাজ্ঞীদিগকে ইহা অপেক্ষা আরও নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানে রাখিতে চাই, ইহাতে রাজ্ঞীদিগের কোন অমত আছে কি না?" কান্তবাবুর এই প্রস্তাবে, তাঁহারা সকলেই বিনাবাক্য ব্যয়ে সম্মত হইলেন। কান্তবাবু সযত্নে পালকী করিয়া, উপযুক্ত প্রহরী সঙ্গে দিয়া, রাজ্ঞীদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রাখিয়া তাঁহাদের সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজ্ঞীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্য কোন উপায় না পাইয়া, কান্তবাবুর বেণারস হইতে প্রত্যাগমন কালে, তাঁহাকে অনেক বহুমূল্য জড়োয়া গহনা, ও দুই এক ছড়া মতির মালা দিতে চাহিলেন। কান্তবাবু নম্রতার সহিত তাহা লইতে অস্বীকার করাতে রাজ্ঞীরা বড় জেদাজেদি করিতে লাগিলেন। অবশেষে কোন

মতে, তাঁহাদের সেই নির্দ্দোষ অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া কয়েকখানি রত্নময় আভরণ গ্রহণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, এক মুখরুদ্র প্রভৃতি বিগ্রহ, ও দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, এবং আর দুই একটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হন। আজও কাশীম বাজার রাজবাটীতে এই সকল বিগ্রহের ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে।

অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুরমণীর সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা জন্য কান্তবাবুর যে পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছিল—সেই পুণ্যবলে শীঘ্রই তাঁহার আরও উন্নতি আরম্ভ হইল। এই সময়ে ঘটনাক্রমে, তিনি দুইটি জাইগীরের অধিকারিত্ব পাইলেন। হেষ্টিংস সাহেব কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গাজিপুর ও আজিম গড় মধ্যস্থ সমস্ত ভুভাগ কান্তবাবুকে জাইগীর স্বরূপ অর্পণ করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার রাজ সম্মানও লাভ হইল। তৎকালে বঙ্গদেশে মহারাজা নন্দকুমার ভিন্ন আর কাহারও, "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি ছিল না। এই বাদসাহী সম্মান, কেবল তিনিই একাকী ভোগ করিতে ছিলেন! হেষ্টিংসের অনুরোধে নবাব নাজিম কান্তবাবুকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু সুচতুর কৃষ্ণকান্ত তাহা আর নিজের জন্য না প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার একমাত্র পুত্র লোকনাথের জন্য সেই উপাধি প্রার্থনা করিলেন। নবাব নাজিমের অনুগ্রহে ও হেষ্টিংসের সহায়তায়, এইরূপে কান্ত বাবু সর্ব্বোচ্চ রাজসম্মান প্রাপ্ত হইলেন। নবাবকে উপযুক্ত উপঢৌকন প্রদান করা হইলে তিনি তৎপরিবর্ত্তে রাজ সম্মান চিহ্ন সকল প্রত্যর্পণ করেন। এইরূপে জগতের যাহা কিছু বাঞ্ছনীয় তাহার সমস্তই লাভ করিয়া কান্তবাবু তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য ধনীদিগের ন্যায় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিলেন। সামান্য কুঠির কর্ম্মচারি হইতে স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভা বলে অসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়া তিনি যে রাজ্যের মধ্যে তৎকালে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন—এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা হইতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইবে।

মা-হারা মেয়ে।

সরসী তীরে।

একটি বালিকা হারায়ে জননী
বসিয়ে রয়েছে অই,—
নয়নের নীর গলিয়ে গলিয়ে
গায়ের বসন গিয়েছে ভাসিয়ে,—
যে যায় সে পথে তাহারে চাহিয়ে
বলে সে "মা—মা—মা—কই?"
জননী হারায়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
বসিয়ে রয়েছে অই।

বারিধারা পাতে দলিত-পল্লব
ক্ষুদ্র যূথিকার মত
হেরিয়া তাহারে, ডাকিনু পারশে,
ধীরি ধীরি আসে—শুকায় তরাসে,
টেনে ধার সেই জীর্ণ—সিক্ত বাসে—
ভয়ে—লাজে অবনত!
হেরিনু তাহারে দলিত-পল্লব
ক্ষুদ্র যূথিকার মত।

ডাকিয়া পারশে জিজ্ঞাসিনু তায়
কোথায় জনম বাস?
—বিধবা জননী, গৃহ দ্বার নাই
ভিখারিণী বেশে পথে পথে যাই—
কহিল—দুজনে ভ্রমিয়া বেড়াই—
নাছিল অপর আশ,
জননী আমার, আমি সে তাহার—
এ জগত গৃহ বাস!

আজি যে জননী অই সরসিতে
নাহিতে নামিল অই—
আমি সে তখন শুইয়া সোপানে
চাহিয়া ছিলাম আকাশের পানে,
ভাবিতে ছিলাম কত কি পরাণে,
—জননী উঠিল কই?
দেখিলাম সে যে নাহিতে নামিল
সরসীর নীরে অই!

কাঁদিল বালিকা গলিত নয়নে—
"মা—মা—মা আমার কই?—
জননী আমার, আমি যে তাহার,
না হেরিলে মোরে, হত অন্ধকার—
নাহিতে নামিল জননী আমার—
দেখিনু অই যে—অই—
কি ভাবিতে ছিনু উপরে চাহিয়া
জননী উঠিল কই।"

মা-মরা মেয়ে।

মা-মরা দুখিনী মেয়ে—বড় যন্ত্রণার।

মা-মরা দুখিনী মেয়ে,
এ ঘরে ও ঘরে যেয়ে
খোঁজে নিতি পাতি পাতি জননী তাহার!
শুধায় আসিয়া কাছে,
"বাবা গো মা কোথা আছে?"
পারি না উত্তর দিতে শিশু বালিকার!

মা-মরা দুখিনী মেয়ে,
যারে দেখে তারে যেয়ে
মা ব'লে আঁচল ধরে টানে অনিবার,
কিন্তু চেয়ে মুখ পানে,
ফিরে সে নিরাশ প্রাণে—
সে দৃশ্য দেখিতে বিশ্ব দেখি অন্ধকার।

মা-মরা দুখিনী মেয়ে,
কোলে উঠে চেয়ে চেয়ে,
কিন্তু কে লইবে কোলে কে আছে তাহার!
কিছুতে নাহিক ভোলে,
উঠিবে মায়ের কোলে,—
পারি না কোলের মেয়ে কোলে
নিতে আর!

মা-মরা দুখিনী মেয়ে,
চুমা খায় চেয়ে চেয়ে
একাকী চুমিতে আজি বহে অশ্রুধার!
এই না দু'দিন আগে,
দু'জনে কত সোহাগে
একত্রে খেয়েছি চুমা কপোলে তাহার!

মা-মরা দুখিনী মেয়ে,
থাকে শুধু পথ চেয়ে,
যে পথে চলিয়া গে'ছে জননী তাহার!
আসিতে চাহে না ঘরে,
কাঁদিয়া পাগল করে,—
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার!

মা-মরা দুখিনী মেয়ে,
বিছানায় শু'তে যেয়ে
মায়ের লাগিয়া স্থান পাশে রাখে তার,
নিশীথে ঘুমের ঘোরে,
মা বলিয়া গলা ধরে,
কে জানে মা-মরা মেয়ে এত যন্ত্রণার!

মা-মরা দুখিনী মেয়ে,
যদি ও দেখিতে যেয়ে
হৃদয়ে উছ'লে উঠে শোক পারাবার!
তবু জীবনের আশা,
এক মাত্র ভাল বাসা
সারদার স্মৃতিচিহ্ন মণিই আমার!

মণিরে গিয়েছে রেখে,
হাসিব কাঁদিব দেখে,
সান্ত্বনা মণিই তার স্নেহ মমতার!
মণিরে রাখিয়া বুকে,
মণিরে দেখিয়া সুখে
অন্তিমে যাইব চলি নিকটে তাহার!
সারদার স্মৃতিচিহ্ন **মণিই** আমার

নিষ্কাম ধর্ম্ম।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষ্কাম ধর্ম্মের বড়ই গৌরব। নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্যতীত মুক্তি নাই। পূর্ণ এবং প্রকৃত হিন্দু হইতে গেলে নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা করা আবশ্যক।

কিন্তু নিষ্কাম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা করা কি সম্ভব? হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বলেন, সম্ভব। নহিলে তাঁহারা নিষ্কাম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবেনই বা কেন? কিন্তু আমরা অনেকে নিষ্কামধর্ম্ম অসম্ভব মনে করি। সেই জন্য অনেকে এখন নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা শুনিলে, হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন।

নিষ্কামধর্ম্ম কি যথার্থই অসম্ভব? অসম্ভব নয়, খুবই সম্ভব। নিষ্কামধর্ম্মের নামান্তর নিষ্কাম কর্ম্ম। অর্থাৎ যে কর্ম্ম ধর্ম্মসঙ্গত বা ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত, সেই কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া সম্পন্ন করাকে নিষ্কামধর্ম্ম বলে। নিষ্কাম হইয়া অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া। কামনাশূন্য হইয়া অর্থাৎ সুখ সম্পদ স্বর্গলাভ ইত্যাদি ফলের কামনাশূন্য হইয়া। সুখ সম্পদ স্বর্গ ইত্যাদি, কাহার? না, যে কর্ম্ম করে তাহার।

এখন বুঝিতে হইতেছে, নিষ্কাম কর্ম্ম কি অসম্ভব? অর্থাৎ সুখ সৌভাগ্য সন্তান সন্ততি স্বর্গ প্রভৃতি কোন ফলের কামনা না করিয়া মানুষ কি কোন কর্ম্ম করে, বা করিতে পারে? বোধ হয় মানুষ অনেক স্থলেই বিশেষ কোন কামনার বশবর্ত্তী না হইয়াই কর্ম্ম করে—কেবল মনের এক একটা ঝোঁকের উপর কর্ম্ম করে। যে সর্ব্বদা মাছ ধরিয়া বেড়ায় সে মাছ পাইবার বা খাইবার কামনায় তেমন করিয়া বেড়ায় না। সে নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও মাছ ধরিতে ছাড়ে না, সে ঝড় বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য করে না। আবার এত কষ্ট করিয়া যে মাছ ধরে তাহা পাঁচজনকে বিলা-ইয়া দেয়। অতএব সে বিশেষ কোন কামনার অধীন হইয়া মাছ ধরে না, মনের কেমন একটা ঝোঁকের উপর মাছ ধরে। তুমি বলিবে যে তাহার স্পষ্ট কোন কামনা না থাকিলেও, তাহার মনে প্রচ্ছন্নভাবে সুখের কামনা আছে। সে পাঁচ বার মাছ ধরিয়া সুখানুভব করিয়াছে বলিয়া আবার মাছ ধরিতে উৎসুক হয়। অর্থাৎ মাছ ধরিবার যে সুখ আবার সেই সুখের অনুধাবন বা অন্বেষণ করে। কিন্তু এই প্রকারে

সুখ অনুধাবন বা অন্বেষণ করাকে সুখের কামনা করা বলে না। পশু পক্ষী প্রভৃতি যে সকল নিকৃষ্ট জন্তুর কামনা করিবার মতন বুদ্ধিবৃত্তি নাই, তাহারাও এই প্রকার সুখের অনুধাবন করিয়া থাকে। অতএব যে কেবল ঝোঁকের উপর মাছ ধরে, সে যে কামনাধীন হইয়া মাছ ধরে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার স্পষ্ট কোন কামনা থাকে তবেই তাহার মাছ ধরা সকাম কর্ম্ম হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তির মাছ ধরার উপর এত ঝোঁক, তাহার বাড়ীতে যদি মাছের অভাব হয়, এবং সেই জন্য সে মাছ ধরিতে যায়, তবে তাহার মাছ ধরা সকাম কর্ম্ম হয়। তেমনি অনেক লোক আছে যাহারা দিবারাত্রি ধনোপার্জ্জনের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধন সঞ্চয় তাহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাহাদের উপার্জ্জিত ধন কি হয় বা কে লয়, তাহারা একবার ফিরিয়াও দেখে না। তাহাদের উপার্জ্জিত ধনে তাহারা গাড়ি ঘোড়াও চড়ে না, বাগান বাড়ীও কেনে না, শাল জামিয়ারও গায়ে দেয় না। অথচ তাহারা দিবারাত্রি ধনোপার্জ্জন করিয়া বেড়ায়। তাহাদের ধনোপার্জ্জন সকাম কর্ম্ম নয়, নিষ্কাম কর্ম্ম। সেইরূপ যে সকল মহাপুরুষ আত্মহারা হইয়া, গৌরব খ্যাতির কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া, দিবা রাত্রি শাস্ত্রাধ্যয়নে নিমজ্জিত থাকেন, তাঁহাদের শাস্ত্রাধ্যয়ন সকাম কর্ম্ম নয়, নিষ্কাম কর্ম্ম। এইটি পাইব বলিয়া এইটি করিতেছি এইরূপ ভাবিয়া যে সেটি করে তাহার কর্ম্ম সকাম, নিষ্কাম নয়; আর এইরূপ না ভাবিয়া যে সেটি করে, তাহার কর্ম্ম নিষ্কাম, সকাম নয়। অর্থাৎ যে কর্ম্মে আপনি আপনার লক্ষ্য নয়, সেই কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম। এ রকম কর্ম্মের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে বালকের খেলার প্রকৃতি বুঝিয়া দেখা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। বালকের আত্ম এবং আত্মেতর ভাব নাই বলিলেই হয়। যদিও থাকে, সে অতিশয় অস্ফুট। কিন্তু সে ভাব না থাকিলে কামনাও অসম্ভব। অতএব বালক সুখের কামনায় খেলা করে না। বালক খেলা না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া খেলা করে। তাহার খেলা তাহার শারীরিক ও মানসিক ধাতু, অবস্থা বা প্রকৃতির ফল, ক্রিয়া বা অভিব্যক্তি মাত্র। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে পৃথিবীতে নিষ্কাম কর্ম্ম যত অল্প বা অসম্ভব বলিয়া সচরাচর লোকের মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে উহা তত অল্প বা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে অনেকে

স্বভাবলব্ধ প্রকৃতির গুণে অনেক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সে সকল কর্ম্ম করিয়া সুখ বা আনন্দ লাভ করিবে বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। তাঁহাদের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি অপর কর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাদিগকে সেই সেই কর্ম্মের দিকে প্রধাবিত করে বলিয়া তাহারা সেই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। অতএব সেই সকল কর্ম্ম সকাম নয়, নিষ্কাম।

ধর্ম্মকর্ম্মেও কতকটা এইরূপ। নিরন্নকে অন্নদান একটি ধর্ম্ম কর্ম্ম। এ কর্ম্মটিও সকাম এবং নিষ্কাম উভয়বিধ হইতে পারে। দান করিলে পুণ্য লাভ হইবে এই ভাবিয়া যদি নিরন্নকে অন্নদান কর তবে তোমার দান সকাম। আর স্বাভাবিক দয়াধিক্য বশত নিরন্নের নিদারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া বিগলিত প্রাণে যদি তুমি তাহাকে অন্নদান কর, তবে তোমার দান নিষ্কাম। কারণ দয়ার উচ্ছ্বাসে তোমার জ্ঞান বা বুদ্ধি বিলুপ্ত প্রায়, অতএব তুমি কোন রকম কামনা করিতে অক্ষম। এমন দয়ার জোরে কি কেহ দান করে না? যাহারা রাজা বাহাদুর বা রায় বাহাদুর হইবার জন্য দশ হাজার বিশ হাজার লক্ষ দেড় লক্ষ দান করে, তাহাদের দান এ রকম দান নয় সত্য। যাহারা স্বর্গলাভের বা পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দান করে, তাহাদের দানও এরকম দান নয় সত্য। কিন্তু এমন দয়ার জোরে দান মানুষের মধ্যে কি কেহ করে না? করে বৈ কি। অনেকে করে। অন্তত যত কম লোকে করে বলিয়া সচরাচর মনে করা যায় তত কম লোকে নয়, তদপেক্ষা অনেক বেশি লোকে করে। ভগবানের কৃপায় অনেকের মনে দয়া প্রভৃতি সদ্ভাব আছে। কাজেই নিষ্কাম কর্ম্ম বা নিষ্কাম ধর্ম্ম সত্য সত্যই আকাশ কুসুম নয়। এখন দেখিতে হইবে, নিষ্কাম ধর্ম্ম লোক মধ্যে প্রসারিত করা যায় কি না। নিশ্চয়ই যায়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় তাহার স্নেহ দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকেও শিক্ষা দ্বারা ফোটান যায় এবং প্রগাঢ় ও বেগবতী করা যায়। শিক্ষার গুণেই নিষ্ঠুর নরমাংসভোজী মনুষ্যসমাজ বুদ্ধ, চৈতন্য, হাউয়ার্ড, সেণ্ট জেবিয়র শীর্ষক মানবসমাজে পরিণত হইয়াছে। অতএব শিক্ষা দ্বারা হৃদয়কেও ফুটান যায়। হৃদয়ের বৃত্তি প্রগাঢ় ও বেগবতী হইলে, সেই ভাবের জোরেই মানুষ পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, কামনার বশবর্ত্তী হইয়া করে না। অতএব শিক্ষার দ্বারা মানুষকে নিষ্কাম কর্ম্মের উপযোগী করা যায়। সে শিক্ষা বিষয়ে পরাঙ্মুখ বা যত্নহীন থাকিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে অসম্ভব বলিয়া উপহাস করা এবং

লোককে প্রকারান্তরে তাহা হইতে বিরত করা জ্ঞানী ধার্ম্মিক এবং সদ্ভাব সম্পন্ন ব্যক্তির কার্য্য নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে অনেকে এখন তাহাই করিতেছেন।

কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার প্রধান উপদেশ এই যে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর অর্থাৎ কর্ম্ম কর কিন্তু তাহার ফল ভগবানকে অর্পণ কর। এ কথার অর্থ বড় গভীর ও সুন্দর। উপরে বলা হইয়াছে, যে হৃদয়ের সদ্ভাব গুলির উত্তেজনায় কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম নিষ্কাম হয়। অর্থাৎ সে কর্ম্মের সহিত আত্মমঙ্গলকামনা এমন কি আত্মকর্তৃত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত সংযুক্ত হইতে পারে না। বাইবেলে যে বলে, তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা কর, বাম হস্ত তাহা যেন জানিতে না পারে সে এই রকম কর্ম্ম সম্বন্ধে। সদ্ভাব বা সৎস্বভাবের গুণে সৎকর্ম্ম করিলে, সৎকর্ম্ম করিলাম বলিয়া একটা জ্ঞান বা অভিমান জন্মে না। তাই সে কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। কেন না সে কর্ম্ম কেবল মাত্র সদ্ভাব হইতে উৎপন্ন, কামনা মূলক নয়। কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ের সদ্ভাবের সংখ্যাও অনেক এবং পৃথিবীতে সদ্ভাবের পাত্রও অনেক। যেখানে সদ্ভাবের সংখ্যা অনেক সেখানে সব সদ্ভাব গুলির পরিচালনা নাও হইতে পারে, তন্মধ্যে দুই একটি মাত্রের পরিচালনা করিয়া মানুষ ক্ষান্ত থাকিতেও পারে। ফলত মনুষ্য মধ্যে সচরাচর সেই রূপই হইয়া থাকে। কেহ খুব স্নেহবান কিন্তু পরদুঃখ কাতর নয়; কেহ দয়ালু কিন্তু ক্ষমাশীল নয়। আবার সদ্ভাবের পাত্র অনেক হইলে মানুষ সে সকল গুলির প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন নাও হইতে পারে এবং কার্য্যত তাহা হয়ও না। এই দ্বিবিধ অসম্পূর্ণতা দুরীকরণার্থ এক দিকে হৃদয়ের সদ্ভাব গুলির সমঞ্জসীকরণ যেমন আবশ্যক, অপর দিকে সদ্ভাবের পাত্রের সমষ্টীকরণ তেমনি আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ঈশ্বর ভক্তি এবং প্রেমেতে সেই সমস্ত সদ্ভাবের সমঞ্জসীকরণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরে সেই সমস্ত সদ্ভাবের পাত্রের সমষ্টীকরণ বা সমাবেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরে ভিন্ন আর কিছুতেই অত বিভিন্ন ভাবও মিলায় না, এবং অত অধিক এবং বিভিন্ন পাত্রও সমান ও সাধ্যায়ত্ত হইয়া থাকে না। এই অপূর্ব্ব সমষ্টীকরণ করিয়া শাস্ত্রকারেরা কহিলেন, কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মের ফল ভগবানকে অর্পণ কর। অর্থাৎ ফল কামনা না করিয়া কেবল ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর। ফল কামনা না করিয়া কেবল ভগবানের জন্য কর্ম্ম করিব, এ কেমন কথা? এ কথার অর্থ এই যে ভগবানে সকল ভূতই বর্ত্তমান। ভগবানকে

পাইলে সকল ভূতই পাইবে। ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তি হইলে সর্ব্বভূতেও প্রেম ও ভক্তি হইবে। অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তি বিশ্বব্যাপী হইবে। প্রেম ও ভক্তি বিশ্বব্যাপী না হইলে, ধর্ম্মও বিশ্বব্যাপী বা বিশ্বজনীন হয় না। অতএব প্রকৃত ধর্ম্মচর্য্যা করিতে হইলে ভগবানের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। ভাল, ভগবানের জন্য যেন কর্ম্ম করিলাম, ফল কামনা করিব না কেন? তাহার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে দুই একটি বলিব। ভগবানের প্রতি যাহার পূর্ণ ও প্রগাঢ় প্রেম, তাহার ফল কামনা অসম্ভব। যেখানে প্রেম পূর্ণ, প্রকৃত ও প্রগাঢ় সেখানে প্রেমিক ও প্রেমের পাত্র একত্রে মিশ্রিত, দুইয়ের পৃথক সত্বা নাই। অতএব সেখানে প্রেমিক প্রেমের পাত্রের কাছে কিছুই কামনা করিতে পারে না। যেখানে প্রেম প্রকৃত এবং প্রগাঢ় সেখানে প্রেমিকের কার্য্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য—প্রেমের পাত্রের পরিতোষ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং হইতেও পারে না। অনন্ত পুরুষকে ছাড়িয়া পরিমিত মানব প্রেমের কথা মনে কর, বুঝিবার সুবিধা হইবে। তুমি তোমার পত্নীকে ভাল বাস। তোমার পত্নীর সহিত তোমার ভাল বাসা প্রকৃত ও প্রগাঢ়। তুমি তোমার পত্নীর উদ্দেশে যে সকল কর্ম্ম কর, তাহা কি কেবল সেই ভাল বাসার জোরে, সেই ভালবাসার ঘোরে—কর না? কেবল তোমার পত্নীর পরিতোষের জন্য কর না? সেই সকল কর্ম্ম করিলে তোমার পত্নী তোমাকে আরো ভাল বাসিবেন বা আরো ভাল করিয়া খাওয়াইবেন,—এই রূপ কোন ফল কামনা করিয়া কি তুমি তাহা কর? না, তা নয়। আত্মহারা না হইলে মানুষ প্রেমিক হয় না। যে প্রেমিক হইয়াছে, সে স্বয়ং মরিয়াছে। যে মরিয়াছে তাহার আবার ফল কামনা কি? তাহার নিজের কিছুই তাহাতে নাই, সে যাহাকে ভাল বাসে, সেই তাহার সমস্তটা অধিকার করিয়াছে, সে তাহাতেই পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাহার আর আছে কি, যে তজ্জন্য সে কোন কামনা করিবে? তাহার থাকিবার মধ্যে আছে —সেই প্রেমের পাত্র, সেই প্রেমময়ী পত্নী। সেই পত্নীর প্রসন্নতাই তাহার পর্য্যাপ্তি। সে সেই পত্নীপ্রেমে ভোর হইয়া, সম্পূর্ণ রূপে আত্মহারা হইয়া সেই পত্নীর প্রীতিকর কর্ম্ম করে। তাহার আবার ফলকামনা কি? ফল কামনা করিয়া সে যদি পত্নীর প্রীতিকর কর্ম্ম করে, তবে নিশ্চয় জানিও তাহাতে পত্নীপ্রেম নাই। ভগবানের প্রতি প্রেম হইলে, মানুষ সেই রূপই করিয়া থাকে। মানুষ আত্মহারা হইয়া ভগবানে মজিয়া যায়। ভগবানে

মজিয়া ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মই করে। ভগবানকে ভালবাসে বলিয়া কেবলই ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম করে। আপনার ফল কামনা করিবে, কেমন করিয়া? আপনি কি আছে, যে আপনার ফল কামনা করিবে? তাহার সবটাই ভগবান, সে কেবল ভগবানেরই প্রীতি সাধন করিতে পারে, আর কিছুই পারে না—পারে না, পারে না, পারে না। তাই বলি, যে ভগবানকে ভাল বাসিলে কর্ম্ম নিষ্কাম বৈ সকাম হইতেই পারে না। তাই মনে করি, যে যাঁহারা বলেন যে আপনার মঙ্গলকামনায় ভগবানের প্রিয় কার্য্য করায় দোষ নাই, তাঁহাদের ভগবানের প্রতি প্রেম নাই, যদি থাকে, সে প্রেম প্রকৃতও নয়, প্রগাঢ় ও নয়। নিশ্চয়ই তাঁহাদের ভগবানেরপ্রতি প্রেম নাই, নিশ্চয়ই তাঁহারা ভগবানকে ভাল বাসেন না। প্রেম এমন জিনিস নয়, যে প্রেমিককে একেবারে মারিয়া তাহার রক্ত মাংস মন প্রাণ আত্মা যথা সর্ব্বস্ব সেই প্রেমের পাত্রে না মিশাইয়া ছাড়িবে। প্রেমিকের কর্ম্ম নিষ্কাম হইবেই হইবে। হিন্দুব নিষ্কাম ধর্ম্মের কথার ন্যায় এমন গভীর অথচ এমন পরিষ্কার কথা কি আর আছে?

অনেকে বলেন যে পুণ্য, পারলৌকিক সদ্গতি প্রভৃতি অতি উত্তম বস্তু। অতএব সে রকম বস্তুর কামনা মন্দ নয়। মন্দ নয় সত্য এবং মন্দ নয় বলিয়াই আমাদের অপূর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকারী বিশেষের সম্বন্ধে তদ্রূপ কামনাও বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে ভগবানকে ভাল বাসিয়াছে, যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানেতে দেখিয়াছে, যে জল স্থল মরুৎ ব্যোম সুখ সম্পদ সমস্তই ভগবানের রূপ বলিয়া বুঝিয়াছে, সে ভগবানকে পাইয়া সবই পাইয়াছে। বস্তুত যে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত এবং ভগবানের প্রেমে প্রেমিক, সে কামনা-অক্ষম, কেন না তাহার সমস্ত কামনা ভগবানেতেই পূর্ণ হয়, তাহার সমস্ত কাম্য বস্তু ভগবানেই বিদ্যমান। ভগবদ্ভক্তের ভগবানই সুখ, ভগবানই সম্পদ, ভগবানই পুণ্য, ভগবানই ইহকাল, ভগবানই পরকাল। ভগবানকে পাইলে সে সব পাইল, সে আর কিসের কামনা করিবে? কোন কিছু কামনা করিবার তাহার যো ই বা কি? ক্ষুদ্র মানবের কথা মনে কর দেখি। "সূর্য্যমুখী কি আমার কেবল স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। * * সংসারে সহায় গৃহে

লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য।" এ প্রেমের কথা। কিন্তু একথায় প্রেমের পাত্রেতেই ত সমস্ত কাম্যবস্তু। একথায় প্রেমের পাত্র এবং কাম্যবস্তু এ দুইয়ের একই অর্থ—প্রেমের পাত্র ছাড়া কাম্য বস্তু নাই, প্রেমের পাত্রকে পাইলে সমস্ত কাম্য বস্তু পাওয়া হইল। যে ভগবানের প্রেমে প্রেমিক, তাহারও সেই কথা। সে ভগবানেতে সমস্ত কাম্যবস্তু পাইয়াছে, ভগবান ছাড়া তাহার আর কাম্যবস্তু নাই। ইহাত গেল প্রেমধর্ম্মের কথা। আবার ভগবান সম্বন্ধে ভগবদ্ধর্ম্মের কথা আছে। ভগবান ছাড়া কিছুই নাই, ভৌতিক জগৎও ভগবান। অতএব ভগবানকে পাইলে সবই পাওয়া গেল—ধন, সুখ, যশ, পুণ্য সবই পাওয়া গেল। তবে আবার কিসের কামনা? যে একটি সুপ্রস্ফুটিত গোলাব ফুল পাইয়াছে, সে কি আবার পৃথক ভাবে সুন্দর রং খুঁজিবে না সুমিষ্ট গন্ধ খুঁজিবে? যদি খোঁজে, তবে নিশ্চয় জানিও সে গোলাব ফুল পায় নাই। যে ভগবানের কাছে সুখ সম্পদ যশ পুণ্য ইত্যাদি কামনা করে, নিশ্চয় জানিও সে ভগবানকে পায় নাই। এবং যখন ভগবানকে পায় নাই, তখন ভগবানকে ভালবাসার কথা ছাড়িয়াই দেও।

আরো এক কথা। কামনা করিয়া পরোপকার প্রভৃতি সৎকর্ম্ম করিলে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা হয় না, আপনারি কর্ম্ম করা হয়। তুমি পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় একজন দরিদ্রকে ধন দান করিলে। বল দেখি, তুমি প্রকৃতপক্ষে পরোপকার করিলে না, আপনারই উপকার করিলে। আপনার উপকার করা কিছু দোষের কথা নয়, ভাল কথা। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত কথা যে আপনার উপকার করা অপেক্ষা পরোপকার করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এইজন্য স্বার্থপ্রণোদিত পরোপকার লোক মধ্যে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যে কেবল দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থ দরিদ্রকে অর্থদান করে, লোকে তাহাকে প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্রের দ্বারা নিজের কোন কার্য্য করাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে যে দরিদ্রকে অর্থদান করে লোকে তাহাকে প্রশংসা করা দূরে থাকুক যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকে।

অতএব ফল কামনা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা হয় না। অধিকন্তু স্থল বিশেষে কেবল আপনার উপকার করিয়া পরের উপকার করিলাম, এইরূপ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস পোষণ করা হেতু অধর্ম্ম-দূষিতও হইতে হয়।

অতএব ধর্ম্ম নিষ্কাম না হইলে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ হয় না, বিশ্বব্যাপী হয় না, বিশ্বজনীন হয় না। হিন্দুর মন বিশুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বগ্রাহী। তাই হিন্দু সমস্ত বিশ্বকে বিশ্বনাথের ভিতর দেখিয়া বিশ্বনাথের য় ভগব মজিয়াছে। এবং বিশ্বনাথের প্রেমে মজিয়া বিশ্বনাথের পরিতোষ নাই, যদি বিশ্বজনীন নিষ্কামধর্ম্ম সাধন ও বিধিবদ্ধ করিয়াছে।

এ হেন নিষ্কামধর্ম্ম কি সত্য সত্যই সাধ্যাতীত? ভগবানকে কি ভাল বাসিতে পারা যায় না? চৈতন্য প্রভৃতি মহাভগবদ্ভক্তের ভারত-ভূমে এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু যদি ভগবানকে ভালবাসিতে পারা না যায়, তবে কি নিষ্কামধর্ম্ম কি সকামধর্ম্ম কোন ধর্ম্মের কথাই কহিও না। আর যদি যায়, তবে যাহাতে ভগবানকে ভালবাসিয়া নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্ম-চর্য্যা করিতে পার, প্রাণপণে পুরুষ পরম্পরা যথাযথ শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা সেই রকম শক্তি ও প্রবৃত্তি অর্জ্জন করিতে চেষ্টা কর।

মাইলডে।

বালককালে কলিকাতায় আমাদের পাড়াতে একজন মাইলাড ছিলেন; পাড়ার সকল লোকে তাঁহাকে মাইলাড বলিয়া ডাকিত এবং তিনিও সকলকে মাইলাড বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভূমিকাস্বরূপ তাঁহার জীবনীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা না করিলে তাঁহার নাম মাইলাড হইল কেন, তাহা আমার পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহার আসল নাম ছিল সীতানাথ ঘোষ। দীর্ঘচ্ছন্দ, শ্যামবর্ণ পুরুষটি, সম্মুখের দন্তগুলি উচ্চ; তাহা দেখিয়াই নাকি তাঁহার পিতা মাতা সকলের নিকট গৌরব করিতেন, যে আমাদের সীতানাথ ছোঁড়া এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে হইবে, কারণ শাস্ত্রে আছে দন্তুর কদাচ মূর্খ। এবং তাঁহাদের আশা যে কিছু পরিমাণে পূর্ণ না হইয়াছিল এমন নহে। কারণ সীতা-নাথ সারবোরান সাহেবের স্কুলে ইংরাজী পড়িয়া কেরাণ বনাত জুতাকে

প্রথমে ৪০ ক্রমে ১০০ টাকা বেতনের এক কেরাণী গিরি পাইয়াছিলেন এবং বৃদ্ধকাল পর্য্যন্তও তাঁহার হস্তে সর্ব্বদা পরিষ্কার কাগজের মলাট দেওয়া বড় বড় কেতাব থাকিতে দেখিতাম। কেতাব পড়িতেন কি না কিম্বা বুঝিতেন কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না কিন্তু তিনি পুস্তক ছাড়া থাকিতেন না। দেখিতাম, পুস্তক খুলিয়া তাহার মধ্যে আপনার নাক মুখ দিয়া দুই হস্তে পুস্তকখানা চাপিয়া ধরিতেন এবং মধ্যে মধ্যে উঁহ উঁহ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া লইতেন, ক্ষণকাল পরে যেন অত্যন্ত তৃপ্তি হইয়াছে এই ভাবে "আহ" শব্দ ব্যক্ত করিয়া মুখ হইতে পুস্তক খানা নামাইয়া লইতেন। পাড়ায় বাঁড়ুয্যে মহাশয় প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্যক্তি-দিগের বিশ্বাস ছিল, যে সীতানাথ এইরূপে ইংরাজী কেতাবের বিদ্যা উদরস্থ করিত।

সীতানাথের প্রথম কালে কলিকাতার ইংরাজী বিদ্যার এত ছড়াছড়ি ছিল না। তখন বদন ছুতারের তালিম দেখিয়া বালকেরা ইংরাজী লিখিতে শিখিত এবং যাহার হাতের লেখা উত্তম হইত, তাহার শীঘ্র চাকরি হইত। সর্ব্বসাধারণের নিকট ইংরাজী বিদ্যার বড় গৌরব ছিল না সেই জন্য কৃষ্ণ বন্দ্যো, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যে পরিমাণে সমাজ সংস্কারক এবং নাস্তিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, কৃতবিদ্য বলিয়া তত পরিগণিত ছিলেন না। বিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত সমগ্র বঙ্গদেশে কেবল কলিকাতায় একমাত্র হিন্দুকলেজ ছিল। ছাত্র বেতন ছিল সিক্কা পাঁচ টাকা। কিন্তু সিক্কা টাকা উঠিয়া যাওয়ার পরে উহা কোম্পানীর টাকায় পরিণত করিয়া ছাত্রদিগের নিকট হইতে চলন টাকার পাঁচ টাকা সওয়া পাঁচ আনা লওয়া হইত। অবশেষে আনা পাইও উঠিয়া গিয়া কেবল ৫ টাকা বেতন হয়। সে সময়ে ছাত্রদিগের অনেক সুবিধা ছিল, কারণ ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ছাত্রদিগের আর কিছুই ব্যয় করিতে হইত না। তাহারা তাহাদের পাঠ্য সমুদয় পুস্তক এবং লিখিবার কাগজ, কলম, কালী ও স্লেট পেন্সিল কালেজ হইতে বিনামূল্যে পাইত। লাইব্রেরীর পুস্তকও তাহারা পড়িতে পাইত। এত সুবিধা থাকিলেও লোকে তখন ৫ টাকা বেতন অধিক বিবেচনা করিত। প্রথমে হিন্দুকালেজ চিৎপুর রোডের ধারে বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্ম সমাজের বাড়ীর নিকট এক গৃহে সংস্থাপিত হয়, কিয়ৎকাল পরে উহার নিমিত্ত গোল

কথার কোনও ফল হইয়াছিল বলিয়া প্রথমে প্রকাশ পায় নাই কিন্তু ক্ষণকাল পরে ম্যাকান সাহেব সেই পুষ্করিণীর পাড়ে ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে এক পায়খানার নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র সীতানাথ তাহাকে থামাইয়া "মাই-লাড here a pykhana is, বদ্‌বো, take this আতর মাইলাড", বলিয়া তাঁহার জেবের মধ্য হইতে এক শিশি আতর বাহির করিয়া সাহেবের নাসিকার নিকট ধরেন। সাহেব সীতানাথের এই সৌজন্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য বদনে সীতানাথকে খুসি করিবার নিমিত্ত তাঁহারই নিজের বাক্য ব্যবহার করিয়া শিশীটা ফিরাইয়া দিল এবং বলিল "Thank you, my Lord!" ম্যাকান সাহেব, এত বড় সাহেব, পুলিসের সার্জ্জন সাহেব—সীতানাথকে মাইলার্ড বলিয়া সম্বোধন করিল তাহাতে পাড়ার লোকের নিকট সীতানাথের অত্যন্ত গৌরব বর্দ্ধিত হইল এবং সেই অবধি সকলে তাহাকে মাইলাড বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। কয়েক বৎসর মধ্যে সীতানাথের এই উপনামটি এমন দৃঢ়বদ্ধ হইল যে পাড়াতে যাহারা নূতন আসিত, তাহারা অনেকে উঁহাকে কেবল মাইলাড বলিয়াই জানিত; তাঁহার আসল নাম জানিত না।

মাইলাডের যে দিন ১০০ টাকা বেতন হইল, সেই দিবস সকলেই মনে করিল যে এখন সীতানাথের দোতালা কোঠা হইবে, কারণ তখন ১০০ টাকা বেতন বড় অল্প কথা ছিল না। আমারই মনে পড়ে যে চাউল বিক্রেতারা বলদের পৃষ্ঠে করিয়া চাউল আনিয়া ঘরে ঘরে ১ টাকা ১৶ আঠার আনা মণ মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়া যাইত। তৈল টাকায় ৭।৮ সের পাওয়া যাইত। ৩।০ পেঁচি বড় বড় জিলাপী দুই খানা এক পয়সায় ছিল এবং রজক মাসিক ।।০ আনা বেতন পাইলে সপ্তাহে দুই ক্ষেপ অর্থাৎ রবিবার ও বুধবার কাপড় ধোলাই করিয়া আনিত; তবে কেবল পরামাণিক মহাশয়েরই এক পয়সার ব্যতিক্রম হয় নাই। এমন সস্তার বাজারে লোকে যে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে দোল দুর্গোৎসব এবং দোতালা তেতালা বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইত, তাহার আর বিচিত্র কি? অথচ সীতানাথ তাঁহার যে পৈতৃক চুন্‌কাম শূন্য এক তালা ঘরে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই ঘর হইতেই তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করা হয়। পৈতৃক গৃহে তিনি একখানা নূতন ইষ্টকও কোনও স্থানে লাগাইতে পারেন নাই। তাঁহার কারণ এই যে তিনি

বড় খোস্ পোষাকী ও খোস্ খোরাকী ছিলেন। যদিও পরিধানের বস্ত্রের বড় জাঁকজমক ছিল না তথাপি উত্তম কাপড় ব্যবহার করিতেন। সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা দুইখানা রুমাল থাকিত, তাহার একখানা দ্বারা মুখ মুছিতেন, দ্বিতীয় খানা দ্বারা পরিধেয় বস্ত্রে ধুলা কিম্বা অন্য কোনরূপ ময়লা লাগিলে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেন। আতর ও লেবেণ্ডর প্রভৃতি সুগন্ধি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন এবং কাণে নিয়ত এক ফাত্তা ইহুদী গেব্রিয়েলের দোকানের ভাল গোলাপি আতর থাকিত। মাইলাড সন্দেশ বড় ভাল বাসিতেন, কাঁচা গোল্লাকে তিনি "বৈদানা ফল" বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং বহুল পরিমাণে তাহা খাইতেও পারিতেন। চোরবাগানের প্রসিদ্ধ গোরা ময়রার দোকানের বড় রাতাবি মণ্ডা তাঁহার নিমিত্ত প্রত্যহ এক সের করিয়া বরাদ্দ ছিল। জলপানের নিমন্ত্রণ হইলে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন। পাত পাতিতে বিলম্ব হইলে তিনি কিছু মাত্র বিরক্ত হইতেন না। সঙ্গে করিয়া বালক-বালিকাগুলীকে লইয়া যাইতেন এবং একখানা পুরাতন নেকড়ায় জুতা জোড়াটি জড়াইয়া রাত্রি হইলে বগলের মধ্যে, নচেৎ হাঁটুর নিম্নে চাপিয়া রাখিয়া খাইতে বসিতেন। লুচি কিম্বা মিঠায়ের প্রতি মাইলাডের বড় দৃষ্টি ছিল না কিন্তু সন্দেশ, বিশেষ ভাল সন্দেশ হইলে, তাহা আর পাতে পড়িয়া থাকিতে পাইত না। ক্ষীরের প্রতিও মাইলাডের তদ্রূপ অচলা ভক্তি ছিল। 'কটোরা করিয়া ক্ষীর দিতে আসিলে তিনি উঁহু উঁহু করিয়া তিজেল খানা দেখাইয়া দিতেন। সমুদয় তিজেল খানা পাইলে তিনি তাহা দুই হাতে ধরিয়া চোঁ চোঁ শব্দে সমুদয় ক্ষীরটুকু শেষ করিয়া নামাইয়া রাখিতেন ও বলিতেন যে "জয় জয় কার হউক, খুব পেট ভরিয়া খাইলাম।" নিজের আহার শেষ হইলেই যে গৃহস্বামীর উপরে তাঁহার দাবী শেষ হইত, পাঠকগণ যেন তাহা মনে করেন না। বিদায় লইতে গিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে অম্লানবদনে বলিতেন যে "আমি ও আমার বালক-বালিকগুলি ত পেট ভরিয়া খাইয়া যাইতেছি, বাড়ীতে কিন্তু বুড়ী উপবাস করিয়া রহিয়াছে, সে কি তাহার একলার জন্য হেঁসেলে হাত পোড়াইয়া মরিবে?" এইরূপ আবদার করিয়া মাইলাড লুচি সন্দেশে একটি হাঁড়ি পূর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।

মাইলাড যে সকল বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাহা সমস্তই সাহেবের দোকান হইতে আহরণ করিতেন, কারণ তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল যে বিলাতী লোকেই বিলাতী জিনিস ভাল চেনে, অতএব তাহাদের নিকটেই উৎকৃষ্ট বিলাতী দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে। হ্যামিল্টন কোম্পানির চসমা, মেকেবের ঘড়ি, বেগবীর বাড়ীর জুতা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না।

গ্রাবু খেলিতে মাইলাড বড় ভাল বাসিত। পাড়াতে দুই তিনটি ভদ্র লোকের বাড়িতে গ্রাবু খেলার আডডা ছিল, মাইলাড প্রত্যহ সন্ধার পরে এবং রবিবার দিবস বৈকালে এই সকল স্থানে যাইয়া মনের আনন্দে চসমা নাকে দিয়া তাস খেলিতে বসিতেন। পাড়াতে দুই তিন জন হঠাৎ বড় মানুষ হইয়া কয়েক বৎসর ধুমধাম করিয়াছিলেন। পল্লীস্থ প্রায় সকল ব্যক্তিই কোন না কোন সময়ে তাঁহাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু আমাদের মাইলাড কখনও তাঁহাদের নিকট দিয়াও হাটেন নাই।

এক জন নূতন মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ ডাক্তার আসিয়া পাড়াতে বাসা ভাড়া করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার পসার খুব বৃদ্ধি হইল। প্রত্যহ প্রাতে ডাক্তার যখন রোগীদিগকে দেখিতেন, তখন মাইলাড সেই খানে তাঁহার ক্রীত ডাক্তারি পুস্তক বগলে করিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ঔষধের ব্যবস্থা লইয়া ডাক্তারের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন। কিছুকাল এইরূপ তর্ক বিতর্কের ফল এই হইল যে, চিকিৎসা বিদ্যাতে মাইলাডের বিলক্ষণ একটুকু ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া উঠিল এবং কালে তিনি সহজ জ্বর, পেটের পীড়া, কাশী ইত্যাদি রোগের সুন্দর চিকিৎসা করিতে পারিতে লাগিলেন। এই সময় মাইলাড নিজেয় ব্যয়ে ব্যাথ্‌গেটের দোকান হইতে নানা প্রকার ইংরাজী ঔষধ ও ঔষধ প্রস্তুত করার আবশ্যকীয় যন্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া একটি আলমারী বোঝাই করিলেন এবং যে চাহিত তাহাকে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। অবশেষে পাড়াতে মাইলাডের এমন সুখ্যাতি হইল যে পীড়ার প্রথমাবস্থায় সকলেই ডাক্তারের নিকট না যাইয়া প্রথমে মাইলাডকে ডাকিত। মাইলাডও অম্লান বদনে সকলের বাড়িতে যাইতেন এবং আবশ্যক হইলে রাত্রিকালে রোগীর নিকট শুইয়া থাকিয়া ঔষধ সেবন করাইতেন। গভীর রাত্রে মাইলাডকে ডাকিলেও তিনি উপযুক্ত ঔষধ সঙ্গে করিয়া লোকের বাড়িতে যাইতেন এবং ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় মাইলাড তাঁহার বাহিরের ঘরে ঔষধের আলমারিটা শিয়রে করিয়া শুইয়া

থাকিতেন, যে কেহ ডাকিতে আসিলে শীঘ্র তাঁহাকে পাইতে পারে। এই সকল কার্য্য তিনি বিনা মূল্যে এবং আনন্দের সহিত করিতেন এবং তজ্জন্য পাড়ার লোকে তাঁহাকে যথাযোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

ধর্ম্ম বিষয়ে মাইলাড়ের কি মতামত ছিল তাহা কেহ জানিত না। তিনি কখনও কোন পূজা কিম্বা অর্চ্চনা করেন নাই এবং কেহ কখনও তাঁহার বাড়িতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে শুনে নাই এবং ব্রাহ্মণকেও পদার্পণ করিতে দেখে নাই। অন্যের বাড়ি প্রতিমা দর্শনের কিম্বা শ্রাদ্ধাদির নিমন্ত্রণ হইলে মাইলাড তাহা যথারিতী রক্ষা করিতেন। মাইলাড কখনও গঙ্গাস্নান করিতেন না। প্রবাদ আছে যে যুবাকালে তিনি জগন্নাথ ঘাটে স্নান করিতে ছিলেন ইতিমধ্যে একটা কি দ্রব্য আসিয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করাতে তিনি তিন লম্ফে জল হইতে "হাঙ্গর হাঙ্গর" বলিয়া চীৎকার করিয়া তীরে আসিয়া কর্দ্দমের মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। লোকে বলে যে জোয়ারে একটা পোড়া কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে ঠেকাতে তিনি এইরূপ করিয়া ছিলেন। যাহা হউক এই ঘটনায় তাঁহার এত আতঙ্ক হইয়াছিল যে সেই অবধি তিনি গঙ্গা কিম্বা পুষ্করিণীতে স্নান করা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মাইলাড়ের মস্তকের উপর দিয়া কত মহা মহা স্নানের যোগ, কত সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ, গেল কিন্তু তাঁহার কূপের জলে ঘটি গঙ্গা গেল না। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার ত্রুটি থাকিলেও তিনি কখনও সমাজ বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতেন না। পাড়ার সেই ডাক্তার বাবুটি বিলক্ষণ দাতা ভোক্তা ছিলেন। তাঁহার গৃহে সামাজিক ভোজ ভিন্ন বৈঠকখানায় প্রায় সন্ধ্যার পরে শেরী সাম্পিন এবং পোলাও কালিয়া ও মটন চপের চকড়্‌বা চলিত। তাহাতে অনেকে যোগ দিতেন, কেবল মাইলাড না। তিনি কি জন্য সুরাপান কিম্বা অখাদ্য ভোজন করেন না বলিয়া আমি তাঁহাকে এক দিবস জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, "মাইলাড যে কর্ম্মসকলের সমক্ষে করা যাইতে পারে না এমন কর্ম্ম করা উচিত নহে।" মাইলাডের আর একটি কার্য্য বর্ণনা করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব।

মাইলাডের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহের উপযুক্তা হইলে তাহার জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করা হইল। একটি হিন্দু কালেজের ও একটি হেয়ার সাহেবের স্কুলের ও একটি সারবোরন সাহেবের ছাত্রের প্রসঙ্গ লইয়া ঘটকী আসিল। মাইলাডের আত্মীয় সকলে হেয়ার সাহেবের স্কুলের ছাত্রটিকে

পছন্দ করেন কিন্তু মাইলাডের ইচ্ছা যে সারবোরন সাহেবের ছাত্রের সহিত বিবাহ হয়। তিনি বলিলেন যে যখন তিনি নিজে সারবোরন সাহেবের নিকট বিদ্যাভাস করিয়াছেন, তখন তিনি ঐ সাঁহেবের পক্ষপাতী। সারবোরন সাহেবের ছাত্র পাইলে তিনি আর কাহাকেও কন্যা দান করিবেন না।

সারবোরন সাহেবকে এখনও অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। আমি তাহাকে তাহার শেষাবস্থায় দেখিয়াছি। চোরবাগানে ধনাঢ্য বাবু স্বরূপ চন্দ্র মল্লিকের পুত্রদ্বয়কে সারবোরন ইংরাজী শিক্ষা দিতে যাইতেন এবং প্রত্যহ ঠনঠনিয়ার কালীতলা দিয়া একটি চাকর-সঙ্গে করিয়া পদব্রজে চুনা-গলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। টেঁসো, কালা ফিরিঙ্গি, গোল মুখ এবং মস্ত এক ভুঁড়ি ছিল। একটা মোটা লাঠি হস্তে করিয়া থব্ থব্ করিয়া হাঁটিত। আমরা তাহাকে ইংরাজীতে "মহাশয় কটা বাজিয়াছে" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাদিগকে সালা বা——উচ্চারণ করিয়া গালী দিত, নচেৎ লাঠি লইয়া মারিতে আসিত; আমরা হি হি শব্দে হাঁসিয়া পলাইতাম।

যাহা হউক মাইলাড এই পাত্রটিকে দেখিতে যাইবার নিমিত্ত একটি দিন স্থির করিলেন এবং আমরা পাড়ার কয়েক জনে তাহাকে মাইলাডের সঙ্গে দেখিতে গমন করিলাম। দেখিলাম পাত্রের বাড়িতে সারবোরন সাহেব স্বয়ং এক কেদারার উপরে উপবিষ্ট। সারবোরন মাইলাডকে দেখিয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং "সীতানাথ তুই কেমন আছিস্" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিলেন যে "দেখ্ সীতানাথ তোরা বাঙ্গালিরা বড় নেমখারাম, তোরা বড়মানুষ হইয়া তোদের ওস্তাদকে ভুলিয়া যাইস্।" এই সকল কথোপকথন বাঙ্গালাতেই চলিল এবং তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল যে ইংরাজী অপেক্ষা সারবোরন সাহেবের বাঙ্গালার উপরেই অধিক দখল। সভাতে বালকটি উপস্থিত হইলে অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির হইল যে যেহেতু কন্যাকর্ত্তা নিজেই ইংরাজীতে ধনুর্দ্ধর তখন তিনিই পাত্রের বিদ্যা সাধ্যের পরীক্ষা করিবেন। তাহাতে মাইলাড পাত্রকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমে সজোরে কয়েকটা গলা থেকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন যে "হোয়াট গো ভোল।" আমি অবাক্। কিন্তু পাত্রটি এই প্রশ্ন শুনিবা মাত্রে তাহার আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভাবি শ্বশুরকে দুই কর যোড় করিয়া এক নমস্কার করত উত্তর করিল যে "ভোল

ইজ এ ওয়ার্ড সিগনিফাইং টু বি, টু ডু অর টু সফার।" পাত্রের মুখ হইতে এই উত্তর বাহির হইবা মাত্র সারবোরন সাহেব তাহার চৌকী হইতে উঠিয়া আসিয়া পাত্রের পৃষ্ঠে দুই তিনটি স্নেহের চপেটাঘাত করিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "জিতা রও বেটা, কেঁউ না হোগা ? জেসা বাপ তেসা বেটা।" বাবা বলিলেন, "না সাহেব ইহা আমার গুণে হয় নাই, তোমারই শিক্ষার গুণে হইয়াছে।" সাহেব উত্তর করিলেন, "হো সেকতা, না হলে কেমন করিয়া দৈরকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শিল, আমার কাছে পড়িয়া এত বড়মানুষ হইয়াছে।" সারবোরন সাহেব অহঙ্কার করিতেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামমোহন রায়, রামকমল সেন, রসময় দত্ত প্রভৃতি সে কালের সমস্ত ধনাঢ্য খ্যাতনামা এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা তাঁহারই কাছে ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। এই কথার সত্য মিথ্যা ঐ সকল ব্যক্তিরা জীবিত থাকিলে আমি তদন্ত করিয়া পাঠকগণকে জানাইতে পারিতাম, কিন্তু এই ক্ষণে তাহার আর উপায় নাই বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। আমাদের সভা ভঙ্গ হইলে পাত্রের পিতা সারবোরন সাহেবকে পাঁচটি টাকা দিলেন। সাহেব তাহা লইয়া বলিলেন "সীতানাথ তুই আমাকে কিছু দিবি না" তাহাতে পাত্রের পিতা বলিলেন যে "যে তিনি বিবাহের দিনে দিবেন।" জলপানের সময় পাত্রের পিতা সীতানাথের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে মাইলাড না না করিলেন, পরে অতিরিক্ত ১৫টা গোলাপী প্যাঁড়া ও এক তিজেল তিন কটোরা ক্ষীর উদরে পুরিয়া গৃহে আসিলেন। আমার দুর্ভাগ্য বশত মাইলাডের কন্যার বিবাহের পূর্ব্বেই আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করিয়াছিলাম, কাজেই বিবাহের লুচি মণ্ডা খাইতে পাইলাম না। বহুবৎসর পরে কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়া শুনিলাম যে মাইলাড পেনসন লইয়া কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, পরে তাঁহার পুত্র তাঁহার চাকরীটি পাইলে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

জাতীয় স্তোত্র।

বন্দে ইংরাজরাজ হ্যাট্‌কোট-ধারী!
বন্দে সভ্যতার শীর্ষ ব্রহ্মজয়কারী!
বন্দে পররাজ্যগত অর্থবৃদ্ধিকারী!
বন্দে প্রবেশের মুখে সূচীরূপধারী!
বন্দে দুর্ব্বলের যম বলীর দুয়ারী!
বন্দে ভারতের 'লাট' রাজকর্ম্মচারী,
নাপিত, কামার, মুচি, বণিক, ব্যাপারী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, বন্দে শ্বেতাঙ্গ ভিকারী,
বন্দে দুর্ব্বাসার খুড়ো মদ মাংসাহারী!
বন্দে গো-খাদক প্রভু 'শ্রীচলোডর্‌'-ধারী!
বন্দে শ্রীগৌরাং মূর্ত্তি——ভারত কাণ্ডারী!

নমঃ শ্বেতচর্ম্মকায় নমঃ ধর্ম্মরাজ!
নমঃ স্ব-উদর-ভর্ত্তা রাজকুল রাজ!
নমঃ অহংজ্ঞান ময় ধরা বিস্ফোটক!
নমঃ সাধু পথদর্শী পরস্ব গ্রাহক!
নমঃ সত্য বিস্মরণ স্বযশ-অবশ!
নমঃ স্বর্গ মোক্ষ কাম—সুবর্ণ পরশ!
নমঃ ভদ্রাসন-শূন্য প্রবাস শোষক!
নমোনমঃ কলিধর্ম্ম ভারত পাবক!

জয় চূরটধর	সিরাজের বৃত্তিহর	টিপুবংশ ধ্বংসকর	জয়!
জয় মির্জ্জাফার-সখা	কৃতজ্ঞতা অঙ্গে লেখা—	'নিজাম' উপাধি বক্ষে	জয়!
জয় দিল্লী তহসিলদার	কুঠিয়াল বাঙ্গালার	এবে রাজ রাজেশ্বর	জয়!
জয় পঞ্চনদ-জিৎ	গোলাব সিংহ সুহৃৎ	কাশ্মীর হিতেচ্ছাকৃৎ	জয়!
জয় কুশাসন দ্বেষী	প্রতিবাসী ছিদ্রান্বেষী	অজগর সমগ্রাসী	জয়!
শনৈঃ শনৈঃ পাদচারী	সুযোগে স্বমূর্ত্তিধারী	লক্ষ্ণৌ সুজীর্ণকারী	জয়!
জয় গুর্খ সৈন্যবল	(বায়ান্ন কোটির কল!)	জয় শিক্ সম্বল	জয়!
জয় চাণক্যের গুরু	চক্ষু পাতা শত পুরু	জয় বাক্য-কল্পতরু	জয়!
জয় চা-বাগান ধারী	সুহৃদের হিতকারী	জয় নীলকর বন্ধু	জয়!
জয় প্রজাভীতিকর	টেক্সরূপ ফণাধর	বৃটিশ বৃষভবর	জয়!
জয় সুবিচার দক্ষ	সদা স্বজাতির পক্ষ	জয় নিজ অক্ষে লক্ষ্য	জয়!
জয় স্বগৌরব অন্ধ	'নেটীবে'র পশুগন্ধ	অসহিষ্ণু নাসারন্ধ্র	জয়!
জয় 'সিবিলের'দল	ভারতের দিক্পাল	শ্রীনন্দদুলাল দল	জয়!
ভারতের পোষ্যবংশ	ভারতের অন্নধ্বংস	জয় কলিদেব অংশ	জয়!
জয় 'ওয়েলিংটন'-পরা	বসুন্ধরা চক্ষে সরা	জয় আত্মম্ভর প্রভু	জয়!!

জয় শ্রীধারণ	ঘোটক বাহন	শৈলশিখর স্বর্গবাসী!
গ্রাম্মে সঞ্চালন	পাঙ্খা সুঘন ঘন	ধীর সমীরণ শ্বাসী!
'বেরুচ'—স্যন্দন	'সোফা'—সিংহাসন	সং-মর্ম্মরে ফুলরাশি!
কোথা ইন্দ্রপুরি	সঙ্গে ফেরে পরি	নিন্দিয়া রম্ভা উর্ব্বশী!
ভারত কপিলে	তুষিলে নী হেলে	হস্ত তুলিলে ভোগরাশি!
উন্নতি সাধন	করে ইংরেজগণ	ভারতবাসি দুখ নাশি!
জয় ইংরেজ প্রভু	হেন ঋণে কভু	ভারত না হবে উদাসী!!

উদ্ভট কথা।

পঞ্চম শাখা।

উদ্ভট কথার চতুর্থ শাখায় আমরা বলিয়াছি, যে মানবের ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া, মানবের চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া, স্বপ্নে আত্মার সৃষ্টি শক্তি বৈচিত্র্য ময়ী এবং দৃষ্টি শক্তি প্রখরা, দূরব্যাপিনী এবং কালভেদিনী হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, যে আত্মশক্তির নানারূপ উন্নতি সম্ভব। আমরা আরও বলিয়াছি, যে যুবক ইউরোপের দেখাদেখি কেবল জড়োন্নতির জন্য আমরা ব্যস্ত হইতেছি, আত্মার উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টিই নাই। অনেকে আত্মার পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাসই করেন না। আত্মবান্ মানবের পক্ষে, বিশেষ আত্মময় হিন্দুজাতির পক্ষে মনের এইরূপ অবস্থা একান্ত শোচনীয়।

আত্মা কেবল জড় পরিণাম নহে, আত্মার পৃথক অস্তিত্ব আছে এরূপ বিশ্বাস যাঁহাদের আছে, আত্মশক্তির উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

জড়শক্তির উপর আত্মশক্তির ক্রমে ক্রমে আধিপত্য স্থাপনেই মানবের উন্নতির ইতিহাস পড়িস্ফুট হইয়াছে। এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত। তবে, কিরূপে আত্মশক্তি জড়শক্তির উপর আধিপত্য লাভ এবং বিস্তার করে, তাহার প্রকরণ পদ্ধতি লইয়া মতভেদ আছে।

এক রূপ জড় শক্তির সহিত অন্য রূপ জড় শক্তির সম্মিলন করিয়া, অথবা পরস্পরে বিরোধ বা সঙ্ঘর্ষণ ঘটাইয়া, জড় শক্তির দ্বারা জড় শক্তিকে পরাভূত করত, আত্মশক্তির দাসত্বে নিযুক্ত করাই ইউরোপীয় প্রকরণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সভ্য, অসভ্য, আর্য্য, অনার্য্য সকল দেশেই ছিল ও আছে। তবে ইউরোপ এবং আমেরিকা, আজি কালি ঐ প্রকরণ পদ্ধতির ঐকান্তিক অনুশীলন করিয়া জড় বিজ্ঞানের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন এবং জড়োন্নতির ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন। ইউরোপের প্রদর্শিত প্রকরণ পদ্ধতি উপেক্ষার বিষয় বা অবহেলার সামগ্রী নহে। তবে আরও এক প্রকার পদ্ধতি যে আছে, তাহা মানব মাত্রেরই জানা আবশ্যক, এবং আমাদের হিন্দুর পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

ইহ জীবনে দেহের সহিত দেহীর বা আত্মার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, যে আত্মা কেবল মাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারে না। আত্মশক্তির স্ফূরণ জন্য অন্তত মন, মস্তিষ্ক, স্নায়ু আদির প্রয়োজন হয়। নিরবচ্ছিন্ন আত্মশক্তির বলে ঐহিক কোন কার্য্যই হয় না। এ কথা যথার্থ হইলেও সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা আছে। আত্মশক্তির স্ফূরণ জন্য আমরা কখন জড় শক্তিই প্রধান ও প্রবল উপাদানরূপে গ্রহণ করি, কখন সেরূপ করি না। জড় শক্তি কখন গৌণ, কখন মুখ্য,—কখন সাক্ষাৎ ভাবে প্রযুক্ত, আবার কখন বা পরোক্ষভাবে প্রযুক্ত হয়। আমার ডান হাতখানি দোয়াতের কাছে লইয়া যাইতে হইবে, আমি বাম হাত দিয়া ডান হাতিখানি তুলিয়া দোয়াতের কাছে লইয়া গেলাম। এস্থলে, আমা কর্ত্তৃক বামহস্তের জড়শক্তির অনর্থক প্রয়োগ হইল। কেন না, আমি ইচ্ছা করিলেই ত, এমনই দক্ষিণ হস্ত দোয়াতের কাছে যাইত। কিন্তু যদি আমার দক্ষিণ হস্ত কোন কারণে শক্তিহীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাম হস্তের প্রয়োগ আর অনর্থক নহে। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, যে বিশেষ ভাবে জড়শক্তির প্রয়োগ যে সকল সময়েই নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হইবে, এমন কোন কথাই নাই।

কালিদাসের একটি শ্লোক মনে পড়িতেছে না। আমি আলমারি হইতে কালিদাসের গ্রন্থ পাড়িয়া আনিলাম, যথাস্থল বাহির করিয়া শ্লোকটি দেখিলাম, সমস্তটিই মনে আসিল। স্মরণে আনিবার এই একরূপ প্রকরণ। আরও একরূপ প্রকরণ আছে, শ্লোক মনে পড়িতেছে না—আমি বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা দুইটি রগ টিপিয়া টেবিলে মাথা নোয়াইয়া, আস্তে আস্তে দক্ষিণহস্তে দাড়ির চুলগুলি টানিতে লাগিলাম এবং মনস্থির করিয়া বিস্মৃত শ্লোকের যে একটি পদমাত্র মনে ছিল, তাহাই আওড়াইতে লাগিলাম,—শ্লোকটি মনে পড়িল। এই উভয় প্রকরণেই জড়শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা আছে, তথাপি আলমারি হইতে গ্রন্থ গ্রহণ স্থলে, জড়শক্তির সাহায্য যেন কিছু মুখ্য ভাবে গ্রহণ বলিয়াই বোধ হয়। কোন্ খানে কোন্ প্রকরণ অবলম্বন করা ভাল, তাহার বিচার আমরা করিতেছি না, বা এ প্রকরণ ভাল, ও প্রকরণ মন্দ, এমন কোন কথাও বলিতেছি না—দুইটা পদ্ধতি যে আছে, তাহাই বলিতেছি। পদ্ধতি অনেক রূপই আছে, তবে কার্য্য

সাধনে জড়শক্তির সাহায্যের ইতর বিশেষ দেখিয়া নানা পদ্ধতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইউরোপ জড় বিজ্ঞানের পদ্ধতি লইয়া আজি কালি মহা বিব্রত। ভারতে এমন একদিন হয়, যখন মুনিঋষিরা আধ্যাত্মিক পদ্ধতি লইয়া মহা বিব্রত ছিলেন। এখন তেমনই হইয়াছে, আমরা জড়ের জড় মহাজড় হইয়া উঠিতেছি।

উদরের দায়ে জড় বিজ্ঞানের উপাসনা আমাদিগকে করিতেই হইবে, তবে এটা না ভুলিলেই হইল, যে উদর ছাড়া মনুষ্যের আরও অনেক অঙ্গ আছে। হৃদয় আছে, মস্তিষ্ক আছে। সেই সকল অঙ্গের দায়ও আছে এবং শরীর ছাড়া আত্মা আছে। আত্মার বিশুদ্ধি, স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি সাধনের চেষ্টা করাও আমাদের কর্ত্তব্য।

চতুর্থ শাখায় আমরা বলিয়াছি যে, স্বপ্ন মিথ্যা এই অনর্থবাদে বিশ্বাস না করিয়া যদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বপ্নের মর্ম্ম বুঝিতে আমরা চেষ্টা করি, তাহা হইলেই দেখিতে পাই, যে স্বপ্নে আত্মশক্তির নানা রূপ বিকাশ হয়। তবেই বুঝা যায়, যে আত্মশক্তির নানারূপ উন্নতি সম্ভব। মনুষ্যের আরও কতক গুলি অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে, ঐ পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূত হয়।

জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগী, মূর্চ্ছাগ্রস্ত ব্যক্তি, ভূতে-পাওয়া স্ত্রীলোক, মন্ত্র-মুগ্ধ বালক—ইহারা সময়ে সময়ে অলৌকিক আত্মশক্তি পায় বলিয়াই বোধ হয়। বিকার কি? মূর্চ্ছা কি? ভূত কিরূপ? মন্ত্র কাহাকে বলে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলেও, এতটুকু বুঝিতে পারা যায়, যে স্বপ্নের মত আরও কোন কোন অবস্থায় মনুষ্যের আত্মশক্তি বৃদ্ধি বা স্ফূর্ত্তি পায়। স্বপ্নে বা রোগে বা অন্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, মানব যেরূপ আত্মশক্তি লাভ করে, বিশেষ বিশেষ যোগাভ্যাস দ্বারা সেই শক্তি মনুষ্য আপনার আয়ত্তিগত করিতে পারে; আমাদের শাস্ত্রে দর্শনে এই কথার উপদেশ আছে, পুরাণে ইতিহাসে ঐ কথার নানারূপ পরিচয় আছে।

আত্মশক্তির উন্নতি এবং স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য হিন্দুদিগের নানা পন্থা আছে। সাধারণত সেই গুলিকে যোগ পন্থা বলে। হঠ যোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ—যোগ নানা প্রকার।

হঠযোগ। হঠ শব্দে বল। প্রথমে বলপূর্ব্বক শরীরের উপর, নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর বল করিতে শিখিতে হয়; সুতরাং হঠযোগ

অর্থে কস্‌লৎ। কস্‌লৎ করিতে করিতে মনের উপরও আয়ত্তি হইতে থাকে।

এই বিষয়ে এই স্থলে কোন শ্রদ্ধাস্পদ পত্র প্রেরকের দুইটি কথা উদ্ধৃত হইল।

১ম কথা। সচরাচর দেখিতে পাই মানুষ যখন নিবিষ্ট মনে কোন চিন্তা করে, তখন প্রায় হস্তাদির দ্বারা স্বীয় অঙ্গের কোন স্থান নিপীড়ন অথবা কোন অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকে। এই রূপ করাতে যেন তাহার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে মন আরও সন্নিবিষ্ট হয়। এই কার্য্যের সংজ্ঞাকরণানুযায়ী নাম একটি কি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয় চিন্তা এবং ব্যায়াম এই উভয় শব্দে একটি যৌগিক শব্দ প্রস্তুত করিতে পারিলে মন্দ হয় না। দেখিতে পাই মুকুলিত বুদ্ধি অল্প বয়স্ক বালক ক্রোড়ে সেলেট রাখিয়া আসন পিঁড়ি হইয়া যখন পাটিগণিত বা বীজগণিতের কঠিন অঙ্ক কসিতে বসিয়াছে, যাই মন চঞ্চল হইয়া লক্ষ্যচ্যুত হইতেছে, অমনি সে হয় হস্তস্থ পেন্‌শিলটি অধর ওষ্ঠে চাপিতেছে, না হয় পদতলে চাপিতেছে। কোন বালক মাতা চুলকাইতেছে বা মস্তকের কেশ ধরিয়া বাম হস্তে টানিতেছে। আবার যে বালক একটু নোংরা স্বভাব, সে হয়ত দন্ত দ্বারা অঙ্গুলির নখ কাটিতেছে। মনঃ সংযোগের জন্য যেন এই রূপ একটা না একটা কার্য্য সকলেরই বিশেষ আবশ্যক হয়। টোলে অধ্যাপক ন্যায় পড়াইতেছেন, ছাত্র পড়িতেছে আর উভয়েই হস্ত দ্বারা পদতল রগড়াইতেছেন বা অঙ্গুলি মোচড়াইতেছেন, আর ঘন ঘন দুলিতেছেন। কখন কখন এই সমস্ত কার্য্য এত জোরে সম্পন্ন হয়, যে সহজ অবস্থায় করিলে শরীরে বেদনা হয়। শুনিয়াছি এক জন উকিল চিত্তবৃত্তি উদ্দিষ্ট-মুখী করিবার জন্যে একটা ফিতা পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলিতে জোরে জড়াইতেন এবং খুলিতেন।

কি বিচারক কি অপর সাধারণ প্রায় অধিকাংশ মনুষ্যকেই চিন্তাকালে শ্মশ্রু বা গুম্ফ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে দেখা গিয়া থাকে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সহজেই অনুভূত হয় যে হঠ যোগের ব্যবস্থিত আসন সমস্ত দুরূহ আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার বা যোগসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল এবং সহায়তা করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ মানসিক বল লাভের জন্য শরীর নিপীড়ন উভয়ত্রই দৃষ্ট হইতেছে।

২য় কথা। অনেক দিন হইল ভারতবাসী পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম,

কয়েক জন মনুষ্য জল মগ্ন হইয়া মুমূর্ষু অবস্থা হইতে জীবন লাভ করিয়া স্ব স্ব অবস্থা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছিল যে "মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় সহ সমস্ত দেহ অবসন্ন, নিস্তব্ধ ও ক্রিয়া বিহীন হইয়া শুদ্ধ জীব চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে (যাহা অল্পক্ষণ পরেই হীনবল প্রাপ্ত হইবে,) সেই সময়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতেছিল। যেন সেরূপ আনন্দ জীবনে আর কখনও অনুভব করি নাই। এবং সেই চৈতন্য মাত্রাবশিষ্ট অবস্থায় মানসপটে শৈশবাবস্থা হইতে উপস্থিত সময় পর্য্যন্তের ঘটনা সমস্তের এক খানি সুন্দর ফটোগ্রাফ্ উঠিয়াছে। যেন জীবিত কালের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সমস্ত ঘটনার কিছুই উঠিতে বাকি নাই, সমস্ত সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।" এই অদ্ভুত কাণ্ডটির সহিতও যোগের কিঞ্চিৎ মিলনের অস্ফুট আভাস পাওয়া যাইতেছে। যোগেতে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিতে হয় এবং ইন্দ্রিয়গণকে নিষ্ক্রিয় করিতে হয়। প্রভেদ এই, যোগ উদ্দেশ্য পূর্ব্বক অভ্যাস দ্বারা সাধন করিতে হয়, আর মুমূর্ষু একপ্রকার আকস্মিক ঘটনা। যোগীর আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ক্রিয়া ঈশ্বর ও অনন্ত জ্ঞান লাভের জন্য, আর মুমূর্ষুর চিন্তা আমি জীবিত অবস্থায় এই রূপ ছিলাম, এক্ষণে একেবারে চলিলাম। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যে সাধনার দ্বারা অনন্তজ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি যোগবিভূতি, পরমানন্দ ও এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়, তাহা সাধ্য। মুমূর্ষু যদি মৃত্যু গ্রাসে পতিত না হইয়া কিছু কাল ঐ অবস্থায় জীবিত থাকিত, তাহা হইলে যেমন উক্ত পরমানন্দ নিরত অনুভব করিতে থাকিত, যোগী অভ্যাস দ্বারা না মরিয়া উক্ত আনন্দ যে নিরত অনুভব করিতে থাকিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মুমূর্ষুর প্রধান চিন্তা জীবন,—তাই সে সেই জীবনের ফটোগ্রাফই দেখিতে পায়। আর যোগীর প্রধান চিন্তা ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হওয়া, সুতরাং যোগী তাহাই লাভ করেন। যোগের বিষয়টা যে একেবারে সমস্তই মিথ্যা তাহা বোধ হয় আজি কালি সকলেই না বলিতে পারেন। প্রমাণাদি এ স্থলে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম।"

আমরাও অদ্য যোগধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত বা প্রস্তুত নহি। দুই একটি স্থূল কথা বলিতেছি মাত্র।

জ্ঞান যোগের স্থূল কথা এই যে, জ্ঞান বিস্তৃতিতে আত্মার শক্তি

বিস্মৃতি হয়। ইংরাজিতে বলে, Knowledg is power—জ্ঞানেই শক্তি সত্তা। পাশ্চাত্য বিদ্যার ভূরি চর্চ্চায় জ্ঞানের শক্তি-জনকতাতে আমরা শ্রদ্ধাবান্ রহিয়াছি সুতরাং এবিষয়ে কিছু না বলিলেও চলে। তবে হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানকে যে ভাবে শক্তির নিদানভূত বলিয়া বিবৃত হইয়াছে, সে ভাব পাশ্চাত্য দর্শনে বড় একটা নাই।

কেবল মাত্র ভক্তিযোগে মানবীয় শক্তির সর্ব্ববিধ স্ফূর্ত্তি হয়, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। পুরাণের ধ্রুব-চরিত্রে এবং প্রহ্লাদ-চরিত্রে ভক্তির শক্তিদায়িনী প্রকৃতি পরিস্ফুট করিয়া বিবৃত হইয়াছে। সকাম ভক্তি বলে ধ্রুব উচ্চ হইতে উচ্চতর, অচল, অটল, ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হন; আর নিষ্কাম ভক্তি বলে প্রহ্লাদ পর্ব্বত বহ্নি বিষ তুচ্ছ করিয়া চরমে পরমগতি লাভ করেন।

আর্য্যাবর্ত্ত ভক্তির পীঠ স্থান; বঙ্গদেশ ভক্তির মহাপীঠ। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভগবানের সাক্ষাৎ ভক্তি মূর্ত্তি এই মহাপীঠে অবতীর্ণা হন; লক্ষ লক্ষ নর নারী সেই মূর্ত্তির সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিল; সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ভক্তির গভীর খরস্রোতে প্লাবিত হইয়াছিল। ভক্তির সেই জলন্ত ইতিহাস পট আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে; আমরা ভক্তির মহাপীঠে অবস্থিত রহিয়াছি; এই কার্ত্তিক মাসে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম সঙ্কীর্ত্তন ভদ্রগৃহে নিত্য গীত হইতেছে; অথচ ভক্তির মহিমা বুঝিতে আমরা দিন দিন অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। ভক্তির উচ্ছ্বাসে কাহাকেও ক্রন্দন করিতে দেখিলে, অনেকে তাহাকে হয় নির্ব্বোধ, না হয় ভণ্ড বলিয়া মনে করেন। বল মহাপ্রভু! তোমার মহাপীঠ বাসীগণের এ দুর্দ্দশা কেন হইতেছে!

প্রহ্লাদ-চরিত্র উপন্যাস। উদ্ভট কথার প্রথম শাখার আদি কথা এই যে, উপন্যাস হইলেই কোন বিষয় অনাদরণীয় বা অবিশ্বসনীয় হয় না। বরং অনেক সময় আমরা ইতিহাস অপেক্ষা কাব্য বা উপন্যাস হইতে অধিতর শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। তবে কোন একটি বিষয়ে বিশ্বাস না হইলে, তাহা হইতে শিক্ষা হয় না। আর কোন একটি বিষয় ভূয়ো দর্শনের সঙ্গে থাপিলেই তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হইয়া থাকে।

কোন একজন আগন্তুক য়ুরোপীয়ান শ্যামদেশের অধিপতির নিকট

বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহার দেশে (উত্তর য়ুরোপে) জল জমিয়া কঠিন হয়; নদীর উপর লোক চলে, গাড়ী যায়। শ্যামরাজ কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করেন নাই। যেখানে এখন, রেলওয়ের হুগলি ষ্টেশন হইয়াছে, সেইখানে ও তাহার নিকটবর্ত্তী মাঠে, রেলগাড়ি চলিবার পূর্ব্বে বরফ পড়িত। নীচে বিচালী কাটা খড় পাতিয়া চিট্‌কে চিট্‌কে সান্‌কিতে অল্প অল্প জল দিয়া রাত্রিতে রাখিত, সেই জল জমিয়া অতি পাত্‌লা বরফ হইয়া থাকিত। আমার একজন M B. ডাক্তার বন্ধুর নিকট আমি ঐ বিবরণ বলিয়াছিলাম; তিনি আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করেন নাই।

শ্যামের রাজা য়ুরোপীয় দূতের কথা বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহার এবং তাঁহার পারিষদ বৃন্দের ভূয়োদর্শনের সঙ্গে কথাটা মেলে নাই বলিয়া। আমার ডাক্তার বন্ধু আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহার কেতাবী দর্শনের সঙ্গে কথাটা মেলে নাই বলিয়া। উষ্ণ কটিবন্ধে বরফ পড়ার কথা, কৈ কোন কেতাবে ত লেখে নাই। তবে তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কেন?

প্রহ্লাদ ভক্তিবলে বলীয়ান্ ছিলেন বলিয়া, বহ্নিতে তিনি দগ্ধ হন নাই, পর্ব্বত পেশনে নষ্ট হন নাই—ইত্যাদি কথা, না, আমাদের ভূয়োদর্শনের সঙ্গে মেলে, না, বিলাতী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কুলায়। কাজেই ও সকল কথায় আমাদের বিশ্বাস হয় না। ও গুলা পৌরাণিক গাঁজাখুরি বলিয়া মনে করি; কাজেই মূল কথা যে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা—প্রহ্লাদ চরিত্র হইতে তাহার কিছুই হয় না বলিলেও চলে।

কিন্তু যতই বয়োধিক্য হইতেছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ততই আত্মশক্তির গৌরব বুঝিতে পারিতেছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় মহা মহা পণ্ডিতে একত্র হইয়া, সমিতি করিয়া, যে সকল ঘটনায় আত্মশক্তির কোন রূপ বিশেষ বিকাশ বা বৃদ্ধি অনুমিত হইতে পারে, সেই সকল ঘটনা ইহাঁরা সংগ্রহ করিতেছেন। স্বপ্নে, সংমোহে, উন্মাদের অবস্থায়, বিকারের সময়, আত্মশক্তির কিরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হয়, তাহাই তাঁহারা বৈজ্ঞানিক ভাবে পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ফল এই দাঁড়াইতেছে, যে সকল ঘটনা অসম্ভব বলিয়া—সাধারণ, অসাধারণ অনেকেরই বিশ্বাস ছিল, সেই সকল এখন বিশ্বস্ত প্রমাণে সাব্যস্ত হইতেছে।

ক্রমে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করিতেছেন, যে জড়শক্তি ছাড়া কোন রূপ জড়েতর শক্তির লীলাখেলা ইহ জগতে দেখা গিয়া থাকে। তাঁহারা Psychic force বা আত্মশক্তি নামে সেই অপর শক্তির নামকরণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই পণ্ডিত অপণ্ডিত সকল শ্রেণীর লোকের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ছিল; পাশ্চাত্য প্রবল জড় বিজ্ঞানের তরঙ্গে একটু কমিতেছিল মাত্র; এখন মনে হয় আবার য়ুরোপের এই নূতন তরঙ্গের অভিঘাতে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের পর্য্যালোচনা গুণে, প্রহ্লাদ চরিত্রের অদ্ভুত উপন্যাসও বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্থাপিত হইতে চলিল।

সম্মোহ রোগে আত্মশক্তির কখন কখন অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়া থাকে। একজন এইরূপ বায়ুগ্রস্ত রোগীর বিবরণ ইংরাজী পুস্তক হইতে এইস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

সম্মোহ রোগে কখন কখন আর একরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকে; তাহার কোন রূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আমি একান্ত অপারগ। সেই সকল স্থলে রোগীর দেহ মধ্যে তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমি এইরূপ ঘটনা অনেকবার দেখিয়াছি, এবং এরূপ ঘটনা সত্য সত্যই হয়, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। সকল ঘটনাগুলিই প্রায় একরূপ সুতরাং দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার বিষয় বলিলেই চলিবে। চুল্লীর বাড়ের কাছে আগুণ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে —আমি দেখিয়াছি—সম্মোহ রোগগ্রস্ত একজন রোগী, সেইখানে গেল, চা-খাবার পেয়ালার মত বড় একখানা গন্‌গনে জ্বলন্ত কয়লা উনানের মাঝখান হইতে আঙ্গুলে ধরিয়া বাহির করিয়া আনিল, আর যে পর্য্যন্ত ঐ কয়লা খণ্ড ঠাণ্ডা না হইল, সে পর্য্যন্ত হাতে করিয়া ধরিয়া রাখিল। যখন সে ধরিয়া আছে, তখন কয়লার গায়ে কাগজ লাগাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিল এবং ছাই হইয়া গেল। এমন মনে হইল, যে, উত্তাপ উপর দিকেই লাগে। হাতের উপর কয়লা রহিয়াছে, কয়লার উত্তাপ তাহাতেই, হয়ত, হাতে লাগিতেছে না। ঐ রূপ সন্দেহ করিয়া হাতের ও কয়লার মাঝে আর এক খণ্ড কাগজ দেওয়া গেল, সেখানাও তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া গেল। আমি বলিলাম, কয়লা খানা আমার হাতে দেওয়া হউক, দেওয়া হইলে, আমি তৎ-

ক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইলাম, তবু হাতটি বিলক্ষণ পুড়িয়া গেল। কিন্তু রোগী আমার হস্ত হইতে পূর্ব্ববৎ অসাড়ভাবে সেই কয়লাখানি গ্রহণ করিল। পরীক্ষায় কোন সন্দেহ না থাকিতে পারে, এই জন্য গন্‌গনে কয়লাখানা রোগীর দুই হাতের মধ্যে দেওয়া গেল; তাহার পর তাহার অঙ্গুলির ফাক দিয়া একখানি কাগজ দিলে, সে খানি তখনি জ্বলিয়া গেল। পরীক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ড রোগীর মাথার উপর দেওয়া গেলে, এক গাছি কেশও ঝল্‌সাইল না; কিন্তু মাথাতেও কাগজ কয়লা স্পর্শ করিবা মাত্র পুড়িয়া গেল। বাজীকরদের ভেল্কিতে, অথবা রাসায়নিক উপকরণ যোগে, যে রূপ অল্প সময়ের জন্য তাপ অনুভূতি হয় না, সেরূপ অল্পকালের জন্য এই পরীক্ষা হয় নাই। সিকি ঘণ্টা ব্যাপিয়া এই পরীক্ষা হয়, তাহার পর কয়লা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। নানাবিধ রূপে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। রোগী বলে, যে জ্বলন্ত অঙ্গারের তাপ তাহার শরীরে বোধ হয় না। আমি দেখিয়াছি, সংমোহবায়ুর রোগী জ্বলন্ত বাতীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আঙ্গুল দিয়া রহিল, পূর্ব্ববৎ তাহার কিছুই হইল না। সংমোহ ঘুচিয়া গেলে, উত্তাপে পীড়িত না হইবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, এবং অন্যান্য সকলের ন্যায় পীড়িত ব্যক্তিও উত্তাপ অনুভব করিতে পারে।

বিশেষ সতর্কে পরীক্ষা এবং পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা স্থির হইয়াছে যে, সচরাচর লোকে মনে করে, এরূপ স্থলে রোগী উত্তাপ কেবল অনুভব করিতে পারে না মাত্র, তাহা নহে; শরীরও দগ্ধ হয় না। এমন রাসায়নিক উপকরণ আছে, যে তাহা ব্যবহার করিলে, অত্যল্প মাত্র সময়ের জন্য, গাত্র চর্ম্ম উত্তাপে বিকৃত হয় না; কিন্তু অনেকক্ষণ উত্তাপ লাগিলেও গাত্র চর্ম্ম বিকৃত হইবে না—এমন কোন উপকরণ নাই। দহনের ক্লেশ অনুভূত হইবে না, এরূপ করা যায়, কিন্তু উত্তাপ বলে শরীরের মাংস বিকৃতি—কিছুতেই আটকান যায় না। চাম্‌ড়ার উপর যে ছোট ছোট লোম আছে তাহা পুড়িয়া যাইবেই, আর অল্পক্ষণ পারে চামড়াও পুড়িতে থাকিবে।

সংমোহ রোগগ্রস্ত যে রোগী সিকি ঘণ্টা গন্‌গনে কয়লা ধরিয়া ছিল, তাহার শরীরে উত্তাপের কোন কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। চুল একগাছিও পুড়ে নাই; আর চামড়াতে, দেখিলে বা শুঁকিলে, পুড়িবার কোন লক্ষণই ছিল না। কিন্তু আমার অঙ্গুলিতে তৎক্ষণাৎ ফোস্কা হইয়াছিল, আর মুহূর্ত্ত মধ্যে কাগজ জ্বলিয়া গিয়াছিল।

অতএব এমত স্থলে, রোগীর উত্তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা হয় না। কিন্তু উত্তাপ রোগীর শরীর মধ্যে প্রবেশই করিতে পারে না।

তাহার পর ভারসহিবার ক্ষমতার কথা গ্রন্থকার এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন ;—

এইরূপ অবস্থায় রোগীর শরীরে এত অধিক ভার সহিবে, যে মনে হইবে, দেহ কাষ্ঠের দেহ ; অস্থি মাংসের নহে। রোগীর মাথা এক খানি কেদারার এক কিনারায় রাখিয়া, পায়ের গোড়ারি ছুটি আর এক খানি কেদারার কিনারায় রাখ;—আর সমস্ত শরীরটা বিনা অবলম্বনে থাকুক। তাহা হইলে দেহটা শক্ত এবং চোস্ত ভাবেত থাকিবেই—সহজ অবস্থায় কোন ব্যক্তিই পাঁচ মিনিট কাল সেরূপ থাকিতে পারে না—উপরন্তু তুমি সেই দেহের উপর দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিবে ; তাহাতে শরীরটা নুইয়াও পড়িবে না, আর বোধ হয় রোগীর কোন কষ্ট বা ক্লেশও হইবে না। একটি বালকের উপর আমি এইরূপে তুই জন লোককে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি।

যাঁহারা পরলোকগত রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংমোহ অবস্থা দেখিয়াছেন—আমি একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম—অথবা কোন বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের 'দশা-প্রাপ্তি' দেখিয়াছেন, ভক্তিতে কিরূপ মানসিক ও দৈহিক পরিণিত হয়, তাহা তাঁহারা কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিতে হইবে। ভক্তিতে যে ভাবে আত্মশক্তির বিকাশ হয়, (এবং তাহাতে জড়শক্তি উপেক্ষিত হইতে পারে বলিয়া পুরাণে ইতিহাসে বর্ণনা আছে,) আকস্মিকভাবে অবস্থা বিশেষে যে সেইরূপ হয়, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। তবু যদি আমরা আপনাদের মূর্খতাকে অভিজ্ঞতা নামে অভিহিত করিয়া, সেই অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া, ভক্তির শক্তিদায়িনী শক্তিতে অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমাদের মত কৃপার পাত্র আর কে আছে!

মহাপ্রভু তুমি যে বলিয়াছিলে,—

ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তি যোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইব সবে প্রতি ঘরে ঘরে॥

তুমি ত অমূল্যধন বিলাইলে, আমরা কুড়াইলাম কৈ? তোমার অবতারণী কি ব্যর্থ হইবে?

---

* এডওয়ার্ড উইলিয়াম কক্সের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভূমিকা গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ হইতে সমস্তই অনুবাদিত।

মিত্র বিলাপ।

রাজকৃষ্ণ! আজি তোমারই কথায় তোমার জন্য ক্রন্দন করিতেছি! তুমি কি এই জন্যই মিত্রবিলাপ লিখিয়াছিলে! তোমার নবজীবনে লিখিবার অগাধ সাধ—তোমার সাধ, আমার সাধ, সকলের সাধ—শেষে কি এইরূপে মিটাইতে হইল? তোমার গুণবর্ণনা করিতে যাঁহারা পারেন, করুন, আমি পারিব না আমি কাঁদিব।

শরত্ হেমন্তে দ্বন্দ্ব যে কাল লইয়া,
সে কালে যখন বঙ্গে,
শারদা আসেন রঙ্গে,
যখন সকল লোকে পুলকিত হিয়া,
অভয়ার আহবান তরে
মনোমত অলঙ্কার পরে
পরিচ্ছন্ন নব বস্ত্র বাছিয়া বাছিয়া—

তখন—তখন—
—কেন স্মৃতি দেখাইছ সে স্বপন আর!
সে আনন্দ পড়ে মনে,
দেখি, হায়, পরক্ষণে,
সকলি আঁধার!
প্রস্ফুটিত প্রায় যবে ফুল
করে দিক্ সৌরভে আকুল,
সহসা করাল কাল করিল সংহার।

অরে রে বিকট কাল
একি তোর রীতি?
যেই দীপ জ্বলে, নিশ্বাসের বলে
নিবাইতে তোর প্রীতি।

যে নিশা-রতনে, চাহে সর্ব্বজনে,
মেঘ-আবরণে, ঢাকিস্ তারে;
যে তরু আশ্রয়, করে জীবচয়,
তাতে কেন হয়, তোর হিংসা রে?

রে কাল, সে ধন কেন হরিলি নিদয়?
শিশির মুকুতা মালা
সাজায় যে স্থল ভালা,
করিস্ সে স্থল শোভা তাপ-বলে লয়।
এ সংসার অন্ধকার,
করিস্ রে দুরাচার,
রাহুরূপে গ্রাস করি শশী সুখময়।
তোর অত্যাচারে খল,
ছিন্ন ভিন্ন ভূমণ্ডল,
ধরা দিলি রসাতল, তপন তনয়।
কোথায় লুকাইল
সে সরল মূর্ত্তি—ছবি হায়, কি হইল?
মরীচিকাবৎ, গিয়াছে তাবৎ,
কালের করে;
নিশার স্বপন, জাগিয়া এখন
একি দেখি সব প্রাণ বিদরে।

থাকিবে কেমনে
নানাবিধ রূপে সাজি জলদ গগনে?
ডুবেছে ভাস্কর, অবনী অম্বর,
গ্রাসে আঁধার;
কালের নিশ্বাস, প্রবল বাতাস,
ছিন্ন ভিন্ন করি, সকলি সারে।

কি বলিছ মৃদু স্বনে ওহে সহকার?
দুঃখ ঢাকি কি হইবে? বল প্রকাশিয়া।
মাধবীরে হারাইয়া যদি কাঁদে হিয়া,
কি কারণ লুকাইছ নিকটে আমার?
আমার সে দশা আজি যে দশা তোমার।

হারাইয়া প্রেমমূর্ত্তি বান্ধব রতনে,
দেখিতেছি শূন্যময় হৃদয়-ভাণ্ডার;
তমোময় বিষময় হয়েছে সংসার;
আপনার দশা দেখি বুঝিতেছি মনে
কি দশা তোমার তরু মাধবী বিহনে।

মিছা কেন মর জ্বলি অন্তর অনলে;
জান না মনের কথা করিলে প্রকাশ,
লোকে বলে হয়ে থাকে
যন্ত্রণার হ্রাস;
আসিয়াছি তাই তরু আজি তব তলে,
দুজনে মনের কথা, কহিব বিরলে।

যখন যেখানে যাই দুখ দেখি তথা,
অনিলে, সলিলে, স্থলে,
আলোকে, আঁধারে,
কাননে, নগরে, পথে,
ঘাটে, ঘরে দ্বারে,
সর্ব্বত্র শুনিতে পাই রাজকৃষ্ণ কথা;
সান্ত্বনা কে করে আর?
বাড়ে মনোব্যথা।

(মিত্রপত্নী দর্শনে)

বিকট রাহুর করাল কবলে
যথা শশীকলা কালের কৌশলে;
বিনা ঋতুপতি, যথা বসুমতী;
কিংবা ছিন্নবৃন্ত কুসুম যেমতি;
অথবা মলিন দিবা যেমন
কুজ্‌ঝটিকা জালে ঘেরে যখন,
কিম্বা মেঘ পালে, আক্রমে যেকালে,
দিনরতন!—

দেখিলাম আজি বন্ধুর বনিতা,
বিষময় শোকে ব্যাকুলা ললিতা।
নয়নের জল, ঝরে অবিরল,
উঠিতে বসিতে অঙ্গে নাহি বল।
কি দুরন্ত কীট মাঝে পশিয়া
কুসুম-সুষমা নিল হরিয়া;
সৌন্দর্য্য কোথায়, দেখি দুঃখে হায়,
বিদরে হিয়া।

কেন অশ্রু জলে ভাসিছ নলিনী?
যে রবিরে ভাবি যাপিছ যামিনী,
চির অন্ধকারে, ঢাকিয়াছে তাঁরে,
বিকট কালের অস্তাচলাগারে।
সে তিমির ভেদি কি সাধ্য তাঁর
দর্শন তোমায় দিতে আবার।
কেবল হৃদয়ে, সে রবি উদয়ে,
এখন আর।

অরে কাল তোর নাহি কিছু মায়া
সন্তাপহারিণী ছিল যেই ছায়া,
একি ব্যবহার, ওরে দুরাচার!
তাহারে হেরিলে জ্বলে অনিবার
সুশীতল মনে যন্ত্রণানল?
কেমন স্বভাব তোর রে খল,
সুধা ছিল যথা, ঢালি কেন তথা,
দিলি গরল?

(মিত্র জননী দর্শনে)

কে মলিনী পাগলিনী পড়িয়া ভূতলে,
যেন ভিন্নবক্ষা শুক্তি ভূমে অচেতন
হৃদয় মুকুতা কাল করিলে হরণ?
কে ডুবিছে ওই শোক-সাগরের জলে
যেমন কমল-লতা সরসী কমলে
যখন কমল কেহ তুলি লয় বলে!

এই দীনা হীনা নাকি বন্ধুর জননী?
ধূলিধূষরিত কেশ, মলিন বসন,
নিরন্তর নীরধারা বর্ষিছে নয়ন।
কাঁদিছ কি তমোবাস পরিয়া ধরণী?
গ্রাসিয়াছে তব রবি কালরূপ ফণী।
আসিয়াছে ভয়ঙ্করী শোকের রজনী।

কেঁদ না কেঁদ না মা গো সম্বর রোদন।
অশ্রু জলে বাড়িবে কি
সে তরু আবার,
কালের কুঠারে মূল কাটিয়াছে যার?
দিন দিন করি ক্ষীণ আপন জীবন
তারে কি জীবন দিতে করেছ মনন?
দীর্ঘশ্বাসে শ্বাস তারে দিবে কি কখন?

পান্থশালা এসংসার, কেহ নহে কার
এক দল আসে আর একদল যায়;
আজি যার সঙ্গে দেখা
কালি সে কোথায়?
ইহাকে উহাকে বলি আমার আমার
মিছা বুদ্ধি করে লোক
জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।

বিচিত্র রঙ্গের কাঁচ খণ্ডের সমান
বিবিধ বরণে মায়া সাজায় সকলি;
কুৎসিত যা, চলি যায় মনোহর বলি।
মায়া-সহচরী আশা হরি সত্যজ্ঞান
চৌদিকে অপূর্ব্ব পুরী করয়ে নির্ম্মাণ;
পলকে তাহার আর না থাকে সন্ধান।

কেন মা দ্বিগুণ তব বাড়িল রোদন?
জ্বলিছে আমার মন শোকের অনলে,
ভাসিতেছি আমিও মা নয়নের জলে;—
মা তুমি কেঁদ না আর—মুছ মা নয়ন—
কাঁদিয়া কি হবে? কর শোক সম্বরণ—
আমি আর উপদেশ কি দিব এখন?

(পরিবর্ত্তিত)
কেঁদ না কেঁদ না মাগো
কেঁদ না গো আর।
উঠ উঠ রাধিকা মা ডাকিছে তোমায়,
কৃষ্ণ দুঃখ নিবার মা—লয়ে রাধিকায়।
যদি ও মা এই পুত্র গিয়াছে তোমার;
অন্য পুত্র হতে ত্রুটি হবে না সেবার।
কেঁদ না কেঁদ না মা গো
কেঁদ না গো আর!

নবজীবন।

৩য় ভাগ। } অগ্রহায়ণ ১২৯৩। { ৫ম সংখ্যা।

সে কালের দারোগার কাহিনী।

৪র্থ ভাগ—নীলকুঠী।

২।

সে কালে যেমন আদালত ফৌজদারির এবং গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কাছারির কর্ত্তা সাহেবদিগের এক এক জন দেওয়ান ছিলেন, নীলকর সাহেবদিগের প্রত্যেক কুঠিতে এবং কনসরণে সেই রূপ দেওয়ান ছিল। ইহারাই সাহেবদিগের দক্ষিণ হস্ত ছিল। সাহেবেরা নিজে কেবল নীল প্রস্তুতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, দেওয়ানজির হস্তে জমিদারী শাসনের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত থাকিত। তদ্ভিন্ন কুঠির সমুদয় খরচ পত্র দেওয়ানের হস্ত দিয়া হইত এবং জমিদারী এবং তালুক সমস্তের আদায় তহসীলও ইহারা করিত। ফলিতার্থে নীলকুঠির দেওয়ানের হস্তে অনেক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। কুঠির যাবদীয় মামলা মোকদ্দমা ইহাদিগের উপস্থিত করিতে এবং চালাইতে হইত। যখন কাহারও সহিত কোন বিবাদ কিম্বা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে আবশ্যক হইত, তাহার সমস্ত আয়োজনের ভার দেওয়ানের উপরে পড়িত এবং কুঠীর অপরাধে ইহাদেরই জেলখানায় যাইতে হইত। ইহাদের প্রকৃত খ্যাতি গোমাস্তা ছিল, কিন্তু লোকে সম্মান করিয়া দেওয়ানজি বলিয়া ডাকিত। দৌরাত্ম্য, অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত নীলকর সাহেবদিগের যে দুর্নাম আছে তাহার অধিকাংশের জন্য তাঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীরা দায়ী। পারস্য ভাষার গোলেস্তা পুস্তকে লিখিত আছে, যে, যদি

বাদসাহের একটি কুক্কুট ডিম্ব আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্মচারীরা দেশের সমস্ত কুক্কুটী জবাই করে। এ কথা বড় মিথ্যা নহে; কারণ কুঠীর দ্বারা এমন অনেক দুষ্কার্য্য হইত, যাহা সাহেবেরা কখনও জানিতে কিম্বা শুনিতে পাইতেন না। সকল সাহেবে এ দেশের সকল অবস্থা জানিতেন না, তাঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীরা ঘরের ঢেঁকী কুমীর হইয়া বিভীষণের ন্যায় ভিতরের কথা জ্ঞাত করাইয়া যে রূপে কার্য্য করিলে সাহেবের উপকার হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিত। ইহার কারণ যদি শুদ্ধ নিস্বার্থ প্রভুভক্তি হইত, তাহা হইলে তাহাদের নিন্দার কথা না হইয়া বরং প্রশংসার বিষয় হইত। কিন্তু তাহা নহে, কারণ ইহাতে তাহাদের বিলক্ষণ লাভের অঙ্ক ছিল। কুঠীর অধিকারের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে আমলাদিগের বেতন এবং উপরি রোজগার বাড়িয়া যাইত এবং সাহেবের প্রভুত্ব যতই বদ্ধমূল হইত, ততই তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইত। নীলকর সাহেবকে তাহার গোমস্তা এক বিষয়ে দুই পয়সার লাভ দেখাইয়া দিতে পারিলে, সে অনায়াসে অন্য দিকে নিজে চারি পয়সা রোজগার করিতে পারিত। আমলার দৌরাত্মের বিষয় সাহেবের নিকট প্রতিবাদ উপস্থিত হইলে, আমলা সাহেবকে এক মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত করিত, যে,—প্রজা কিম্বা বাহিরের লোকের সঙ্গে এই রূপ ব্যবহার না করিলে কুঠীর প্রভুত্ব থাকে না এবং সাহেবকে কেঁহ ভয় করিবে না।

নীলকরের চাকরী করিয়া তাঁহাদের দেওয়ান গোমস্তারা অনেকে প্রচুর সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিল এবং সকল জাতীয় লোক ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। ব্রাহ্মণ কায়স্থের অভাব ছিল না। খাল বোয়ালিয়া কুঠীতে ঢাকা জেলার কার্ত্তিকপুর অঞ্চল নিবাসী রামমাণিক্য সোম নামক এক জন বঙ্গজ কায়স্থ দেওয়ান ছিলেন। এই ব্যক্তি অতি বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মদক্ষ ছিলেন এবং তিনি খাল বোয়ালিয়া কনসরণের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই প্রদেশের লোকে অত্যন্ত ভয়ও করিত। তাঁহার দর্পের একটি কৌতুক কর কথা বলিব।

রামমাণিক্য যে ঘরে বসিয়া কাছারী করিতেন, তাহার সম্মুখে সাধারণের এক বর্ত্ম ছিল। এক দিবস তিনি কাছারী করিতেছেন, এমন সময় এক জন গোস্বামী তাঁহার তুরী ভেরী ও দলবল লইয়া পাল্কী আরোহণে ঐ পথ বহিয়া যাইতে ছিলেন। গোস্বামীর গলায় পৈতা দেখিয়া রামমাণিক্য তাহাকে আপন স্থান হইতে হাত তুলিয়া প্রণাম করিলেন। গোস্বামীও দেওয়ানজির ন্যায়

ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন দেখিয়া, হৃষ্ট চিত্তে পাল্কীর মধ্য হইতে যত দূরে পারিলেন হস্ত বাহির করিয়া, দেওয়ানজিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামমাণিক্য তাঁহার মজলিশের উপস্থিত ব্যক্তিদিগের নিকট এই গোস্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা উত্তর করিল যে "উনি ভাজন ঘাটের অমুক বৈদ্য গোসাঞী"। অনেকে অবগত না থাকিতে পারেন, যে কাটোয়া অঞ্চলের শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামীদিগের ন্যায় কৃষ্ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ভাজনঘাট নামক গ্রামেও কয়েক ঘর বৈদ্য গোসাঞী আছেন। ইহাঁরা অনেক নবশাখ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোককে মন্ত্র দিয়া থাকেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামীরা মুরশিদাবাদের কাশীমবাজারের প্রসিদ্ধ মহারাণী স্বর্ণময়ীর ইষ্টদেবতা। এইরূপ শ্রীখণ্ডের এবং ভাজনঘাটের বৈদ্য গোস্বামীদিগের অনেক ধনাঢ্য শিষ্য সেবক থাকাতে তাঁহারা নিজে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। ভাজনঘাটের ইহারই এক জন গোস্বামী রামমাণিক্য দেওয়ানের সম্মুখস্থ পথ দিয়া শিষ্য বাড়ী যাইতেছিলেন। একে পূর্ব্ব দেশীয় বঙ্গজ কায়স্থ, তাহাতে আবার হেরিস সাহেবের দেওয়ান, রামমাণিক্য যাই শুনিল যে, যাহাকে সে প্রণাম করিয়াছে সে ব্রাহ্মণ নহে, বৈদ্য,—অমনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া গোসাঞীকে পাল্কী সমেত তাহার নিকটে উপস্থিত করিতে কয়েক জন লাঠিয়াল পাঠাইয়া দিল। সেই সময় ঐ প্রদেশে এমন অল্প লোক ছিল, যাহারা রামমাণিক্যকে তাচ্ছিল্য করিতে পারিত, কিম্বা ভয় না করিত। অল্পক্ষণের মধ্যে লাঠিয়ালেরা গোস্বামীকে দেওয়ানের নিকট উপস্থিত করিলে দেওয়ানজি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ না বৈদ্য। গোস্বামী বৈদ্য বলিয়া উত্তর করিলে দেওয়ান এক ভ্রুকুটী সহকারে বলিলেন যে "তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুমি বৈদ্য হইয়া কায়েতের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছ. ভাল চাও ত এই দণ্ডে সকলের সম্মুখে আমার প্রণাম ফিরাইয়া দেও"। গোসাঞী এত ক্ষণ ভয়ে নবমী পূজার পাঁটার ন্যায় কাঁপিতেছিলেন, মনে ভাবিতেছিলেন যে দেওয়ান না জানি তাঁহাকে কতই গুরুতর শাস্তি দিবেন। কিন্তু দেওয়ানের মুখে এই লঘু আজ্ঞা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রামমাণিক্যকে নতশিরে এক নমস্কার করিলেন এবং দেওয়ানজিও তাঁহাকে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকিতে বলিয়া বিদায় দিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলার সকল নীলকুঠীতে ইদানীন্তন প্রায়ই কৈবর্ত্ত জাতীয় ব্যক্তিরা দেওয়ান গোমস্তা ছিল। ইহারা অনেকে নীলকুঠীর কার্য্যে

দক্ষ হইয়াছিল, এবং দুই তিন পুরুষ নীলকরের চাকরী করিয়া বিলক্ষণ সম্পত্তি করিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশের বিশ্বাস বা ভৌমিক কিম্বা ভুঞা পদবী ছিল এবং দেখিতে শুনিতে, আচার ব্যবহারে এবং কর্ম্ম কার্য্যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা হীন ছিল না। ইহারা অশ্বারোহণে খুব পটু ছিল, কারণ ভালরূপে ঘোড়া চড়িতে না পারিলে নীল-কুঠীর গোমাস্তাগিরি কর্ম্ম চলিয়া উঠিত না। কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় শ্রাবণে নীলকর্ত্তন সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ পাতে কুঠীর সমস্ত নীলের ভূমি পরিদর্শন করিতে না পারিলে, নীলের ব্যাঘাত হইত সুতরাং অশ্বারোহণ অভ্যাস না থাকিলে এই কার্য্য বিধিমত নির্ব্বাহিত হইতে পারিত না। এই জন্য প্রত্যেক গোমাস্তার ৩। ৪টা অশ্ব নিযুক্ত ছিল।

নীলকুঠীর কৈবর্ত্তজাতীয় গোমাস্তার মধ্যে ওয়াটসন কোম্পানীর গোমাস্তা ভবানন্দ দেয়াড় নিবাসী কৃষ্ণলাল ভুঞা অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি তাঁহার জীবন কাটাইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তিও রাখিয়া গিয়াছিলেন। লেখা পড়ায় পারদর্শিতা অধিক না থাকিলেও কার্য্যদক্ষতা এবং বৈষয়িক বুদ্ধি খুব চমৎকার ছিল। প্রতাপে প্রভুভক্তিতে কৃষ্ণলাল খালবোয়ালিয়ার দেওয়ান রাম মাণিক্য অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলেন না। কৃষ্ণনগর জেলার উত্তর প্রদেশে এমন কোন লোক ছিল না যে কৃষ্ণলাল ভুঞার নাম না জানিত। এত দূর পর্য্যন্ত জনরব আছে, যে কৃষ্ণলালের দোহাই চলিত। পক্ষান্তরে অনেকে তাহাকে অত্যাচার এবং দৌরাত্ম্যের জন্য নিন্দা করিয়া থাকে কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্রজাপীড়ন এবং নিকটবর্ত্তী তালুকদারের প্রতি অত্যাচার করা নীলকরের গোমাস্তাদিগের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য—কারণ তাহা না করিলে নীলকুঠীর উপকার হয় না। প্রজারঞ্জন এবং নীলকরের হিত এই দুই কার্য্যের পরস্পর ভাব যেমন চিঁড়া কাঁচাকলার ভাব, উভয়, কখনও বিমিশ্রিত হয় না। যাহা হউক ভুঞাজির প্রভুভক্তি অতি প্রবল ছিল। কিসে ওয়াটসন কোম্পানীর লভ্য হইবে, ক্ষতি হইবে না—ইহাই তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। একবার যশোহর জেলার অন্তর্গত এক কুঠীর গোমাস্তার প্রতি ওয়াটসন কোম্পানীর প্রাপ্য কয়েক হাজার টাকা ঐ জেলার কলেক্টরী হইতে বাহির করিয়া লওয়ার আদেশ হয় এবং গোমস্তাও কলেক্টরী হইতে

ঐ টাকা পাওয়ার সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু টাকা আনিবার নিমিত্ত শিকারপুর হইতে লোক প্রেরণ করার পূর্ব্বে সংবাদ আসিল, যে দৈব অগ্নি লাগিয়া সেই কুঠী জ্বলিয়া গিয়াছে এবং টাকাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ম্যানেজর সাহেবের তৎসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ কিম্বা কোন চিন্তা হইল না, কারণ ওয়াটসন কোম্পানীর এক দিকে কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি হইলে বড় আসে যায় না, কিন্তু বাঙ্গালি কৃষ্ণলালের মনে অমনি অবিশ্বাস জন্মিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটি ঘোড়ায় চড়িয়া কৃষ্ণলাল যশোহর যাত্রা করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে এইরূপ ভ্রমণ করা নীলকুঠীর গোমাস্তার পক্ষে বড় কঠিন কিম্বা কষ্টকর কাজ ছিল না। শিকারপুর হইতে যশোহরে পত্র পৌছিতে পারে, এমন সময়ের পূর্ব্বে ভুঞা স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে সেই কুঠীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে গৃহদাহ মিথ্যা। গোমাস্তাও তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইল, কারণ সে কখনও ভাবে নাই যে শিকারপুর হইতে কেহ এত শীঘ্র সেই স্থানে আসিবে। সে ভাবিয়াছিল, যে আর দুই এক দিবসের মধ্যে টাকাগুলি স্থানান্তর করিয়া কাছারি ঘরে আগুন দিয়া নিজেই শিকারপুর যাইয়া একরূপ বন্দোবস্ত করিবে। কিন্তু কৃষ্ণলালের উদ্যোগে তাহার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। কৃষ্ণলাল সমস্ত টাকাগুলি তাহার নিকট বুঝিয়া লইল এবং তাহা শিকারপুর প্রেরণের উচিত বন্দোবস্ত করিয়া মানেজর সাহেবের নিকট প্রত্যাগমন করিল। কৃষ্ণলাল যশোহর গিয়াছিল শুনিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করাতে কৃষ্ণলাল বলিল, যে যথার্থ ঘর পুড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু টাকার লোকসান হয় নাই। সেই গোমস্তাটি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণলাল তাঁহার প্রভুর নিকট এইরূপ চাতুরি খেলিয়াছিলেন। প্রভুর স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত যে ভৃত্যের এইরূপ যত্ন, তাহার যশ এবং শ্রীবৃদ্ধি কেন না হইবে?

কৃষ্ণলাল ভুঞার বিলক্ষণ দানশক্তি ছিল, এবং ব্রাহ্মণকে বিশেষ বৈষ্ণবকে তিনি গাঢ় ভক্তি করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে এবং শিকারপুরের বাসাতে অতিথি সেবা করিতেন। কৃষ্ণলালের নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলে, কেহ রুক্ষহস্তে ফিরিয়া যাইতেন না। তজ্জন্য অনেক দূর হইতেও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাচঞা করিতে আসিতেন।

কৃষ্ণলালের দানশীলতার কথা শুনিয়া এক দিবস একজন উলার ব্রাহ্মণ

কিছু পাইবার আশায় শিকারপুরে তাঁহার নিকট প্রাতঃকালে উপস্থিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণলাল তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল এক ঠেঙ্গা-মারা প্রণাম করা ভিন্ন অন্য কোনও রূপ সমাদর কিম্বা সম্ভাষণ করিলেন না। ব্রাহ্মণ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। সে শুনিয়াছিল, যে ভুঞাজি ব্রাহ্মণ সজ্জনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার প্রতি এইরূপ বিমুখ হওয়ার কারণ কিছু বুঝিতে পারিল না। অবশেষে ব্রাহ্মণ স্নানের সময় ঐ স্থানের আর একটি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, যে কৃষ্ণলাল অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত, সেই জন্য তিনি যে ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের গলায় মালা না দেখেন, তাহাকে সমাদর করেন না। উলার বিটল ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া মনে মনে কৃষ্ণলালকে বঞ্চনা করার নিমিত্ত সুন্দর একটি কৌশল সৃষ্টি করিল। স্নান করিয়া আসিয়া কৃষ্ণলালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভেউ ভেউ করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণলাল শশব্যস্তে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ অতি কাতর ভাবে বলিল যে "ভুঞাজি তোমাকে আমার দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? আমি হরিনামের মালা জপ এবং ধারণ না করিয়া জলগ্রহণ করি না। অদ্য আমার কপাল পুড়িয়াছে, পথে মালা ছড়াটা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। আমি কি প্রকারে হরিনামের মালা না জপিয়া দিনপাত করিব, তাই ভাবিয়া রোদন করিতেছি।" ব্রাহ্মণের এই গাঢ় কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া কৃষ্ণলালের অশ্রুপতন হইতে লাগিল এবং শীঘ্র তাহাকে একছড়া তুলসীর মালা দিয়া প্রচুর রূপে আহার করাইয়া ব্রাহ্মণের আশার অতিরিক্ত দান করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ভণ্ড ব্রাহ্মণ টাকাগুলি হস্তগত করিয়া কৃষ্ণলালের বাসা বাড়ী হইতে কিছু দূরে আসিয়া গলা হইতে মালাছড়াটি টানিয়া ভুমিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিল যে "পেটের দায়ে কি না করিতে হয়? অদ্য গলায় মালাও পরিতে হইয়াছিল।" কৃষ্ণলাল এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে "বামনটা কি পাষণ্ড!"

কৃষ্ণলাল ভুঞার যেরূপ গুণকীর্ত্তন করিলাম, নীলকুঠীর এই জাতীয় অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের সেইরূপ গুণানুবাদ করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইতাম, কিন্তু তাহাদের দোষে দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল এবং সাধারণের নিকট তাহাদের দুর্নাম ভিন্ন যশ হয় নাই, এবং সেই জন্য ভদ্র মণ্ডলীতে এই জাতীয় ব্যক্তিরা "কেওট" নামে অভিহিত ছিল।

কৈবর্ত্ত মহাশয়েরা যে কেবল নীলকরের চাকর হইয়া প্রভুর স্বার্থ বর্দ্ধনের

নিমিত্ত প্রজা এবং নিকটবর্ত্তী তালুকদারের উপরে অত্যাচার করিতেন বলিয়া জন সমাজে নিন্দিত ছিলেন এমন নহে, তাঁহাদের আরও অনেক প্রকার দোষ ছিল এবং অনেক সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর বলে উচিত দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। এই সকল ব্যক্তিরা সাধারণত যে চরিত্রের মনুষ্য এবং যে নিমিত্ত তাহারা ভদ্র মণ্ডলীতে ঘৃণিত ছিল, একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই তাহার অনেকটা বুঝা যাইবে। এই দৃষ্টান্তে আরও একটি কথা প্রকাশ পাইবে। তাহা এই যে, শেষাবস্থায় নীলকর সাহেবদিগের প্রতাপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে রাজপুরুষেরাও তাঁহাদের আশঙ্কা না করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না।

এক দিবস কৃষ্ণ নগরের মাজিষ্ট্রেট এলিয়ট সাহেব ডাকাতি নিবারণের কমিসনর ওয়ার্ড সাহেবকে লইয়া একখানি বগি গাড়িতে কৃষ্ণ নগরের কোতওয়ালী থানাতে আসিয়া আমাকে ঐ গাড়ির উপর তুলিয়া লইলেন এবং ঐ সহরের কোম্পানির বাগান নামক এক জন শূন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া অবতরণ করিলেন এবং গাড়ী সহিসের নিকট রাখিয়া বাগানের প্রান্ত ভাগে এক নির্জ্জন স্থান দেখিয়া তথায় গমন করিলেন। সাহেব দ্বয়ের এই রূপ সাবধানের কার্য্য দেখিয়া আমার মনে মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হইল এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবও আমাকে বলিলেন যে "আমরা তোমাকে এই গোপন স্থানে খুন করিতে আনিয়াছি, তুমি তোমার ঈশ্বরের নাম লও।" ওয়ার্ড সাহেব এলিয়ট সাহেবের এই কথা শুনিয়া পাছে আমি সত্য সত্যই ভয় পাই এই আশঙ্কায় আমাকে তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দিয়া বলিলেন "না দারোগা এলিয়ট কৌতুক করিতেছেন, আমি তোমাকে একটি অতি গোপনীয় কথা বলিব বলিয়া এই নির্জন স্থানে আনিয়াছি তুমি আমার সঙ্গে আইস।" বলিয়া একটা বৃহৎ শিমূল বৃক্ষের মূলের উপরে উপবিষ্ট হইয়া আমাকেও তাঁহার পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রহরী স্বরূপে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কমিসনর। দারোগা তুমি মহতপুরের বৈকুণ্ঠনাথ মজুমদারকে জান?

দারোগা। আমি তাহার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও দেখি নাই?

কমিসনর। সে কেমন লোক বলিয়া তুমি জান?

দারোগা। শুনিয়াছি নীলকর পেট্রিক স্মিথ সাহেবের দেওয়ান এবং বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী।

কমিসনর। তাহার কখনও চুর ডাকাতির অপবাদ শুনিয়াছ ?

দারোগা। না সাহেব! কিন্তু নীলকর সাহেবের স্বার্থের জন্য প্রজার পীড়ন করে বলিয়া শুনিয়াছি।

কমিসনর। আমি হুকুম দিলে তুমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস কর ?

দারোগা। আমার এই কার্য্য, কেন পারিব না ?

কমিসনর। তুমি কাঁচা লোকের ন্যায় কথা কহিতেছ। বৈকুণ্ঠ যে কত বড় দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি তাহা তুমি জান না বলিয়া এই রূপ সাহস করিতেছ। বিশেষ সে তোমার থানার এলাকায় বাস করে না, ভিন্ন এলাকার বাস করে।

দারোগা। আমি বহু লোক সঙ্গে লইয়া গেলেও কি ধরিতে পারিব না ?

কমিসনর। না পারিবে না। কারণ ঐ অঞ্চল সমুদয়ই নীলকর সাহেবের অধিকার; তাহাতে কেহই বৈকুণ্ঠের বিরুদ্ধে তোমার সহায়তা করিবে না। বিশেষ একবার যদি বৈকুণ্ঠ জানিতে পারে যে তাহার গ্রেপ্তারির জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে এ জন্মে তাহাকে ধরা কঠিন হইবে। সেই জন্য আমি তোমাকে এই নির্জ্জন স্থানে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। বৈকুণ্ঠকে ধরিবার কোন উপায় করার নিমিত্ত আমি কৃষ্ণনগর আসিয়াছি। এলিয়ট সাহেব বলেন, যে তুমি অনেক কৌশল জান, মনে করিলে নিঝঞ্ঝাটে তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবে; পারিলে আমি তোমার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব।

ডাকাতি নিবারণের কমিসনর সাহেবের কথা শুনিয়া আমার মনে একটা কথার উদয় হইল; সাহেবকে বলিলাম যে "যদি আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি না করেন, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিয়া দিব।"

সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার জেবের মধ্য হইতে এক খানা ইংরাজি পরওানা বাহির করিয়া আমার হস্তে দিয়া কহিলেন "তুমি যত কাল ইচ্ছা লও, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমি যেন তাহাকে শেষে পাইতে পারি। তাহাকে পাইলে আমার অনেক উপকার হইবে।"

দারোগা। বৈকুণ্ঠ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, যে আপনি তাহাকে ধরিতে এত ব্যগ্র হইয়াছেন।

কমিসনর। বৈকুণ্ঠ এক জন প্রধান ডাকাত, এই কথা বোধ হয় তুমি

নূতন শুনিলে, কিন্তু আমি উপর্য্যুপরি প্রমাণ পাইয়াছি যে, সে ডাকাতের সর্দ্দার; তাহার পাল্লায় অনেক লোক আছে; তাহাদের দ্বারা সে ডাকাতি করে, এবং ডাকাতি করিয়া, সে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে।

দারোগা। নীলকর সাহেব কি তাহার এ চরিত্রের কথা জানেন না?

কমিসনর। জানেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু শুনিয়াছি যে কুঠীর লোকের দ্বারাই বৈকুণ্ঠ ডাকাতি করে। কিন্তু ইহাও আমি অবগত আছি যে, কুঠীর সাহেব বৈকুণ্ঠকে খুব বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন এবং কুঠীর ও কুঠী সংক্রান্ত সমস্ত জমিদারীর তত্ত্বাবধারণের ভার বৈকুণ্ঠর হস্তে অর্পিত আছে।

কতক্ষণ পরে সাহেবেরা আমাকে থানায় পৌছাইয়া দিলেন। তাহার পরে আমি অনুসন্ধানে জানিলাম যে বৈকুণ্ঠ খুব ধনাঢ্য ব্যক্তি, জমি জমা, গোলাবাড়ি ও নগদ টাকার কারবার আছে। কৃষ্ণনগরের হরিনাথ কুমারের বেড় নামক পল্লীতে তাহার এক সুন্দর বাসাবাড়ীও ছিল। সাধারণের নিকট সে এক জন ভদ্র ও বিশিষ্ট লোক বলিয়া পরিচিত। এবং অতি অল্প লোকেই তাহার দস্যু বৃত্তির কথা জানিত। কেবল ইতর লোকে অর্থাৎ যাঁহারা ঐ কর্ম্মের কর্ম্মী এবং তাহার অধীনে নিজে কিম্বা যাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা ঐ সকল দুষ্কার্য্যের সঙ্গী ছিল, তাহারাই, বৈকুণ্ঠের দোষের সংবাদ জানিত। আমার সংসারে এক জন গোয়ালা চাকর ছিল, সে বৈকুণ্ঠের প্রতিবাসী এবং পূর্ব্বে তাহার চাকরিও করিত। এই ব্যক্তির নিকট আমি বৈকুণ্ঠের অনেক কাহিনী শুনিলাম; তন্মধ্যে একটি আমি বিবৃত করিব। বৈকুণ্ঠের বাড়ী খড়িয়া নদীর নিকট। একবার উত্তর-অঞ্চলের এক খানি চাউল বোঝাই নৌকার ব্যাপারীর নিকট বৈকুণ্ঠ ৭০০ টাকার চাউল কিনিয়া তাহাকে এমন সময় নগদ টাকা বুঝাইয়া দিল, যে ব্যাপারী সেই দিবস নৌকা খুলিয়া কিছুতেই কৃষ্ণনগরের কুতঘাটে আসিয়া পৌছিতে পারে না। কাজেই পথের মধ্যে এক স্থানে নৌকা লাগাইয়া ছিল। রাত্রিকালে বৈকুণ্ঠ তথায় অধীনস্থ কয়েক ব্যক্তি ডাকাতকে পাঠাইয়া ব্যাপারীর নৌকা হইতে ঐ টাকা এবং আরও যে কিছু টাকা পাইল, লুঠিয়া লইয়া গেল। আমি যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, ততই বৈকুণ্ঠের দোষ জানিতে পারিলাম।

এইরূপে ৪। ৫ মাস গত হইল, কিন্তু আমার প্রত্যাশিত সুযোগ উপস্থিত হইল না। ওয়ার্ড সাহেবও হুগলী হইতে আমাকে লিখিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে আরও কিছু কালের নিমিত্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলাম।

কৃষ্ণনগরের কোতওয়ালি থানার হাতার উত্তর পার্শ্বে, একটি ছোট পুষ্করিণী আছে, তাহাতে পল্লীস্থ অনেক স্ত্রীপুরুষে স্নান করিত। এক দিবস স্নানের সময় এই পুষ্করিণীর ঘাটে বামা নাম্নী একটি বারাঙ্গনাকে দেখিতে পাইয়া, আমার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলাম। সেই সুযোগ এই যে, আমি জানিতাম, যে বামা বৈকুণ্ঠের উপপত্নী এবং বৈকুণ্ঠ বামাকে লইয়া গিয়া তাহার নিজ বাড়ীতে রাখিয়াছে। বৈকুণ্ঠ যখন যে স্থানে যায়, বামাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণনগর আসিলে. বামা তাহার সঙ্গে আসিয়া থানার নিকটে তাহার বৃদ্ধ পিতামহীকে দেখিতে আসে। অদ্য বামাকে ঘাটে দেখিয়া নিঃসন্দেহ বিবেচনা করিলাম, যে সর্পের লাঙ্গুল যে থানে, সর্পও সেই স্থানে অবশ্য আছে। আমি বৈকুণ্ঠ বামা ঘটিত সম্বন্ধ অবগত থাকাতেই, ডাকাতি নিবারণের কমিসনর সাহেবকে সাহস করিয়া বলিয়াছিলাম, যে নির্ঝঞ্চাটে আমি তাহাকে কিছু কাল বিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া দিতে পারিব।

আমি কয়েক জন বরকন্দাজ সঙ্গে করিয়া বৈকুণ্ঠের বাঁসার নিকট গিয়া দেখিলাম, যে সে তখন অশ্বারোহণে খড়িয়া নদী হইতে স্নান করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিতেছে। সে ঘোড়া হইতে উত্তরণ করত বাসা বাড়ীতে প্রবেশ করিবা মাত্রই আমি তাহাকে ডাকাতি নিবারণের কমিশনরের পরওয়ানা দেখাইয়া গ্রেপ্তার করিলাম এবং তাহার বাসার লোকে জ্ঞাত হওয়ার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে থানায় লইয়া আসিলাম। এদিকে এলিয়ট সাহেবকে এই সংবাদ দেওয়া মাত্রই তিনি জেলখানা হইতে ২৫ জন ও আমার থানা হইতে ১৫ জন বরকন্দাজের ও দুইজন জমাদারের হেফাজতে বৈকুণ্ঠকে অবিলম্বে শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিতে লিখিলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠকে যে স্থানে প্রেরণ করা হইল, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে তিনি আমাকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। বৈকুণ্ঠকে চালান করার কিয়ৎকাল পরেই নীলকর পেট্রিক স্মিথ সাহেব থানায় আসিয়া বৈকুণ্ঠের তত্ত্ব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, যে আমি তাহাকে অন্যায় করিয়া গ্রেপ্তার

করিয়াছি এবং তিনি তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণে জামিন দিতে প্রস্তুত আছেন। বৈকুণ্ঠ জেলখানায় আছে বলিয়া আমি সাহেবকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিয়া দিলাম। সাহেব শশব্যস্তে জেলখানায় গেলেন, পুনরায় আমার নিকট আসিলেন এবং অবশেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে শুনিলাম, যে ১০। ১২ জন লোক দৌড়িয়া যাইয়া দিগনগর গ্রামের নিকট শান্তিপুরের রাস্তার উপরে বৈকুণ্ঠকে ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বরকন্দাজেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিছু কাল হুগলীতে ডাকাতি নিবারণের কমিশনরের গারদে থাকার পর, আলিপুরের সেসন জজের আদালতে বৈকুণ্ঠের বিচার হয়। তাহাতে বৈকুণ্ঠ একজন বারিষ্টার সাহেব আনাইয়া খালাসের চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞা হয়।

নীলকরের গোমাস্তাদিগের মধ্যে এমন আর কত বৈকুণ্ঠ মজুমদার ছিল, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু সে যাহা হউক, সকলের উপরে নীলকরের ভয়ে আমাদের রাজপুরুষেরাও যে সশঙ্কিত থাকিতেন, ইহাই তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইতর লোকের বিশ্বাসেও নীলকর সাহেবদিগের প্রতাপ যে কেমন অখণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত ছিল, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তেই প্রকাশ পাইবে। আমি ১৮৬৫ সালে ঢাকা হইতে মাণিকগঞ্জের পথে নৌকাযোগে কুষ্টিয়া যাইতে ছিলাম। সাবাড়ের পশ্চিমে একস্থানে, ধলেশ্বরী নদীর উত্তর ধারে কয়েকটা বৃহৎ কুম্ভীর শুইয়া রহিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ ধারে এক ঘাটে বহুলোক অনায়াসে স্নান করিতেছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটি পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে পর পারে কুম্ভীর দেখিয়াও তাহারা কিরূপে নিঃশঙ্কচিত্তে স্নান করিতেছে? তাহাতে সে উত্তর করিল, "ইহা নীলকর ওয়াইজ সাহেবের মাটী, কুমীর বেটারা তাঁহাকে ভয় করে"!

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেবের আমলেই নীলকরদিগের গৌরব চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তিনি নিশ্চিন্তপুর কনসরণের মানেজর ফরলং সাহেবের ন্যায় দুই তিন জন প্রধান নীলকর সাহেবকে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সম্মানিত করেন। আমাদের দেশীয় জমিদারের মধ্যে কেহ গবর্ণমেণ্টের

নিকট রাজা উপাধি পাইলে, যেমন তাঁহার পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিই নিজে নিজে কেহ রাজা, কেহ কুমার, কেহ রাণী ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব কিম্বা অধীনস্থ লোকে ঐরূপে তাঁহাদের সম্ভাষণ না করিলে অসন্তুষ্ট হন, সেইরূপ নীলকরের মধ্যে দুই তিন জন নীলকর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছে দেখিয়া সকল নীলকর সাহেবেই নিজে নিজে মাজিষ্ট্রেট হইয়া কুঠীতে কাছারি খুলিতে লাগিলেন। কুঠীর এক কামরায় প্রকাশ্যরূপে নীলকরের এই সকল আজখোদ কাছারি হইত। গবর্ণমেণ্টের আদালত ফৌজদারী কাছারীর ন্যায় ইহাতেও সাজসজ্জা থাকিত। ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, আমলা, হাকিম ও দর্শকের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ কাছারি বসিত এবং ভাঙ্গিত। কুঠীর সাহেব, -বিচারক; কুঠীর দেওয়ান গোমাস্তা,—আদালতের সেরেস্তাদার, পেস্কার প্রভৃতির ন্যায় আমলা; আর প্রত্যেক মোকদ্দমায় পৃথক্ নথী লিখিত পঠিত হইত। দোষী ব্যক্তিকে কেবল অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত এমন নহে, শারীরিক শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। এই সকল কাছারির আনুসঙ্গিক, কুঠীতে গারদ এবং জেলখানা ছিল এবং তাহাতে নীলকরের হুকুম মতে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে কয়েদ থাকিতে হইত। দরিদ্র প্রজা—যাহার নিকট আদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহাদের প্রতি শারীরিক শাস্তির হুকুম হইত। গবর্ণমেণ্টের আদালতে বেত্রাঘাত দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়, কিন্তু নীলকরের আদালতে এই শাস্তির জন্য নূতন যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং কোনও কুঠীতে শ্যামচাঁদ ও কোনও কুঠীতে রামচাঁদ ইত্যাদি নামে এই যন্ত্রের উল্লেখ করা হইত। বিচারক হুকুম দেওয়ার সময় এইরূপ উক্তি করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতেন, "অমুক আসামি তাহার অপরাধের জন্য দশ কি বিশ ঘা শ্যামচাঁদ কি রামচাঁদ খায়।" এই অস্ত্রটির গঠন সকল কুঠীতে এক রকম ছিল না। কুঠী বিশেষে এবং নীলকর কিম্বা দেওয়ানজির দয়ার তারতম্য অনুসারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত। কোনও স্থানে একটা লাঠির অগ্রভাগে এক হাত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ হাত প্রস্থ খুব শক্ত এবং মোটা চর্ম্মের এক খানা হাতা, এবং কোনও স্থানে হাতার পরিবর্ত্তে অগ্রভাগে গ্রন্থিযুক্ত কয়েক ছড়া চর্ম্মের রজ্জু বান্ধা থাকিত। ইহার এক আঘাতে গবর্ণমেণ্টের আদালতের বেতের বহু আঘাতের ফল হইত। দশ ঘা বেত খাইলে

মনুষ্যের যে কষ্ট না হইত, শ্যামচাঁদ রামচাঁদের এক ঘায়ে তাহার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। শ্যামচাঁদ নামক এইরূপ এক অস্ত্র ইণ্ডিগো কমিশন সাহেবদিগের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্টের কারাগারে কয়েদিরা যেমন করিয়া হউক, প্রত্যহ দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার করিতে পায়। কিন্তু কুঠীর গারদে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ ছিল। দেওয়ানজির এবং তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের দয়ার এবং তত্ত্বাবধারণের উপর কয়েদিদিগের আহার নির্ভর করিত; তাহাতে হতভাগাদিগের যত সুচারু আহার ঘটিত, তাহা সকলে বুঝিতে পারেন। কয়েদীদিগের কপালে আর এক কষ্ট ছিল। নীলকরেরা কোনও ব্যক্তিকে কয়েদ করিলে তাহার বন্ধু বান্ধবেরা তাহাকে মুক্ত করার জন্য পুলিসে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিত। পাছে পুলিস আমলারা কয়েদী ব্যক্তিকে ধরিতে পায়, সেই জন্য তাহাকে এক কুঠী হইতে অন্য কুঠীতে চালান করা হইত এবং অনেক সময়, দীর্ঘ কাল ধরিয়া তাহার এই রূপ স্থান পবিবর্ত্তনে বিশেষ রাত্রি কালে কুঠীর প্রহরীদিগের সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইত বলিয়া, তাহার আহার করা দূরে থাকুক, কিছু কাল এক স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করারও অবকাশ হইত না। কুঠী কুঠী চালান করার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব।

আমি কোন এক বিশেষ কার্য্যে হার্দ্দি থানায় প্রেরিত হইয়াছিলাম। হার্দ্দির এলাকার মধ্য দিয়া পাঙ্গাসিয়া নদী বহমান এবং সেই নদী দিয়া মোরঙ্গ হইতে শাল কাষ্ঠের মাড় লইয়া অনেক ব্যাপারী কলিকাতাভিমুখে যাইত। পাঙ্গাসিয়া নদীর নিকটে বামনদী কুঠী স্থাপিত ছিল এবং তাহার মানেজর ট্রিপ সাহেবের শাল কাষ্ঠের প্রয়োজন হওয়াতে একটা মাড় আটক করিয়া সুলভ মূল্যে তাহা লইতে চেষ্টা করেন। ব্যাপারীর গোমাস্তা তাহাতে অসম্মত হওয়াতে ট্রিপ সাহেব বলপূর্ব্বক কাষ্ঠ সমস্ত তীরে উঠাইয়া ব্যাপারীর ঐ গোমাস্তাকে কয়েদ করেন। তাহার সঙ্গী লোকেরা কৃষ্ণনগর যাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কয়েদ খালাসীর দরখাস্ত করে। বামনদী হইতে কৃষ্ণনগর প্রায় ত্রিশ ক্রোশ ব্যবধান। সেই সময় এক জন আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, তাঁহার নাম আমার এক্ষণে স্মরণ নাই, শিকারপুর অঞ্চলে মোতায়েন ছিলেন। বড় মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে এবং হার্দ্দিতে আমাকে, বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে নীলকরের

হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওনা পাইয়া আমি বামনদী যাইয়া ট্রিপ্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করাতে, সাহেব এবং তাঁহার দেওয়ান কুঠীর সমস্ত বাড়ি, ঘর, কামরা, গুদাম, জাত ঘর প্রভৃতিতে লইয়া গিয়া দেখাইলেন, যে তাহার কোনও স্থানে কোনও ব্যক্তি কয়েদ নাই। ঐ ব্যক্তিকে ইত্যগ্রেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, সুতরাং সাহেব এবং তাঁহার কর্ম্মচারী নিঃশঙ্ক চিত্তে কুঠীর এলাকার সমস্ত স্থান আমাকে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি থানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঠীক সংবাদ পাইলাম যে ট্রিপ সাহেব ঐ হতভাগাকে বামনদী হইতে অনেক দূর পূর্ব্ব দিকে কুষ্টিয়ার নিকট পল্‌তা কি সিমলা—আমার ঠিক স্মরণ নাই—নামক একটি ছোট কুঠীতে অনেক প্রহরী দিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, এবং দুই চারি দিবসের মধ্যে পদ্মাপার করিয়া রাজসাহী জেলায় লইয়া যাইবে। আমি তৎক্ষণাৎ দিন এবং সময় নির্ব্বাচন করিয়া সেই স্থানে যাইতে এবং আমিও সেই স্থানে ঐ সময় উপস্থিত হইব বলিয়া—আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে শিকারপুরে লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহার পর দিবস বৈকালে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের প্রধান আমলা প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থানায় পৌছিয়া আমাকে জানাইলেন যে সেই রাত্রেই সাহেব সেই কুঠীতে যাইবেন এবং আমাকে তথায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। সাহেব এবং বাঙ্গালিতে কত প্রভেদ, তাহা এই স্থানেই প্রকাশ পাইবে। আমরা দুই জন পালকিতে পরিচিত লোক সমভিব্যাহারে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়াও নিরূপিত স্থানে পৌছিতে পারিলাম না। সেই কুঠীর দুই তিন ক্রোশ ব্যবধান সদরপুর গ্রামে আমাদের প্রভাত হইল। এমন সময় দেখিলাম যে স্বয়ং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট অশ্ব পৃষ্ঠে, পশ্চাতে পশ্চাতে একটি মলিন বস্ত্রধারী পশ্চিম দেশীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া সেই সদরপুর বাজারে আমাদের নিকট পৌছিলেন এবং আমাদের দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "দেখ, আমি সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছি।" তাঁহার নিকট শুনিলাম যে তিনি করিমপুর হইতে একাকী অশ্ব পৃষ্ঠে বাহির হইয়া পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, পলতার কুঠীতে পৌছিয়া প্রহরীদিগের নিকট তিনি ছোট সাহেব বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তাহারা কুঠীর ছোট সাহেব মনে করিয়া কুঠী খুলিয়া দেয় এবং কয়েদি ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করে। কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতে তিনি উহাকে অন্য কুঠিতে লইয়া যাইবেন বলিয়া

সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বিশ্বাস, যে কুঠীর লোকেরা তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেট বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তিনি এত সহজে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিতেন না। এই মোকদ্দমায় অবশেষে ট্রিপ্ সাহেবের শাস্তি - কিছু অর্থ দণ্ড মাত্র—হইয়াছিল। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, ঐরূপ তৎপরতায় এবং কৌশলের সহিত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে না পারিলে, তাহাকে আরও অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইত এবং কে বলিতে পারে যে, সে পুনরায় প্রাণ লইয়া তাহার বাড়ী প্রত্যাগমন করিতে পারিত?

এই রূপে কত শত লোক কুঠী কুঠী চালান হইয়া শেষে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। শেষ নিরুদ্দেশের দৃষ্টান্ত হাঁসখালির গোবিন্দপুরের গোপাল তরফদার। সেই ব্যক্তি তাহার গ্রামের প্রজাবর্গের সাহায্যে কুঠীর বিরুদ্ধাচরণ করাতে, এক দিবস রাত্রে একটা হস্তী সমেত কয়েক জন অস্ত্রধারী লোক গোবিন্দপুর গ্রাম আক্রমণ করিয়া দীন দরিদ্র চাষী প্রজা-দিগের যথা সর্ব্বস্ব লুঠ পাট এবং অপচয় করে এবং অবশেষে গোপাল তরফ-দারকে যৎপরোনাস্তি বে-ইজ্জৎ করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হন, সেই আর এস টটেনহাম সাহেব তখন কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি আমাদিগকে লইয়া গোপালের অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে শুনিলাম, যে ধরিবার সময় গোপাল তরফদারকে আঘাত করিয়া ধরা হইয়াছিল এবং সেই অবস্থায় তাহাকে নানা স্থানে চালান করাতে, সেই ক্লেশে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার মৃতদেহ তাহার বন্ধু বান্ধবের হস্তে পড়িতে না পারে, সেই জন্য তাহা নীলের গিঠির দ্বারা জ্বালাইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলা হয়।

কিন্তু গোপাল তরফদারের মৃত্যুই নীলকরের কাল হইল। এ দিকেও বোধ হয় তাহাদের পাপের চারি পোয়া পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। গোপাল মরিয়া যেন কৃষ্ণনগর এবং যশোহর জেলার সমুদয় প্রজাকে খেপা-ইয়া তুলিল। নীলকরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব দাবানলের ন্যায় হুহু করিয়া সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া জ্বলিয়া উঠিল। "মোরা আর নীল করবো না" বলিয়া প্রজারা যে সুর ধরিল, তাহা আর কেহ নিরস্ত করিতে পারিল না। ধন্য প্রজার প্রতিজ্ঞা। নীলকর সাহেবদিগের এত দর্প, এত ক্ষমতা, এত ধন,—সকলই প্রজার প্রতিজ্ঞার সম্মুখে জলের মধ্যে মৃণ্ময় প্রতিমার ন্যায় গলিয়া গেল। যে সাহেবদিগের ইঙ্গিতে শত সহস্র লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা আসিয়া

একত্রিত হইত, তাঁহারাই প্রজাদিগের ভয়ে কম্পিত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলার স্থানে স্থানে অশ্বারোহী সেনা আনিয়া স্থাপিত করিতে প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টও নীলকরের সাহায্যার্থ এই সময় এক বিশেষ আইন প্রকটন করিলেন যে,—যে সকল প্রজারা নীল করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা নীল না করিলে কারারুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহাতেও প্রজারা ভয় পাইল না। বলিহারী—প্রজাদিগের একতা এবং সাহস। তাহারা এক স্বরে বলিল যে জেলখানায় যাওয়া তুচ্ছ কথা, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ফাঁসি দিতে চাহিলেও তাহারা গলা বাড়াইয়া দিবে "তবু মোরা নীল করবো না।" বাস্তবিক তাহারা দলে দলে জেলখানায় যাইতে লাগিল। এই কার্য্যে কৃষীবর্গের এমন উৎসাহ হইয়াছিল যে, যে তাহা দেখিয়াছে, সে আর এ জন্মে তাহা ভুলিতে পারিবে না। চাপরাসী বরকন্দাজেরা দামুরহুদা প্রভৃতি স্থান হইতে যখন প্রজাদিগকে জেলখানায় লইয়া যাইত, তখন পথের সকল গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা খাদ্য সামগ্রী হস্তে লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং চাপরাসীদিগকে কোনও স্থানে কাকুতি মিনতি করিয়া এবং কোনও স্থানে ঘুস দিয়া বন্দী প্রজাদিগকে খাওয়াইত এবং ধন্যবাদের সহিত উৎসাহের বাক্য প্রয়োগ করতে করিতে কতক দূর তাহাদিগের সঙ্গে যাইত। এক দিকে যথার্থ ধর্ম্মাবতার দেশের সেই সময়ের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সর জন পিটার গ্রাণ্ট সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে প্রজা এবং নীলকরের মধ্যে তিনি অপক্ষপাতরূপে বিচার করিবেন, আর এক দিকে সুপণ্ডিত দেশ হিতৈষী দয়ার সাগর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদ পত্রে সপ্তাহে সপ্তাহে গরিব প্রজাদিগের দুঃখের কাহিনী প্রচার করিয়া দেশ শুদ্ধ লোককে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলের উপরে স্বয়ং প্রজাদিগের সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং প্রতিজ্ঞাই প্রবলশক্তি হইয়া উঠিল। ঐ ত্রিবিধ অস্ত্রে প্রজাদিগের চিরশত্রু সংহারিত হইল। সেই পর্য্যন্ত নীলের চাষ উঠিয়া গেল এবং সাহেবেরা জাল গুটাইয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ করিয়া ইট কাঠ বিক্রয় হইয়া গেল এবং কুঠির হাউজ প্রভৃতিতে শৃগাল কুকুরের বাসস্থান ও জঙ্গল হইয়া পড়িল। সে ঐশ্বর্য্য এবং বিক্রম এখন কোথায়? সে রাবণও নাই, সেই লঙ্কাও নাই।

পুরাতন দিল্লী।

পুরাণা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, আমরা প্রথমেই সর্ব্বজনারাধ্যা যোগমায়া দেবীকে দর্শন করি। একখানি প্রস্তর খণ্ড যোগমায়া বলিয়া আরাধ্যা। পাণ্ডারা কহিল ইহা পৃথ্বীরাজের স্থাপিতা এবং তাঁহার আরাধ্যা দেবতা। পাণ্ডাদের এই কথা আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। পৃথ্বীরাজের ঠাকুর বাড়ী ভিন্ন স্থানে ছিল, মোসলমানেরা তাহা নষ্ট করিয়াছে; আর হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষী মোসলমানেরা এই যোগমায়াকে আস্ত রাখিবে, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? মন্দিরের নূতনত্ব দৃষ্টে আমরা পাণ্ডাদিগকে বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, ২০০ বৎসর হইল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে পূজা, অর্চ্চনা, ভোগ রাগের কোন ব্যবস্থা দেখিলাম না, কেবল ঘণ্টা বাজানই সার, (১) আর পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্য; কিন্তু দুই কি চারি আনা দিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। আমরা যোগমায়াকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়া ও ঘণ্টা বাজাইয়া যোগমায়ার বাটী হইতে বহির্গত হইলাম, এবং পাণ্ডাকেও কিছু দিলাম।

দিল্লীতে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি আছে, লৌহ স্তম্ভ তন্মধ্যে প্রাচীন এবং চমৎকার। কুতবল এস্লাম্ মস্জিদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে উক্ত লৌহ স্তম্ভ এখন দেখিতে পাই, যখন লৌহ স্তম্ভ স্থাপিত হয় তখন কুতবল এস্লাম কি উহার প্রাঙ্গন ছিল না। স্তম্ভ স্থাপন স্থানের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা প্রকাশ নাই। অবশ্যই রাজধানীর নিকটে কোন প্রকাশ্য স্থানে স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, কোন প্রাঙ্গনে স্থাপিত হয় নাই। স্তম্ভটি গোলাকার; ১৬ ইঞ্চি ব্যাস; স্তম্ভটি কেবল মাত্র লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত নহে, অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত আছে। মৃত্তিকার উপরে ২২ ফিট দণ্ডায়মান। কনিংহাম্ সাহেব স্তম্ভ মূল খনন করিয়াছিলেন, তিনি অনুমান করেন উহা ৬০ ফিট লম্বা, মৃত্তিকাভ্যন্তরে ৩৮ ফিট প্রোথিত আছে। স্তম্ভ গাত্রে গুপ্ত রাজাদের সময়ের চলিত নাগরাক্ষরে ছয় পংক্তিতে তিনটি কবিতা লিখিত আছে;—যথা।

---

(১) যোগমায়ার মন্দিরের বারেন্দাতে একখানি কাষ্ঠফলকে চতুষ্কোণাকারে ৮৪টি ঘণ্টা ঝুলান আছে, দর্শকেরা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আসিবার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন, এক কালে ৮৪টি ঘণ্টার বাদ্য হয়।

যেনাদ্বর্গবতঃ (১) প্রতীক মুদিতান্ শত্রূন্ সমেত্যাগতাং
বঙ্গেষ্বাহব বর্ত্তিনো বিলিখিতং খড়্গেন কীর্ত্তের্ভুজং।
তীর্ত্বা সপ্ত মুখাধিপেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতাবাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধি বাস্যতে জলনিধি র্ব্বীর্য্যান্বিতৈর্দ্দক্ষিণঃ॥

সিংহস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতে র্গামাশ্রিত স্যোত্তরাং
মূর্ত্ত্যাকর্ম্মচিতাঘ নিধৃতবতঃ কীর্ত্ত্যাস্থিতস্য ক্ষিতৌ।
শান্তস্যেব মহাবলে কৃত ভূজে যস্য প্রতাপো মহা-
ন্নাদ্যাপ্যুৎ সৃজাতি প্রণাশিত রিপোর্যত্নস্য লেশঃ ক্ষিতি

প্রাপ্তেন স্বভুজার্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধি রাজ্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রার্কেণ সমগ্র চন্দ্র সদৃশীং বক্তৃশ্রিয়ং বিপ্রতা।
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ধাবেন বিষ্ণৌমতিং
প্রাংশু র্বিষ্ণুপদে শিরো ভগবতো বিষ্ণোর্ভুজঃ স্থাপিতঃ

ঐ তিনটী শ্লোকের ভাবার্থ এই। ধাবনামা জনৈক রাজা যাঁহার ক্ষতমা দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তিনি প্রতীক দেশবাসী শত্রু-দিগকে সমরে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে এবং সিন্ধু দেশস্থ বাহ্লিকদিগকে জয় করিয়া, এবং নিজ ভূজার্পিত রাজ্য লাভ করিয়া, বিষ্ণু বিষয়ে মতি রাখিয়া এবং বিষ্ণুপদে শির নিহিত করিয়া, বিষ্ণু ভুজ নামে এই বিশাল স্তম্ভ স্থাপন করিলেন।

ধাব কোন বংশীয় রাজা, কোন সময়ে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করেন, এবং কোথা হইতে আসিলেন, ইহার কিছুই স্তম্ভ লিপিতে প্রকাশ নাই। স্তম্ভ স্থাপয়িতা হয় ত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার মত বিখ্যাত জেতার পরিচয় সকলেই জানে এবং জানিবে, আর অতিরিক্ত বর্ণনার কি প্রয়োজন? কিন্তু দেখা যাইতেছে, কালের অসীম ক্ষমতা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ইতিহাস পুস্তকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজগণের শ্রেণীতে ধাবের বর্ণনা নাই। যদি লৌহ স্তম্ভ লিপি না থাকিত, তাহা হইলে ধাবকে কে জানিত? "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই কথা

(১) প্রাচীন সময়ে হ্রস্ব উ কোন ব্যঞ্জনবর্ণে যোগ হইলে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকার প্রায় লিখিত হইত,—যথা দ্ব বর্ত্তমান কালে দ্রু। ক্ব বর্ত্তমানে কু ইত্যাদি। অতএব "যেনাদ্বর্গবতঃ" পাঠ না হইয়া "যেনাদুর্গবতঃ" পাঠ হইতে পারে।

এখানে সফল হইয়াছে। এই স্তম্ভে, স্তম্ভ স্থাপনের পরবর্ত্তী কালে বহু বিজক অঙ্কিত হইয়াছে। ১১০৯ সম্বতে অনঙ্গ পাল কর্ত্তৃক যে বিজক অঙ্কিত হয়, তাহা পাঠে জানা যায়, ১১০৯ সম্বতে অনঙ্গ পাল পুরাতন দিল্লীতে প্রজা বসতি করান। কোন্ সময়ে স্তম্ভ স্থাপন হয়, স্তম্ভ গাত্রাঙ্কিত শ্লোকে তাহার উল্লেখ নাই। স্তম্ভাঙ্কিত বিজকের অক্ষর, গুপ্ত রাজাদের সময়ের চলিত অক্ষরের সদৃশ এবং বাহ্লিক জয়, ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা বিবেচনা করিয়া, পুরাবৃত্ত-সন্ধান-কারীরা খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে স্তম্ভ স্থাপন হওয়া, অনুমান করেন; কিন্তু এসম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ নাই।

এই স্তম্ভ সম্বন্ধে দিল্লী অঞ্চলে নানাবিধ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। প্রথম প্রবাদ এই, পাণ্ডবেরা এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবাদ এই, অনঙ্গ পালের সময়ে সম্বৎ ৭৯২ অব্দে এক ক্ষুদ্র লৌহ শলাকা প্রোথিত হয়। (১) তৃতীয় প্রবাদ এই, পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক এই স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে স্তম্ভাঙ্কিত শ্লোক পাঠ হইবার পর, সমুদয় জনশ্রুতি, কল্পনা-মূলক এবং সত্য নহে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে। উক্ত স্তম্ভ বাসুকির মস্তকে স্থাপিত এবং যে পর্য্যন্ত স্তম্ভ বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত রাজ্য লোপ হইবে না, দিল্লী অঞ্চলে এ জনশ্রুতিও প্রচার ছিল। আধুনিক পর্য্যটক মেঃ আর্চ্চর প্রভৃতিও এই প্রবাদ শুনিয়াছেন।

অনঙ্গপাল যমুনাতীর হইতে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানী পুরাতন দিল্লীতে আনিয়া প্রজা বসতি করান, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তদতিরিক্ত তিনি লালকোট নামে দুর্গ নির্ম্মাণ এবং অনঙ্গ তাল নামে পুষ্করিণী খনন করান। লাল কোট দুর্গ ধূসর বর্ণের প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত; দুর্গের পরিধি ২॥০ মাইল; দুর্গের প্রাচীর ৩০ ফিট পরিসর, এবং দুর্গ রক্ষার্থ মৃত্তিকা নির্ম্মিত বহিঃ প্রাচীর (Rampart) ৬০ ফুট উচ্চ; এই দুর্গ দেখিলেই একাদশ শতাব্দীতে

---

(১) খড়্গারায় ভাটের কথা এই,—ব্যাস কর্ত্তৃক তুয়ার রাজা ২৫ অঙ্গুলী লম্বা এক লৌহ পেরেক প্রাপ্ত হন, তখন ব্যাস কহিয়াছিলেন—

তোমছে রাজ কদি জায়েগা নেহি
ইহ খুন্তি বাসুকি কি মাথমে গাড়ি হেয়।

তাহার পর ব্যাস প্রস্থান করিলে, বলবান্ দেব তুয়ার উহা উঠাইয়া দেখেন।

বলবান্‌দেব খুন্তি উখরায়া দেখি
তব লোহ * * * * নেকালি।

রাজপুত্রদিগের দুর্গ নির্ম্মাণের কৌশল ও সামরিক অভিজ্ঞতা প্রতীয়মান হয়। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ৮ বৎসরে লালকোট দুর্গ নির্ম্মাণ সমাধা হইয়াছিল নিম্ন লিখিত বিজক এখনও বিদ্যমান আছে যথা—

সম্বত ১১১৭। দিল্লীকা কোট করায়া
লালকোট কহায়া।

কুতব মিনারের পশ্চিমোত্তর এক পোয়া মাইল দূরে অনঙ্গ তাল। অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছে বলিয়া অনঙ্গ তাল নাম হইয়াছে, অনঙ্গ তাল বৃহৎ পুষ্করিণী নহে, সামান্য জলাশয়; বাঙ্গলাতে সচরাচর, ইহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ পরিমিত পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে। দিল্লীর মৃত্তিকা প্রস্তর মিশ্রিত বলিয়া, এতাদৃশ ক্ষুদ্র পুষ্করিণীও দেখিতে ইচ্ছা হয়; বিশেষত প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিলে মনে আনন্দ জন্মে। অনঙ্গ তাল উত্তর দক্ষিণে ৮৫ হাত লম্বা। পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭৬ হাত প্রশস্ত। এখন শুষ্ক; খনন সময় হইতে ৩০০।৩৫০ বৎসর পরে শুষ্ক হইয়াছে।

পৃথ্বীরাজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদে ব্যস্ত থাকিতেন; মাতৃস্বসা পুত্র, নিকট বাসী রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর তাঁহার প্রধান শত্রু-ছিল। তাহার পর, মোসলমানগণের ভাবি আক্রমণ তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল; ইহাতেই তিনি লালকোট দুর্গ লইয়া একটি বৃহদ্দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহা ৪ মাইল বিস্তৃত, এবং দুর্গ নির্ম্মাণ কারয়িতার নামানুসারে উহা রায়পিথোরা, নামে আখ্যাত। সুপ্রসিদ্ধ লালকোট দুর্গ রায় পিথোরার একাংশ ভুক্ত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজ নিজে বীর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সৈন্য সামন্ত শিক্ষিত ও বলবান ছিল; তাঁহার ভগনীপতি রাজপুতানার অধিপতি বিখ্যাত যোদ্ধা সোমারজি পৃথ্বী রাজার সহায় ছিলেন। ইহাতেও যবন কর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও ধৃত হইয়া মৃত হন। রাজশ্রী স্থায়িনী নহে; কে মনে করিত, পৃথ্বীরাজের রাজত্ব যাইবে? কে মনে করিয়াছিল, মোগলেরা পাঠানদিগকে জয় করিয়া দিল্লীতে রাজা হইবে? আবার মোগল সম্রাটের অতুল ঐশ্বর্য্য ও বলবিক্রম দেখিয়া, কে মনে করিত মোগল রাজ্য ধ্বংস হইবে? এই রূপে কত কত প্রবল সম্রাট রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন এবং কত কত প্রবাল সম্রাট রাজ্য চ্যুত হইবেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, রায়পিথোরার পশ্চিম দ্বার দিয়া মোসলমানেরা দিল্লী প্রবেশ ও অধিকার করে। এই দিন হইতে ভারতবর্ষ পরাধীন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন! এই দুর্দ্দিনের কথা মনে হইলে, কি বিজাতীয় দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

দিল্লী অধিকার করিয়াই মোসলমানেরা দিল্লীতে জুম্মা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। পরে ভারত-জেতা কুতব উদ্দীনের অথবা প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা কুতব উদ্দীনের নামানুসারে, উহার কুতবল এস্লাম নাম হয়। আফ্রিকা দেশীয় এব্নে বতুত নামা জনৈক ভ্রামক কুতবল এস্লাম নির্ম্মাণের ১২৫ বৎসর পরে দিল্লীতে আসেন। তিনি কহিয়াছেন, দিল্লী মোসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে, এই মসজিদ হিন্দুদিগের দেব মন্দির ছিল এবং হিন্দুরা বুতখানা কহিত। পরে মুসলমান কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার হইলে, ইহা মসজিদ রূপে পরিবর্ত্তিত ও ব্যবহৃত হইল। এই মসজিদ মোসলমান রীতির বিরুদ্ধে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা, পূর্ব্বে হিন্দু দেব মন্দির থাকাতেই এরূপ বিসদৃশ হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের প্রবেশ দ্বারের উপরে আরবিক অক্ষরে যে বিজক লেখা আছে, তদ্দৃষ্টে অবগতি হয়, ২৭টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব মন্দির ভগ্ন করিয়া তাহারই উপকরণে কুতব উদ্দীন, উহা নির্ম্মাণ করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ মসজিদ নির্ম্মাণে তিন বৎসর মাত্র অতিবাহিত হয়। উহা দীর্ঘে ১৪৫ ফিট, প্রস্থে ৯৩ ফিট। প্রাঙ্গন সহিত লম্বাতে ৪২০ ফিট এবং প্রস্থে ৩৮৪ ফিট। কুতব উদ্দীনের জামাতা আল্‌তমাস আপন রাজ্য কালে এই সুপ্রসিদ্ধ মসজিদের উত্তর এবং দক্ষিণে দুইটি কক্ষ সংযোগ করিয়া বড় করিয়াছেন। তৈমুরলঙ্গ ভারত অধিকার করিয়া, ইহার আদর্শে লইয়া সমরকন্দে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

পৃথ্বীরাজের ঠাকুরবাটীতে যে সকল স্তম্ভ ছিল, তাহাও মোসলমানেরা ব্যবহার করিয়াছে। প্রতিমাবিদ্বেষী মোসলমানগণ ঐ সকল স্তম্ভ ও প্রস্তরখণ্ডে আস্তর করিয়া তাহাতে অঙ্কিত দেবমূর্ত্তি সকল অদৃশ্য করে। এখন আস্তর খসিয়া পড়াতে দেবমূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হইতেছে। উত্তরপার্শ্বে ভিতরদিকে উত্তর পূর্ব্বকোণে সংলগ্ন প্রস্তর খণ্ডে যে সকল দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রাতপের নীচে পর্য্যাঙ্কোপরি বিষ্ণুমূর্ত্তি, ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্র মূর্ত্তি, হংসারূঢ় ত্রিমুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি, ত্রিশূলধারী বৃষভবাহন মহাদেব মূর্ত্তি, চিনিতে পারা যায়; অন্য মূর্ত্তি সকল চেনা যায় না।

পাঠান ও মোগলেরা এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, মোগল সম্রাটেরা পাঠান কীর্ত্তি স্থিরতর রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাতেই কুতবল্ এস্লামের ভগ্নদশা আরম্ভ হয়, এখন প্রায়ই সমস্ত ভগ্ন। মধ্যের বৃহৎ খিলান ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মেরামত করিয়াছেন। অহি নকুলে যে সম্বন্ধ, রাঠোর চৌহানে যে সম্বন্ধ, পাঠান এবং মোগলেও সেই সম্বন্ধ। অদ্যাপিও পল্লিগ্রামে মোগল পাঠানের যুদ্ধ ব্যঞ্জক, 'মোগল পাঠান' নামক খেলা হইয়া থাকে।

কুত্রবল এস্লাম এবং লৌহস্তম্ভ দেখিয়া, আমরা কুতব মিনার দেখিতে গেলাম এবং কষ্টে মিনারের উপরে উঠিলাম। স্তম্ভাকার উন্নত এই প্রাসাদ—দেখিতে অতি অদ্ভুত, আনন্দজনক এবং মনোরম। প্রবাদ এই যে, উহা পূর্ব্বে ২০০ হাত উচ্চ ছিল; এই প্রবাদের কোন মূল নাই। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উহা পরিমাণ করাতে ২৫০ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চ ঠিক হইয়াছিল। পরে লেপ্টেনেণ্ট বুণ্ট সাহেব যখন উহা পরিমাপ করেন তখন ২৪০॥ ফুট উচ্চ ছিল; বর্ত্তমান সময়ে ২৩৮ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চ আছে। মিনারের উপরের চূড়া পতিত হইয়াছে। ১৭৯৪ সালে চূড়া সহিত এবং বর্ত্তমান সময়ে চূড়া রহিত অবস্থাতে মাপ হওয়াতে ৬০।১২ ফিটের প্রভেদ হইতেছে।

কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই উচ্চ প্রাসাদ প্রশংসনীয়। আলেকজেন্দ্রিয়া নগরস্থ পম্পিপিলার, কায়রো নগরস্থিত হুসেন মস্‌জিদের মিনার, মস্কৌ নগরস্থিত স্তম্ভ—এ সকলই কুতব মিনারের নিকট নত মস্তক। এই উচ্চতম প্রাসাদ ৫ প্রকোষ্ঠে (তালাতে) বিভক্ত; ভূমি হইতে ৯৫ ফুট স্থানে একটি বারেন্দা আছে; ১৪৮ ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ; তথাও একটি বারেন্দা। ১৮৮ফুট পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রকোষ্ঠ; তথা তৃতীয় বারেন্দা আছে; ২১২ ফুট উর্দ্ধ স্থান পর্য্যন্ত চতুর্থ প্রকোষ্ঠ; তথাও একটি বারেন্দা আছে। তাহার উপর পঞ্চম প্রকোষ্ঠ; তাহার পর মিনারের চূড়া ছিল। প্রত্যেক বারেন্দাতে পাথরের তক্তার রেল দেওয়া আছে। প্রাসাদ বহির্নিঃসৃত দৃঢ় প্রস্তর খণ্ড বারেন্দা (Balcony) চতুষ্টয় স্থিত আছে। ভিতর হইতে প্রতি বারেন্দাতে যাইবার পথ আছে, আরোহীরা ইচ্ছা করিলে বারেন্দাতে যাইয়া ভ্রমণ ও চতুর্দ্দিক দেখিতে পারেন, অথবা একেবারেই প্রাসাদের শিখরদেশে উঠিতে পারেন। প্রাসাদের উপষ্টম্ভ (অধোদেশের পরিধি) ৬০ হাত পরিমিত উর্দ্ধভাগের পরিধি তাহার এক তৃতীয়াংশ হইবে। উপষ্টম্ভ হইতে ১২১ হাত পর্য্যন্ত কঙ্করময় লোহিত বর্ণের প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং চতুর্দ্দিকে সপ্তবিংশতি খোদিত রেখায় সুন্দররূপে রচিত। তাহার উপর হইতে শিখর পর্য্যন্ত জয়পুরী উত্তম শ্বেত মর্ম্ম প্রস্তরে গোলাকারে নির্ম্মিত। প্রাসাদের মূলদেশ হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত চক্রাকার আবর্ত্তন শীল (ঘুরান) সিঁড় আছে, সর্ব্বশুদ্ধ সোপানের সংখ্যা ৩৭৬। সিঁড়ি গুলিন দুরারোহ নহে। আরোহীদিগের সুবিধা জন্য ভিতরের

দেয়ালে লোহার কড়া ছিল, ইচ্ছা করিলে শ্রান্তি দূর জন্য আরোহীরা হস্তদ্বারা ঐ কড়া আশ্রয় লইতে পারিবেন, এখন ঐ সকল কড়া নাই। সোপানমার্গে বাতাস ও আলোক আসিবার পথ আছে।

এই প্রাসাদের প্রথম প্রকোষ্ঠে, আরবিক অক্ষরে ছটি বিজক লিখিত হইয়াছে; তাহার সর্ব্বোপরি বিজক কোরাণের বচন। তাহার নিম্নেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের আরবি ভাষায় এক শত নাম। তৃতীয় বিজক মনাজুদ্দিন আবুল মজফর মহম্মদ বিন্‌ছামের (প্রকাশ্য মহম্মদ ঘোরি) নাম ও প্রশংসাবাক্য। চতুর্থ বিজক কোরাণের বচন। পঞ্চম সুলতান মহম্মদ বিন্‌ছামের নাম ও প্রশংসা বাক্য। ষষ্ঠ অথবা নিম্ন বিজক অপাঠ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যে বিজক আছে তাহাতে লিখিত আছে, আল্‌তমাস বাদসাহ মিনার সম্পন্ন করিবার আজ্ঞা করিলেন। তন্নিম্নে শুক্রবারে উপাসনার আবশ্যকতা বিষয়ে কোরাণের বচন লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠের দ্বারস্থ বিজকে লিখিত আছে আলত-মাস বাদসাহের রাজ্যকালে মিনার প্রস্ততে আজ্ঞা হয়। পঞ্চম প্রকো-ষ্ঠের দ্বারদেশে যে বিজক লিখিত আছে, তাহাতে অবগতি হয়, কুতব উদ্দীনের রাজ্যকালে মিনার প্রস্তুত হইয়া আলতমাসের রাজ্যকালে উহা সম্পন্ন হয়।

কুতব মিনার নাম দ্বারা এবং উপরি উক্ত বিজক দৃষ্টে অনেকেই কুতব মিনারকে মোসলমান কীর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং কুতবল এস্লাম মসজিদের মেজিনার জন্য কুতব মিনার প্রস্তুত হইয়াছে কহেন। কুতব মিনার হিন্দু কীর্ত্তি, কি মোসলমান কীর্ত্তি,—তাহা লইয়া এখনও তর্ক চলিতেছে এবং ইহার স্বপক্ষে বিপক্ষে দুইদল লোক আছেন। সূক্ষ্মভাবে স্থির বুদ্ধিতে পক্ষপাত ব্যতিরেকে বিবেচনা করিতে গেলে, কুতব মিনার আদিতে হিন্দু রাজার প্রস্তুতি, পরে মোসলমান বাদসাহের দ্বারা উহার পুনঃ সংস্কার (১) হইয়া রূপান্তর হইয়াছে প্রতীয়মান হইবে। কুতব মিনার যে হিন্দু রাজ দ্বারা আদিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার স্বপক্ষে নিম্ন

(১) বজ্রপতনে মিনারের পুনঃ সংস্কার আবশ্যক হওয়াতে ১২৬৮ অব্দে ফিরোজসাহ পুনঃ সংস্কার করেন। তাহার পর ১৫০৩ অব্দে সেকে-ন্দর লোধির সময়ে পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হওয়াতে সেকেন্দর লোধি, খোয়াজ খাঁর পুত্র ফতেখাঁ দ্বারা সংস্কার করেন। তাহার পর ১৮০৩

লিখিত নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতে পারে। (১ম) কুতব মিনার কুতবল এস্লাম হইতে দূরে; দূরে মেজিনা নির্ম্মাণের পদ্ধতি নাই। ভারতবর্ষে সাধারণ পদ্ধতি এই যে প্রতি মসজিদে দুইটি করিয়া মেজিনা থাকে। এখানে আর একটি নাই কেন? (২য়) মোসলমানেরা উচ্চ প্ল্যাটফারম, (অথবা গোড়া পত্তনার্থ স্থান উচ্চ করিয়া (Plinth) নির্ম্মাণ করিয়া) তাহার উপর মেজিনা গাঁথে; কিন্তু কুতর মিনাব সমান ভুমি হইতে উঠিয়াছে এবং সকল মেজিনাই পূর্ব্ব দ্বারী কিন্তু কুতর মিনাব উত্তর দ্বারী। (৩য়) কোন মেজিনাতে শূন্যে বারেন্দা (Balcony) থাকে না, কুতব মিনারে তাহা আছে। মেজিনার গঠন গোল নহে কিন্তু কুতব মিনারের উপরের গঠন গোল, এবং মেজিনার কার্য্যে কুতব মিনার যে ব্যবহার হইয়াছে তাহারও প্রমাণ নাই। (৪র্থত) কুতবল এস্‌লামের মেজিনা হইলে কুতব মিনার স্বতন্ত্র নাম কেন হইল? কোন মসজিদেরই মেজিনা হইতে স্বতন্ত্র নাম নাই। (৫মত) কুতব মিনারের চতুর্থ প্রকোষ্ঠের দ্বাব দেশে দেবনাগর অক্ষরে যে বিজক আছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, চাহদদেব পালের পুত্র লাল পাল বিশ্ব কর্ম্ম প্রসাদে রচনা করিলেন। হিন্দু দ্বেষী ফিরোজ সাহ হিন্দু দ্বারা পুনঃ সংস্কার করাইয়া দেবনাগর অক্ষরে সেই কথা এবং শ্রীবিশ্ব কর্ম্ম প্রসাদে রচিত—ইহা লিখিতে দিবেন সম্ভব নহে। ভারতবর্ষ মধ্যে মোসলমান জাতি যে সমস্ত অট্টালিকা ও মসজিদ ও স্তম্ভ করিয়াছেন, তাহার কিছুতেই হিন্দু চিহ্ন এবং নাগরাক্ষরে লিখিত বিজক দেখিতে পাওয়া যায় না। (৬ ষ্ঠত) কুতব মিনারের নিকটে সমসুদ্দীন আল্‌তমাস বাদসাহ কৃত এক অপরিসমাপ্ত প্রাসাদ আছে। (১) ঐ যবন স্তম্ভের সহিত কুতব মিনারের তুলনা করিয়া দেখিলে কুতব মিনারকে মোসলমান কীর্ত্তি বলা সঙ্গত হইবে না। (সপ্তমত) স্লীমান সাহেব (২) আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তিনি দিল্লী

খৃঃঅব্দে প্রবল ভূমিকম্প দ্বারা কুতব মিনারের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হয়; তখন দিল্লীর সম্রাটের দেওয়ানি-ভার-প্রাপ্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কুতবের সংস্কার করেন।

(১) অসমাপ্ত প্রাসাদ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। একদল লোক কহে, কুতব মিনারাখ্যাত প্রাসাদ হইতে সুন্দর মতে যমুনা দর্শন না হওয়াতে, দ্বিতীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ হয়, রাজ্যচ্যুতি নিবন্ধনে অসমাপ্ত রহিয়াছে।

(২) Rambles &c. in India by L. C. W. Sleeman. Vol II.

নগরে জনশ্রুতিতে অবগত হন, যে পৃথুরাজ স্বীয় কন্যার প্রাত্যহিক সূর্যোদয় ও যমুনা দর্শন জন্য ঐ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এই জনশ্রুতি শুনিয়া অনুসন্ধান করাতে দিল্লীর সম্রাটের একজন প্রাচীন মুন্সী (১) তাঁহাকে অবগত করাইল, "আমরা চিরকাল এইরূপ শুনিয়া আসিতেছি, কুতব মিনার কোন পূর্ব্বতন হিন্দুরাজার কীর্ত্তি। উষাকালে অরুণোদয় দর্শন, ও হিন্দুদিগের পবিত্র নদী যমুনা সন্দর্শন জন্য ঐ প্রাসাদ প্রস্তুত হয়।" এই প্রাচীন জন প্রবাদের অবশ্যই গুরুত্ব আছে।

যাহা হউক আদিতে কুতব মিনার হিন্দু কীর্ত্তি থাকিলেও ফিরোজসাহ এবং সেকেন্দর লোধী দ্বারা পুনঃ সংস্কৃত হইয়া মোসলমান কীর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা মোসলমান পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহারাও বাধ্য হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে, হিন্দু শিল্পী দ্বারা, হিন্দুদিগের প্রণালী মতে, হিন্দু উপকরণে কুতব মিনার প্রস্তুত হইয়াছে। তাঁহারা আরও কহেন, যে হিন্দু রাজা আরম্ভ করিয়া থাকিবেন, মোসলমান সমাপ্ত করিয়াছেন (২)।

১৮০৩ সালের ভূমিকম্প দ্বারা কুতব মিনারের বিস্তর ক্ষতি হয়, এবং গুম্বজ ভাঙ্গিয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এইবার ইংরাজেরা মেরামত করেন। এবং গুম্বজের পরিবর্ত্তে লোহিত প্রস্তরের অষ্টকোণ বিশিষ্ট চতুর্দ্দোলাকৃতি একটী চূড়া স্থাপিত হয়। কিন্তু কুতব মিনারে তদ্রূপ চূড়ার শোভা না হওয়ায় ১৮৪৭ সালে তাৎকালিক গবর্ণর জেনেরলের আজ্ঞাক্রমে উক্ত চূড়া নামান হইয়াছে এবং তাহা মিনারের পার্শ্বে মৃত্তিকাতে রক্ষিত আছে।

---

(১) এই মুন্সির নাম সৈয়দ আহম্মদ। ইনি দ্বিতীয় আকবরের (জাহাঙ্গিরের) কোর্ট মুন্সি ছিলেন।

(২) যাঁহারা কুতব মিনারকে মোসলমান কীর্ত্তি কহেন, তাঁহারা মিনারস্থ তিনটি বিজকের লেখার উপর নির্ভর করেন। পঞ্চম প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশস্থ প্রথম; চতুর্থ প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশস্থ দ্বিতীয়; তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশস্থ তৃতীয় বিজক; প্রথম বিজকের ভাষায়, কুতবউদ্দিনের রাজ্যকালে মিনার প্রস্তুত আরম্ভ হয়; দ্বিতীয় বিজকের মতে তাহার বিপরীত আলতমাস বাদসাহের রাজ্যকালে মিনার প্রস্তুত আরম্ভ হয়; তৃতীয় বিজকের কথায় আলতমাস মিনার সম্পন্ন করিবার আজ্ঞা দিলেন। এই তিনটি বিজক পরস্পর বিরোধী এবং লেখনের সম সাময়িক বলিয়া বোধ হয় না।

কুনব মিনারের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে যে ভগ্ন অট্টালিকা বিদ্যমান আছে তাহা আলাউদ্দিনের প্রাসাদ। ইহার কোনটিরই ছাদ নাই, প্রাচীর সকল বিলক্ষণ প্রশস্ত। আলাই দরওয়াজাতে আরবি অক্ষরে যে বিজক লিখিত আছে, তাহাতে অবগতি হয়, হিজরা ৭১০ (খৃঃ ১৩১০) অব্দে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। আলাউদ্দিন আপনাকে সেকন্দর ছানি (দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডর) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আলাই দরওয়াজা ৫৬ ফিট উচ্চ এবং খিলানের উচ্চতার সীমা ৩৪ ফিট। কনিঙহাম সাহেব কহেন, এরূপ সুন্দর পাঠান অট্টালিকা তিনি দর্শন করেন নাই।

কাশীম বাজারের রাজবংশ।

কান্তবাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি প্রচলিত জন প্রবাদ আছে, আমরা এইস্থলে দুই চারিটি উদ্ধৃত করিব। তিনি প্রথম অবস্থায় যখন মুরশীদাবাদের কুঠীতে চাকরি করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার বসতবাটীর পার্শ্বেই একঘর কলু বাস করিত। কুঠিতে যাইবার কালে প্রতিদিবস প্রাতঃকালে সেই কলুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। ক্রমশ যতই তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল, ততই তিনি প্রতিদিবস কোন বিশেষ কার্য্যে যাইতে হইলে, উক্ত কলুর মুখদর্শন করিয়া যাইতেন। যখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ জমীদার হইয়া সম্মানের ও ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার কোন আত্মীয় একদিন বলিলেন, "আপনি এতদূর সম্মানিত ব্যক্তি, আপনার ন্যায় ধনীর গৃহপার্শে একঘর সামান্য তৈলজীবী বাস করিবে, ইহা দেখিতে ভাল দেখায় না।" কান্তবাবু অমায়িকতার সহিত, দৃঢ়তার সহিত সেই ব্যক্তিকে বলিলেন, "মহাশয়, এ প্রকার বলিবেন না। আমি প্রতিদিন ঐ ব্যক্তির মুখদর্শন করিয়া কার্য্যস্থানে গিয়াছি, তাহাতেই আমার আজ এই উন্নতি হইয়াছে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন ঐ ব্যক্তিকে এইস্থানে অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষা করিব, নতুবা আমারে পাপের ভাগী হইতে হইবে।" বলা বাহুল্য উল্লিখিত তৈলজীবীকে কান্তবাবু যথাসাধ্য সহায়তা করিতেন।

কার্য্য হইতে অবসর লইয়া জীবনের শেষাংশে কান্তবাবু তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন হিন্দু অবশেষে জগনাথ

পুরীতে উপস্থিত হইলেন। কান্তবাবু পুরীতে আসিতেছেন একথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। পাণ্ডারা মনে করিল যে কলিকাতা হইতে একজন প্রধান ধনী তীর্থ দর্শনে আসিতেছেন, সুতরাং তাহারা অপরিসীম ধনলাভ করিবে। কিন্তু কান্তবাবু পুরীতে উপস্থিত হইলে যখন তাহারা শুনিল, যে তিনি তৈলিকজাতীয়, তখন তাহাদের আশা নিরাশায় পরিণত হইল। তখনকার প্রধান পাণ্ডারা তৈলিক প্রভৃতি জাতির দান গ্রহণ করিত না। তাহারা কান্তবাবুর দান গ্রহণে সুতরাং অস্বীকৃত হইল। কান্তবাবু পুরীতে এক অন্নসত্র খুলিবার বাসনা প্রকাশ করিলে, পাণ্ডারা তাঁহার জাতি সম্বন্ধে সন্দেহজনক আপত্তি তুলিয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। পরম হিন্দু কৃষ্ণকান্ত বড়ই ব্যথিত হইলেন, কোন তীর্থেই তাঁহাকে এ প্রকার বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই। অবশেষে তিনি তাঁহার জাতি সম্বন্ধে পাণ্ডাদিগের ভ্রমাপনোদনের জন্য নবদ্বীপ, কর্ণাট, দ্রাবিড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধস্থল হইতে তথাকার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা আনাইলেন। পণ্ডিতেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন, "তৈলী বলিয়া কোন বিভিন্ন জাতি নাই। তুলাদণ্ডধারী তৌলিক অর্থাৎ যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য জন্য স্বহস্তে তুলাদণ্ডধারণ করিত, তাহাদের বংশাবলীই তৌলিক বলিয়া কথিত হইত। তৌলিক হইতে তৈলিক শব্দ ক্রমশ অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছে। এ প্রকারস্থলে এই জাতির দান গ্রহণ করিলে পাতকগ্রস্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।" এই প্রকার ব্যবস্থাদ্বারা তিনি পাণ্ডাদিগের ঘোরতর আপত্তি খণ্ডন করাইয়া তাহাদিগকে দান গ্রহণ করাইলেন ও অন্নসত্র স্থাপন করিলেন।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী সামান্যরূপ শিক্ষিত হইয়াও, স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে—অতিসামান্য অবস্থা হইতে, মানবজীবনের, সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় আরোহণ করেন। ১১৯৩ সালে, একমাত্র পুত্র, মহারাজ লোকনাথ বাহাদুরকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত, সজ্ঞানে জাহ্নবীতীরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণকান্ত বহুকাল হইল স্বর্গে গিয়াছেন বটে—কিন্তু তাঁহার প্রপৌত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর কার্য্যগুণে—তাঁহার বংশের যশোরাশি ভারতের সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

মহারাজা লোকনাথ বাহাদুর পিতার মৃত্যুর পর প্রায় ষোড়শবর্ষ জীবিত ছিলেন—তাঁহার জীবন নিতান্ত সুখের ছিল না। বিষয়ভার প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই—তাঁহার শরীরে কালব্যাধি প্রবিষ্ট হয়। এই ব্যাধির যন্ত্রণায়

তিনি তাঁহার ক্লেশময় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিশয় যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। সাধ্যমতে পিতার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ পরিবর্দ্ধিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু যে কালব্যাধি ধীরে ধীরে তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা এই সময়ে ভয়ানক ভাব ধারণ করিয়া তাঁহার ক্লেশময়, স্তিমিত জীবন দীপ নির্ব্বাপিত করিল। ১২১১ সালে মহারাজা লোকনাথ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

মহারাজ লোকনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার একবর্ষ বয়স্ক শিশুপুত্র—কুমার হরিনাথ কাশীমবাজার রাজবংশের অতুল সম্পত্তির অধিকারী হন। কুমার হরিনাথের নাবালগ অবস্থায় তাঁহার অতুলবিভব, কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে আসে। কোর্ট এই বিষয় যত্নের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়া ছিলেন। কুমার হরিনাথ সাবালগ হইয়া সেই সকল বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া অনেক সৎকার্য্যে তাহা ব্যয় করেন। হিন্দুকালেজের প্রথম স্থাপনোদ্দেশে তিনি এককালীন ১৫০০০৲ পনরহাজার টাকা দান করেন। হরিনাথ স্বভাবতই নিতান্ত দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। আজ কাল যে সকল গুণ থাকিলে লোকে Public spirited বলিয়া থাকে কুমার হরিনাথের সেই সমস্তগুণের কোনটিরই অভাব ছিল না। পুষ্করিণী খনন, দেবালয় স্থাপন ও অন্নসত্র প্রতিষ্ঠ করিয়া তিনি প্রজাদের অনেক উপকার করিতেন। কোন প্রসিদ্ধ ও বহুলোকপূর্ণ জমীদারি মধ্যে প্রজাদিগের অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে, কুমার হরিনাথ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কয়েকটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। এই সমস্ত সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তৎকালীন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুর কুমারকে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।

ভারতীয় প্রধান মাতৃভাষা সংস্কৃতের উন্নতি সাধনে রাজা হরিনাথ বাহাদুরের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তিনি এই ইচ্ছা সাধ্যমত কার্য্যেও পরিণত করিয়াও ছিলেন। সংস্কৃতশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগকে তিনি যথাসাধ্য উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা কাশীম বাজারের নানাস্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করাইয়াছিলেন। তিনি নির্দ্ধারিত সময়ে এই সমস্ত চতুষ্পাঠীতে যথাসম্ভব অর্থ সাহায্য প্রদান করিতেন। তিনি উপস্থিত থাকিয়া—অনেক চতুষ্পাঠীতে বসিয়া, ছাত্রদিগের—ন্যায় ও স্মৃতির, অধ্যাপনা দেখিতেন ও তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগকে প্রশ্ন করিতেন।

তিনি নিজেও অল্প পরিমাণে সংস্কৃত জানিতেন—কিন্তু পারসীতে তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। ইহাঁরই সময়ে কাশীম বাজারে কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন নামক জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। রাজা নিজে পরম হিন্দু ছিলেন ও সর্ব্বদা পণ্ডিত মণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন।

রাজা হরিনাথের জীবনে প্রধান দুইটি সখ্ ছিল। তিনি নিজে সুগঠিত ও বলবান পুরুষ ছিলেন বলিয়া—ব্যায়াম কার্যে সর্ব্বসাধারণকে সর্ব্বদাই প্রোৎসাহিত করিতেন। কলিকাতা ও ভোজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে, বাছা বাছা পালোয়ান লইয়া গিয়া উচ্চবেতনে নিজ অধীনে নিযুক্ত করিতেন। সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বা লোক জন জড় করিয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাহাদের মল্লক্রীড়া দেখিতেন। বিজয়ী পুরুষ তাঁহার নিকট হইতে উচ্চদরের পুরস্কার পাইত।

ইহা ছাড়া তিনি নিতান্ত সঙ্গীত রসজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সভায় দুই চারিটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী নিযুক্ত ছিলেন। রাজা হরিনাথ আখড়াই কবি শুনিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন—তাঁহার নিজের বাটীতে প্রায়ই কবির গান দিতেন ও নগরের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত স্থলে কবির নিমন্ত্রণ হইলে, তথায় শুনিতেও যাইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কবি ও হাপ-আখড়াই প্রধান সামাজিক আমোদ বলিয়া বিবেচিত হইত। ১২৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এক পুত্র, এক কন্যা ও বিধবা রাজ্ঞী হরসুন্দরীকে রাখিয়া রাজা হরিনাথ পরলোক গমন করেন।

রাজা হরিনাথের মৃত্যুর সময় তাঁহার পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথ, নিতান্ত নাবালগ ছিলেন। পিতার ন্যায় তাঁহারও বিষয় গুলি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধারণে রক্ষিত হয়। কুমার কৃষ্ণ নাথ—এই কোর্টের তত্ত্বাবধারণে ইংরাজী ও পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া ছিলেন। সর্ব্বদা ইংরাজের সংস্রবে, ও ইংরাজি কুশিক্ষার দোষে তিনি অনেকটা সাহেব ঘেঁসা হইয়া উঠেন। ইংরাজীতে তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া ছিলেন ও সাহেবদের মত, সুন্দররূপে অনর্গল ইংরাজীতে কথোপকথন করিতে পারিতেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে কুমারের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের আয়ও খুব বাড়িয়া উঠিয়া ছিল। যখন তিনি সাবালগ হইয়া কোর্টের নিকট হইতে স্বীয় বিষয়াদির ভারগ্রহণ করেন—সেই সময়ে

কাশীম বাজার রাজ ভাণ্ডারে কোর্টের যত্নে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নগদ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল।

মৃগয়াব্যাপারে কুমার কৃষ্ণনাথের অত্যন্ত আসক্তি ছিল। প্রতি বৎসর এই মৃগয়া ব্যাপারে তাঁহার অনেক ব্যয় হইত। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও দেশীয়েরা তাঁহার সঙ্গে মৃগয়ায় যাইতেন। তিনি মৃগয়া কার্য্যে অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন—কখনও মৃগয়ায় গিয়া শূন্য হস্তে ফিরিতেন না। তৎকালীন শিকারামোদী বাঙ্গালীরদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন।

শিক্ষাকার্য্যে উৎসাহ দিতে কুমার কৃষ্ণনাথ—অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বনামখ্যাতা মহারাণী স্বর্ণময়ী যেমন মুক্তহস্তে বিদ্যা-নুশীলন কার্য্যে প্রচুর ব্যয় করিয়া আসিতেছেন—কুমার কৃষ্ণনাথও তদ্রূপ শিক্ষাকার্য্যে দান করিতে মুক্ত হস্ত ছিলেন। দেশীয় উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার প্রধান সহায়, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনার্থে মেডিকেল কালেজে যে মহতী সভা আহূত হয় তাহাতে কুমার কৃষ্ণনাথ সভাপতির কার্য্য করিয়া ছিলেন। এই সভায় তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঁদা দেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার জীব-নের শেষ মুহূর্ত্তে যে উইল করেন তাহাতে তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তিই মুরশীদাবাদে একটি University স্থাপনের জন্য অর্পণ করিয়া যান। নানাকারণে সেই উইল রদ্ হইয়া যায়। কুমার কৃষ্ণনাথ লর্ড অকলাণ্ড কর্ত্তৃক মহাসমারোহে, রাজা উপাধিতে ভূষিত হন।

"সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় একবার কুমার কৃষ্ণনাথের কোপে পড়িয়াছিলেন। ভাস্করে রাজা

---

* এই কথা লইয়া ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন,—"A long minority produced a large accumulation and Krishna Nath on attaining his majority became master of a mint of money." দুঃখের বিষয় এই যে, কুমার কৃষ্ণনাথ এই সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই অপব্যয় করিয়াছিলেন।

* বাবু দিগম্বর মিত্রকে কোন বিশেষ কারণবশত কুমার কৃষ্ণনাথ এক-কালে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই দিগম্বর মিত্রই রাজা দিগম্বর মিত্র।

Vide—Friend of India. Vol. X P. 758 and Cal. Rev. CXII.

কৃষ্ণনাথের সম্বন্ধে কুৎসাজনক বিদ্রূপাত্মক কোন প্রবন্ধ লিখিত হওয়াতে তিনি সুপ্রীমকোর্টে ভাস্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এই মানহানির মোকদ্দামায় তিনিই জয় লাভ করেন ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুই বৎসরের জন্য কারা নিক্ষিপ্ত হন।

রাজা কৃষ্ণনাথের মৃত্যু অতি শোচনীয়! যৌবনদশায়, দৈববিপাকে পড়িয়া তিনি অপরিণত বয়সে,—আত্মসম্মান রক্ষার্থে স্বহস্তে জীবলীলা সাঙ্গ করেন। আমরা নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।—

তাঁহার অধীনস্থ কোন ভৃত্য বিশেষ অপরাধে অপরাধী হওয়াতে রাজা কৃষ্ণনাথ ক্রোধবশে তাহাকে সাতিশয় প্রহার করেন ও যন্ত্রণা দেন। মাজিষ্ট্রেটের কাছে এই বিষয়ের নালিশ হওয়াতে তিনি—রাজা কৃষ্ণনাথকে উপযুক্ত জামিনে—খোলসা দেন। এই সময়ে কৃষ্ণনাথ,—তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ বাটীতে বাস করিতে ছিলেন। পরে আঘাতিত ভৃত্যটির মৃত্যু হওয়াতে মাজিষ্ট্রেটের আদেশে কৃষ্ণনাথের উপর ওয়ারেণ্ট জারি হয়। সাক্ষ্য দ্বারা নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা বিফল হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত, জেলার জজের মনোমালিন্য ছিল। জনশ্রুতি এই—যে জজের সহিত রাজা কৃষ্ণনাথের সৌহৃদ্যতা থাকাতে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব, তাঁহার উপর জাতক্রোধ হন। এক্ষণে আইনের সহায়তায়, তিনি কৃষ্ণনাথের যথোচিত লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ—কান্তবাবুকে আইনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালার গবর্ণর হেষ্টিংস অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার বংশধরকে—সেইরূপ আইনের তীব্র শাণিত অস্ত্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইলেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব, আইনের দোহাই দিয়া কৃষ্ণনাথকে, সামান্য অপরাধীর ন্যায় কলিকাতা হইতে আবদ্ধ করিয়া থানা-বথানা, মুরশীদাবাদে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। যে বংশ বরাবর রাজসম্মান, ও দেশের ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছে—যে বংশ উত্তর-বাঙ্গালার মধ্যে প্রধান সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বিখ্যাত—যাহাদের যশঃ সৌরভ দেশ বিদেশে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে—সেই বংশোদ্ভব হইয়া এই প্রকার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইবে—ইহা রাজা কৃষ্ণনাথের সহ্য হইল না। তিনি এই প্রকার অপমানিত হওয়া অপেক্ষা—মৃত্যুই শ্রেয়স্কর বলিয়া বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

যখন ওয়ারেণ্ট লইয়া এই সমস্ত গোলযোগ চলিতেছে তখন—কুমার কৃষ্ণনাথ যোড়াসাঁকোর বাটীতে ছিলেন। তিনি ২৩শে অক্টোবর বুধবার ১৮৪৪, সন্ধ্যা হইতে রজনীর শেষ যাম পর্য্যন্ত জাগিয়া, বঙ্গ ভাষায় একখানি সুদীর্ঘ উইল (দানপত্র) প্রস্তুত করিলেন—তিনি যেন ৹মরিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—জীবনের বাসনা তিরোহিত হইয়াছে—জীবন অতিশয় ভারবোধ হইতেছে। জীবনের এই প্রকার উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত অবস্থায় রাজা কৃষ্ণ নাথ একখানি উইল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। এই উইলের সর্ত্তানুসারে তিনি তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ীকে তাঁহার মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১৫০০৲ পনরশত টাকা—ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ পত্রাদি প্রদান করিয়া যান। এই দানপত্রে তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীকে পোষ্য পুত্র লইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার অগাধ বিষয়ের অবশিষ্টাংশ মুরশীদাবাদে তাঁহার নিজ নামে একটি University স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়া যান। গভীর রজনীতে এই প্রকার অস্বাভাবিক দানপত্র লিখিয়া পর দিবস, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে একটি রিবল্‌বর দ্বারা জীবনের সমস্ত যাতনা নষ্ট মরেন। গৃহের দ্বার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল; কেহই তাঁহার মনের কথা জানিতে পারে নাই সুতরাং সকলেই নিশ্চিন্ত ছিল। পিস্তলের কর্ণভেদী আওয়াজ শুনিয়া আত্মীয় স্বজন-ভৃত্যবর্গ দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিল—যে রাজা বাহাদুরের সুকোমল দেহ রক্তাপ্লুত হইয়া ভুমিতলে লুটিতেছে—জীবন বায়ু ধীরে ধীরে দেহ হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই প্রকার শোচনীয় রূপে কান্ত বাবুর বংশের শেষ বংশধরের জীবলীলা সাঙ্গ হইল।

রাজার এই প্রকার শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে—তদীয় পতিব্রতা পত্নী রাণী স্বর্ণময়ী, অন্নজল ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র পতিশোকে, রোদন করিতে লাগিলেন। পতিরতা হিন্দুরমণী দিন দিন পতিশোকে, ক্ষীণা ও রুগ্না হইতে লাগিলেন। ইংরাজেরা বাঙ্গালীর কোন সদ্গুণেরই প্রশংসা করেন না—কিন্তু এই সময়ে শোক কাতরা রাণী স্বর্ণময়ীকে দেখিয়া—কোন বিশিষ্ট ইংরাজ বলিয়া ছিলেন—"She was as Rachel who would not be comforted." কালের স্বধর্ম্মে পতিশোক কতকটা মন্দীভূত হইয়া আসিলে রাণী স্বর্ণময়ী—ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে মনঃসন্নিবেশ করত পতির পারত্রিক মঙ্গল কামনায় নানাবিধ ধর্ম্ম কার্য্য করিতে লাগিলেন।

মহারাণীর মুক্তহস্ততার কথা কে না জানে? বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্যান্যস্থলে এমত কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই—যাহাতে মহারাণীর কোন না কোন সংস্রব আছে। দীনের দুঃখমোচনে—দরিদ্রের অশ্রুজল মোচনে—বিদ্যালয় স্থাপনে—পুষ্করিণী খননে—ও অন্যান্য সকল প্রকার দেশ ও লোক হিতকর কার্য্যে—মহারাণী স্বর্ণময়ী পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া মুক্তহস্তা। বাঙ্গালী এমন কেহ নাই—যিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীকে বিশেষরূপে না জানেন।

রাজা কৃষ্ণনাথের বিধবা পত্নী রাণী স্বর্ণময়ীকে, তাঁহার এই প্রকার দান শৌণ্ডিকতার ও সৎকার্য্যে মুক্তহস্ততার জন্য পুরস্কৃত করিতে ভারতীয় গবর্মেণ্ট—তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধিতে ভূষিত করেন। কমিশনর সাহেব নিজে কাশীম বাজারে উপস্থিত হইয়া—রাজবাটীতে গিয়া মহারাণীকে উপাধি প্রদান করেন। এই সময়ে কয়েক দিন নগরী দিবারাত্র উৎসবে মগ্ন ছিল। চারিদিকেই আনন্দ কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইত না।

ইহার পর ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ২০এ আগষ্ট তারিখে—* স্বয়ং বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কাশীম বাজারে গমন করেন। তখন মহারাণীর সুযোগ্য দেওয়ান রায় রাজীবলোচন বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সকলকেই সমুচিত সমাদর ও আতিথেয়তার সহিত সম্বর্দ্ধনা করেন। একটি যবনিকার অন্তরালে মহারাণী ছিলেন। হিন্দীতে কথোপকথন হইতে লাগিল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর—মহারাণীকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং উপসংহারে মহারাণীকে—Best female subject of the Queen in the Bengal Presidency" বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মহারাণী তদুত্তরে বলিলেন—"আমাতে সুখ্যাতির যোগ্য কিছুই নাই—লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার্থে যাহা আমার কর্ত্তব্য ও জীবনের ব্রত তাহাই আমি পালন করিতেছি—যশের বা গৌরবের আশা আমার নাই।" উত্তরটি প্রকৃত হিন্দুমহিলার উপযুক্ত বটে!! মহারাণী স্বর্ণময়ী আজি পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ত্তব্য সমূহ পূর্ব্বের ন্যায় অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন—জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে তিনি, সর্ব্বসাধারণের

* Vide Friend of India August 1872. Third week.

আরও ভক্তির ও শ্রদ্ধার ভাজন হউন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আমাদের আর অধিক বক্তব্য নাই।

আমরা ইংরাজ রাজত্বের প্রথম বিকাশ সময়ের সেই ঘোর তমসাবৃত কালের বিশৃঙ্খল গর্ভ্ভ হইতে কান্ত বাবুর সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ বহু আয়াসে সংগ্রহ করিয়াছি ও উপরে কাশীম বাজার রাজবংশের যে ইতিহাস প্রদান করিলাম, বোধ হয় এস্থলে তাহাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং এইস্থলে আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

হিন্দু কাহাকে বলে ?

উপসংহার ।

"হিন্দু কাহাকে বলে ?"(১) এই প্রশ্নের উত্তর অতি কঠিন ; কারণ হিন্দুধর্ম্ম অতি উদার। যাঁহারা হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ দেখিয়া এবং আধুনিক ভট্টাচার্য্যদের সহিত কথোপকথন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্ম অতি সংকীর্ণ,—তাঁহারা স্থুলদর্শী। বস্তুত হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম পৃথিবীতে নাই। ইহাতে অরূপ ব্রহ্মের উপাসক, পৌত্তলিক এবং জড়োপাসক—সকলেই স্থান পাইয়াছেন। এমন কি কোন নিরীশ্বরবাদী কপিল বা শাক্যের ন্যায়

(১) "হিন্দু" পারস্য শব্দ ; সংস্কৃত "সিন্ধু" শব্দের বিকৃতি মাত্র। ইহার অর্থ "সিন্ধু দেশবাসী"। সংস্কৃত "স" স্থলে পারস্য ভাষায় "হ" প্রয়োগ হয়, যথা সপ্তাহ, হফ্‌তা ; অসুর, অহুর ; সুরী, (সুরনারী), হুরী ; সম, হম্‌ ইত্যাদি। মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পারসিকদিগের যে ভারতবর্ষে যাতায়াত ছিল, তাহার প্রমাণ মুদ্রারাক্ষসে আছে। পারসিকেরা সিন্ধুনদ ভাল জানিতেন ; এজন্য সমগ্র ভারতকে তাঁহারা "হিন্দুস্থান" অর্থাৎ "সিন্ধুস্থান" (সিন্ধুদেশ) বলিতেন। পারসিকেরা হিন্দুদের অপেক্ষা গৌর বর্ণ ; তাঁহারা হিন্দুদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। এজন্য "হিন্দু" শব্দের গৌণ অর্থ "কৃষ্ণবর্ণ"। মহা কবি হাফেজ, শেষোক্ত অর্থে "হিন্দু" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এক প্রসিদ্ধ গীতি কাব্যে "বখালে হিন্দুএষ" পদের অর্থে "তাঁহার একটি কৃষ্ণ তিলের জন্য"। পারস্য ভাষায় যে অর্থে "হিন্দু" শব্দ ব্যবহৃত হয়, প্রবন্ধে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই,—ইহা বলা বাহুল্য।

জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক হইলে, তিনিও অহিন্দু বলিয়া পরিত্যক্ত হন নাই, বরং সম্মানিত হইয়াছেন। এই ঔদার্য্য গুণ থাকায় হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নহে।

তবে স্থূল কথা ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে ধর্ম্মে মনুষ্যের জ্ঞানানুসারে তাহার ধর্ম্ম প্রণালীর পার্থক্য হয়, তাহাই হিন্দু ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মে জ্ঞানীর পক্ষে এক পন্থা, মূর্খের পৃথক্ পন্থা। অনেকে বলিবেন, যে ইহা হিন্দুধর্ম্মের দোষ; আমরা বলি যে ইহা হিন্দুধর্ম্মের গুণ। মহম্মদ মনুষ্য মাত্রকেই ব্রহ্ম বাদী করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু লক্ষ মুসলমানের মধ্যে এক জনের অধিক প্রকৃত ব্রহ্মবাদী আছে কিনা সন্দেহ। অনেক সাধনা ব্যতীত অরূপ ব্রহ্মকে মনে ধারণা করা নিতান্ত অসম্ভব; কিন্তু এবম্বিধ সাধনা কত মনুষ্য করিয়া থাকে, বা করিতে সক্ষম? সুতরাং মহম্মদের মতাবলম্বীদিগের মধ্যে মৌখিক ব্রহ্মবাদীর সংখ্যাই অধিক; আমাদের প্রাচীন মহাত্মাদের মতে, যাহারা নিরাকার পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতে অক্ষম, তাহারা সাকার উপাসনা করুক, কাহারও মৌখিক ব্রহ্মবাদী হইবার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের দৌর্ব্বল্য হেতু সাকার উপাসনার প্রয়োজন হইয়াছে।

বালক অতি সুবোধ হইলেও অরূপ ব্রহ্ম যে কি তাহা বুঝিতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকাংশ মনুষ্য বালকের ন্যায়; কিন্তু তাহারা নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান করিতে অক্ষম বলিয়া যে কোন প্রকার উপাসনা করিবে না,— এমন কথা নিতান্ত অসঙ্গত। আমরা ভক্তিবর্দ্ধন জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি; যিনি পৌত্তলিকতার নিতান্ত বিদ্বেষী, তিনিও গির্জ্জায় বা ব্রহ্মমন্দিরে বাদ্যযন্ত্র ও গীতের ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না; তবে তিনি ভক্তিবর্দ্ধন জন্য উপাসনালয়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য, কেন এমন গর্হিত বিবেচনা করেন? পক্ষান্তরে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে উপাস্য দেবতার পশুর ন্যায় মুখ বা অন্য অবয়ব কল্পনা করা নিন্দনীয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে হিন্দুধর্ম্মে জ্ঞানীর জন্য এক পন্থা এবং জ্ঞানহীনের জন্য পৃথক পন্থা। তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তকর্ম্মবন্ধনাৎ॥

ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

যিনি নিত্য ও নিশ্চল পরব্রহ্মে (ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি) কোন নাম না দিয়া, এবং কোনরূপ (রক্তবর্ণ চতুরানন, কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ, রজতবর্ণ পঞ্চানন ইত্যাদি) আরোপ না করিয়া, তাঁহার তত্ত্ব যথার্থরূপে জানিয়াছেন, তিনি কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।

অগ্নির্দ্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতং।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং, সর্ব্বত্রসমদর্শিনাং॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

দ্বিজাতিদের দেবতা অগ্নিতে, মুনিদের দেবতা হৃদয়ে, স্বল্পবুদ্ধিদের দেবতা প্রতিমায়, এবং সমদর্শী জ্ঞানীদিগের দেবতা সর্ব্বত্র।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥

ইতি মহানির্বাণ তন্ত্র।

মৃত্তিকা শিলা ধাতু দারু, আদির মূর্ত্তিকে যে ঈশ্বর বোধ করে, তাহার তপস্যা ক্লেশের কারণ হয়। জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই।

অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং, হৃদি দেবো মনীষিণাং।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্রবিদিতাত্মনাং॥

ইতি কুলার্ণব।

অগ্নিতে ব্রাহ্মণদিগের দেবতা, হৃদয়ে বুদ্ধিমানদিগের দেবতা, প্রতিমায় স্বল্প বুদ্ধিদের দেবতা, সর্ব্বত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞের দেবতা।

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং মুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥

ইতি শাতাতপ সংহিতা।

জলে সাধারণ মনুষ্যের দেবতা, স্বর্গে বুদ্ধিমানদের, কাষ্ঠ মৃত্তিকায় মূর্খদের, এবং আত্মাতেই জ্ঞানীদের দেবতা।

এই সমস্ত বচনের মধ্যে কোনটিই নূতন সঙ্কলিত নহে। মহাত্মা রামমোহন রায় সমুদয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যবশত যিনি হিন্দু-ধর্ম্মের সার বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাকে লোকে অহিন্দু ও নাস্তিক বলিত। কোন বচন তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নহে। আমাদের রত্নাকর মন্থন করিয়া যে সুধা বাহির করিয়াছিলেন, গরল বলিয়া তাহা অনেকেই ত্যাগ করিল।

জ্ঞান কাণ্ডে জলময় তীর্থ এবং পাষাণ ও মৃণ্ময় দেবতা নাই।

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণ মৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যান পরায়ণাঃ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

তীর্থ সম্বন্ধে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ।
সা তীর্থ বর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ ॥
জ্ঞান প্রবাহা বিমলাহি গঙ্গা।
সা কাশিকাহং নিজবোধ রূপং ॥

মনকে নিবৃত্ত করাই পরম শান্তি। তাহাই বরণীয় তীর্থ মণিকর্ণিকা। জ্ঞান প্রবাহই নির্ম্মলা গঙ্গা। আপনাকে আপনি বুঝিতে পারিলে, তাহাই কাশী।

জ্ঞানকাণ্ডে অযৌক্তিক কিছুই নাই। কর্ম্মকাণ্ডে ইহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। এই কাণ্ডে নানা মুনি নানা মত চালাইয়াছেন, সুতরাং মত ও বিশ্বাসের বিলক্ষণ বিরোধ আছে, স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশের সহিত প্রলাপও আছে। কোন কোন মহাশয় আপন সম্প্রদায়ের গৌরব বর্দ্ধনার্থ এবং অপর সম্প্রদায়ের নিন্দার্থ কৃত্রিম শাস্ত্র প্রস্তত করিয়াছেন; যথা অনন্ত সংহিতা এবং তন্ত্ররত্নাকর। দেবনিন্দা কর্ম্মকাণ্ডের প্রচলিত শাস্ত্রের একটি প্রধান দোষ। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছেঃ—

জন্মাপবাদং দ্রোহঞ্চ তথামিথ্যাবভাষণং।
কামং ক্রোধং তথা চৌর্য্যং পরদারাভিমর্ষণং ॥
বীভৎসং মরণং ক্ষোভং দুষ্ক্রিয়া বিবিধঃ কলৌ।
পাষণ্ডিনো বিধাস্যন্তি বিশুদ্ধে পরমাত্মনি ॥

কলিযুগে পাষণ্ডগণ বিশুদ্ধ পরামাত্মাতে জন্মাপবাদ, দ্রোহ, মিথ্যাকথন, কাম, ক্রোধ, চৌর্য্য, পরদার গমন, বীভৎস, মরণ, ক্ষোভ ও বিবিধ দুষ্ক্রিয়া আরোপিত করিবে।

কেবল কলিযুগের গ্রন্থে কেন, যে সমস্ত পুরাণ অন্যান্য যুগে প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতেও ঐ দোষ আছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির উপর নিন্দনীয় কার্য্য আরোপিত করিয়া পুরাণকারগণ সন্তুষ্ট হন নাই; সত্বগুণের আধার ব্রহ্মাকেও কন্যাগমন মহাপাপে পাপী বলিয়া বর্ণনা করিয়া-

ছেন। পুরাণাদির যে যে অংশে ঐরূপ দেব নিন্দা থাকে, সেই সেই অংশ অশাস্ত্র বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত।

ফলত জ্ঞানকাণ্ডে না পৌঁছিলে চিত্তের প্রকৃত শান্তি লাভ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। সকলেরই জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশ জ্ঞানকাণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। এ জন্য বানপ্রস্থ বা পরিব্রাজক হইবার প্রয়োজন নাই; সংসারে থাকিয়া মনুষ্যের হিতসাধন করা জ্ঞানকাণ্ডে পৌঁছিবার একটি প্রধান সোপান।

তা. প্র. চ.

——:০:——

হরিনাম।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছেন। বৃন্দাবন শোকাচ্ছন্ন। রাধিকার কুঞ্জ নিরানন্দময়। শ্যামবিলাসিনী উন্মাদিনী। দুই এক জন সখী মাঝে মাঝে আসিয়া সান্ত্বনা করিয়া যাইতেছে। কেহ বা সতীত্বাভিমানিনী ঈর্ষা-পূর্ণ-হৃদয়া সান্ত্বনাছলে মিষ্ট তিরস্কার করিয়া যাইতেছেন। একটি বালক বোধ হয়, তাহাকে কেহ শিখাইয়া দিয়া থাকিবে, রাধার সন্নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,

"প্রেমডোরে যায় বাঁধিলে
রাখ্‌লে কে তায় ধরি?
কলঙ্কটি রইল পড়ে,
হরিবোল হরি।"

এই কথা শুনিয়া রাধিকা সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বালকের মুখচুম্বন করিতে করিতে এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন।

কি নাম শুনালি রে আমায়!
বল বাছা বল মোরে,
কে নাম শিখালে তোরে?
কোথা পেলে মহারত্ন, কে দিল তোমায়?
হরিশূন্য বৃন্দাবনে,
আজ রাধা শূন্য মনে?
হরি আশে পথে পথে ঘুরিয়ে বেড়ায়;
বল রে দুধের ছেলে!
এ ঔষধ কোথা পেলে?
একবার পিয়ে যাহা সব জ্বালা যায়।

নাম রে কি এতগুণ তোর!
এ শূন্য হৃদয়াগারে
পূর্ণ করি সুধাধারে,
একেবারে করে দিলি
রসেতে বিভোর;
একেবারে মাতাইয়ে,
অন্তরের অন্তরে গিয়ে,
মন সাধে ঘুচাইলি বিরহের ঘোর!

রাধা তোরে পায় কেবা আর!
নামে নামে যোগ করি,
মনোমত গঠি তরী,
রঙ্গে ভঙ্গে চলে যাবি যমুনার পার।
যাইয়া হেরিবি শ্যামে,
আনন্দে বসিবি বামে,
বৃন্দাবনে বসে পাবি আনন্দ অপার।

কাজ কি তোমারে শ্যামরায়!
সুদূরে বসিয়া আজ,
পরিয়া নামের সাজ,
ঘুচাইবে রাধা তব বিরহের দায়।
নাম নয় তোমার মতন
চিরদিন তোমা লাগি,
কেঁদেছে রাধা অভাগী,
ভাবিতে ভাবিতে রাধা হত অচেতন;
নাম নয় তোমার মতন।
তোমার মতন জালা,
দিবে না সে তুই বেলা,
তব মত মজাবে না সেত অবলায়,
নাম নও তুমি শ্যাম রায়!

হরিনামে এত গুণ কে জানিত আগে রে
কে জানিত আগে?
একবার শুনি যায়,
প্রেমে প্রাণ পূরে যায়,
প্রথমেই এসে যেই তোষে অনুরাগে।
জানিলে এগুণ তব,
ওহে কাঙ্গালিনী ধব,
ছাড়ি শ্যামে তোমা নাথ
ভজিতাম আগে।
হরি কলঙ্কিনী হয়ে কি সুখ লভেছি হে,
বলদেখি শ্যাম!
তোমার লাগিয়ে রাধা,
ছাড়িল সংসার বাধা,
তুমি হলে বাম।
ঝুরিলে তোমার তরে,
হাসে, গালি দেয় পরে,
সবাই ছাড়ে সে পথ, যেথা ছলে রাধা।
কিন্তু ওহে গুণধাম,
ভজিলে তোমার নাম,
কেহ কি পারিত মোর
সুখে দিতে বাধা?

বাধা দেওয়া দূরে থাক
যে যেথায় আছে হে
গোকুলে রমণী,—
তোমার নামের গুণে,
সকলে রাধার সনে,
মনোরঙ্গে হইবে হে নামে কলঙ্কিনী।
মনোরঙ্গে সবে মিলি,
হরি হরি হরি বলি,

হরি হরি হরিনাম রোপিব গোকুলে,
হাসিবে নাচিবে রাই,
প্রেমে মাতি হে কানাই!
হৃদি হতে শোকশল্য সুখে দিব তুলে।

শ্যামহে তোমার লাগি ঝুরিব না আর,
শ্যাম হে তোমার লাগি,
তব প্রেম ভিক্ষা মাগি
পথে ঘাটে গোঠে মাঠে ফিরিব না আর;
শ্যাম হে তোমার তরে,
কাঁদিব না আর।
শ্যাম হে তোমার তরে,
ভাসাব না হৃদয়েরে,
না ভিজাব ধরাবক্ষ ফেলি অশ্রুধার।

শ্যামরায় ঘুচে গেছে, রাধার যন্ত্রণা,
তোমা বিনা শূন্য মনে,
একাকিনী ধরাসনে,
আশা শূন্যা, শূন্যে চেয়ে
আত্মহারা হব না।
আর খাবনা হে শ্যাম সখীর গঞ্জনা—

আবার প্রেমমদে মাতাতে জীবন
হয়েছে অভিলাষ;
আবার হয়েছে আশা,
পাইতে হে ভালবাসা,
আবার খেলিতে ইচ্ছা আনন্দের সনে।
আবার রাধার ঘরে,
কেঁদে হাতে পায়ে ধরে,
আনন্দে রাখিতে বারমাস
রাধার হয়েছে অভিলাষ।

যেথায় যাইবে রাধা,
নাম সঙ্গে যাবে গো!
ওহে বনমালী!
ও নামের শ্রীচরণে
জীবন যৌবন মনে
সব দিনু ডালি।
শ্যাম হে তোমার আশা,
তোমা ধনে ভাল বাসা
পরিহরি সব আজ নামে দিনু দান;
বুঝেছি বুঝেছি হরি!
রাধিকার দুঃখ হরি,
বাঁচাইতে কেহ নাই নামের সমান।

নামে অবহেলা করি
যে শ্যামে ভজিতে চায়,
সে কি তারে পায়?
না লয়ে হরির নাম,
হরি লাভে মনস্কাম,—
পুরিবে না বৃথা আশা, বৃথা সমুদায়।

তবে কেন পুড়ে রাধা চিন্তার কবলে?
পুনঃ জ্বালো হৃদে আলো
হরি হরি বলে।
ঘুচাও হৃদয় ব্যথা অন্তর আঁধার লো।
হরি বিলাসিনি!
নিজদোষে এতকাল,
ঘটায়েছ এ জঞ্জাল,
নিজদোষে এত কাল হরি বিরহিণী।
নিজ দোষে এসংসার,
তব চক্ষে অন্ধকার,
নিজদোষে এতকাল, তুমি কাঙ্গালিনী।

আর ভাবিও না রাধা !
আর, ঘুরিও না লো !
কাছে আছে ধন,—
শোকচিহ্ন পরিহরি,
সুখে বল হরি হরি !
হরিনাম সুধা-নীরে হও নিমগন।

ও সুধা সংগ্রহ করি,
সর্ব্বাঙ্গে মাখাও 'হরি'
মুখে বল হরি হরি ! হৃদে রাখ হরি,
নামের নাই গো তুল,
ও নামে পাইবে কুল,
হরিনাম তরী ; হরি,—ভবের কাণ্ডারী।

যাব আজি কালিন্দীর কূলে;—
অম্বুকুম্ভে আজি হরি !
হরিনাম সুধাভরি,
মন সাধে ঢেলে দিব যমুনার জলে।
মন সাধে সেই জলে,
অবগাহনের ছলে,
পবিত্র করিব আজি গায়;—
ভাসিয়া তরঙ্গ সঙ্গে,
আজি প্রভু মনোরঙ্গে,
প্রাণের অনিন্দ রাধা দেখাবে তোমায়।

এক রূপ দরশনে কি আনন্দ হয় গো !
কেমনে বলিব ?
আজি যমুনার নীরে,
প্রত্যেক তরঙ্গ শিরে,
সেই মত শত শত মুরতি হেরিব।

কালিন্দী হিল্লোলকোলে,
সে মূরতি ঢলে ঢলে,
হাসি হাসি আমায় হাসাবে বারেবার;
শুনিয়া নীরব গান,
হবে মুগ্ধ মত্ত প্রাণ,
ভাব দেখি রাধাতে কি রাধা রহে আর ?

যাব কদম্বের মূলে থাকিতে যথায় হে !
বংশীলয়ে করে।
যাহার মধুর রব,—
হরিত রাধার সব,—
শুনিলে যা থাকিতে না পারিতাম ঘরে।
ইচ্ছায় হারাতে মন
ওহে রাধিকারমণ !
নিজে যাব ছড়া দিব কদম্বের গায়,
আবার তাহার তলে,
ঢেলে দিব কুতূহলে,
প্রাণ-ভরা হরিনাম সুধা শ্যামরায় !
সে মধুর রস পিয়ে,
কদম্ব প্রেমে মাতিয়ে,
প্রতিশাখে প্রতি পত্রে ধরিবে হে গান !
শুনিবে যখন কাণে,
সে মধুর হরিগানে,
বল দেখি কোথা রবে রাধিকার প্রাণ ?
বল দেখি যবে হরি,
অসংখ্য মূরতি ধরি;
মিশিয়া সে গান সনে দিতে আলিঙ্গন,
আসিবে রাধার পাশে,
ডুবিয়া মধুর ভাষে,
প্রেমমদে মত্ত তুমি, কি করি তখন !

আমি গো সাধিব না তোমায়!
করিব হে কালাচাঁদ,
শ্রীহরি নামের ফাঁদ,
পড়িয়া তাহাতে তুমি সাধিবে আমায়!

গুঞ্জরিবে অলি যবে মঞ্জু কুঞ্জবনে হে!
ফুল কুল বঁধু।
রাধা যাইয়ে সেথায়,
সে রম্য কুসুম-গায়
মাতাইতে মধুকরে মাথাইবে মধু।—
মধু সূদনের নাম,
পূরাইবে মনস্কাম;
সুধাপানে যবে সবে ধরিবে হে গান!
সে নামের কোলাহল,
পূর্ণ করি বন স্থল,
বল দেখি দিবে মোরে কি আনন্দ দান!

মধুপ গাইবে হরি!
বিটপী গাইবে হরি!
হরি হরি নামে পূর্ণ হইবে গগন,
সুখের তরঙ্গ তুলে,
সমীরণ কুতূহলে
নাম সুধা ছড়াবে, ভাসাবে বৃন্দাবন।

চন্দ্রার কুঞ্জেতে গেলে রাধার অন্তর গো
পুড়ে হতো ক্ষার।
আজি হরি অকাতরে,
বৃন্দাবনে ঘরে ঘরে,
হাসিতে হাসিতে হরি! প্রেম দিব ধার।

বন্ধন অন্যোন্ন প্রেমে সহিত না যার!
সেই রাধা ফুল্লমনে,
প্রতি ঘরে বৃন্দাবনে,
সবার পীরিতে পদ বাঁধিবে তোমার।
রাখিব সবার পাশ,
পুরাব সবার আশ,
বাড়িবে বাসনা মোর আশা পূর্ণ হবে।
করিলেও বিতরণ,
রাধার বাড়িবে ধন,
রাধার এ পোড়া মন সুশীতল রবে।

আয় তবে ব্রজনারী
কে আসিবি আয়লো!
কে আসিবি আয়।
আয় লো ব্রজের বালা
কে ঘুচাবি ভবজ্বালা,
সুখনদী পারে তোরা
কে আসিবি আয়!

কর না বিলম্ব আর, ঘুচাইতে অন্ধকার,
এনেছি প্রেমের চাঁদ, আয় তবে ত্বরা,
পাইলে একটি নাম পূর্ণ হবে ঘর লো
নাম সুধারসে।
নিকটে থাকিলে নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
মথুরার হরি তোরা ঘরে পাবি বসে।
আয় ভাই সবে মিলি
হরি হরি হরি বলি.
একা হরি এককালে সকলে বাঁধি।
প্রত্যেক ভবনে তায়
দিয়া প্রেমডোর পায়,
আপন আপন পাশে ধরিয়া রাখিব।

আয় তবে ব্রজনারী!
হাত ধরাধরি করি,
হরি হরি বলি আয় সবে সমস্বরে,
আয় উচ্চ করি গান,
জাগুক জগতপ্রাণ
মাতুক শ্রীহরি প্রেমে জগতের নরে।

বল রাধা হরি হরি, হরি হরি বোলে,
চিরকাল মগ্ন রও নামের কল্লোলে॥
কালও পদযুগলে, স্মরি দেবি কেঁদে বলে,
দাওগো ও মহামন্ত্র সকলের কাণে;
ঘুচিবে গো ভব ভয়, হইবেক প্রেমময়,
সংসার, মাতুক এবে, বাঁচুক পরাণে।

মনুষ্যের ভোজ্য।

মানবজাতির কোন্ দ্রব্য ভোজ্য, কোন্ দ্রব্য অভোজ্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে, এবং অতি আদিম অবস্থার মনুষ্য কি খাইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহা বলাও কঠিন। তবে পৃথিবীতে এক্ষণে যে সকল অসভ্য জাতি আছে, তাহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কতক কতক বলা যাইতে পারে যে আদিম কালে মনুষ্যেরা কিরূপ দ্রব্য আহার করিত। কারণ সভ্যতা আধুনিক কালের বিকাশ। পূর্ব্ব কালে হয় ত সকল জাতীয় মনুষ্যই অসভ্য ছিল সুতরাং অসভ্য মানুষে এখন যাহা খায়, পূর্ব্বকালের মানুষেরাও হয়ত তাহাই খাইত। কিন্তু এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমার মনে একটি খট্‌কা উপস্থিত হইতেছে। বিজ্ঞানবিদ্ ডারবিন সাহেবের যুক্তি যদি বিশুদ্ধ হয়, যে বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে, মানুষ কি প্রকারে মাংস ভোজী হইল, তাহা আমি শীঘ্র বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মানুষের ন্যায় বানরেরও মাংস ছেদনের দন্ত আছে, কিন্তু গোরিল্লা হইতে আমাদের জঙ্গলের সামান্য মরকট বানর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রকার বানর আছে, তাহার কোন জাতীয় বানরই মাংস ভোজী নহে। তবে কি প্রকারে মানুষ মাংসাশী হইল? এই প্রবৃত্তি কি ক্রমশ অর্জ্জিত প্রবৃত্তি, না ইহা লইয়াই মানুষের জন্ম হইয়াছিল? আমার একজন ডারবিন তত্ত্বজ্ঞ বন্ধু বলেন যে, মনুষ্য প্রথমে, ফল মূলের উপরে নির্ভর করিত, কিন্তু সকল স্থানে এবং সকল সময়ে তাহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ক্রমশ মাংস খাইতে তাহাদের অভ্যাস হয়। এই অনুমানটি আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ মাংসের ব্যবহার মনুষ্য মধ্যে এমন ব্যাপক এবং দৃঢ়, যে তাহা মানুষের স্বভাব সিদ্ধ

বলিয়াই বিবেচনা করিতে আমরা বাধ্য, অর্জ্জিত ব্যবহার কিম্বা অভ্যাসের ফল বলিয়া বোধ হয় না।

সভ্য মনুষ্যের আহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমাদের কোন লাভ হইবে না; কারণ সভ্য মনুষ্যের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বহুবিধ কারণে খাদ্যাখাদ্যের অনেক ব্যত্যয় এবং বিভিন্নতা হইয়া উঠিয়াছে। অসভ্য জাতীয় মধ্যে এখনও তাহা হয় নাই; হইলেও এত অল্প মাত্রায় হইয়াছে যে তাহা আদিম অবস্থা বলিয়া অনায়াসে পরিগণিত হইতে পারে। এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণের ন্যায় বোধ হয় আর অধিক অসভ্য মনুষ্য নাই। পশু হইতে ইহাদের অতি অল্প প্রভেদ; ভাষাও এত অসম্পূর্ণ, যে চারির অধিক ইহারা গণনা করিতে পারে না। তাহাদের দৃষ্টির উপরে যে সকল বস্তু আছে, সে সকলেরও তাহাদের ভাষায় নামাকরণ নাই। দেখিতেও তাহারা এমন কদর্য্য যে তাহাদিগকে এক প্রকার বন-মানুষ বলিয়াই বোধ হয়। এখনও তাহারা বস্ত্র কিম্বা অন্য কোন প্রকার শরীরের আচ্ছাদন ব্যবহার করে না, উলঙ্গ হইয়া থাকে। বাস স্থানের জন্যও তাহারা কুটীর কিম্বা ঘর প্রস্তুত করিতে জানে না।

আমার ঠিক স্মরণ নাই কিন্তু বোধ হয়, ১৮৫৫ কি ১৮৫৬ সালে ডাক্তার মাওয়াট সাহেব বঙ্গাদি প্রদেশের কারাগার সমগ্রের প্রথম তত্ত্বাবধারক পদে নিয়োজিত হইয়া বৃটিশ ভারতের দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগের নির্ব্বাসনের স্থান নির্ব্বাচনের নিমিত্ত আন্দামান দ্বীপ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পরে ডাক্তার সাহেব তথাকার ৪।৫ জন আদিমবাসীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। আহারের জন্য তাহাদিগকে অনেক দ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু একটি শূকর বৎস পাইয়া তাহারা যে প্রকার আনন্দ প্রকাশ করে, সেইরূপ আর কিছুতেই করে নাই। শূকর বৎসটি দেখিবা মাত্রই তাহারা নৃত্য এবং আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল, অবশেষে সকলে মিলিয়া দন্ত এবং হস্তের নখ দ্বারা তাহা বধ ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রক্তপান ও মাংস ভোজন করিয়া ফেলিল। বৎসের দেহের কোনও ভাগই তাহারা পরিত্যাগ করিল না এবং তাহাদের খাইবার জন্য লবণের কিম্বা অন্য কোনও উপকরণেরও আবশ্যক হইল না। সুপক্ক রম্ভা, আম্র প্রভৃতি অনেক সুখাদ্য ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইত, তাহাও তাহারা খাইত, কিন্তু শূকর বৎস পাইয়া তাহারা যেরূপ হর্ষিত হইয়াছিল এমন আর কিছুতেই

হয় নাই। ইহাতেই সুন্দর রূপে বুঝা যাইতেছে যে অসভ্য মনুষ্যের নিকট ফল মূল অপেক্ষা মাংসই আদরণীয়।

সকলে জানেন যে অনেক জাতির মধ্যে নর মাংস আহার্য্য দ্রব্য। কেবল অসভ্যদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত এমন নহে, অনেক অর্দ্ধ সভ্য জাতিও নর মাংস ভক্ষণ করে। বহু কালের কথা নহে ভারতবর্ষের অনেক অনার্য্য প্রদেশে মানুষে মানুষ খাইত এবং এখনও কুকী নাগা, আখা, লুসাই, গারো, প্রভৃতি জাতিরা নরমাংস ভোজন করিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বুসমান জাতি বিষ্ঠা ভক্ষণ করে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বাসীদিগের মধ্যে কোন জীবই পরিহার্য্য নহে। বৃক্ষের বাকলের ভিতরে যে সকল পোকা থাকে, তাহা তাহাদিগের নিকট বড় উপাদেয় বস্তু। অত্যন্ত অসভ্য মনুষ্যে অগ্নি ব্যবহার করিতে জানে না; যাহা পায় সকলই কাঁচা খায়। কিঞ্চিৎ অসভ্যতা দূর হইলে পরে অগ্নি ব্যবহার করিতে শিখে, তখন দগ্ধ মাংস খাইতে ভাল বাসে। সভ্যতার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে লবণ ও সিদ্ধ পক্ক বস্তুর ব্যবহার আরম্ভ হয়। গ্রীস্ রোম প্রভৃতি দেশে সভ্যতার উন্নতি হইলে পরেও মিষ্ট খাইতে হইলে, মৌমাছির চাক ভাঙ্গিয়া মধু খাইত। খর্জ্জুর গাছের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া এবং ইক্ষু দণ্ড পেষণ করিয়া চিনি প্রস্তুত করা কেবল ভারতীয় আর্য্য মহাশয়েরাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাতেই সংস্কৃত শর্করা বাক্য হইতেই লাটিন, গ্রীক, ফার্সি এবং অন্যান্য ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহে শক্কর, শাকেরস, শুগার নাম গুলির উৎপত্তি হইয়াছে। মনুষ্য কুম্ভকারের বিদ্যা শিখিলে পরে আহারের দ্রব্য সিদ্ধ পক্ক এবং দুই তিন বস্তু একত্রে মিশ্রিত করিয়া লওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশের মনুষ্য কদর্য্য দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অসভ্য অবস্থায় যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার ছিল, এখনও তাহাই আছে; তবে এই মাত্র প্রভেদ যে পূর্ব্বকালে ঐ সকল দ্রব্য তাহারা কাঁচা খাইত, এক্ষণ তাহা রন্ধন করিয়া খায়। চীনের ন্যায় এমন সভ্য এবং শিল্পপটু রাজ্যে এখনও ইন্দুর, ভেক, খাওয়ার প্রথা খুব প্রচলিত। তাহাদের আর একটি আহারীয় দ্রব্যের কথা শুনিলে আমার হিন্দুপাঠকগণ ন্যক্কার করিবেন। চীনারা বিষ্ঠার কৃমি বড় উপাদেয় বস্তু বলিয়া জ্ঞান করে এবং চীনের সম্রা... নিমিত্ত ভাল কৃমি জন্মাইবার জন্য

বড় বড় বিষ্ঠার হ্রদ প্রস্তুত করা আছে। আমাদের মলহ্রদ দীর্ঘকাল অপরিষ্কার থাকিলে তাহাতে যে শাদা শাদা লাঙ্গুলযুক্ত কৃমি জন্মে সেই কৃমিই চীনামানের আদরের আহার। আমাদের দেশে যেমন গোয়ালারা বাঁকে করিয়া দধি দুগ্ধ লইয়া বিক্রয় করে, সেইরূপ চীন রাজ্যের ক্যাণ্টন প্রভৃতি সহরে বাঁকে করিয়া একদিকে এক হাঁড়ি ভাত, আর দিকে আর এক হাঁড়ি তরকারী ও বাঁকের মধ্য স্থানে সিদ্ধপক্ক ১০।১২টা বড় ইন্দুর লেজে ঝুলাইয়া "চাই ইন্দুর" বলিয়া দিনের বেলায় ফিরি করিয়া বিক্রয় করে। তদ্ভিন্ন সোয়ালো বা তালচঞ্চু (অথবা তালচোঁচ) নামক পক্ষীর বাসা ঐ রাজ্যে অতি আদরণীয় আহারের সামগ্রী। এই পাখী আন্দামান ও বোর্ণীয় প্রভৃতি দ্বীপের অগম্য পর্ব্বত গুহার মধ্যে বাসা করে। বাসার ভিতর ভাগটা একরূপ ধবল বস্তু দ্বারা পক্ষীরা আচ্ছাদন করে। সেই শ্বেত বস্তু কিছু কাল জলে সিক্ত করিলে স্ফীত এবং নরম হয়, তাহা কুক্কুটের যূষে কিম্বা অন্য প্রকার ঝোলে মিশাইলে নাকি অত্যন্ত সুখাদ্য হয়। ইহার এক সের ১৫০ মূল্যে বিক্রীত হয়।

মগদিগের আহারও অতি কদর্য্য, মরা এবং পচা মাংসে তাহাদের অশ্রদ্ধা নাই। শুনা আছে, যে যদি কোন স্থানে একটা হস্ত মরে, তাহা হইলে তাহার চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা আসিয়া তাহার মাংস কাটিয়া লইয়া যায়। তদ্ভিন্ন তাহারা ব্যাং, ইন্দুর, গিরগীটে, গোসাপ, মাকড়শা, আরশুলা এবং বড় বড় সর্পও খাইতে ক্রটি করে না। বিশেষ তাহাদের মধ্যে ঞাপী নামক যে এক নিত্য আহারের দ্রব্য আছে তাহা শুনিলে, আমাদের চমৎকার বোধ হয়। একটা হ্রদ করিয়া তাহার মধ্যে নানা প্রকার মৎস্য, মাংস, এবং পোকা মাকড় পচাইয়া খুব দ্রব করে। আমরা যেমন রন্ধনে, মশলার ফোড়ন দিই এবং ভাতে ঘি মিশাইয়া খাই, মগেরা তদ্রুপ তাহাদের ব্যঞ্জনে ও ভাতে ঞাপী যুক্ত করিয়া খায়। তাহাদের বাজারে আমরা ঞাপীর গন্ধে প্রবেশ করিতে পারি না কিন্তু তাহারা উহা অতি সদগন্ধ বিবেচনা করে। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মগেরা ঘৃত কিম্বা তৈল ব্যবহার করে না, ঘৃত এবং তৈলের গন্ধে তাহাদের বমন হয়।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীনে ক্রোট নামক এক দল অশ্বারোহী সেনা আছে। ইহারা অত্যন্ত সাহসী এবং বীর্য্যবন্ত। যুদ্ধের সময় প্রত্যহ প্রাতে সমস্ত দিনের আহারের জন্য ইহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কাঁচা

মাগং ও কিঞ্চিৎ লবন এবং মরিচ চূর্ণ বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। মাংস দুই তিন খণ্ডে কাগজে জড়াইয়া অশ্বের পৃষ্ঠে রাখিয়া তাহার উপরে জীন বান্ধিয়া লয় এবং অশ্বারোহণ করিয়া যেখানে আবশ্যক চলিয়া যায়। আহারের সময় উপস্থিত হইলে, জীনের নিম্ন হইতে একখণ্ড মাংস টানিয়া বাহির করে। অশ্বের শরীরের উত্তাপে মাংস যে পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই ক্রোটাদিগের বিবেচনায় যথেষ্ট এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ এবং মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া অতি তৃপ্তমনে তাহা আহার করে। দক্ষিণ আমেরিকার পাটে-গোনিয়া প্রদেশের অধিবাসীগণ অত্যন্ত দীর্ঘচ্ছন্দ এবং বলিষ্ঠকায়; তাহারা এরূপ দীর্ঘচ্ছন্দ যে সাহেবেরা কাহাকেও অতিরিক্ত লম্বা দেখিলে, তাহাকে পাটেগোনীয়ান বলিয়া অভিহিত করেন। পাটেগোনিয়নেরা সর্ব্বদা অশ্বপৃষ্ঠে থাকে। পুরুষানুক্রমে তাহারা এইরূপ করাতে, তাহাদের হাঁটিবার শক্তি অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে যাত্রা করিবার সময়, তাহাদের আরূঢ় অশ্বের সম্মুখে কয়েকটা বৃদ্ধা অকর্ম্মণীয় অশ্বিনী লইয়া বাহির হয়। আহারের সময় উপস্থিত হইলে উহারই একটি অশ্বিনী বধ করিয়া যত আবশ্যক, কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে এবং অবশিষ্ট কিছু থাকিলে, তাহা প্রত্যেকে ভাগ করিয়া লইয়া পুনরায় যাত্রা করে। গ্রীণল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড, বেয়ারিং প্রণালীর তীর প্রভৃতি হিম-প্রধান প্রদেশ সমস্তে, বস্ত্রের নিমিত্ত শ্বেত ঘোটক, শীল মৎস্য, কাল শৃগাল প্রভৃতি জন্তুর চর্ম্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জন্তুর দেহ হইতে চর্ম্ম খুলিলে পরে, তাহাতে যে সকল চর্ব্বি, মাংস এবং শিরা প্রভৃতি অপরিষ্কার দ্রব্য লাগিয়া থাকে, তাহা স্ত্রীলোকেরা জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া পরিষ্কার করিলে, তাহা পোষাকের উপযোগী হয়। একুইমোর মেরুদেশবাসী কুক্কুরের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল অসভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য জাতির কথা বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে অতি সভ্য জাতিরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাহার কথা কিঞ্চিৎ বলিব। ফরাসী এবং আমেরিকা দেশে ব্যাঙ্গের ব্যবহার আছে; ঐ সকল দেশবাসীরা ঘোটক এবং গর্দ্দভের মাংসও খাইয়া থাকেন। আমাদের ইং-রাজ বাহাদুরদিগের দেশে যদিও ঐ সকল মাংস প্রকাশ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না তথাপি গো-মাংস বলিয়া মাংস বিক্রেতারা বৃদ্ধ এবং অকর্ম্মণ্য ঘোটক এবং গর্দ্দভের মাংস চালায়। মাংস সিদ্ধ করিয়া সসেজ নামক এক প্রকার

খাদ্য প্রস্তুত হয়। জনরব এই যে সামান্য লোকের নিমিত্ত লসেজে বিড়াল কুক্কুর ও ইন্দুরের মাংসও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সাহেব-দিগের খাদ্য যেরূপ থাকুক কিন্তু এক্ষণে আহারের প্রতি তাঁহাদের খুব নজর আছে, তথাপি অনেক বিষয়ে তাঁহাদের হাড়ে টক্ রহিয়া গিয়াছে। মুক্তা-প্রসাবিনী বড় ঝিনুকের মিষ্টতা এখনও তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। চিমটা দ্বারা ঝিনুকের মুখ খুলিয়া তাহার নাড়ি, ভুঁড়ি শাঁস গুলা গলার মধ্যে ঢালিয়া এক ব্যক্তি ৫।৬ টা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেন। তাঁহাদের দেশীয় ঝিনুকই তাঁহারা উৎকৃষ্ট বোধ করেন এবং তাই তাঁহারা "নেটিব" বলিয়া আদর করিয়া ডাকেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের পনির এবং শূকর মাংসে পোকা জন্মিলেই তাহা উত্তম খাদ্য হয়।।

কলিকাতায় মেঃ বেরিগণী নামক এক জন খ্যাত্যাপন্ন হোমিওপেথিক ডাক্তার ছিলেন, তিনি ফরাসি। এক দিবস তাঁহার সহিত খাদ্যাখাদ্যের বিষয় সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইতেছিল। তাহাতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষের লোকেরা যেমন সদ্য মাংস ভালবাসে, তাঁহাদের দেশে তাঁহারা সেরূপ জ্ঞান করেন না। মাংস কিঞ্চিৎ নরম না হইলে, তাঁহাদের মুখে তাহা ভাল লাগে না। এই নিমিত্ত তাঁহাদের রাজধানী পারি নগরের বড় বড় হোটেলে যে সকল কাষ্ঠের পায়খানার বাক্স আছে, তাহাতে দুই তিন দিবসের বিষ্ঠা জমিতে দেওয়া হয়। তাহা ক্রমে পচিয়া উঠে ও ভিতর হইতে বিষ এবং উত্তপ্ত বাষ্প উঠে। সদ্য মাংস খণ্ড সকল কাগজে জড়াইয়া, তাহাতে বিষ্ঠা না লাগে এমন করিয়া, ঐ বাক্সের মধ্যে ৫।৬ ঘণ্টা কাল বন্ধ করিয়া রাখা হয়। বাক্সের বিষ্ঠার উত্তপ্ত বাষ্পে মাংস শীঘ্র নরম ও সিদ্ধের ন্যায় হইলে, আহারের জন্য অতিশয় উপাদেয় হইয়া উঠে! বেরিগনী সাহেব বলিলেন, যে তিনি খাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার মুখে তাহা অত্যন্ত সুস্বাদ বোধ হইয়াছিল। আমি এই কথা শুনিয়া "রাম রাম" বলিয়া উঠাতে তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, যে সভ্যতার উন্নতাবস্থায় পৌঁছছিতে আমাদের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। থাকুক বিলম্ব, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু এই সকল পিশাচের ঔষধ সেবন করা উচিত কি না, তাহাই চিন্তার কথা বলিয়া, তখনই আমার মনে উদয় হইয়াছিল।

আসল কথা বুঝিয়া দেখা ভাল যে, কেন আমরা মাংস খাই? জীব হত্যা

না করিলে কি মানুষের আহার চলে না? মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যখন বিলাত গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই থান হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার ইণ্ডিয়ান মিরার সংবাদ পত্রে ইংলণ্ডের এবং ইংলণ্ড বাসীদিগের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতেন। বিলাতী ভোজের তিনি যে সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায়, যে সাহেবদিগের খানার মেজ, এক রূপ পশ্বালয় (Menagerie) বিশেষ। বাস্তবিক তাহাই ঠিক কথা, কারণ সাহেবদিগের একটা বড় খানার হিসাব দেখিলে, উপলব্ধি হইবে যে, তাহাতে ভূচর, খেচর এবং জলচর সকল প্রকার জীব আছে। জলচর মধ্যে কচ্ছপ, ঝিনুক, কর্কট ও নানাবিধ মৎস্য; খেচরের মধ্যে মুর্গী, রাজ হংস, পাতি হংস, পেরু, কবুতর এবং ভূচরের মধ্যে গাভী, মেষ, ছাগ, হরিণ, শূকর, শশক প্রভৃতি জন্তু। প্রত্যহ এই রূপ ভোজে যে কত সংখ্যক প্রাণী হত্যা হয়, তাহা কে গণনা করিয়া উঠিতে পারে? অনেকে বলেন যে যখন স্বভাবের নিয়ম এই যে, এক জীব আর এক জীবকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে এবং মাংসাশী জন্তুর ন্যায় মানুষেরও মাংস খাওয়ার উপযুক্ত কয়েকটি দন্ত আছে,—বিশেষ অনেক ধর্ম্ম শাস্ত্রেও মাংস ভক্ষণের অনুমতি আছে, তখন আমরা মাংস খাইব না কেন? সত্য বটে; কিন্তু আমরা মাতৃ গর্ভ হইতে অনেক পাশব বৃত্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হই,—তাহা ত সকলই আমরা দমন করিতে শিক্ষা করি, তবে কি নিমিত্ত আমরা কেবল ভক্ষ্য ভোজ্য বিষয়ে পশুদিগের অনুকরণ করিব? পরমেশ্বর পশুদিগকে যাহা দেন নাই, তাহা দিয়া মনুষ্যকে জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য করিয়াছেন। বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য ভূমি কর্ষণ করিয়া নানা প্রকার আহারের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে, এবং দয়ার মহিমায় জীব হত্যায় ক্ষান্ত থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যের সদ্‌গুণ সমস্ত সুন্দর রূপে পরিচালিত হইলে, মাংস ভোজনের আবশ্যকতা থাকে না এবং মাংস ভোজন করিতে পারে না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে মাংস না খাইলে মানুষের বল বীর্য্য হয় না এবং মানুষে যুদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু প্রথম কথা, যুদ্ধ-পটুতাই কি মনুষ্যের এক মাত্র পরম আরাধ্য বস্তু? দ্বিতীয় কথা, যদি মাংস ভক্ষণই যুদ্ধ-পটুতার কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদের সিপাহী, মারহাট্টা, শীখ, এবং গুর্খা সৈন্য—যাহারা আট্টা, চাউল, বুট, চিড়া প্রভৃতি খাইয়া থাকে, তাহারা আমাংসভোজী গোরা সৈন্যের অপেক্ষা যুদ্ধ বিষয়ে অপকৃষ্ট নহে কেন?

যাহাই হউক, মাংস ভক্ষণের দোষ গুণ পরীক্ষা করিতে অদ্য আমরা প্রবৃত্ত নহি। সে অনেক কথার কথা; তবে মহামাংসভোজীগণের পাকশালার সঙ্গে, একবার হিন্দুর নিরামিষ রন্ধন শালার তুলনা করিতে বলি; তুলনার পর আপনি যদি বুক ফুলাইয়া বলিতে চান, যে ভিন্ন রুচির্হি লোকা—তবে তাহাই বলিবেন। তাহাতে আমি কিন্তু অতি কুণ্ঠিত ভাবে, কপালে হাত দিয়া সেই কথাই বলিব, যে, ভিন্ন রুচির্হি লোকা।

পাঠক এখন একবার এক বাবুর্চিখানায় পদার্পণ করুন; দেখিবেন ঘরের মধ্যে এক দিকে কয়েকটা গলাকাটা মুর্গী ছট ফট করিতেছে; আর এক দিকে একটা মেষের কিম্বা বাছুরের শব ঝুলাইয়া চর্ম্ম হইতে মাংস বাহির করিয়া লওয়া হইতেছে; ঘরের মেঝের উপরে চতুর্দ্দিকে রক্ত, নাড়ি, ভুঁড়ি ও গোঘাসী বিস্তীর্ণ হইয়া আছে; দুর্গন্ধ নিষ্কাশিত হইতেছে। সমস্ত শরীর দাদে-ভরা ভিস্তী সাহেব আসিয়া তাহার কত কালের অধৌত পুরাতন শৈবাল পূর্ণ মসক হইতে জল ঢালিতেছেন। একটা বৃহৎ মেষের মুণ্ড দাঁত খিচাইয়া শিব-নেত্রে তাকের উপর বিরাজমান। মুণ্ডের এক শৃঙ্গে বাবুর্চির নিমুর টুপি, অন্য শৃঙ্গে জবায়ের রক্তমাখা ছোরা খানা ঠেসান রহিয়াছে। এক খানা বড় টিনের প্লেটে, আটা, বেসম, লালে জোলে কতক গুলা ডিমের খোলা, আর বাবুর্চি সাহেবের কাঁকুই এবং ক্রস্। গৃহ অঙ্গন সমস্তই ক্রমে লশুনের গন্ধে পরিপূরিত। পক্ষান্তরে কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের রন্ধন-ঘরে আগমন করুন। যদি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে দেখিবেন, যে উনানের ভিতর পর্য্যন্ত সমুদয় ঘর সদ্য লেপা পোঁছা; ঘরের মেঝেয় শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা, নবধৌত আলুলায়িত কেশ যুক্তা, হাস্য বদনা, কয়েকটি স্ত্রীলোক কেহ কুটনা কুটিতেছেন, কেহ বাটনা বাটিতেছেন; কেহ বা দুগ্ধ জাল দিয়া বাটিতে ঢালিতেছেন কেহ বা ডালে কাটি-দিতেছেন। বাসন গুলি মার্জ্জনের গুণে দর্পণের ন্যায় ঝকমক করিতেছে; কোনও রূপ দুর্গন্ধ কোথাও নাই। পাচক, পরিচারক, রন্ধনের দ্রব্য জাত, বাসন, যন্ত্র সকলই পবিত্র। আমি মানব রূপ; ব্যাঘ্র শৃগালের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা যথার্থ মানুষ, তাঁহারাই বুঝিবেন, যে ইহার কোন্‌টি ভাল। ইহার কোনও সন্দেহ নাই যে মনুষ্যের যত জ্ঞানের ও দয়ার উন্নতি হইবে, ততই বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" তাহাদের অনুপালনীয় হইবে।

যম।

যম! কে বলে তোমায় অপ্রিয়, কে বলে আততায়ী, কে বলে তোমায় দুরন্ত! তুমি যদি আমার অপ্রিয়, তবে আমার প্রিয় কে এখন শমন? যা' নিয়ে আমার সুখের সংসার, প্রফুল্ল পরিবার, যা নিয়ে আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যা যা জড়িয়ে আমার আশা—ভালবাসা,—বড় সাধের গৃহস্থালী, তা, যম, তোমার ঘরে,—তোমার উদরে। যাঁদের জন্য আমি, আমার জন্য যাঁরা, তাঁরা তোমার গৃহে বাস করিতেছেন, তোমার তত্ত্বাবধানে সেবা শুশ্রূষা পাইতেছেন। তোমায় অনাত্মীয়, অপ্রিয় কেমনে বলিব? যাঁদিগকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, নয়ন অপেক্ষা দীপ্তিমান্, আত্মা অপেক্ষাও আত্মীয় জ্ঞান করিতাম এবং করি, তাঁরা এখন তোমার আলয়ে, তোমার যত্নে অবস্থিত। তুমি আমার প্রিয় বস্তু গুলির প্রহরী। কোন্ প্রাণে তোমায় অপ্রিয় ভাবিব যম! যে সকল আমার সংসারের সুকুমার বন্ধন, যাহা বন্ধনে সুখ, সুখে আশা, আশায় আগ্রহ, আগ্রহে অনুরাগ, অনুরাগে উৎসাহ, উৎসাহে উত্তেজনা—আমার কার্য্যের কারণ ও কৌশল—আমার পরিশ্রমের, লক্ষ্য ও ফল—আমার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ ও ফলে পরিপক্ক—আমার বুদ্ধির বৈচিত্র, বিদ্যার ব্যুৎপত্তি, জ্ঞানের গৌরব,—আমার পুণ্যের প্রবর্ত্তক, পাপের নিবর্ত্তক, ধর্ম্মে বেদ, অধর্ম্মে নিষেধ,—আমার বুকের বল, চরিত্রের বল, হৃদয়ের সম্বল,—আমার চিন্তায় মন্ত্রণা, শোকে সান্ত্বনা, কার্য্যে কামনা,—আমার জীবন যাত্রার পুঁজি ও পাথেয়,—সকলই যম, তোমার নিকট। হায়! সে সবই পৃথিবীর পরিদৃশ্যমান বক্ষ হইতে তোমার অজানিত কক্ষে নীত হইয়াছে! আমার আদরের অঙ্কুরটি, সাধের মুকুলটি, সোহাগের কলিকাটি, প্রিয় ফুলটি, বহুযত্নের ফলটি—তোমার বাতায়ন পার্শ্বে সারি সারি সাজান রহিয়াছে। আমার স্বরোপিত চারা আপন ক্ষুদ্র ফুলবাড়ী হইতে ছিঁড়িয়া তোমার অসীম উদ্যান চত্বরে পাঠাইলাম। আমার বহু যত্নে পালিত, তরু পত্রে পুষ্পে সুশোভিত, ফুলে মুকুলে ভরা, আহা! ফল ধরে ধরে, ধরেছে, এমন সময়, স্নেহের, যত্নের ধনকে, পালিত প্রিয় তরুটিকে, নিজের অঙ্গন হইতে ফুলে ফলে উপড়াইয়া তোমার অনন্ত উদ্যানে পুঁতিলাম! তুমি অপ্রিয়! তবে প্রিয় কে? তুমি আততায়ী, তবে আত্মীয়

কে! অস্তিত্বের অস্থি—মজ্জা—রক্ত—মাংস—প্রাণ যাহা, জীবনের যথা-সর্ব্বস্ব যাহা, তাহা, যম, তোমার নিকট গচ্ছিত। তুমি আমার জীবনের যথা-সর্ব্বস্বের ভাণ্ডারী, আমার প্রিয়বস্তু কয়টির প্রহরী। কোন প্রাণে তোমায় অপ্রিয় ভাবিব, অনাত্মীয় বলিব, যম! পিতৃপ্রেমের পবিত্র জ্যোতি, মাতৃস্নেহের মধুর ছায়া,—আহা সে ছায়া কি শীতল! কি শান্ত! কি গাঢ়! কি প্রশস্ত! যদি সে ছায়ায় মুহূর্ত্তের তরেও একটিবার বসিতে পাইতাম,—সৌভ্রাত্রের প্রফুল্ল ফুল,—সে ফুল এ জীবনে আর ফুটিবে না, সে ফুলের সৌরভ এ জগতে আর ছুটিবে না, হায় সে ফুল ইহলোকে আর ফুটিবে না, পরলোকে ফুটিবে কি? ফুটিবে কি আর কোন খানে?—সেই জেঠ কনেঠ দুই ফুল? যাদব মাধব—জুঁই, চামেলি? ফুটিবে কি আর অমৃত অপরাজিতা,!—সৌভ্রাত্রের প্রফুল্ল ফুল, সৌহার্দ্দ্যের সরল জ্যোৎস্না, পিতৃপ্রেমের পবিত্র জ্যোতি, মাতৃস্নেহের শীতল ছায়া—আবার সেই স্নিগ্ধ ছায়ার উপর আর এক আদরের ছায়া,—সহোদরা সহোদর-সদৃশা লতাগুলির ছায়া,—এ সবই যম তোমার নিকট গচ্ছিত। এ সব,—আরও একটি দ্রব্য—সেটি অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কিন্তু হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসেছিল; আহা সে একটু হাসি, অস্ফুট অর্দ্ধস্ফুট একটু হাসি, এক বিন্দু, এক খানি মুখের,—সে হাসিটুকুও অহে যম! তোমার নিকট গচ্ছিত। মহান্ মহীরুহ হইতে আমার ক্ষুদ্র ফুলবাড়ীর কচি পাতাটি পর্য্যন্ত তোমার গৃহজাত করিয়াছি। অতএব এখন বল দেখি, তুমি আমার আততায়ী না আত্মীয়! তুমি অনাত্মীয়! এত করিয়াও ইহার পর কি তাই সম্ভবে? ভালবাসার অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে তুমি আমার প্রিয়, পরমাত্মীয়। আমার প্রিয়তমদের স্পর্শে তুমি আমার প্রিয় হইয়াছ; যথার্থই তোমার বড় ভালবাসি যম। যাঁরা আমায় বড় ভাল বাসিতেন, আমি যাঁদিগকে বড় ভাল বাসিতাম, তাঁহাদিগকে তুমি ভাল বাসিয়া ডাকিলে, আমি তোমায় ভাল বাসিব না? আমি কি এতই হৃদয়হীন, এতই কঠিন,—আমি কি এতই অকৃতজ্ঞ। না—না—না, আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসি; ভয় করি না। তোমায় ভয়? তুমি যে আমার—ভরসা। আহা এক মাত্র ভরসা তুমি। তোমারই ভরসায়, কেবল তোমারই ভরসায়, এখনও এ দেহ-যষ্টি বহিতেছি, এখনও শ্মশানের পোড়ামাটী ওলোট পালোট করিতেছি। পৃথিবীর আর

মাধ্যাকর্ষণ নাই। আমার পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ হারাইয়াছে। মনোরাজ্যে মাধ্যাকর্ষণ—মনোহারিতা। আমার পৃথিবীর মনোহারিতা যাহা, মনোহারিতার অবলম্বন আকর্ষণ যাহা,—তাহা, যম, তোমার রাজ্যে; কাজেই আমার পৃথিবীর আকর্ষণ যমালয়ে এখন বর্ত্তিয়াছে। পৃথিবীতে মনোহর পদার্থ তেমন আর আমার নাই, কাজেই তাহার আকর্ষণ আমার উপর আর তেমন নাই। যমালয়ই আমার মনোহর এখন, কারণ মনোহারী সামগ্রী তথায়। যমালয়ের মাধ্যাকর্ষণের টান বাড়িয়াছে; তাই না তোমায় ভালবাসি সর্ব্বান্তক! আমি তোমায় ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস কই? আমার উপর দিয়া গেলে, নীচে দিয়া গেলে, দক্ষিণে বামে ঘুরিলে, সম্মুখে পশ্চাতে সকল দিকে জুড়িয়া আমাকে প্রদক্ষিণ করিলে, নিকট নিকটতর নিকটতম আরও নিকট স্থান মাড়াইয়া গেলে, কিন্তু অঙ্গ ছুঁইলে না। হৃদয় ভাঙ্গিলে কিন্তু অঙ্গ ছুঁইলে না। আমিই কি তোমার এত অপ্রিয় হইলাম, আর তাহারা এত প্রিয় হইল! আমার অঙ্গ অশুদ্ধ, অপবিত্র তাই কি তাহা ছুঁইলে না, চারি দিকে বেড়া আগুণ জ্বালিয়া দিয়া গেলে তাহাকে শুদ্ধ করিবার জন্য। হইয়াছে, হে হইয়াছে! অঙ্গ অগ্নিশুদ্ধ হইয়াছে, তোমার অনলের পূর্ণ বিকাশে! এখন এস এস এস হে! গাঢ় আলিঙ্গন করি।'

যম তুমি দুরন্ত নও, অতি প্রশান্ত। কে বলে তোমায় দুরন্ত! দুরন্ত কি কখনও শান্ত করিতে পারে। চঞ্চল কি কখনও অচল করিতে পারে। যে চাঞ্চল্য চরাচরে ধরিত না, তাহা এখন কোথায়? সে কার্য্যাভিমুখী চাঞ্চল্য কোথায়, সুখ-সাহিত্যাভিমুখী চাঞ্চল্য—সংসার সম্ভ্রম আশা উদ্যমের চাঞ্চল্য—কোথায়? হায় সকল চাঞ্চল্য সংযত,—যম তোমার প্রভায়। যে সংকল্প-স্রোতে সপ্তসিন্ধু বহিত—শত স্বর্ণতরী ভাসিত, তাহা আজ কোথায়! সে দুরন্ত মনোবেগ, চিত্তবেগ, হৃদয়বেগ কে শান্ত করিল? যম তুমি, তুমি করিলে। তুমি শান্ত করিলে, আশান্ত করিলে। আশান্ত না হইলে কি কেহ শান্ত হয়? যম তুমি দুরন্ত নও, শান্ত। তুমি যম নও—সংযম। তুমি রশ্মি সংযম কর, মানুষের মনোরথের। মনোরথের বাসনা রজ্জু আকাশ পাতাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, এ রজ্জু গুটাইয়া দিতে তুমি সিদ্ধ-হস্ত। যোগীর রজ্জু যোগী নিজে গুটান, ভোগীর রজ্জু তুমি গুটাও; কিন্তু হায়! গোল মিটাও কই? বেগ ত কমাইলে, কিন্তু উদ্বেগ বাড়াইলে কেন! বাসনা

ধ্বংশে ব্রহ্ম দর্শন,—সে শঙ্করের, শমনের নহে। শমন বাসনা ধ্বংশ করে, ব্রহ্ম দর্শন করায় না, কেবল বিড়ম্বনা বাড়ায়। লোকে ধর্ম্ম সন্ন্যাস করে, কেহ কেহ বা, কর্ম্ম-সন্ন্যাস করে; যম শোক-সন্ন্যাস করায়। কিন্তু শান্তি দেয় কই? ভ্রান্তি ঘুচায় কই? শান্তি দিল না, হায়! শ্রান্তি দিল। ভ্রান্তি ঘুচাইল না, অহো ক্লান্তি বাড়াইল। শান্ত হইলাম যদি, কিন্তু শান্তি কই? যমরাজ! তোমার নিকটে গেলে, শান্তি পাইবত?

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্।

দার্শনিক মত।

কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বাদিবাদ বুঝিতে হইলে, শাস্ত্রীয় মত যৎ কিঞ্চিৎ বোঝা আবশ্যক; এ কারণ শাস্ত্রীয় মত চুম্বক করিয়া তুলিতে হইল।* সৃষ্টির প্রাক্-কালে—প্রলয়াবস্থায়—ঈশ্বর ভিন্ন পদার্থান্তর থাকে না। তখন সৃষ্ট বস্তু স্বকারণ অবিদ্যায় বীজভাবে পরিণত থাকে। অবিদ্যা ঈশ্বরের শক্তি বিশেষ সুতরাং স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের আদি বীজ স্বরূপ অবিদ্যা ঈশ্বরেই অভিন্নভাবে অবস্থান করে। এই জন্যই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। আবার সৃষ্টি কালে জীবের কর্ম্ম-নিবন্ধন ঈশ্বরের সৃষ্টি চিকীর্ষায় অবিদ্যা ক্রমশ সূক্ষ্ম-স্থূল ভাবে পঞ্চভূতে পরিণত হইয়া যাবতীয় সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করে। অবিদ্যার পরিণাম স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহে পর-মাত্মার (ঈশ্বরের) প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয়। জড়বস্তু তাঁহার নিজ শক্তি অবিদ্যার প্রকারান্তর মাত্র। দেহস্থিত আত্মা তাঁহার নিজ অংশ মাত্র। তখন "ইদং সর্ব্বং যদয় মাত্মা" এই যে আত্মা (ঈশ্বর) এই সকল বাহ্য প্রপঞ্চ-রূপে পরিণত হইয়াছেন। কারণ অনুধাবন করিতে হইলে, তখনও "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্।"

স্থূল কথা, যেমন জল বরফের সমবায়ি কারণ,* সেই রূপ ঈশ্বরও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচরের সমবায়ি কারণ। বরফ যেমন জল-যমাট ভিন্ন অন্য

---

* যে কারণ কার্য্য রূপে পরিণত হয়, তাহাকে সমবায়ি কারণ কহে। যেমন মৃত্তিকা ঘটের সমবায়ি কারণ।

পদার্থ নয়, সেই রূপ জগতও ঈশ্বরের বিকার ভিন্ন পদার্থান্তর নয়। অথচ বরফ যেমন রূপান্তরিত বলিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পদার্থান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ জগতকেও আমাদের বাহ্য বিষয়াসক্তলোচনে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ বলিয়া ভ্রম জন্মে।

ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, তুমি, আমি, সকলই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশ। যেমন মৎস্য খণ্ড মৎস্য নামে ব্যবহৃত হয়, সেই রূপ ব্যষ্টি জগতও ঈশ্বর নামে অভিহিত হইতে পারে এবং ঈশ্বর বিবেচনায় অৰ্চ্চিত হইতে পারে। কৃষ্ণ যখন জগৎ ছাড়া নন—ব্যষ্টি জগতের অন্তর্গত, তখন তুমি কৃষ্ণকে মনুষ্য বল, ঈশ্বর বল, ঈশ্বরের অংশ বা অবতার বল, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

বিষম কথা—কৃষ্ণ যদি তোমার আমার মত হইলেন, তখন তোমাতে আমাতে—কৃষ্ণে ভেদ কি? কৃষ্ণের উপাসনার প্রয়োজন কি?—নিজের উপাসনা নিজে করিলেই তো হয়?

অসংস্কৃত অথচ অপরীক্ষিত স্বর্ণ পদার্থান্তর বলিয়া বোধ হয়। সেই স্বর্ণ যথোচিত সংস্কার করিলে, জন সমাজের আদরের জিনিস হয়। কৃষ্ণের আত্মার সংস্কার হইয়াছিল—মলামাটী কিছু মাত্র ছিল না, তাঁহার স্বরূপ কোন বস্তুতে অপলাপ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার আত্মা, পরমাত্মা (ঈশ্বর) বলিয়া উপাসক সম্প্রদায়ে প্রথিত হইয়াছে। আমাদের আত্মা অসংস্কৃত; মলায় আবৃত; সুতরাং আমাদের প্রকৃত পরিচয় হয় না। যদি কালে আমাদের আত্মার সংস্কার হয়, তখন তোমাতে, আমাতে, কৃষ্ণে, ঈশ্বরে ভিন্ন থাকিবে না। কৃষ্ণ সাধনা বলে সোহং জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাই জনসমাজে ভক্তির পাত্র, ভগবান, আরাধ্যদেব বলিয়া বিখ্যাত। আমাদের যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। আমরা আপনাকে আপনি যেমন দেখি, পরেও আমাদিগকে সেই রূপ দেখিয়া থাকে। যাহার যেরূপ ভাব, পরের স্বচ্ছ হৃদয়ে সেই রূপ ভাবই প্রতিফলিত হয়। শুকদেব পরম জ্ঞানী ছিলেন। অমুক স্ত্রী, অমুক পুরুষ এরূপ ভেদ জ্ঞান ছিল না। তাঁহার হৃদয়ে লজ্জা, সরম, দ্বেষ, হিংসা, সংকোচ, ভয় ইত্যাদি—কিছুরই সদ্ভাব ছিল না; সুতরাং উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়া জল-ক্রীড়া-রত দিগম্বরী রমণীরা লজ্জা বা সঙ্কোচ কিছুই করে নাই। বৃদ্ধ ব্যাস দেবের স্ত্রী-পুরুষে ভেদ জ্ঞান ছিল। আপনাকে পুরুষ বলিয়া অভিমান ছিল। অভিমান-সূচক বস্ত্রও পরিধান করিতেন। তাই তাঁহাকে দেখিয়া রমণীগণ

বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল।* সেই রূপ কৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন, তদনুরূপ অলোক সাধারণ কার্য্য করিতেন; তাই লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর ভাবে পূজা করিয়া থাকে—ঈশ্বর ভাবিয়া তাঁহার সাযুজ্য প্রার্থনা করে। তিনি আপনাকে আপনি চিনিতেন বলিয়া আপনার (দেহ স্থিত আত্মার) পূজা আপনি করিতেন—আপনার অচিন্ত্য শক্তি আপনি পর্য্যালোচনা করিয়া কি জানি কি-ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। আমরা আপনাকে আপনি চিনি না—আপনার মাহাত্ম্য আপনি জানি না, তাই পরের উপাসনা করি। তাঁহাদের আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করি। ভ্রমবশত নিজের কলমটি নিজের কাণে গুঁজিয়া, পরের কলমে লিখিয়া থাকি। যদি কেহ বলিয়া দেয়, "ভ্রান্ত তোমার কলম তোমারই কাণে।" আর আমরাও যদি কাণে হাত দিয়া আপনার কলম পাই, তাহা হইলে আর পরের কলমের ধার ধারিতে হয় না। সেই রূপ যদি কোন মহাত্মা বলেন "মূর্খ! তোমাদের আরাধ্যদেব তোমাদেরই নিকট। কেন উদ্যানস্থিত মধু ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছ?" আর, আমরাও যদি তাঁহার কথামত যথাবিহিত আরাধ্য দেবের সন্ধান পাই। তখন আর কৃষ্ণের উপাসনা করিতে হইবে না। তখন তোমাতে আমাতে—কৃষ্ণে—বিষ্ণুতে ভেদ থাকিবে না। তখন সকলই কৃষ্ণ, সকলই বিষ্ণু, সকলই আমি। তখন সর্ব্বং আমিময়ং জগৎ।' পাঠক শিহরিয়া উঠিবেন না।

আর একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ রূপে বুঝা যাইতে পারে। আজন্ম চণ্ডাল গৃহে প্রতিপালিত ব্রাহ্মণতনয় আপনাকে চণ্ডালতনয়, বলিয়া জানে। কাজেই 'ব্রাহ্মণতনয়' বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। পরিচয় দিলেও

দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি—
স্ত্রী পুং ভিদা, ন সুতস্য বিবিক্ত দৃষ্টেঃ॥ ভাগবত।

অর্থ—জল ক্রীড়ারত রমণীগণ পুত্রের অনুগামী অনগ্ন ব্যাসদেবকে দেখিয়া বসন পরিধান করিল। কিন্তু তাঁহারা উলঙ্গ পুত্রকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। এই আশ্চর্য্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় ব্যাসদেবকে রমণীগণ বলিল "আপনার স্ত্রী পুরুষে ভেদ জ্ঞান আছে, কিন্তু আপনার পুত্রের পবিত্রদর্শনে সকলই সমান।"

মুখের কথায় কেহ বিশ্বাস করে না। সেই রূপ আমরাও আপনার পরিচয় জানি না, সুতরাং যথাযথ পরিচয় দানে অপারগ। কিন্তু যদি কোন সদয়-হৃদয় ব্যক্তি উহাকে ব্রাহ্মণতনয় বলিয়া বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়া দেন, আর সে যদি তাঁহার কথামত যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত, উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হয়, তাহা হইলে সে আপনাকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া পরিচয়দানে কুণ্ঠিত হয় না। কৃষ্ণ গুরূপদেশে আপনার পরিচয় জানিয়াছিলেন ও আপনার সংস্কার করিয়াছিলেন; তাই তিনি অর্জ্জুনের নিকট নিকট যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন।

"অহং সর্ব্বস্ব প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।"

আমি সকলের উৎপত্তির কারণ। আমা হইতে সমস্ত সম্পাদিত হয়।

এখানে "অহং" বা আমি' শব্দের অর্থ ঈশ্বর। যখন আমার আত্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ নাই, তখন স্বরূপত আমি ঈশ্বর। অর্জ্জুনও তাই বুঝিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের যাহা কিছু ভ্রম ছিল, কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে দূর হইয়াছিল। নতুবা ঈশ্বর কখন সশরীরে কৃষ্ণ হন নাই। তাঁহার সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব ঘুচিয়া চৌদ্দ-পোয়া নন্দের নন্দন হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কৃষ্ণও অনেক স্থলে অর্জ্জুনকে ঈশ্বর হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া দেখিলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কেবল কৃষ্ণই আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, এমন নয়, ব্রহ্মজ্ঞানী মাত্রই ঐরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রতর্দ্দন ইন্দ্রকে বলিলেন,

"তমেব বৃণী যং তং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে।" উপনিষৎ।

সেই উপদেশ করুন, যা মনুষ্যের পক্ষে হিততম বিবেচনা করেন। অর্থাৎ মুক্তির উপায় আমাকে বলুন।

ইন্দ্র উত্তর করিলেন;—

"মামেব বিজানীহি" ইত্যাদি।

"স যো মাং বেদনহ বৈ তস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে।

আমাকে জানিলেই মুক্তি হইবে। যে ব্যক্তি আমাকে জানে, তাহার কোন কর্ম্মই মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না।

এদিকে দেখুন আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির পথ নাই।

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।"

তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) জানিলেই মুক্তি হয়, নিত্যধাম যাইবার অন্য পথ নাই।

ইন্দ্রও জানিতেন একমাত্র আত্ম-জ্ঞান-সাধ্যই মুক্তি। অতএব এখানেও "আমি" বলিতে ঈশ্বর। আমাকে জান অর্থাৎ ঈশ্বরকে জান। এই বিষয় ব্রহ্মমীংসায় বেদব্যাস মীমাংসা করিয়াছেন। যথা ;—

"শাস্ত্র দৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ।"

ইন্দ্র আর্ষ দৃষ্টিতে আপনার আত্মাকে পরমাত্মা জানিয়া প্রতর্দ্দনকে বলিয়াছিলেন, মামেব বিজানীহি, আমাকেই জান। যখন আমি পরমাত্মা, তখন আমাকে জানিলেই পরমাত্মাকে জানা হইবে; কেননা, আমার আমিত্ব-জ্ঞান-সাপেক্ষ পরমাত্ম-জ্ঞান।

এক দিন পরম জ্ঞানী বামদেব মহর্ষি বলিয়াছিলেন;—

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।" শারীরক ভাষ্য।

'আমি মনু হইয়াছি। আমি সূর্য্য হইয়াছি।' অর্থাৎ যখন আমি আর ব্রহ্ম ভিন্ন নহি—যাবতীয় পদার্থই যখন ব্রহ্মভাবাপন্ন, তখন সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থনিচয়ই আমি।

ইন্দ্রও এই ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়াছিলেন "মামেব বিজানীহি।" কৃষ্ণও সেই রসে রসিক, সুতরাং তিনিও যে "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইত্যাদি বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

উপদেশক মাত্রই প্রায় নিজের ব্রহ্মত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ উপদেশ্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝাইয়াছেন। ছন্দোগ্যোপনিষদে আছে ;—

"স য এষো ঽনিমা। ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং তৎসত্যং
স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" ইত্যাদি।

সেই যে ঈশ্বর,—তিনি জগতের সূক্ষ্ম মূল স্বরূপ। এই সকল বস্তুই ঈশ্বরাত্মক। তিনিই একমাত্র সত্য—পরমার্থ নিত্য বস্তু; অথচ তিনি এই সকল নশ্বরবস্তুর স্বরূপ। শ্বেতকেতু, তুমি কি তাঁহাকে চিনিতে পারিলে? যদি না পারিয়া থাক, তবে বলি শুন—তুমিই তিনি (ঈশ্বর)।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইল, কৃষ্ণ মনুষ্য হইয়াও ঈশ্বর। তাই তিনি ঈশ্বরোচিত কার্য্য করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহস্থালি কর্ম্ম কি প্রণালীতে করিতে হয়, তাহারও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণ-চরিত্রে অসম্পূর্ণতা দোষ দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণের যোগাভ্যাসের কথা শ্রুতি-

তেও আছে। সুতরাং কৃষ্ণ মনুষ্য—যোগী; ঈশ্বর—ঈশ্বরাবতার। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে এইরূপ বহুরূপতা থাকায় বহুলোকে বহুভাবে দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত হিন্দু কি ভাবে দেখেন? হিন্দু তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান ভাবিয়া ভাবনা করেন,—ঈশ্বর-পরায়ণ পরমভক্ত ভাবিয়া তাঁহার সাযুজ্য প্রার্থনা করেন;—আদর্শ মনুষ্য ভাবিয়া, তদাচারিত কার্য্যের অনুকরণ করেন। যিনি কৃষ্ণকে ঈশ্বর-পরায়ণ মনুষ্য বলায় ক্ষুণ্ণ হইবেন—তাঁহার ব্রহ্মে ও ব্রাহ্মে ভেদজ্ঞান আছে।

কাব্যি-সমালোচনা।

কল্পনা কি ছায়াময়ী? আমিত বলি, কল্পনা সুস্পষ্ট-অবয়বা, সুদৃষ্ট-ভঙ্গিমতী এবং উজ্জ্বল বর্ণা। কল্পনার প্রিয় সহচরী কবিতাও ত ছায়াময়ী নহে; তবে তোমরা এরূপ কুয়াসার কুহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গ সাহিত্য গো-ধূলি গোধূলি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন?

প্রকৃতিতে যে পরাকৃতির অংশ আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়াই কল্পনার লীলা খেলা, তাহা লইয়াই কবিতার কুন্দন। পরাকৃতিত অস্পৃষ্ট ছায়াময়ী নহে, সুস্পষ্ট কায়াময়ী। তবে সুস্পষ্টকে অস্পষ্ট করিবার জন্য তোমরা পাচজনে এত ব্যগ্র হইয়াছ কেন?

আছে; প্রকৃতিতেও ছায়া আছে। ছায়া প্রকৃতি ছাড়া নহে। আবার ছায়াতেও পরাকৃতি ভাব আছে এবং সেটুকু কবিতার লীলাস্থলীও বটে। কিন্তু আমরা যখন নিরাশার কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন হই, তখনই আমাদের সেই ধূঁয়া ধূঁয়াভাব ভাল লাগে; ভাল না বাসিলেও, ভাল লাগে। অতীত যখন আমাদিগকে প্রতারণা করে, বর্ত্তমানের বিকট ভ্রূকুটি যখন সহ্য করিতে পারি না, যখন আমরা আপনাদিগকে ভবিষ্যতে অবলম্বন-শূন্য মনে করি, তখন দৃষ্টি ক্ষীণ হয়, কর্ণে কেবল ঝীম্ ঝীম্ রব শুনিতে পাই, শিরায় শিরায় রীণ্ রীণ্ করিতে থাকে। তখন অন্তরে ধূমা, বাহিরে ধূমা, অনন্তে ধূমা,—সকলই ধূমাময় বোধ হয়। যে সৌন্দর্য্য দেখিতে শিখিয়াছে, সে সেই কুজ্ঝটিকা মধ্যেও অনন্তের ছায়া দেখিতে পায়। আর, অনন্তের উপলব্ধি ছায়াময়ী হইলেও তাহাতে সৌন্দর্য্য বিভাসিত হয়। স্বীকার করি, সৌন্দর্য্যের সেই অপূর্ব্ব বিকাশ কবিতার সম্পত্তি; তথাপি

জিজ্ঞাসা করি, যে এই নিরাশার কুয়াসা লইয়াই কি কবিতা মুগ্ধ থাকিবে?

সংসার নিরাশা? না আশা? জীবন নিরাশা? না ভরসা?

এই হেমন্তের প্রাতঃকালে একবার ঘন ঘটিত কুজ্ঝাসায় এই মহানগরী সমাচ্ছন্ন ছিল বটে। বৃক্ষ জড় সড়, লতা গুড়ি সুঁড়ি, পাতা টস্ টস্, ঘাস ভিজে ভিজে, ময়দান ধূয়া, কেল্লা ধূয়া, চারি দিকে ধূয়া,—মাঝে মনুমেণ্ট ধূয়ার র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে, কেবল ধূয়াই দেখিতেছিল—কিন্তু সে ভাব আর এখন আছে কি? ঐ দেখ, একটু বেলা হইয়াছে, তরু সর সর করিতেছে, তবু দেখ লতা তাহার সর্ব্ব শরীর বঙ্কিম করিয়া বাম দিক হইতে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে; ঐ দেখ এই রহস্য দেখিয়া পাতা করতালি দিতেছে; ঘাস আনন্দে লুটিতেছে; স্বয়ং ময়দান সমস্ত বক্ষে লইয়া চৌরঙ্গির চৌঘুড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটাছুটি করিতেছে; কামান-কোটর সকল বিকাশ করিয়া, কেল্লা দানব দম্ভ করিতেছে; জাহ্নবী শত জাহাজ বক্ষে ধারণ করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে; আর মনুমেণ্ট—নগ্ন দেহে, সমানে, উত্তরে বাতাসকে উপহাস করিতেছে। ইহাতে আশা দেখিতেছ? না,—নিরাশা দেখিতেছ?

চল, তোমার আকাশেই চল; অনন্তাহইতে অনন্তেই চল; ঐ যে নীলাকাশে অনন্তের বক্ষে, ধীরে ধীরে পাখা মেলিয়া চীল উড়িতেছে—উহা নিরাশা? না, আশা? ঐ যে দিবা-দেব অলক্ষ্য গতিতে ক্রমে তোমার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন, সেই ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি-নিরাশার? না আশার? বিশ্বের সর্ব্বত্রই ত গতিশক্তি; সর্ব্বত্রই ত চলাচল; সর্ব্বত্রই ত বৈচিত্র; সর্ব্বত্রই আশা;—জীবনে মরণে, সংসারে বাহিরে, অনন্তায়, অনন্তে। সর্ব্বত্রই আশা—তবে তোমরা কেবল নিরাশ, নিরাশ! হুতাশ! হুতাশ! উদাস! উদাস! শব্দে সাহিত্য পরিপূরিত করিবে কেন?

জগদ্গ্রন্থের প্রথম পাঠ না পড়িয়া, আপনাকে আপনারা বুঝিতে না পারিয়া, আত্মপ্রতারিত হইয়া, তোমরা অনর্থক নিরাশার কুহকে পড়িয়াছ, কাজেই কুহেলিকা দেখিতেছ; আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে শিক্ষা করিয়া, সেই বাষ্পময় শ্বাসে কেবল কুহেলিকা নিঃসরণ করিতেছ। না—ও রূপ আর করিও না; ও রূপ চলিবে না।

তোমাদের কথায়, শেলির সেই নদীগর্ভে নৌকার উপর ন-পুং ন-স্ত্রী জীব সৃষ্টি মনে পড়ে। তোমাদের গুরুভক্তি ধন্য; তোমাদের মহাগুরুর আদর্শ—তোমাদের কবিতার সর্ব্বত্রই বিরাজমান। তোমাদের উচ্ছ্বাস—ন কাব্য,—ন কবিতা। **কেবল কাব্যি।** না মরদ, না মহিলা। কেবল কাব্যি।

শেলির অন্তর্জ্জগৎ সত্যসত্যই কুজ্ঝটিকাময় ছিল। সেই অন্তরের কুয়াসায় তিনি তাহার বহির্জ্জগৎ আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। শেলি মনে করিতেন, তিনি বসন্তের বুলবুলের মত শাখীতে শাখীতে গান গাহিয়া, ফুলে ফুলে উড়িয়া উড়িয়া, জীবন যাপন করিবেন; কিন্তু তাঁহার বিষম শিক্ষা বলে, তাঁহার সাধের বসন্তে চিরদিনের তরে কেবল কাল-বৈশাখী লাগিয়াছিল। সেই কাল-বৈশাখী তাঁহার শাখী ভাঙ্গিতে লাগিল; তাঁহার ফুল ছিঁড়িতে লাগিল; শেষে হঠাৎ তুফান তুলিয়া তাঁহার সাধের তরণীস্থ সোণার খাঁচা ডুবাইয়া দিল।

শেলি শিক্ষাদোষে, অভ্যাস করিয়া, আপনার অপূর্ব্ব বসন্তে কুয়াসা করিয়াছিলেন। তিনি বায়রণের ধূপ-ছায়ার ধূপ ফুটাইতে না পারিয়া, কেবল ছায়ার মায়ায় মজিয়া ছিলেন। বায়রণ নিশ্বাস ফেলিতেন,—ধূমের সহিত তাহাতে অগ্নি নিকলিত; শেলি নিশ্বাস কেলিতেন,—ধূঁয়া—ধূঁয়া—কেবল ধূঁয়া।

পাহাড়ের অসাড় অনড় কর্কশ কঠিন কঠোরতা, সাগরের দুর্জ্জয় গর্জ্জনের সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গ, প্রভঞ্জনের নিদারুণ ঝঞ্চা, বিদ্যুৎ বজ্রভরা প্রখরা বৃষ্টি, গ্রীষ্মের ভীষ্ম প্রতাপ, বসন্তের অনন্ত সৌন্দর্য্য,—সর্ব্বত্রই বায়রণের লীলাখেলা। শেলী খুঁজিতেন কেবল, ছায়া, নিভৃতি, নিরালয়, বাসি ফুলের ম্লানভাব, কুল্যার অর্দ্ধস্ফুট ফুল কুলবর, বাতাসের হুতাশ, আকাশের উদাস, চাতকের পিপাসা, আর পাতকীর নিরাশা।

শেলি বায়রণের শেড্, শেলি বায়রণের ছায়া ভাগ, শেলি বায়রণের কালিমার অংশ, বিলাতের উনবিংশ শতাব্দীর সেই অর্দ্ধগঠিত, অসম্পূর্ণ ছায়াময়ী মূর্ত্তি তোমরা তোমাদের আদর্শ করিবে কেন?

লঙ্কায় গেলেন দরিদ্র, লইয়া এলেন হরিদ্র। বিলাতে সোণা আনিতে গিয়া ভাই! সোণার রঙ্গই দেখিলে, ওজনও দেখিলে না, উজ্জলতাও বুঝিলে না। যদি শেক্সপিয়র প্রমুখ বিলাতের পূর্ব্বতন কবি গণ, পুরাণ পাপী বলিয়া তোমাদের পরিত্যজ্যই হইয়া থাকে, যদি নূতনেই মজিতে হয়, আর

এই উনবিংশ শতাব্দীই তোমাদের আদর্শের এলাকা হয়,—তবে নূতন ছায়ায় মজিলে কেন? নূতন কায়ায় মজিলে না কেন? বায়রণের যে জ্বলন্ত প্রত্ন ভক্তিতে ইটালি কাঁপিতে থাকে, য়ূনানী মাতিয়া উঠে,—কৈ তোমার সে প্রত্ন-ভক্তি, সে দেশ-ভক্তি, সে আশা, সে উৎসাহ, সে সাহস, সে সজীবতা, সে স্ফূর্ত্তি কৈ? একে, এদিকে বণিগ্বৃত্তিবিদেশীয় রাজার শোষণে এবং কতক গুলি পাশববৃত্তি রাজ কর্ম্মচারীর পেষণে আমাদের রাজ-নৈতিক আকাশ ঘন ঘটায় সমাচ্ছন্ন—অন্য দিকে, কতক গুলি নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের অর্থ লোভে, আর কতক গুলি দুর্ব্বোধ সংস্কারকের নাম-লোভে আমাদের সামাজিক গগণ ধূলি ধূসরিত,—তাহার উপর, তোমরা যদি আমাদের নব মুকুলিত সুকুমার সাহিত্য সহকার কুঞ্জে কেবল কুয়াসা সংঘটন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অকালে মুকুল গুলি চুঁইয়া যাইবে, ফলের আশা দুরাশা হইবে। তাই বলি, তোমরা কৃতি হইতে গিয়া, আর এমন অকীর্ত্তির উদ্যোগ করিও না।

সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের চিরন্তন আদর্শ। সংস্কৃতে কোথাও কোথাও জটিলতা, কুটিলতা, কূট, কাটব্য আছে; জটিলতাতে কোথাও অস্পষ্টতাও হইয়াছে। কিন্তু সেটা ভাষার দোষে, ভাবের পূর্ত্তি হয় নাই বলিয়া নহে। মূর্ত্তির অস্পষ্টতা—প্রচলিত সংস্কৃতে নাই বলিলেও চলে। কালিদাসের ছায়াময় মেঘের মায়া কাহিনীতেও দেখ কেমন স্পষ্ট ছবি। নির্ব্বাসিত যক্ষরাজ রামগিরির কন্দর উষ্ণশ্বাসে পরিপূরিত করিতেছে, কিন্তু তাহার ভূধর, নগর, নদী, নাগরীর বর্ণনা—কেমন উজ্জ্বল, কেমন রঙ্গভরা, কেমন সুন্দর, কেমন সুস্পষ্ট! যক্ষ কর্ত্তৃক যক্ষ-পত্নীর ধ্যান—কেমন জীবন্ত, প্রতিভাত, সহজ এবং সরল! সে সকল উজ্জ্বল আদর্শ কিসে যে, তোমাদের পরিত্যাজ্য হইল, তাহা বুঝি না।

বাঙ্গালা সাহিত্য সূতিকাগার হইতেই সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব কবিগণের নন্দ, যশোদা,—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী,—বৃন্দা, চন্দ্রা,—শ্রীদাম, সুবল—মান, মাথুর,—, রাস, প্রভাস—সকলই বর্ণনার গুণে আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ। যেখানে জগদ্বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ বংশী আপনার সম্মোহিনী ধ্বনিতে সংসার আচ্ছন্ন করিতেছে, সেখানেও দেখিবে চিত্র অতি স্পষ্ট; প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান—

যতেক গোধন নাহি খায় তৃণ,
জড়বত কোন কারণে।

যমুনার জলে বহিছে উজান
তরু হিলে বিনা পবনে।

যেখানে বিদ্যাপতি অনন্তের উপাসনায় বিভোর, সেখানেও অনন্তের চিত্র সুস্পষ্ট।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।

বিশাল সাগর রূপ অনন্তের বক্ষে ব্রহ্মা আদি দেবগণ লহরীর মত উঠিতেছে পড়িতেছে। এই সামান্য সরল কথায় অনন্তের লীলা খেলা যেন চোখের উপর ভাসিতে থাকে।

ঐ ত কবিত্ব; ঐ ত কল্পনা। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া দৃষ্টিপথে ধরিবে, তবে ত তুমি কবি। নহিলে আমাদের যে সামান্য দৃষ্টি টুকু আছে, তাও যদি কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া রোধ কর, তাহা হইলে, আর কবিত্ব কোথায়? সেত কেবল কাব্যি।

কেবল বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়াই নহে, বাঙ্গালার পূর্ব্বতন সকল কবিই সুস্পষ্ট চিত্রণে সমীচীন। গীতি কাব্যের ত কথাই নাই; উহা জগতে অতুল্য। বাঙ্গালির গান বর্ষার রামধনুর মত নিবিড় কাদম্বিনী কোলে জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে। বাঙ্গালার মঙ্গল কাব্য গুলিও জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণের দারিদ্র দুঃখ বর্ণনা—যে কখন দুঃখের মুখ দেখে নাই, তাহাকেও দীন হীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান!
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।

দুবেলা দুসন্ধ্যা অন্ন জুটেনা—কোন দিন ভাত খাই, কোন দিন বা আমানি খাইয়া কাটাই। খাবার ত কোন পাত্র নাই; ভাত পাতে খাওয়া যায়, আমানি ত পাতে খাওয়া যায় না, হাঁড়িতেও খাইতে নাই, মেঝেয় গর্ত্ত করিয়া করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতেই ঢালিয়া আমানি খাই।

যে আমানি খাইয়া মধ্যে মধ্যে দিন কাটায়, সে অত কথা বলিবে কেন? সে বলিল,—আমাদের দুঃখ বুঝিবে ত ঐ আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ।

দারিদ্রের কি কঠোর অভিব্যক্তি! কথা কয়টা বুকের ভিতর বসিয়া যায়! ভাঙ্গাঘরের গর্ত্ত কয়টা বিলাসীগণের জটে ধরিয়া, তাহাদিগকে নাড়া দিতে থাকে। আবার বলি ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা। সার্থক প্রতিভা।

আর, নদীর ধারে কসাড়বনে তোমাদের জ্যোৎস্না গা ঢালিয়া দিয়া ঘুমায়, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘোলা ঘোলা কবিত্বও ঘুমাইতে থাকে। এ পোড়া ঘুম কি আর ভাঙ্গিবে না? দেখিয়াছি, চাঁদনি চক্ চক্ করিতে থাকে,

নদী ঝক্ মক্ করিতে থাকে—জ্যোৎস্না জাগিয়া উঠে। কিন্তু তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে না কেন? ঘুম ভাঙ্গিলেও অহিফেণ-সেবীর মত ওরূপ অনন্ত ঝিমুনিতে ঝিম্যইতে থাক কেন?—একবার চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাও, ছায়ার মায়া কাটাইয়া উঠ—দেখ, চারিদিকেই আশা; চারিদিকেই ভরসা; সৌন্দর্য্য ফুটিতেছে, উৎসাহ ছুটিতেছে, রূপরাশি ফুটিয়া পড়িতেছে; আনন্দের উৎস উঠিতেছে। উঠ; চক্ষু মেল; দেখ—আর তোমাদের সামর্থ আছে, দশ জনকে এই সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র দেখাইয়া জীবন সার্থক কর।

কবিতা আশাময়ী; কবিতা কায়াময়ী; কবিতা আলোকময়ী; কবিতা প্রভাময়ী; কবিতা উচ্ছ্বাসময়ী, কবিতা আনন্দময়ী; কবিতা করুণাময়ী। কবিতা চিত্রময়ী; কবিতা বৈচিত্রময়ী; কবিতা সৌন্দর্য্যময়ী। কবিতায়—আকৃতির বৈচিত্র; প্রকৃতির বৈচিত্র; বর্ণের বৈচিত্র; স্বরের বৈচিত্র; তালের বৈচিত্র; তানের বৈচিত্র; নানারূপ বৈচিত্র আছে।

কেবল সে-যেন, কি-যেন, কেন-যেন, কোথা-যেন, যেন-যেন করিলে কবিতা হয় না।

> সে-যেন কোথায় হায়! কি-যেন বলেছে,—
> কেন-যেন তার স্মৃতি, অন্তরে আমার
> জ্বলেও না, নিভেও না; শুধুই সে-যেন,
> নিরাশ হতাশ করে, উদাসিয়া মন
> —বিহ্বল, বিভোর।—যেন তামসে আবৃত।

এমন করিয়া কেবলই যেন যেন করিলে, ছায়া ছায়া আঁকিলে, আর হতাশ, হুতাশ, উদাস, আকাশ—বলিলেই কেবল কবিতা হয়;—আর কিছুতে হয় না, এমন নহে। কবিতার অস্থি আছে, মজ্জা আছে, রক্ত আছে, মাংস আছে; কবিতা কেবলই ছায়াময়ী কায়ার বাষ্পময় দীর্ঘশ্বাস নহে।

শেলি শেলি, শেলি—কেবল শেলির দোহাই দিয়া কি এই কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জনের পরিপুষ্ট ও পরিত্যক্ত অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পত্তি নষ্ট করিবে?

বায়রণ সম্প্রদায়ের জীবন্ত জ্বলন্ত প্রতিমায় শেলি সম্প্রদায় সেড্ লাগাইয়াছেন বলিয়াই, শেলি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব। একবার বায়রণ সম্প্রদায়ের জ্বলন্ত মূর্ত্তি উঠাইয়া লও, দেখিবে বিলাতের ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত ছায়াময় কাব্য অতলের অতলে ডুবিয়া যাইবে। ধূপ-ছায়ায় ধূপের গুণেই, ছায়ার আদর। তোমরা ছায়া—তোমাদের ধূপ কৈ? ছায়া—কিসের ছায়া? বায়রণের ছায়া শেলি। শেলির ছায়া হইবে? এবং ছায়ার ছায়া—তাহাতে বিদেশের ছায়া—এ দেশে লাগিবে কেন?

নবজীবন।

৩য় ভাগ। } পৌষ ১২৯৩। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সে কালের দারোগার কাহিনী।

৫ম ভাগ—চোরের আবদার।

বঙ্গদেশে অতি অল্প লোকের নিকট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের নাম অপরিচিত আছে। নিজ কলিকাতায়, হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমায়, এবং কৃষ্ণনগরের শান্তিপুর অঞ্চলে,—তাঁহার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে ঈশ্বরবাবু এক জন বিলক্ষণ বলবান পুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা এবং কার্য্য-দক্ষতার জন্য সকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিত। পেনসন লইয়া চাকরি হইতে অবসর হওয়ার পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। শান্তিপুরেতেই তাঁহার নাম বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থানে তিনি প্রথম মিউন্সিপাল আইন প্রচলিত করিয়া নগরে অনেক উন্নতিসাধন, সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন, এবং শান্তি সংস্থাপন করেন, এবং সেই কার্য্য করিতে গিয়া তিনি অনেকের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, এবং অনেক অধিবাসীরা তাঁহার শত্রুতাও করিয়াছিল। তিনি যে সর্ব্ব বিষয়ে ঐকান্তিক ঋষি-পুরুষ ছিলেন, এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু তাঁহার দোষ হইতে গুণের ভাগ অধিক ছিল। এই সময়ে শান্তিপুরে আর এক জন বিখ্যাত মনুষ্য ছিলেন—শান্তিপুরের জমিদার বাবু উমেশচন্দ্র রায়; তাঁহাকে লোকে সাধারণত মতিবাবু বলিয়া জানিত। বৈষয়িক বুদ্ধিতে মতিবাবুর তুল্য তখন বঙ্গদেশে অতি অল্প লোক ছিল। জগৎ বিখ্যাত বাবু দ্বারকা-

নাথ ঠাকুর এই মতিবাবুকে তাঁহার অধীনে এক চাকরিতে নিযুক্ত করিয়া তাহার কূট বুদ্ধির প্রখরতা দৃষ্টে বলিয়াছিলেন যে "এই মতির যোড়া মেলা ভার।" সকলেই অবগত আছেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্যান্য গুণের মধ্যে মনুষ্যের চরিত্র নির্ব্বাচনের ক্ষমতা অধিক পরিমাণে ছিল, অতএব তিনিই যখন মতিবাবুর বুদ্ধির জটিলতার প্রশংসা করিয়াছিলেন তখন সে বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। মতিবাবু শান্তিপুরের কিয়দংশের জমিদার ছিলেন, কিন্তু কিয়দংশ হইলে কি হয়, তাঁহার এমনই বুদ্ধি কৌশল এবং প্রতাপ ছিল যে শান্তিপুরের বড় ছোট সকল অধিবাসীগণের উপরে তাঁহার ষোল আনা প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার অমতে কাহারও কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না এবং যাহাকে যে দণ্ড করিতেন কিম্বা শাস্তি দিতেন তাহা দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের নত শির করিয়া মানিয়া লইতে হইত। মতিবাবুর দণ্ডের মধ্যে অর্থ দণ্ডই অধিক পরিমাণে ছিল এবং তাহা না দিলে শান্তিপুরে তাহার বাস করা কঠিন হইত। ফলে শান্তিপুরে মতিবাবুর একাধিপত্য ছিল।

ঈশ্বরবাবু শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হওয়ার পূর্ব্বে লো সাহেব নামক এক জন গোরা শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সাহেব পরে কলিকাতার পুলিশের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া খুব যশ লাভ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে বুঝি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতার পুলিশের মাজিষ্ট্রেটও হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক ইনি শান্তিপুরে আসিয়া মতিবাবুর কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালির কূটবুদ্ধির সম্মুখে তিনি এমন পরাস্ত হইয়াছিলেন, যে অবশেষে নিজের চেষ্টায় তাহাকে শান্তিপুর হইতে বদলী হইতে হইয়াছিল। মতিবাবুর চরম উন্নতি সময়ে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল আসিয়া শান্তিপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেন। দুঃখের বিষয় এই যে দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন জীবিত ছিলেন, না, থাকিলে তিনি তাঁহার অতুল্য মতির যোড়া দেখিতে পাইতেন; ঈশ্বরবাবু দেখিলেন যে শান্তিপুরে মতিবাবু অদম্য এবং মতিবাবুকে দমন করিতে না পারিলেও শান্তিপুরের অধিবাসীগণের শান্তি হইবে না। তিনি আরও দেখিলেন যে কেবল প্রচলিত আইন পরিচালনের দ্বারা মতিবাবুর প্রতাপের থর্ব্বতা করা দুঃসাধ্য, অতএব তিনি তৎকালের নূতন প্রকটিত মিউনিসিপাল আইন পরিচালনের দ্বারা মতিবাবুকে দমন করার কল্পনা

করিলেন। কিন্তু সেই আইনও অধিবাসীগণের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, এবং মতিবাবুকে সম্মত করিতে না পারিলে অধিবাসীরা সম্মত হইবে না। অতএব ঈশ্বরবাবু মতিবাবুর সহিত এমন সৌহৃদ্যতা ও বন্ধুতা সংস্থাপন করিলেন এবং এই আইনের দ্বারা মতিবাবুর এত অধিক উপকার এবং লভ্য হওয়ার প্রলোভন দেখাইলেন, যে অল্প কালের মধ্যেই তিনি মতিবাবুকে ভুলাইয়া আইনটি শান্তিপুরে চালাইতে পারিলেন। স্বকার্য্য সাধন করার পরেই ঈশ্বর বাবু তাঁহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং পদে পদে মতিবাবুকে অপদস্থ করিতে লাগিলেন। মতিবাবু তখন নিজের ভ্রম দেখিতে পাইয়া এই আইন শান্তিপুর হইতে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য অনেকে চেষ্টা করিলেন এবং ঈশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে তাঁহার নিন্দা সূচক অনেক দরখাস্ত দেওয়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমশ ঈশ্বরবাবু এমন বুদ্ধি কৌশল পরিচালন করিলেন যে শান্তিপুরে মতিবাবুর স্থলে ইশ্বরবাবুরই প্রভুত্ব প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার পরে আমি কিছুকালের নিমিত্ত হাঁসখালির থানায় ছিলাম, সেই স্থানে মতিবাবুর সহিত আমার এক দিবস সাক্ষাৎ হয়, অন্যান্য কথার মধ্যে আমি তাঁহার শান্তিপুরের প্রভুত্বের কথা উল্লেখ করাতে তিনি কিঞ্চিৎ ম্লান বদনে আমাকে বলিলেন যে "দারোগা বাবু! আমাকে আর ও কথা বলিবেন না, আমি এখন শান্তিপুরের কুকুরটাকেও ছেই করি না।" মতিবাবুর নিজের মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনি কতদূর অপদস্থ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে মতিবাবু দীনদয়াল পরামাণিক নামক শান্তিপুরের একজন বিত্তশালী ব্যক্তির নামে কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্টে এক মিথ্যা মোকদ্দামা উপস্থিত করাতে, বিখ্যাত বিচারপতি সর মর্ডাণ্ট ওএলস তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য কলিকাতার বড় ফাটকে প্রেরণ করেন এবং সেই খানে দণ্ডের কাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মতিবাবু লোকান্তর গমন করেন। মতিবাবুর মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু ঈশ্বরবাবুর প্রতি মতিবাবুর দলের লোকের শত্রুতা গেল না। তাহারা পুনরায় কি এক কারণে ঈশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ঈশ্বরবাবুকে ছয় মাসের নির্ব্বাসনের ন্যায় কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমায় থাকিতে আদেশ করেন এবং ঈশ্বর বাবু তদনুসারে শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ির বড় সড়কের পূর্ব্বধারে রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বাবুদিগের দুই খানা দোতালা বাসা বাড়ী আছে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনই তাহা খুব পুরাতন হইয়াছিল, এক্ষণে কি অবস্থায় আছে তাহা বলিতে পারি না। বাড়ী দুই খানা পাশাপাশি এবং প্রত্যেকের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত হাতা এবং হাতা ইটের প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইহার দক্ষিণদিকের বাড়ীতে ঈশ্বরবাবু বাঁসা কারিলেন এবং উত্তরের বাড়ীতে সরবে বিভাগের ডেপুটী কলেক্টর বাবু অভয় চরণ মল্লিক বাস করিতেন। ঈশ্বরবাবুই আমাকে নবদ্বীপ থানার দারোগা পদে নিযুক্ত করেন এবং তদবধি আমাকে যেমন অনুগ্রহ করিতেন, তেমন আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। কৃষ্ণনগর আসিলে পরে আমি তাঁহার নিকট প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে যাইয়া রাত্রি ৯। ১০ টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতাম এবং মধ্যে মধ্যে উক্ত অভয় বাবুও আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন। এইরূপ দুই তিন মাসের পরে এক দিবস প্রত্যূষে ঈশ্বরবাবুর খানসামা আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে "গত রাত্রে চোরে বাবুর শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া অনেক দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে। বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন চলুন।" আমি যাইয়া দেখি যে ঈশ্বর বাবু এবং অভয় বাবু একত্র বসিয়া আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্রই অভয় বাবু আরক্ত লোচনে ইংরাজীতে আমাকে বলিলেন যে "আমি মাজিষ্ট্রেট হইলে তোমাকে এইক্ষণে বরতরফ করিতাম। তোমাকে কি জন্য এত মোটা বেতন দেওয়া যাইতেছে, যদি তুমি চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিতে না পারিবে।" কিন্তু ঈশ্বরবাবু তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন যে "দারোগা তুমি এই পাগলের কথায় ব্যাজার হইওনা, ও এই সকল বিষয়ের কি জানে?" আমি অভয় বাবুর কথায় কোন উত্তর না দিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইলাম। এইস্থানে ঈশ্বর বাবুর শয়নকক্ষের দৃশ্যটা বর্ণনা না করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন না যে, চোরে কি অসমসাহসীরূপে এই ঘরে চুরি করিয়া গিয়াছিল। ঘরের দুই কোণে দুইটি দুনলী বিলাতী বন্দুক; চারি প্রাচীরের গায় চারিখানা তরবার ও চারিটা ঢাল ঝুলিতেছিল। ঈশ্বরবাবু একটু নেয়ারের অর্থাৎ ফিতার খাটে শয়ন করিতেন, শিয়রে একটা সেই সময়ের নূতন আবিষ্কৃত রিবল্‌বার পিস্তল ও দুই পার্শ্বে দুই খানা ভুটিয়া ভোজালী, পদতলে একখানা বিলাতী হেঙ্গার তরবার। তদ্ভিন্ন ঘরের

মধ্যে দুই টা মুগদর, একটা লেজাম ও কতকগুলী শূকর শীকারের বল্লমও ছিল। বন্দুক ও পিস্তল প্রত্যহ শয়ন করার পূর্ব্বে তৈয়ার করিয়া রাখিতেন। ঘর দেখিয়া বাঙ্গালীর ঘর বলিয়া বোধ হইত না, কোন যোদ্ধার ঘর বোধ হইত। ঈশ্বরবাবু সখ করিয়া কেবল শোভার নিমিত্ত এই সকল অস্ত্র রাখিতেন এখন নহে, নিজে অস্ত্র চালাইবারও তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল এবং শীকার করিতে বড় ভাল বাসিতেন। এই সকল অস্ত্র চতুপার্শ্বে করিয়া এই বীরপুরুষ শুইয়াছিলেন, চোর আসিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে চোরের যে কি অবস্থা হইত, তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করা যাইতে পারে এবং চোরেরও ধন্য সাহস ও চতুরতা যে এইরূপ বিপদ এড়াইয়া সে তাহার কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দেখিলাম যে বাঁশের একটা বড় মই সিড়ি দোতালার জানালায় লাগাইয়া জানালার গরাদিয়া কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং ঈশ্বর বাবুর কোট, পেণ্টলুন, কামিজ প্রভৃতি অনেক পরিধেয় বস্ত্র ও পোষাক, ফুলাল তৈলের ও শেরির ৪টা বোতল ও নানা বিধ কাঁচের গ্লাশ, কাঁটা চামচা ক্ষুপ, সোনার ঘড়ি ও চেন, রূপার গেলাস, বাটী, রেকাব, হুকা, গুড়গুড়ী, পানের ডিপা, সোনার নস্য দানী ও একটা পেনসিল কেস্, নগদ কয়েক খানা গিনি মোহর ও প্রায় ১০০ টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। আমি দেখিয়া স্তম্ভিত, কি করিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ঈশ্বর বাবু আমাকে সকলের নিকট প্রচার করিতে অনুমতি করিলেন, যে যদি কেহ চোর ধরিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তিনি ১০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। এই ঘটনার চারি দিবস পূর্ব্বে গোয়াড়ীর বাজারে এক বাড়ীতে ঠিক এইরূপ দোতালার জানালা ভাঙ্গিয়া একটা চুরি হইয়াছিল। অতএব উপর্য্যুপরি অল্প সময়ের মধ্যে একই প্রণালীর দুইটি চুরি হওয়াতে গোয়াড়ীর অধিবাসীগণের মনে অত্যন্ত আতঙ্ক জন্মিল, এবং তাহা জন্মিবারও কথা। সকলে আমাকে বলিল যে এই চোর ধরিতে না পারিলে গোয়াড়ীর কখন কাহার সর্ব্বনাশ হয়, তাহার ঠিকানা নাই। আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এই চোর আবিষ্কার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দুদ্ধু নামে আমার অধীনে এক জন বরকন্দাজ ছিল, সে পূর্ব্বে বিখ্যাত বদমাএস ও চোর ছিল—আমি তাহাকে প্রথমে চৌকীদারী ও পরে বরকন্দাজী দিয়া আমার নিকটে রাখিয়া ছিলাম।

সে ব্যাটা চোর ধরার কার্য্যে এমন পণ্ডিত ছিল যে সিঁধ দেখিয়া বলিতে পারিত যে ইহা অমুক চোরের, কিম্বা ইহা দেশী কি বিদেশী চোরের কার্য্য। ফলে তাহার সন্ধান অব্যর্থ ছিল এবং তাহাকে আমি রাখিবার পরে কৃষ্ণনগরে চুরি এককালে তিরোহিত হইয়াছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বুদ্ধু এই দুই চুরি দেখিয়া, নির্ব্বাক হইয়া পড়িল। সে বলিল যে ইহা কোন নূতন ব্যক্তির কার্য্য, দেশী চোর কর্তৃক হয় নাই। তথাপি আমি কৃষ্ণনগরের সকল বদমাএসকে ধরিয়া আনিয়া কত প্রহার করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না। ইংরাজীতে বলে যে জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণ অবলম্বন করিয়াও বাঁচিতে চেষ্টা করে। আমার ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। আমার চিত্ত এমন ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে আমাকে যে যাহা পরামর্শ দিত, তাহাই আমি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম যে নবদ্বীপ হইতে একজন জ্যোতিষী ঠাকুর আসিয়াছেন, তাঁহার গণনা অতি চমৎকার। গেলাম, সেই জ্যোতিষীর নিকটে। তিনি তাঁহার পাঁজি পুথি বাহির করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে "পুব, পুব, দক্ষিণ, দক্ষিণ।" "খর্ব্বাকার, লম্বা চুল, খড় ঢাকা" ইত্যাদি বাতুলের ন্যায় নানা অসংলগ্ন বাক্য ব্যয় ও পুথি নাড়া চাড়া করিয়া দুই ঘণ্টা সময় অপচয় করিলেন। ফল, কোনরূপে চেষ্টা করিতে আমি ক্রটি করিলাম না।

থানার এক রীতি ছিল যে সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস থানার অধীনস্থ সকল গ্রামের চৌকীদারেরা ও ফাঁড়ির বরকন্দাজেরা দারোগার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় মহল্লার সংবাদ ব্যক্ত করিত। এই চুরির পরে আমি সকল চৌকীদার এবং ফাঁড়িদার বরকন্দাজকে এই ঘটনার ও চোর ধরিয়া দিতে পারিলে ১০০ টাকা পুরস্কারের সংবাদ জানাইয়া তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ঈশ্বর বাবুর বাসায় যাই এবং প্রত্যহই অভয় বাবুর অনুযোগ তিরস্কার শ্রবণ করি। এমন করিয়া কয়েক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। চুরির নবম দিবসে আমি ঈশ্বর বাবুর নিকট হইতে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় গৃহে যাইতে ছিলাম, এমন সময় থানার নাএব দারোগা আমাকে থানার মধ্যে ডাকিয়া বেলপুকুরের ফাঁড়িদার রামহিত ওঝা বরকন্দাজের প্রেরিত এক খানা পত্র দেখাইল, তাহাতে কেবল এই মাত্র

লেখা ছিল যে "পত্রপাঠ চলিয়া আসিবেন, এক ব্যক্তির উপরে আমার শোভে হইতেছে।" আমি তৎক্ষাণাৎ ঈশ্বরবাবুর নিকট পুনরাগমন করিয়া তাঁহার দ্রব্য সকল চিনিতে পারে এমন এক জন চাকর সঙ্গে লইয়া বেলপুকুর যাত্রা করিয়া শেষ রাত্রিতে সেই থানে পৌছিলাম। ফাঁড়িদার বলিল যে তন্নিকটস্থ সুজনপুর গ্রামে ছিরা কায়েত নামে এক জন প্রসিদ্ধ বদমাএস আছে, তাহাকে লোকে ছিরা চোর বলিয়া ও ডাকিয়া থাকে। সে অদ্য ৪। ৫ দিবস অবধি বেলপুকুরের বাজারের এক বেশ্যার বাটীতে প্রত্যহ রাত্রিতে খুব সরাপ খাইতে ও ধুমধাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং লোকে তাহাকে নূতন নূতন রকমের বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দেখিয়াছে, ইহাতে ফাঁড়িদার সন্দেহ করিয়া আমাকে সংবাদ পাঠাইয়াছে। আমি সেই বেশ্যার বাড়ী যাইয়া দেখি যে তখনও তাহারা বসিয়া সুরাপান ও আমোদ প্রমোদ করিতেছে। ছিরাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা বাঁশের আলনার উপরে একটা কামিজ ও পেণ্টেলুন ঝুলিতেছে দেখিয়া ঈশ্বর বাবুর খানসামা বলিয়া উঠিল, যে উহা তাহার বাবুর পোষাক। ছিরা তখন সরাপের নেশাতে বিভোর, ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না। আমি তাহাকে ফাঁড়ি ঘরে প্রেরণ করিয়া ঐ বেশ্যার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম যে সে আমার পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তি। আমি যখন নবদ্বীপ থানাতে ছিলাম তখন এই বেশ্যাও সেই থানার নিকটে বাস করিত। সে আমাকে মুক্ত-কণ্ঠে বলিল যে ছিরা অদ্য কয়েক দিবস ধরিয়া তাহার নিকট আসিয়া প্রত্যহ অনেক টাকা ব্যয় করিতেছে এবং এক বাক্স পোষাক ও অন্যান্য দ্রব্য আনিয়া তাহার ঘরে রাখিয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে কিম্বা কোন্ স্থান হইতে আনিয়াছে তাহা সে জানে না। প্রাতে বেলপুকুরের বাজারের কএক জন লোক আনিয়া তাহাদের সমক্ষে বেশ্যার ঘর হইতে এই বাক্স বাহির করিয়া দেখিলাম যে তাহার মধ্যে সোনা রূপার দ্রব্য সকল ভিন্ন আর সমুদায় অপহৃত দ্রব্য এবং বস্ত্র আছে। সুজনপুরের নীলকুঠির মালিক মেঃ ডুরেপ ডি ডম্বাল সাহেব আমাকে বলিলেন যে ছিরা ধৃত হওয়াতে তাঁহার অত্যন্ত উপকার হইল, কারণ ছিরা প্রায় সর্ব্ব-দায়ই তাঁহার কুঠির দ্রব্যজাত চুরি করিত। সুজনপুর গ্রামে যাইয়া ছিরার বাড়ী তল্লাস করিলাম কিন্তু সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না।

আমার সুবুদ্ধি উদয় হইয়াছে, আমি অবশিষ্ট মাল সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছি, ফলে বৈরাগী আমার সঙ্গেও ছিল না এবং মালও তাহার হস্তে নাই। মাল আমার নিজ গ্রামে আমার এক জন জ্ঞাতির নিকট আছে, আপনি আমাকে একবার সুজনপুর লইয়া যাইতে পারিলে, সেই মাল দেখাইয়া দিতে পারিব।"

দারোগা—তুমি এক্ষণে হাজতের আসামী; তোমাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া স্থানান্তর লইয়া যাইতে আমার ক্ষমতা নাই। আমি তাহা করিতে পারিব না, তোমার যদি যথার্থই সন্তাপ হইয়া থাকে এবং মালগুলি দেওয়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নাম এবং কোন স্থানে সে মাল গোপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিলেই আমি সেই স্থানে যাইয়া তাহা উদ্ধার করিতে পারিব।

চোর——না আপনি তাহা পারিবেন না, আমি সেখানে নিজে গমন না করিলে অন্যের কাহারও সাধ্য হইবে না।

দারোগা—তবে ইহাতে তোমার আরও কিছু অভিসন্ধি আছে।

চোর——থাকিতে পারে, কিন্তু আমি ইহা উপলক্ষ করিয়া আপনার হস্ত হইতে পলাইবার চেষ্টা করিব, এমন যেন আপনি মনে না করেন।

দারোগা—তাহা যে তুমি করিবে না, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব।

চোর——আপনি যদি তাহা মনে করেন, তাহা হইলে আপনি পাগল। আমি যদিও দুরদৃষ্ট বশতঃ চোর হইয়াছি তথাপি আমি ভাল মানুষের ছেলে, লেখা পড়াও কিঞ্চিৎ জানি, অতএব আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই, যেখানে যাইয়া ইংরাজের হস্ত হইতে লুকাইয়া থাকিতে পারিব। অতএব আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন, আমি পলাইব না। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে যেমন করিয়া হউক, আপনি আমাকে সুজনপুরে না লইয়া গেলে, আপনি সেই অবশিষ্ট দ্রব্য গুলিন পাইবেন না।

ছুরিার এই সকল কথা শুনিয়া আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলাম যে, আমি কল্য প্রাতে যাহা হয় তাহাকে জানাইব। ঈশ্বর বাবুকে জানাইলাম। তাঁহার ইচ্ছা যে যেন তেন প্রকারেন মাল গুলি পাইলেই হয়;

অতএব তিনি ছিরার কথায় কোন দোষ দেখিলেন না এবং আমাকে ছিরার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। ছিরাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের আবশ্যক কিন্তু সেই সময়ে মাজিষ্ট্রেট মেঃ এফ, আর, ককরেল্ সাহেব তখন মফঃস্বল ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন, কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমার সমুদয় কার্য্যের ভার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী ইএতজাদ হোসেনের হস্তে অর্পিত ছিল। মৌলবী সাহেবের ন্যায় ধর্ম্মভীত এবং নিরীহ ভাল মানুষ আমি চক্ষে দেখি নাই। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া সকল কথা ব্যক্ত করাতে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন যে "বাবু আমি আর কিছু জানি না, তুমি যদি আসামীর জেম্বা হইয়া বাহির করিয়া লইতে সাহস কর, তাহা হইলে আমি হুকুম দিতে পারি"। আমি অগত্যা তাহা স্বীকার করাতে তিনি জেল-দারোগাকে সেই হুকুম প্রদান করিলেন।

পর দিবস প্রাতে আমি ছিরাকে জেল খানা হইতে বাহির করিয়া থানায় লইয়া যাইতে চাহিলাম কিন্তু সে থানায় যাইতে অস্বীকার করিল। বলিল যে "আমি এখন থানায় যাইব না, আমাকে আপনার বাসায় লইয়া চলুন, আমি অনেক দিন ভাল দ্রব্য খাইতে পাই নাই, একটা রুই মাছের মুড়া ও দধি দুগ্ধ সন্দেশ খাইতে বড় সাধ হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ান।" আমি তাহাই করিলাম। বাসায় লইয়া যাইয়া সেইরূপ আহারের উদ্যোগ করিলাম ও চৌকীদার দ্বারা তাহার স্নানের জল আনাইয়া দিলাম। অন্য ভদ্রলোকের ন্যায় সে আমার বিছানায় বসিল, আমার হুকায় তামাকু খাইল, আমার গামছা ব্যবহার করিয়া স্নান করিল এবং অবশেষে একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মত বসিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করিল এবং ভোজন করিয়া খুব তৃপ্তি প্রকাশ করিল। ভোজনান্তে থানায় যাইয়া শয়ন করিল। এবং নিদ্রাভঙ্গের পরে আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল যে "দারোগা *

---

* (ভগিনী সুরুচি এই স্থানে আপনি আমাকে কৃপা পূর্ব্বক মার্জ্জনা না করিলে, আমি মারা যাই। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন বঙ্গদেশে আপনার আবির্ভাব হয় নাই সুতরাং তখন আপনার নিয়মের বিরুদ্ধে এমন অনেক কার্য্য করিয়াছি, যাহার জন্য আমরা

মহাশয়, আপনি জানেন যে আমার শরাব খাওয়ার অভ্যাস আছে,— আমাকে ঈশ্বর বাবুর নিকট হইতে সেইরূপ এক বোতল শেরী আনাইয়া দিলে বড় ভাল হয়, কিন্তু তাহা থানায় বসিয়া খাইব না, আমীণ বাজারে রমণী নাম্নী আমার এক প্রণয়িনী আছে, আমি তাহার ঘরে তাহার সঙ্গে বসিয়া অদ্য সমস্ত রাত্রি আমোদ করিতে চাহি। আপনি বেশ বুঝিতেছেন যে আমার নিস্তার নাই, ৫।৭ বৎসরের জন্য আমাকে কয়েদ থাকিতে হইবে এবং তাহা হইতে বাঁচিয়া পুনর্ব্বার বাড়ী যাইব কি না সন্দেহ,' অতএব মনের সাধ মিটাইয়া আজকার একটা রাত্রি যদি আমাকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কাটাইতে দেন, তাহা হইলে চিরকাল আপনার এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখিব। আমি পলাইবার চেষ্টা করিব বলিয়া আপনি যেন কিছু মাত্র আশঙ্কা করেন না, আর এক কথা এই যে আমি যখন রমণীর ঘরে থাকিব তখন সেখানে যেন কোন চৌকীদার কিম্বা বরকন্দাজ আমাদের উপরে প্রহরী স্বরূপে বসিয়া আমাদের আমোদের বিঘ্ন না করে।" ছিরার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। হাঁসিব কি রাগ করিব, স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে "ইহাও একটি কম মজার তামাসা নহে" বলিয়া আমার মনে উদয় হওয়াতে আমি ছিরার সমুদায় অনুরোধ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইলাম। অভয় বাবু শুনিয়া "ছি ছি" করিয়া উঠিলেন, কিন্তু ঈশ্বর বাবু হো হো করিয়া হাঁসিয়া বলিলেন যে "যাও ব্যাটার আবদার প্রতিপালন করা উচিত, পুলিশ আমলার এই সকল কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" তাঁহার নিকট হইতে দুই বোতল শেরী লইয়া আমীণ বাজারে রমণী বেশ্যার বাড়ীতে গমন করিলাম। আমীণ বাজার নিজ কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ির মধ্যস্থল এবং এইস্থানে একটি ভাল বাজার ও নীচ বেশ্যাদিগের উপনিবেশ আছে। রমণীকে সকল কথা অবগত করিয়া ছিরা তাহার ঘর হইতে পলায়ন করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলাম এবং অধিক শরাবের আবশ্যক হইলে আবগারীর দোকান হইতে যত ইচ্ছা শরাব আনিয়া লইতে বলিলাম এবং আরও কহিলাম, যে ছিরা

এইক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত আছি। কিন্তু যে স্থলে প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই আমার সংকল্প হইয়াছে, তখন সত্যের অপলাপ করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিতেও পারিতেছিনা—ক্ষমা প্রার্থনা করি।)

যাহাতে শীঘ্র মাতাল হইয়া অজ্ঞান হয়, তাহা যেন রমণী চেষ্টা করে। তদুত্তরে রমণী মাথা নাড়িয়া কহিল যে "দুই কলসী মদ খাইলেও ছিরার কিছু হইবে না।" পরে রমণীর বাড়ীর পার্শ্বস্থ বেশ্যাদিগকে সতর্ক করিয়া কৃষ্ণনগরের অনেক পাড়া খালি করিয়া চৌকীদার আনিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে এক এক জন প্রহরী বসাইয়া দিলাম। থানার সমস্ত বরকন্দাজ গুলিকেও স্থানে স্থানে রাখিলাম এবং তাহাদের উপরে থানার ও বালাগস্তির জমাদার দ্বয়কে মোতায়েন করিলাম এবং সকলের উপরে আমি স্বয়ং রমণীর বাড়ীর নিকটে—এক দোকানদারের দোতালা ঘরে শয়নের উদ্যোগ করিলাম। সেই ঘর হইতে রমণীর বাড়ী দেখা যায়। এইরূপে সাবধান হইয়া ছিরার আবদার পালনে ব্রতী হইলাম। সন্ধ্যার পরে ছিরা পুনরায় আমার বাসাতে আহার করিয়া আমীণ-বাজার যাইবার পূর্ব্বে—আমার চাকরের নিকট হইতে আমার একখানা পরিধেয় কোঁচান ধুতি ও চাদর চাহিয়া লইয়া পরিধান করিল, এবং কিঞ্চিৎ আতরও চাহিয়া লইয়া আমার জুতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশত আমার জুতা তাহার পায়ে ছোট হইল। পরে আমার বাসা হইতে নির্গত হইয়া আমাকে তাহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল, চৌকীদার কিম্বা বরকন্দাজের সহিত যাইতে অসম্মত হইল। আমরা যাইতে আরম্ভ করিলাম, কোন বরকন্দাজ কিম্বা চৌকিদার না দেখিয়া সে বড় সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু আমাদের পশ্চাতে এক ব্যাটা দাড়ী-ওয়ালা মুস্কিল-আসান একটা মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া আসিতেছিল। সেই মুস্কিল-আসান আমার বৃদ্ধ বরকন্দাজ। ছিরাকে রমণীর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া আমি নিজ স্থানে গমন করিলাম এবং সেই দ্বিতল কক্ষ হইতে সমস্ত রাত্রি রমণীর ঘরে হাসি তামাসার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমাদের কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, অবশেষে ভোর হওয়ার পূর্ব্বে ছিরা টলিতে টলিতে থানায় প্রত্যাগমন করিল এবং আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই দিবস ছিরা সুজনপুর যাইতে পারিল না। পর দিবস নায়েব দারোগার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। নায়েব দারোগা প্রত্যাগতে মোহর ও টাকা ব্যতীত অপহৃত সমুদয় সোণা রূপার দ্রব্য ও চেন সমেত ঘড়িটা আনিয়া উপস্থিত করিয়া ব্যক্ত করিল যে ছিরাব জ্ঞাতির কথা মিথ্যা,' সে নিজেই এক গোপনীয় স্থান হইতে ঐ

দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া দিল। দায়রার বিচারে ছিরার ছয় বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল এবং ঈশ্বর বাবু তাঁহার ঘড়িটি পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে আমার সহিত সেক-হাণ্ড করিলেন। চোরের আবদারের কথাও আমার এইস্থানে সমাপ্ত হইল।

পুরাতন দিল্লী।

কুতব হইতে নূতন দিল্লী অভিমুখে আসিতে ৪ মাইলের উপর এক স্থানে সড়কের ডাইন ভাগে, সাপুরা নামক স্থানে, কিল্লা সিরির (১) ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই কিল্লা আলাউদ্দীন কর্তৃক প্রস্তুত হয়, বহুতর মোগল সৈন্য তরজা খাঁর অধীনে একত্র হইয়া যুদ্ধোদ্যোগ করাতে আলাউদ্দীন ইহা প্রস্তুত করেন। জনৈক ফকির (নিজাম উদ্দিন আউলিয়া) হঠাৎ মোগল সৈন্য মধ্যে ভয়োৎপাদন করাতে মোগল সৈন্য স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সের সাহ এই দুর্গের প্রস্তারাদি সামগ্রা লইয়া সেরগড় প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দুর্গের মধ্যে "কৈশোর হাজার সতুন" অর্থাৎ হাজার থাম্বার অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

কুতব মিনার লইতে সোজা পথে যে সড়ক দিয়া দিল্লী আসা যায়, সেই সড়কের ধারে, কুতব মিনার এবং দিল্লীর মধ্য পথে, সফ্দর জঙ্গের সমাধি মন্দির বিরাজ করিতেছে। ইহা তাজ মহলের অনুকরণে প্রস্তুত। বাহির হইতে জমকাল দেউড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। সমাধি মন্দিরও দেখিতে সুদৃশ্য এবং বহু ব্যয়ে প্রস্তুত। এই মন্দির-শায়ী সফ্দর জঙ্গ অযোধ্যার নবাব। (২) তৎ পুত্র সুজাদ্দৌলা দ্বারা এই সমাধি মন্দির, প্রস্তুত হইয়াছে।

তোগ্লকাবাদ প্রাচীন দিল্লীর একাংশ বলিতে হয়। আমরা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তোগ্লকাবাদ দেখিতে গেলাম। এইখানে তিন "খোয়া

---

(১) আলাউদ্দীনের প্রস্তুত। এই হেতু ইহাকে "কিল্লা আলাই" ও কহে।

(২) মহম্মদ সাহ্ কর্ত্তৃক সয়াদৎ খাঁ অযোধ্যার নবাব হইয়া আসেন। সফ্দর জঙ্গ তাঁহার ভ্রাতৃ পুত্র। মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক তিনি অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর উজির নিযুক্ত হন। সয়াদৎ খাঁ হইতে অযোধ্যা একটি পৃথক রাজ্য হইবার সোপান হইয়া পরে, পৃথক রাজ্য হয়।

মাইল দীর্ঘ এবং এক পোয়া মাইল প্রশস্ত একটি জলাশয় আছে। কনিঙ-হাম সাহেব বিবেচনা করেন তুয়ার বংশীয় অনঙ্গপাল উপাধিধারী জনৈক মহীপাল নামা রাজা (১১১০ হইতে ১১৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যাহার রাজত্ব কাল ছিল), উহা খনন করিয়াছেন। একশত গজ পরিসর একটি খাল-দ্বারা উক্ত জলাশয় যমুনার সহিত সংযুক্ত ছিল। কিন্তু ফিরোজ সাহা প্রস্তরাদি দ্বারা উত্তর দক্ষিণে লম্বা বাঁদ দিয়া উক্ত জলাশয়কে যমুনা হইতে পৃথক করেন।

গায়েস উদ্দিন তোগ্‌লক, তোগ্‌লক বংশের আদি ব্যক্তি। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন, এবং ৪। ৫ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ রাজ্য অধিকার করেন। জুনা খাঁ ১৩২৫ অব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। গায়েস উদ্দিন ১৩২১ হইতে দুই বৎসরে তোগ্‌লকাবাদ নামা প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গের বিষয় অধিক বর্ণনার প্রয়োজন নাই। বস্তুত ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের যত দুর্গ আছে, তাহার মধ্যে এই দুর্গ বড় এবং কার্য্যোপযোগী। সমর নিপুণ ব্যক্তি-গণের চিন্তাশীলতার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায় এবং বিশিষ্টরূপ আত্ম-রক্ষার উপায়ের সহিত ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল। কিঞ্চিদূন ৪ মাইল ইহার পরিধি। পাদরি হিবর সাহেব এই দুর্গ দেখিয়া কহিয়া গিয়াছেন "পাঠা-নেরা রাক্ষসের ন্যায় বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করে এবং মনিকারের ন্যায় সমাধা করিয়াছে।" স্লিমান সাহেবও এই দুর্গ দেখিয়া চমৎকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কহেন "তোগ্‌লকাবাদের দুর্গের ভগ্নাংশের উপর যাইয়া আমার মনে হইল ইহা রাক্ষসী কীর্ত্তি, রাক্ষসেরা রাক্ষসের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে" ইত্যাদি। এই দুর্গ লালকোট কি রায়পিথোরা হইতে শ্রেষ্ঠ পদারূঢ় নহে এবং উভয়ের তুলনাতে দেখা যায় ৩০০। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনঙ্গপালের সময় লালকোট নির্ম্মাণ কালে হিন্দুদের যেরূপ সাম-রিক অভিজ্ঞতা ছিল, গায়েস উদ্দীনের সময়ে সামরিক অভিজ্ঞতা তাহা হইতে উন্নতি লাভ করে নাই।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণ সেনকে জয় করিয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার জয় বাঙ্গালার পশ্চিমাংশেই নিবদ্ধ ছিল। পদ্মা নদী পার হইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে বক্তিয়ারের জয় পতাকা উড্ডীন হয় নাই। লক্ষ্মণাত্মজেরা পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে স্বাধীন ছিলেন। এই গায়েস

উদ্দিন তোগ্‌লকই পূর্ব্ব বাঙ্গালার স্বাধীনতা নষ্ট করেন, এবং মিথিলা জয় করিয়া মিথিলা-রাজকে বন্দী করেন। মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর এতই দৌরাত্ম্য করিয়া ছিল, যে হিন্দুরা কহিয়া থাকেন মুসলমানের প্রেতাত্মাও মন্দ চেষ্টাকারী। অধিকন্তু তাঁহারা আরও কহেন, গায়েস উদ্দিন তোগ্‌লকের প্রেতাত্মা, অনিষ্ট করার অভিসন্ধিতে অদ্যাপি বিচরণ করিয়া থাকে।

তোগ্‌লকাবাদের দুর্গের প্রাচীরের বাহিরে পূর্ব্বোক্ত জলাশয়ের মধ্যে, মহম্মদ তোগ্‌লক (জুনাখাঁ) আপন পিতার সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সমাধি মন্দিরের বহিরঙ্গ পঞ্চকোণ বিশিষ্ট। ২৭টি খিলান যুক্ত ৬০০ ফিট লম্বা সেতু দ্বারা দুর্গের সহিত সংলগ্ন। ৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া গায়েসউদ্দীন এতই কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন, যে তাঁহার নিন্দা সূচক কথা অদ্যাপি চলিত আছে এবং তাঁহার প্রেতাত্মাও সুখে কালকর্ত্তন করিতে পারিতেছে না। তোগ্‌লকাবাদের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে মহম্মদাবাদ নামে একটি পৃথক ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মিণ হইয়াছিল। জাহাপানা নামে একটি মনুমেণ্ট, হুমায়ুন টোমের নিকট নীলা বুরুজ, এবং কিঞ্চিৎ ব্যবধানে তীর বুরুজ নামে অট্টালিকা সকল—পাঠান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনই অধিকাংশই ভগ্ন।

১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগ্‌লকের মৃত্যুর পর ফিরোজ তোগ্‌লক দিল্লী অধিকার করেন, ইনি ফিরোজ সাহ নামে খ্যাত। ইনি বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য অধিকার করেন এবং ৩৭ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ৯০ বৎসর বয়ক্রমে ১৩৮৮ খৃঃঅব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি যমুনা তীরস্থ ইন্দ্র প্রস্থ হইতে কুশক শিকার পর্য্যন্ত যমুনার ধারে ধারে, ক্ষুদ্র এবং নিম্ন পর্ব্বত মালার উপরে নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া ফিরোজাবাদ নাম দেন, ইহাকে ফিরোজ সাহার কতিলাও কহে। ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়।

দিল্লী দরজার বাহিরে যে প্রস্তর স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে, যাহাকে ফিরোজ লাট কহে, তাহা বাস্তবিক ফিরোজ সাহার প্রস্তুত স্তম্ভ নহে। এই স্তম্ভটি ৪২ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা; তাহার ৩৫ ফুট উত্তম পালিস করা স্তম্ভটি একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই সুবৃহৎ স্তম্ভ দিল্লী হইতে ৯০ ক্রোশ দূরে যমুনা তীরে সানোরা প্রদেশে ছিল। হিন্দুরা কাহিত ইহার গোড়া এত

মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত যে কোন মতেই স্থানান্তরিত হইতে পারে না। ইহাতেই ফিরোজ সাহ ৯০ ক্রোশ দূর হইতে স্তম্ভটি আনিয়া দিল্লীতে স্থাপন করিয়াছেন। স্তম্ভের নীচে একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তর ছিল, অর্থাৎ কালে স্তম্ভ বসিয়া না যায় এইজন্যেই একখানি প্রস্তরের উপর স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, দিল্লীতেও সেই প্রস্তর খানি স্তম্ভের সহিত আনীত হইয়া তাহারই উপরে স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত স্তম্ভাঙ্কিত, পালি অক্ষরে লিখিত, পালি ভাষার বিজক পঠিত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত ঐ স্তম্ভ সম্বন্ধে নানা রূপ গল্প প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা কহিত ভীমের গদা, (১) মুসলমানেরা কহিত বৃদ্ধ সম্রাট ফিরোজের ভ্রমণ যষ্টি, ইউরোপীয়েরা কহিতেন পুরুরাজকে পরাজয়-করণ-জ্ঞাপক আলেকজাণ্ডরের স্থাপিত জয় স্তম্ভ। আসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক মৃত জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেব উহার পাঠ উদ্ধার করিতে নিতান্ত যত্ন শীল হন এবং তাঁহারই যত্নে মৃত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার বর্ত্তমান বঙ্গের বর্ণমালার সহিত প্রাচীন পালি অক্ষরের মিলন করিয়া পাঠ উদ্ধার করেন। পাঠ উদ্ধার হওয়াতে স্থির হইয়াছে, প্রিয়দর্শী নামা জনৈক বৌদ্ধ রাজা এই স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই হইতে প্রয়াগ, পাটনা, মরথিয়া, ভাররা, ধাউলি এবং জুনাগড়স্থ (২) স্তম্ভ লিপির পাঠ উদ্ধার হইয়াছে।

সাহেবেরা প্রিয়দর্শী রাজাকে অশোক রাজ কহেন। এই জন্য এই সকল পিলারকে সাহেবেরা অশোক-পিলার কহিয়া থাকেন। চন্দ্রগুপ্ত এবং সান্দ্রকোটস্ যদি এক হন, তাহা হইলে প্রিয়দর্শী রাজার অন্য নাম অশোক ইহা স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্বে যে সকল কারণ প্রয়োগ হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। বিশেষত এই সকল স্তম্ভ অশোকের সময় স্থাপিত হইলে, অশোক নাম উল্লেখ না হইয়া প্রিয়দর্শী নাম উল্লেখ হইবার প্রয়োজন ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র

---

(১) আলাহাবাদের দুর্গ মধ্যে যে প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপিত আছে, তাহা দেখিয়া তীর্থ যাত্রীরা, পাণ্ডাদের মুখে শুনিয়া ভীমের গদা বলিয়া বিশ্বাস করে। ভীমের গদা কত বড়, তাহা সাধারণে অবগত নহে।

(২) প্রয়াগের স্তম্ভ আলাহাবাদের দুর্গ মধ্যে দণ্ডায়মান আছে। পাটনার স্তম্ভ বক্রা গ্রামে স্থাপিত। মরথিয়া বেতিয়া রাজ্যের অন্তর্গত। ভাররা গ্রাম জয়পুরের ১২ ক্রোশ দূরে। ধাউলি গ্রাম কটক জেলার অন্তর্গত, সমুদ্র পারে। জুনাগড়, সৌরাষ্ট্র দেশে।

অশোক যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময়ে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার ছিল না। পৌরাণিক বর্ণন মতে খৃঃ পূ ১২৪৩ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজা ছিলেন, অশোক তাঁহার পৌত্র। অতএব শাক্য সিংহ বৌদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে অশোক বর্ত্তমান ছিলেন। প্রিয়দর্শী নামা রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্মে জ্ঞান লাভ করাতে, তাঁহার অশোক (শোক রহিত) নাম হইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রিয়দর্শী ও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক এক ব্যক্তি হইতেছেন না। অশোকের পাটনাতে রাজধানী ছিল, কিন্তু রাজধানীতে কোন স্তম্ভ স্থাপন না করাই অশোক কর্ত্তৃক এই সকল স্তম্ভ স্থাপন না হওয়ার প্রবল আনুমানিক প্রমাণ হইতেছে।

সম্প্রতি স্তম্ভের উপরিভাগ নেড়া; ১৬১১ অব্দ পর্য্যন্ত উহার উপর সোণার চূড়া ছিল। এইজন্যে মুসলমানেরা মিনার জারিন (সোণার থাম্বা) কহিত। স্তম্ভগাত্রে স্তম্ভ স্থাপয়িতার বিজক ভিন্ন আরও বহু বিজক আছে। চৌহান বংশায় বিশালদেব কর্ত্তৃক ১১২০ সম্বতে এক বিজক খোদিত হইয়াছে। দিল্লী জয় করার পরেই বিশাল দেবের আজ্ঞায় বিজক খোদিত হইয়া থাকিবে। বিশাল দেবের রাজ্য হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল,—ইহা স্তম্ভাঙ্কিত বিজকে লিখিত আছে। অন্যান্য বিজক গুলিন ঐতিহাসিক বিবরণ সংস্পৃষ্ট নহে। অসভ্য জাঠগণ এই স্তম্ভ নষ্ট করার চেষ্টা করিয়াছিল। ফিরোজ সাহ মিরাট হইতে আর একটি স্তম্ভ আনিয়াছিলেন। ফরোক সাহার রাজ্য কালে উহা বারুদের আগুণে পাঁচ খণ্ড হইয়া ভাঙ্গে; এখন কুশক শিয়ারে হিন্দুরায়ের কুঠির নিকটে যথা-ক্রমে ৫ খণ্ড জোড়া দিয়া, ইংরাজেরা স্থাপন করিয়াছেন। তাহার পাদস্থলীতে ইংরাজি অক্ষরে স্তম্ভের সংক্ষেপ ইতিহাস লিখিত আছে। এই স্তম্ভের উত্তরে অনতিদূরে সুপ্রসিদ্ধ সিপাই বিদ্রোহের জয় জ্ঞাপক এক মিনার স্থাপিত হই-য়াছে। এই স্থানে সিপাই প্রভৃতি বিদ্রোহিরা পরাভূত হইয়াছিল বলিয়া ইহার ফতেগড় নাম হইয়াছে। ফতেগড় নূতন দিল্লীর পশ্চিমোত্তর কোণে।

ফিরোজসাহ তাঁহার মৃত্যুর ৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৮৭ অব্দে তুর্খোমান দ্বারের নিকটে স্থিত কালী মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করেন; ইহা সাধারণের উপাসনা মন্দির ভাবে প্রস্তুত হয়। ১৩৭০ অব্দে ফিরোজ সাহ, সফ্দর জঙ্গের মসজিদের নিকট একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহাও বিচিত্র কারু কার্য্যে ভূষিত। ফিরোজ সাহার রাজ্য কালে ১৩৪০ অব্দে খাঁ জাহান সিরির নিকটে এক

মসুজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ৬০টি খিলান বিশিষ্ট সত-পুলা সেতু ফিরোজ সাহার কীর্ত্তি। ফিরোজের কীর্ত্তি সকলের মধ্যে যমুনার খাল কর্ত্তনই প্রধান কীর্ত্তি। এখন ইহার 'পাশ্চাত্য যমুনা-খাল'' নাম হইয়াছে। কুতব মিনার হইতে ৪।৫ মাইল ব্যবধান হাউস্ খাস্ নামক স্থানে ফিরোজের সমাধি হইয়াছে।

দিল্লীতে হিন্দুদিগের এক মাণ-মন্দির ছিল। ফিরোজসাহ ঐ মন্দিরকে আপন পুরী মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বনাম খ্যাত করেন। মোসলমানেরা সর্ব্বদাই এবম্প্রকার কার্য্য করেন, কুতব মিনার নামা প্রাসাদের রূপান্তর করার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আওরঙ্গজেব বাদসাহের সময় যবনেরা কাশীস্থ বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভঙ্গ করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করে এবং ঐ রূপে বিন্ধ্য মাধবের মন্দির ধ্বংস করিয়া তথা মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ফিরোজসাহ কর্ত্তৃক হিন্দুদিগের মাণ-মন্দির ধ্বংস হওয়া বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তিনি একটি মাণ-মন্দির নষ্ট করিলেন, কিন্তু তাহার অভাব পূরণ করেন নাই। যাহা হউক মোগল রাজত্বের চরম দশাতে মহম্মদ সাহ, জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এক মাণ-মন্দির নির্ম্মাণের আজ্ঞা করেন। জয় সিংহও তদনুসারে একটি মাণ-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। স্থানীয় লোকেরা এই মাণ-মন্দিরকে যন্ত্র-মন্ত্র বলে।

এই মাণ-মন্দির দিল্লী হইতে ২ মাইল দূরে, দিল্লী হইতে কুতব পর্য্যন্ত যে সড়ক আছে, তাহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এইক্ষণ ভঙ্গ দশাপন্ন। চতুর্দ্দিকে আবাদ হয়। জওয়াহর সিংহ জাঠের অধীনস্থ অসংখ্য জাঠগণ ইহাকে শ্রীহীন ও ভঙ্গ করিয়াছে। জয়সিংহ প্রথমে পিত্তলের যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু তাহাতে সিদ্ধকাম না হইয়া প্রস্তর, ইষ্টক, চুণ, কাঠ, উপকরণে মাণ-মন্দির প্রস্তুত করেন। কথিত আছে যে, ইহাতে তিনি পারস্ দেশীয় এবং ইউরোপীয় জোতির্ব্বিদগণের সহায়তা পাইয়াছিলেন। কিন্তু মাণ মন্দিরের ভঙ্গাবশেষ দেখিলে, হিন্দু প্রণালীতে হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে নির্ম্মাণ হইয়াছিল, প্রতীয়মান হয়। ডবলিউ হণ্টার নামা জনৈক জ্যোতিজ্ঞ পণ্ডিত দিল্লীর মাণ-মন্দির বিষয়ে যে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। (১)

"ঐ মাণ-মন্দির এইক্ষণে কতকগুলি ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপ মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে এবং পৃথক পৃথক স্থানে ঐ মাণ-মন্দিরান্তর্গত এক একটি

(১) বিবিধার্থ সংগ্রহ ৭ পর্ব্ব ১৩ পৃষ্ঠা

পৃথক পৃথক ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ঘর গুলি প্রত্যেকেই জোতিষ তত্ত্ব নিরূপণের এক একটি যন্ত্র স্বরূপ। যে মণ্ডলাকার বৃহৎ যন্ত্রে নিরক্ষ বৃত্তের অঙ্কপাত রহিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার প্রান্তভাগের কোন দিকেরই কিছু বৈলক্ষণ্য হয় নাই, যেমন তেমনই রহিয়াছে; কেবল তন্মধ্যস্থিত শঙ্কুর পার্শ্ব দেশের কোন কোন স্থানে এবং যে প্রশস্ত মণ্ডলে অংশ সকল চিহ্নিত করা আছে, তাহার কোন কোন ভাগ কিছু কিছু ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ঐ শঙ্কুর পরিমাণ ৭৮ হস্তেরও অধিক হইবে। উহা যে মণ্ডলাকার যন্ত্রের মধ্যে স্থাপিত আছে, তাহার প্রান্ত হইতে শঙ্কুর মূল পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ৬৮ হাতের অধিক এবং ঊর্দ্ধে ৩৮ হাতের অধিক। জয়সিংহ ঐ প্রকাণ্ড যন্ত্রকে সকল যন্ত্রের প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা সামান্য প্রস্তর ময়, কিন্তু শঙ্কুর দুই ধার ও অংশ পরিমাণের অর্দ্ধ মণ্ডলাকার স্থান গুলিন শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। কিয়দ্দূর অন্তরে এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র আর একটি যন্ত্র সম্পূর্ণরূপ প্রকৃতাবস্থায় বর্ত্তমান আছে; তাহার গঠন বিভিন্ন প্রকার। মধ্যস্থানে যে শঙ্কু আছে; তাহার মাথার উপর আরোহণ করিবার নিমিত্ত সেই শঙ্কুর গাত্রে একটি অপূর্ব্ব সোপান আছে। শঙ্কুর চারিদিকেই সমকেন্দ্র অর্দ্ধমণ্ডল বিদ্যমান আছে। ঐ অর্দ্ধ মণ্ডলগুলি দ্রাবিমার (Longitude) প্রতিরূপ। এস্থানেও আর একটি শঙ্কু আছে।

এই যন্ত্র গৃহের উত্তর ভিত্তির সহিত তিনটি শঙ্কুরই যোগ আছে এবং দর্শকের ঠিক পূর্ব্ব কি পশ্চিম দিক্ স্থিত গ্রহাদির উচ্চতা নিরূপণ করিবার জন্যই ভিত্তির গাত্রে উপর্য্যুপরি অর্দ্ধ মণ্ডলাকার রেখা সকল পাতিত আছে। এই যন্ত্র গৃহের পশ্চিম দিকের এক ভিত্তিতে গ্রহাদির উচ্চতা নির্ণয় করিবার একটি যন্ত্র আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহন্মণ্ডলাকার দক্ষিণ যন্ত্রের দিকে আর দুইটি সমরূপ যন্ত্রালয় আছে। ঐ দুইটি দ্বারাই আকাশস্থ জ্যোতিঃ পদার্থের দূরতা ও উচ্চতা নিরূপিত হয়। এই দুইটি যন্ত্র-গৃহই মণ্ডলাকার, তাহার প্রত্যেকেরই মধ্যস্থানে এক একটি স্তম্ভ আছে এবং স্তম্ভ হইতে একটু অন্তরে মণ্ডলাকার ভিত্তি ঐ স্তম্ভের মস্তকের সঙ্গে সমান উচ্চ হইয়া উত্থিত হইয়াছে। স্তম্ভের দুইহাত উচ্চ স্থান হইতে কড়িকাষ্ঠের ন্যায় প্রস্তরময় লম্বাকার ভুজ সকল নির্গত হইয়া, দিগন্তভাবে ঐ মণ্ডলাকার ভিত্তি পর্য্যন্ত চালিত হইয়াছে। স্তম্ভের চতুর্দ্দিক হইতে

ঐ প্রকার ত্রিংশৎ ভুজ বহির্গত হইয়াছে। স্তম্ভ হইতে ভিত্তি যতদূর, প্রত্যেক ভুজই পরস্পর ততদূর অন্তরস্থ। তাহারা স্তম্ভ হইতে ক্রমে যতদূর গমন করিয়াছে, ততই পরস্পর ক্রমে অধিক অন্তরস্থ হইয়াছে। যাহাতে ঐ গৃহের উপরে উঠা যায়, উক্ত মণ্ডলাকার ভিত্তির গাত্রে তদ্রূপ পথও আছে। স্তম্ভের ছায়া দ্বারা সূর্য্যের উচ্চতা স্থির হয়। ভিত্তির গাত্রে তাহার পরিমাণ পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে এবং ঐ পরিমিত অংশ সকল পুনর্ব্বার সূক্ষ্মরূপে বিভক্ত হইয়া তাহাতে চিহ্নিত হইয়াছে। ঐ ভিত্তির মধ্যে মধ্যে উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত আরও কতক গুলিন রেখাপাত আছে। ঐ রেখার উপর, স্তম্ভের ছায়া দেখিয়া সূর্য্যের কোট্যগ্র পর্য্যন্ত নিরূপণ করিতে পারা যায়। এই গৃহস্থিত যন্ত্রাদি দ্বারা চন্দ্র এবং নক্ষত্রেরও দূরতা ও উচ্চতা নিরূপিত হয়। এই গৃহের পরিমাণ ডাক্তার হণ্টর পরিমাণ দ্বারা যে স্থির করেন, তাহা এই; পরিধি ১৭২ ফিট ৬ ইঞ্চ। স্তম্ভের পরিধি ১৭ ফিট। স্তম্ভ-সংলগ্ন উপরি উক্ত ভুজের দৈর্ঘ্য ২৪ ফিট ৬ ইঞ্চ।

এই সকল যন্ত্র গৃহের কিঞ্চিদুত্তরে ৯০টি সোপান বিশিষ্ট আর এক যন্ত্র আছে। উত্তর মুখ হইয়া ৯০ ধাপ অতিক্রম করিয়া, উপরিভাগে উঠা যায়, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চভাগে উঠিলে, উত্তর মুখী থাকিতে হয়। এই সোপানের ঢালু পার্শ্ব দিয়া দুই ছিদ্র দ্বারা তাহার সমসূত্রে উর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিলে, নভোমণ্ডলের ঠিক চতুর্থাংশের মধ্য দৃষ্ট হয়, এবং সেই স্থানে ধ্রুব তারা দৃষ্ট হইলে, অপর সকল তারার স্থান অনায়াসে নিরূপণ হইয়া থাকে। এই সোপানের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধ গোলাকার একটি প্রাচীর আছে, তাহার উত্তান দেশ দণ্ড ও পলের অঙ্ক চিহ্নিত আছে। সূর্য্য কিরণে সোপানের ছায়া সেই চিহ্নিত স্থানে পড়িয়া কাল নিরূপণ করে। এই এক প্রকার প্রকাণ্ড সূর্য্য ঘটিকা।”

হণ্টর সাহেব এই মাণ-মন্দিরের গঠন প্রণালী এবং কৌশলাদির বিষয় অনেক প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কালসহকারে এবং অযত্নে মাণ-মন্দির ভগ্ন হইয়াছে; হণ্টর সাহেব যাহা দেখিয়াছেন এখন তাহাও নাই। মহম্মদ সাহ মোগল বংশে ক্ষমতা শূন্য সম্রাট ছিলেন, তাঁহার এমত কিছু কীর্ত্তি নাই, যাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। মাণ-মন্দির একমাত্র কীর্ত্তি ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল

খেয়াল গায়ক ও গায়িকাদের মুখে মহম্মদ সাহার নাম শুনিতে পাই। মহম্মদ সাহার সময় হইতে মোগল রাজ্যের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়, আওরঙ্গজেবের কার্য্য-প্রণালীই তাহার মূল কারণ। মহম্মদ সাহার বিলাস-প্রিয়তা তাহার সহায়তা করিয়াছিল। এই মহম্মদ সাহার সময়েই ময়ূরাসন ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছে। ইহাঁর রাজ্যকালেই নাদির সাহ অনাথ প্রায় দিল্লীর প্রজাগণকে বিনাশ করিয়াছিল।

পূর্ব্বে পুরাতন এবং নূতন দিল্লীর যে সকল অট্টালিকার বিবরণ লিখিত হইল, তাহা ছাড়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা সমাধি মন্দির এবং মসজিদ কতক ভগ্নাবস্থাতে, কতক কিয়ৎ পরিমাণে ভাল অবস্থাতে দেখিতে পাওয়া যায়; নিম্নে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইল।

বুড়াপুল।	বল্লভ গড় পর্য্যন্ত প্রকাশ্য পথে ১১ থিলান যুক্ত পুল।
আরবকা সরাই।	আরব দেশীয় লোকের বাস নিমিত্ত হাজি বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এইক্ষণে ভগ্ন-দশা-গ্রস্ত।
মক্‌বুরা খান্ খানান	হুমায়ূন টোমের বাহিরে। আরবকা সরায়ের বল্লভগড় দরওয়াজার ধারে। বরহাম খাঁর পুত্র মির্জা খাঁ খান খানান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আপন স্ত্রীর সমাধি মন্দির উদ্দেশে প্রস্তুত হয়, কিন্তু নিজেই ইহাতে শয়ান রহিয়াছেন।
মসজিদ ইসাখা।	চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। ইহাকে ইসা খাঁর কোতিলা কহে।
তাগা খাঁর সমাধি মন্দির	রক্তবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত।
চৌষট্টি খাম্বা।	তাগা খাঁর পুত্র আজিম খাঁর সমাধি মন্দির, ইহার অনুকরণে দেওানিয়া থাস প্রস্তুত। ইহা একটি মনোজ্ঞ অট্টালিকা; ৬৪ স্তম্ভ ইহাতে নিবদ্ধ আছে; সেইজন্য চৌষট্টি খাম্বা নাম হইয়াছে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত।

লাল বাঙ্গালা।	আরব সরাই হইতে পুরাণা কিল্লা আসিতে সড়কের বাম ভাগে। এইস্থানে দুইটি সমাধি মন্দির। বড়টি ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন তাঁহার পত্নী বিশেষের জন্য প্রস্তুত করেন। ছোটটি দ্বিতীয় সাহ আলম, তাঁহার লাল কুনওর নাম্নী স্ত্রীর মৃতদেহ সমাধি জন্য নির্ম্মাণ করেন।
কালা মহল।	পুরাণা কিল্লার নিকটে; সম্প্রতি সম্পূর্ণ ভগ্ন।
জিহানারা সরাই।	ফিরোজ লাটের সম্মুখে বৃহৎ এবং উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত সরাই। জিহানারা রাজ কন্যার প্রস্তুত; সম্প্রতি উহা জেল খানা।
আদম খাঁর সমাধি মন্দির।	আদম খাঁ এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ দুষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট লোক ছিলেন।
রওসন চেরাগ।	ইহা একটি ধর্ম্ম মন্দির; জনৈক প্রসিদ্ধ ফকিরের স্মরণার্থ ফিরোজ সাহ প্রস্তুত করেন।
বেলোলি লোদিব সমাধি মন্দির।	রওসন চেরাগের সন্নিকটে।
সেকন্দর লোদির সমাধি মন্দির।	সফ্‌দর জঙ্গের সমাধি মন্দিরের সম্মুখস্থ সমাধি মন্দির সমূহের মধ্যস্থ।
কুমারী মসজিদ।	যমুনাতীরে দারিয়া গঞ্জের নিকটে। আওরঙ্গজেবের কুমারী কন্যা জিনাত উল্ নেছা কর্ত্তৃক প্রস্তুত। ইহার সন্নিকটে শ্বেত প্রস্তরের সমাধি মন্দিরে কুমারী জিনাত উল নেছার সমাধি হইয়াছে।
রোসিনারা বাগান	আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারা কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

১১৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত দিল্লী, পাঠান এবং মোগল উপাধিধারী মুসলমানদিগের অধীনে থাকে। পাঠান বাদশাহগণ পরস্পর মারামারি করিয়াই সময় কাটাইতেন; তাঁহাদের রাজ্যকাল ঘোর

অসুখের কাল ছিল; দেশে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। অধিকাংশ পাঠান বাদসাহ নৃশংস ছিলেন, গায়েস উদ্দিন তোগ্লকের পুত্র মহম্মদ তোগ্লক বিদ্বান্ ছিলেন বটে; কিন্তু তিনিও বিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। ফিরোজসাহ তোগ্লকের রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল; তাঁহার সময়ে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন হইয়াছিল। পাঠান রাজ্য হইতে মোগল রাজ্য অপেক্ষাকৃত সভ্য হইলেও মোগল রাজ্য কালে কোন দেশ হিতকর কার্য্য হয় নাই। আকবর সার সময়েই মোগল রাজ্যের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি হয় ও দেশে শান্তি স্থাপন হয়, তিনিও বিদ্যালয়াদি বহুল পরিমাণে করিয়াছিলেন এমন প্রকাশ নাই। সাহ জাহান নূতন দিল্লী নগর পত্তন করিলেন। নিজের বিলাস প্রিয়তার জন্য, আম্ দেওয়ানিয়া, দেওয়ানিয়া খাস্, মতিমহল প্রভৃতি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। ৬ কোটী টাকা ব্যয়ে ময়ূরাসন প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু একটি বিদ্যালয় কি চিকিৎসালয়, কি পান্থ নিবাস, কৈ প্রস্তুত করিলেন? মহম্মদ সাহার সময়েও রাজকীয় ব্যয়ে কোন বিদ্যালয় স্থাপন হয় নাই। উজির গাজিউদ্দিন এক মাদ্রাসা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রাজধানী যেমন রাজার বাস স্থান, তেমন জ্ঞানালোচনার সর্ব্ব প্রধান স্থান হইবে। দিল্লী ৬০০ বৎসরের কিঞ্চিৎদধিক কাল মুসলমান বাদশাহার অধীনে ভারতের রাজধানী ছিল। একাল মধ্যে দিল্লী হইতে কি জ্ঞানালোক বাহির হইয়াছে, তাহা জানি না। দিল্লী নগরী নানা পাপের মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বাস ঘাতকতা, রাজ্য লোভে নৃশংস ভাবে রাজ হত্যা, দিল্লীর প্রাত্যাহিক ঘটনা। যিনি বাদশাহ, তিনিও কথন নিশ্চিন্ত হইয়া, কোন দিন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। পুরাতন দিল্লী এবং নূতন দিল্লীকে প্রেত ভূমি বলা যাইতে পারে। নর রক্তে মৃত্তিকার প্রত্যেক কণা সিক্ত হইয়া রহিয়াছে।

মহা হিন্দুসমিতি।

পূর্ব্ব প্রস্তাবের সমর্থন।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়াই আমাদের প্রবীণ হিন্দু মহোদয় "মহাহিন্দু সমিতি" সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যে দিকে দৃষ্টি-পাত করি, সেই দিকেই দেখি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে। ব্রাহ্মই হউন, আর সাকারবাদী হিন্দুই হউন, উপাধি-ধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই হউন, আর ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত হিন্দুই হউন, সকলকেই আজি কালি প্রাচীনকালের আর্য্যদিগকে প্রশংসা করিতে দেখা যায়। এক সময়ে আর্য্যগণ যে, উন্নতিরূপ গিরির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন, এ কথা এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহাদের গভীর গবেষণার ফল স্বরূপ যে সকল তত্ত্ব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য সকলেই প্রয়াস পাইতেছেন এবং প্রাচীন ঋষিদের স্তূপাকার গ্রন্থ সমুদায়ের মধ্যে যে সকল রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা বাহির করিয়া আপামর সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে, ভগবান ভারতের পক্ষে সদয়। নতুবা কে আশা করিয়াছিল যে, ইউরোপ প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, ঋগ্বেদ সংহিতা অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীদের উপকার সাধন করিবেন, বিখ্যাত উপন্যাস লেখক বঙ্কিম বাবু, পার্থিব প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া পরম প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের চরিত ব্যাখ্যা করিতে বদ্ধ-পরিকর হইবেন, এবং চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ তাঁহাদিগের নিজের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিবেন। এ দৃশ্যটি যে কেবল বঙ্গদেশেই দেখা যাইতেছে, এমত নহে। আর্য্যকীর্ত্তি নিনাদের প্রতিধ্বনি ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনের প্রতিষ্ঠিত আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণীসভা, সমধিক উৎসাহের সহিত আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, পঞ্জাবে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর স্থাপিত আর্য্য সভা সকল বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম সাধারণ সমক্ষে ব্যাখ্যা করিতেছে, বোম্বায়ে, মিত্রমণ্ডলী আর্য্যরীতি নীতি সংরক্ষণ জন্য সাধারণকে উত্তেজিত করিতেছে এবং মাদ্রাজে, দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছেন। অধিক আর

কি বলিব, বৃদ্ধ সর রাজা মাধব রাও রাজ্য শাসনকার্য্যে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া, এখন হিন্দু ধর্ম্মকে বিশুদ্ধভাবে পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। সভ্যতম ইউরোপখণ্ডে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া দেখি, সেখানেও আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সংঘটিত হইতেছে। প্রাচীন আর্য্যভাব ইউরোপকেও মোহিত করিয়াছে। সেখানে কোন কোন আর্য্য ব্যবহার অবলম্বন করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। লোকে মাংস ত্যাগ করিয়া উদ্‌ভিদ্‌ভোজী হইতেছে—সুরাত্যাগ করিয়া মিতাচারী হইতেছে। অনেকে মৃতদেহ ভূমিতে প্রোথিত করিতে চাহে না—তাহা এখন হিন্দু-প্রণালী অনুসারে দগ্ধ হইতেছে। সমস্ত পৃথিবী যে আর্য্যভাবে অনুরঞ্জিত হইবে, এখন এরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছে। যে সকল হিন্দু পাশ্চাত্য চাল-চলন অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছেন। লজ্জায় পড়িয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইতেছে; কেহ কেহ হিন্দুর চাল চলন পুনরায় গ্রহণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া ভারতকে প্লাবিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। ভারতের শুভগ্রহে তাহা বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। এক প্রদেশের হিন্দু অন্য প্রদেশের হিন্দুকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলেরই এক প্রকার অভাব, সকলেরই এক প্রকার আশা, সকলেরই এক প্রকার উদ্দেশ্য। এক কান্না সকলেই কাঁদিতেছে, এক কষ্ট সকলেই ভুগিতেছে, এক জ্বালায় সকলেই জ্বলাতন। এমন অবস্থায়, ভারতের সমগ্র হিন্দুগণের একত্র হইয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় স্থির করা বিচিত্র নহে।

এই নিমিত্ত আমরা আমাদের বৃদ্ধ বন্ধুর প্রস্তাবটিকে সময় উপযোগী বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকায় যে প্রকার উদার ভাবে ইহার আলোচনা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে ভারতবাসীগণ, অন্তত আমাদের বঙ্গীয় ভ্রাতাগণ, বদ্ধ পরিকর হইয়া এই মহাসমিতি আহূত করিয়া ভারতের দুঃখ দূর করিবেন। আমরা উৎসুক অন্তরে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে এই প্রস্তাবের একটি সমালোচনা দেখিলাম। সমালোচক মহাশয়ের আন্তরিক ইচ্ছা যে এই প্রস্তাবটি শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়। কিন্তু তৎপক্ষে কয়েকটি অন্তরায়ের উল্লেখ করিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন

যে, "আমরা উহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেও, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অসম্ভব বলিয়া আশা-শূন্য।" আমরা ভারতের এক প্রান্তে থাকিয়া যখন আশা করিতেছি যে, প্রস্তাবিত "মহা হিন্দু সমিতি" সংস্থাপিত হইবে এবং আমরা আমাদের বৃদ্ধ বন্ধুকে কোলে করিয়া নৃত্য করিব, তখন যে সমালোচক মহাশয় আমাদের বন্ধুর নিকটে থাকিয়াও আশা-শূন্য হইয়া রহিবেন ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। এই নিমিত্ত তাঁহার মনে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করিতে আমরা প্রয়াস পাইব।

প্রস্তাবিত সমিতির তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম বিবৃত উদ্দেশ্যটি, অর্থাৎ "হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা" সম্বন্ধে, সমালোচক মহাশয় অনেকগুলি কথা বলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, "হিন্দুদিগের প্রকৃত ধর্ম্মই যে কি, তাহাই যখন আজিও সন্দেহ ও বিবাদের স্থল, তখন হিন্দু ধর্ম্মের স্বত্ব ও অধিকার বলিলে আমরা কি বুঝিব?" ইহার পরই তিনি বলিয়াছেন, "যে দেশে গো-মাংস ভোজী, সুরাপায়ী কিন্তু পুত্তলিকা-সেবী ব্যক্তি—হিন্দু, অথচ নিরামিষ আহারী মাদক মাত্র ত্যাগী, কিন্তু নিরাকারবাদী ব্যক্তি অহিন্দু এবং সমাজে অপদস্থ, সে দেশে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা কিরূপ আযৌক্তিক এবং কতদূর দুরূহ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে ধর্ম্মেরই আদৌ স্থিরতা এবং সংজ্ঞা নাই, সেই অনিশ্চিত এবং সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত ধর্ম্মের অধিকার কখনও নির্ণীত ও রক্ষিত হইতে পারে না।" এই কথাগুলি বলিয়া, নিরাকারবাদী, বিধবাবিবাহ পক্ষপাতী, জাতিভেদ দ্বেষী-ব্রাহ্ম এবং ধর্ম্ম-দ্বেষীদিগকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা, যে অসঙ্গত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। অবশেষে, বলিয়াছেন যে "আমরা এই সকল স্থলে হিন্দুধর্ম্ম অর্থে বেদ উপনিষৎ প্রতিপাদিত হিন্দুধর্ম্মের কথা বলিতেছি না, বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কথা বলিতেছি।" অখাদ্য খাইয়া হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া থাকা যে সম্ভব, তাহা আমরা এই মাত্র সমালোচক মহাশয়ের কাছে শুনিলাম। ইহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে ইউরোপ প্রত্যাগত ব্যক্তিগণকে সমাজে গ্রহণ করিতে কেহ কোন আপত্তি করিত না। অমৃতলাল বাবুকে হিন্দু সমাজে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে এত আন্দোলন কেন হইয়াছিল? বিজাতীয় খাদ্য দ্রব্য সেবন কি, তাহার কারণ নহে? একথা যথার্থ বটে যে, অনেক হিন্দু গোপনভাবে অখাদ্য

খাইয়া থাকেন। কিন্তু গোপনে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, তৎসম্বন্ধে হিন্দু সমাজ কি করিতে পারে? কোন অন্যায় কার্য্য সপ্রমাণ না হইলে, তাহার কি দণ্ড হইতে পারে? রাজ্য-শাসন ব্যাপারেও, কোন ব্যক্তি দোষী সপ্রমাণ না হইলে, তাহার দণ্ড হয় না। এমন শোনা গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে বিচারকর্ত্তা দোষী বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছেন কিন্তু তাহার দোষ সম্বন্ধে প্রমাণ না পাওয়াতে, তাহাকে নিষ্কৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। সমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। কোন হিন্দু গোপনভাবে অখাদ্য খাইতে পারেন। কিন্তু, তিনি হিন্দু মণ্ডলীর সমক্ষে অখাদ্য সেবন করুন দেখি? তাহা হইলে, অবশ্যই তিনি জাতিচ্যুত হইবেন।

"পুত্তলিকা-সেবী ব্যক্তি হিন্দু" এই কএকটি কথা বলিয়া সমালোচক মহাশয় হিন্দুদিগের অন্তঃকরণে বড় আঘাত দিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ঘৃণা ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পৌত্তলিক কে? যে প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বরের পূজা করে, সে পৌত্তলিক নহে। হিন্দু মাত্রেই নিরাকার-বাদী। ঈশ্বরের নিরাকার ভাব হিন্দুর মজ্জায় মজ্জায় অঙ্কিত রহিয়াছে। তবে, এ ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া হিন্দু গণ তাঁহাকে প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া ধারণা করে। অন্তরের রিপুসকল, বিষয়-কামনা, যশঃ-প্রার্থনা প্রভৃতিকেই পুত্তল বলা যায়। যাহারা এই সকলের পূজা করে, তাহারাই পৌত্তলিক। নিরাকার বাদী বলিয়া যাঁহারা অহঙ্কার করেন, তাঁহারা যদি এই সকল ভাব পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা ঘোর পৌত্তলিক বলিব। আবার যাঁহারা এই সকল ধর্ম্মধ্বজীর নিকট পুত্তল-পূজক বলিরা ঘৃণিত, তাঁহারা যদি মনের কুবৃত্তি সকলকে পদতলে দলিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃত নিরাকার-বাদী। সমালোচক মহাশয়, চৈতন্য-দেব তুকারাম ও রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করিতে ইচ্ছা করেন, করুন। কিন্তু আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব যে, বর্ত্তমান সময়ের উৎফুল্ল নিরাকারবাদীগণ তাঁহাদের চরণ ধুলা স্পর্শ করিবার যোগ্য নহেন। উল্লিখিত মহাপুরুষগণ মনের কু-প্রবৃত্তি সকলকে; দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বরকে ধারণা করত চরমে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে কি বলে? না, যত দিন লোকে ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার

তাঁহাকে প্রতিমায় পূজা করিবে। তাহার পর, দিব্য জ্ঞানলাভ করিলে তাহারা তাঁহাকে অন্তরাত্মা বলিয়া উপলব্ধি করিবে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা এবং সেই অনুসারেই তাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন। সমালোচক মহাশয় আরও বলিয়াছেন—"কিন্তু নিরাকারবাদী ব্যক্তি অহিন্দু এবং সমাজে অপদস্থ"। এ বড় অশ্চর্য্য কথা। অহঙ্কারে উৎফুল্ল হইয়া, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া আস্ফালন করেন, এরূপ ব্যক্তিগণ হিন্দু সমাজে সম্মান না পাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁহারা প্রকৃত পুত্তল পূজা (কুপ্রবৃত্তি সকল) ত্যাগ করিয়াছেন, হিন্দু সমাজ অবনত মস্তকে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। যে চৈতন্যদেব মুসলমানের সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্য দেব আজ দেবতা বলিয়া পূজিত। যে তুকারাম এক জন সামান্য শূদ্র ছিলেন, সেই তুকারাম আজ দেবতার আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও আমরা এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাই। হিন্দুরা সন্ন্যাসীদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাঁদের জাতি নাই, গোত্র নাই, ইহাঁরা সামাজিক ব্যবহারের অতীত, অথচ নিরাকারবাদী। এই সকল মহাপুরুষ, নানা স্থলে ভ্রমণ করেন। যেখানে গমন করেন, সেই খানেই ইহাঁরা আদরের সহিত গৃহীত হয়েন। হিন্দুরা জানেন যে ইহাঁরা যথার্থই ব্রহ্ম জ্ঞানী। এই জন্যই ইহাঁরা আদরিত।

ইহার পর, সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন, "যে ধর্ম্মেরই আদৌ স্থিরতা এবং সংজ্ঞা নাই। সেই অনিশ্চিত এবং সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত ধর্ম্মের অধিকার কখন নির্ণীত ও রক্ষিত হইতে পারে না।" হিন্দুধর্ম্মের স্থিরতা নাই একথা সমালোচক মহাশয়কে কে বলিল? সকল শাস্ত্রেই এক ভাবে বলিতেছে যে, যত দিন লোকে ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিবে, তত দিন তাহারা তাঁহার প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া পূজা করিবে। কিন্তু যখন তাঁহাকে নিরাকার ভাবে ধারণ করিতে সক্ষম হইবে, তখন প্রতিমা অনাবশ্যক জ্ঞান করিবে। এতদ্ব্যতীত নানা দেব দেবীর পূজার প্রণালী শাস্ত্রে বিবৃত আছে এবং বিবিধ আচার ব্যবহারের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রীয় উপদেশ অনুসারে হিন্দুগণ ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন। তবে সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন, যে যখন হিন্দু ধর্ম্ম সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তখন কি প্রকারে ইহার অধিকার নির্ণীত হইবে?

সম্প্রদায় লইয়া যে কথা তোলা হইয়াছে,—এ কথা ত পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে? খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে ক্যাথলিক্ ও প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে, তাহা কে নির্ণয় করে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা আপন আপন স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য একত্রিত হন না? খৃষ্টের নামে তাঁহারা কি উন্মত্ত হইয়া বিধর্ম্মীদিগকে দণ্ড দিতে বদ্ধ পরিকর হন না? ইউরোপ প্রত্যাগত হিন্দু, ধর্ম্ম-দ্বেষী, ব্রাহ্ম প্রভৃতিকে হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত করিবার প্রস্তাবে সমালোচক মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন। সমালোচক মহাশয় বলুন দেখি, কোন ধর্ম্মে কাল্পনিতা প্রবেশ করে নাই? সমালোচক মহাশয় কি অবগত নহেন যে খৃষ্টিয়ান সমাজের মধ্যে সহস্র সহস্র উন্নতমনা ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের খৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই এবং যাঁহারা তাঁহাদের বাইবেলের বিরুদ্ধে কত কার্য্য করিয়া থাকেন? রবিবারে খৃষ্টীয়ানদের বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা নিষেধ। কিন্তু কয় জন খৃষ্ট্রীয়ান এ আদেশটি পালন করিয়া থাকেন? তাই বলিয়া কি তাঁহাদিগকে খৃষ্টীয় সমাজ ভুক্ত বলা যাইবে না? মুসলমানদের মধ্যেও সিয়া স্নুন্নি দুই প্রধান সম্প্রদায়। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার হইলে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত না উত্তেজিত হইয়া উঠেন? আবশ্যক হইলে, তাঁহারা জেহাদ্ (ধর্ম্ম যুদ্ধ) জারি করেন। কোন সম্প্রদায় মধ্যে মত ভেদ হইবে না, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-সমাজ সকল সাম্প্রদায়িকতা লোপ করিবার যাহার উদ্দেশ্যে, সৃষ্ট হইয়া তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইত না। বলিতে কি পৃথিবীতে দুইটি লোক পাওয়া কঠিন, যাঁহাদের সকল বিষয়ে এক মত। কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলের একত্রিত হইয়া কোন মহদুদ্দেশ্য সংসাধন জন্য বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত নহে? কোন কোন বিষয়ে মত ভেদ সত্বেও, যে যে বিষয় লইয়া আমরা এক সূত্রে বদ্ধ হইতে পারি, তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া সকলেরই উচিত। মহা হিন্দু সমিতির প্রস্তাব কর্ত্তা সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। হিন্দু সমাজে কোন কোন বিষয়ের বিকৃত ভাব দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহাও শাস্ত্র অনুমোদিত নহে। বিকৃত ভাবকে সংশোধিত করা উচিত, অবনত সমাজকে উন্নত করা কর্ত্তব্য। সমাজ অধঃপতিত হইতেছে, তাহাকে উত্তোলন করা কর্ত্তব্য। তাহাকে পড়িতে দেখিয়া স্থির ভাবে থাকা কি উচিত?

এখন দেখা যাউক, আমাদের সম্প্রদায় বিভক্ত সমাজে একতা সংস্থাপনের স্থল আছে কি না।

ভারতবর্ষের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখি হিন্দু মাত্রেই এক শাস্ত্রের দ্বারায় শাসিত। যে শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বঙ্গবাসী ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেই শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক ও ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সহিত বঙ্গবাসীদের বহুকাল হইতে সংস্রব আছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্য সমন্ধে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অনভিজ্ঞ। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি যে বঙ্গদেশের উপাসনা প্রণালীর সহিত দাক্ষিণাত্যের উপাসনা প্রণালীর অনেক মিল আছে। বঙ্গে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে; এ অঞ্চলে সেই সময়ে দেবীর মন্দিরে চণ্ডী পাঠ ও উপাসনা হয়। ইহার নাম নব রাত্রি। বাঙ্গালার ভূত চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে চৌদ্দ প্রদীপ দিবার নিয়ম আছে, এখানে তাহা দীপাবলী নামে পরিচিত। বাঙ্গালার সরস্বতী পূজার উপলক্ষে পুস্তকাদি পূজা করিবার নিয়ম আছে। এখানে সরস্বতীর প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হয় না বটে, কিন্তু বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এখানকার লোক পুঁথি প্রভৃতির পূজা করে। বাঙ্গালার শিব রাত্রিতে শিবপূজা হইয়া থাকে। এখানে "শিবরাত্রি" "মহাশিব রাত্রি" বলিয়া পরিচিত। অতি সমারোহের সহিত লোক শিব মন্দিরে গমন করে এবং রাত্রিতে আপন আপন বাটীতে শিব পূজা করে। বাঙ্গালার দোল, এখানে "শিম্‌গা।" বঙ্গ দেশের ন্যায় এখানেও "ন্যাড়া পোড়া" হইয়া থাকে। তবে বঙ্গবাসীরা এই উৎসবটিকে শ্রীকৃষ্ণের দোলের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন, এখানকার লোক শাস্ত্র অনুযায়িক হোলিকোৎসব *

---

* ভবিষ্যোত্তর পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সত্য যুগে রঘু রাজার সময়ে ঢোণ্ঢা নামক এক রাক্ষসী বালকগণের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত। রাজা বশিষ্ঠ দেবের নিকট ইহা নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, এই রাক্ষসী তপস্যায় দেবতাকে তুষ্ট করিয়া অমরত্ব প্রার্থনা করে। সে এই বর পায় যে কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না, কেবল পাগল ও বালকদের দ্বারা ঋতুর সন্ধি কালে তাহার ভয় উপস্থিত হইবে। এই জন্য রাক্ষসী বালকদের উপর পীড়ন করে। ইহা নিবারণের উপায় এই যে, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর সন্ধি স্থলে স্তূপাকারে কাষ্ঠ একত্রিত করত রক্ষোঘ্ন মন্ত্রে

করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাকে "হোলি" বলে। বাঙ্গালার ন্যায় এখানেও রাম নবমী ও জন্ম অষ্টমীতে উৎসব হইয়া থাকে। এই সকল উৎসব ব্যতীত, স্ত্রীলোকদের কোন কোন ব্রতও এখানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে যথা; অনন্ত চতুর্দ্দশী, চাঁপা ষষ্ঠী ও বট সাবিত্রী। এতদ্ভিন্ন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াও প্রায় এক প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যা, দেবতা পূজা, তর্পণ, একাদশী ব্রত এবং নিয়মিত দিনে পূর্ব্ব পুরুষদের শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাধা হইয়া থাকে। মকর সংক্রান্তিতে পুণ্য তোয়ার স্নান এবং তীর্থাদি দর্শন করিবারও নিয়ম আছে। আচার ব্যবহারেও অনেক মিল দেখা যায়। আমাদের দেশের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এখানে "ভাউ বীজ," বাঙ্গালার পোষড়া এখানে "তিল গুড়" নামে বিখ্যাত। বিজয়ার দিনে আমরা যেমন পূর্ব্বকার শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকি, দাক্ষিণাত্যের লোকও সেইরূপ উচ্চ ভাব দেখাইয়া থাকে। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সোণা দান করিয়া নমস্কারের বিনিময় করে। ইহা প্রকৃত সোণা দান নহে। সোণার পরিবর্ত্তে কাঞ্চন পত্র প্রদান করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব যেন সোণার ন্যায় উজ্জ্বল ও পবিত্র হয়। এখানে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া দেখিয়াছি যে এ প্রদেশের লোক বঙ্গ বাসীদের প্রতি সহানুভুতি প্রকাশ করে। আমাদের ও ইহাদের উৎসব ও অনুষ্ঠানাদির মধ্যে অনেক ঐক্য আছে, ইহা অবগত হইয়া তাহারা আনন্দিত হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ঐক্যের স্থল অনেক আছে। উভয়ের অভাব ও দুর্দ্দশা এক প্রকার বলিয়াও পরস্পর পরস্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। এই সমুদায় বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু একত্রিত হইয়া কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। কেবল সকলের মধ্যে ভাবের বিনিময় এবং ঘনিষ্ঠতা আবশ্যক। এই ঘনিষ্ঠতা "মহা হিন্দুসমিতি" সম্পাদিত করিতে পারিবে।

এই স্থলে, শাক্ত ও বৈষ্ণব যে দুই প্রধান সম্প্রদায় আছে, তৎ-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এক সময়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ

তাহা প্রজ্বলিত করিলে এবং বালকগণ সেই অগ্নিকে তিনবার পরিক্রম করিয়া হাস্য করতালি ও গান করত রাক্ষসীকে গালাগালি দিলে সে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

রূপে বিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হইত। চৈতন্যদেবের সময়ে বৈষ্ণবগণ শাক্ত-দিগের কর্ত্তৃক অতিশয় নিপীড়িত হইতেন। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। আমাদের উপাসনা-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? না, যে দ্বিজ, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেবীর উপাসনা করেন, তিনিই আবার নারায়ণপূজা করিয়া থাকেন। যিনি কালীঘাটে, কালী ও কাশীধামে অন্নপূর্ণা পূজা করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন, তিনিই আবার বৃন্দাবন ধামে গমন করত গোবিন্দজী দর্শনে জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। কালিকাপুরাণে বিবৃত দুর্গাপূজা পদ্ধতির মধ্যে, নারায়ণ পূজা করিবার নিয়ম আছে। ব্রজলীলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কালী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যে রাধিকা ভগবানের প্রেমের ভিখারিণী ছিলেন, তিনি আবার তাঁহার শক্তির উপাসনা করিলেন। এই দুই সম্প্রদায় লোকের ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলে আর এ ভ্রম থাকে না। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার নিয়ম আছে, তাহা এক করিয়া লইতে হইবে। শাক্ত, শক্তিরূপা দেবীর উপাসনা করেন, বৈষ্ণব, প্রেমরূপী ঈশ্বরের পূজা করেন। প্রত্যেক সাধকের উভয়ের উপাসনা আবশ্যক। রাধিকার কালীপূজা এই ভাবটীই প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আর বিদ্বেষভাব দেখা যায় না। দেবতা লইয়াও উভয়ের মধ্যে গোলযোগ নাই। যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী, এ ভাবটী সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এখন প্রভেদের মধ্যে এই যে, শক্তি উপাসনায় বলিদানের নিয়ম আছে। কিন্তু, সাত্বিক উপাসনায়, বলি-দানের প্রয়োজন নাই। অন্তরের কয়েকটী রিপু বলি স্বরূপ প্রদান করাই প্রকৃত বলিদান। এ ভাবটী যখন সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন তখন আর অপরের কথা কি কহিব। সাধকপ্রবর তাঁহার একটি পদে গাইয়াছিলেন—"মেষ ছাগল মহিষাদি, কায কিরে তোর বলি-দানে। তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দেয় ষড়রিপু গণে।"

নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে। তাহারা কুসংস্কারা-পন্নও হইতে পারে। কিন্তু, পৃথিবীতে কি এরূপ জাতি আছে, যাহাদের মধ্যে এ প্রকার দৃশ্য দেখা যায় না? কোন জাতির মধ্যে সকলেই কুসংস্কার-বর্জ্জিত হইতে পারে না—সকলেরই উদার ভাব হয় না। তাই বলিয়া কি কোন মহদুদ্দেশ্য সংসাধন জন্য একত্রিত হওয়া অসম্ভব? ইহা বিবেচনা

করা উচিত, কাহাদের কর্ত্তৃক এই সমিতি আহুত হইবে—কাহারা ইহাতে প্রথমে যোগ দিবে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহারা কৃত-বিদ্য তাঁহারাই ইহার উদ্দেশ্য সংসাধন পক্ষে যত্নবান্ হইবেন। সমালোচক মহাশয় বলুন দেখি, যে ভাবে সমিতি সংগঠিত হইবে, তাহা কি সকল সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণের অনুমোদিত হইবে না? বৈষ্ণব চূড়ামণি কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস এবং উদার ব্রাহ্মগণ যে এ সমিতিতে যোগ দান করত তাহার উদ্দেশ্য সংসাধন পক্ষে যত্নবান হইতে পারেন, তৎপক্ষে কি কোন সন্দেহ হইতে পারে?

সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "যাহা কিছু অধিকার হওয়া সম্ভব, সে অধিকার কেবল হিন্দুর নহে" * * * জগতের সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ অধিকার এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা দেখাইয়াছেন যে, "এক জন ব্রাহ্ম যদি কোন দেবমূর্ত্তির অপমান শুনিয়া দুঃখিত হন, তাহা হইলে জুমা মসজিদে মৃত শূকরশাবকের কথা শুনিয়াও তাহার দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য। এবং তাহা যদি হন, তবে কেবল হিন্দুজাতির সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্য কোন সভায় তাঁহার যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। জগতের যে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর যখনই কোন অত্যাচার হইবে, দুঃখিতহৃদয়ে তৎ-ক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।" একথাগুলি অতি উদার ভাব ব্যঞ্জক। কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, মুখে যাহা বলা যায় কার্য্যে তাহা পরিণত করা সহজ নহে। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করা সহজ নহে। পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য সংস্থাপন করা কি সহজ কথা? কথায় বলে "হেলে ধর্ত্তে পারে না কেউটে ধর্ত্তে যায়।" একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার অভিপ্রায়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম হইতেই চেষ্টা যে, সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে এক পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত হয়। এই জন্য, হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে বিবিধ উপদেশ সঙ্কলন হইয়া পুস্তক প্রকাশ হইল, সমাজের উপাসনাপ্রণালী দেশীয়ভাবে সমাধা হইতে লাগিল। এক সময়ে সকলের আশা হইয়াছিল যে ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক হিন্দুদের বিশেষ উপকার হইবে। পরে কতকগুলি অল্পবয়স্ক ব্রাহ্ম এই ভাবটীকে সংকীর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিলেন—উদার ভাব দেখাইবার জন্য

তাঁহারা বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহার একটি স্বতন্ত্র দল বাধিলেন। ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ইউরোপে ও আমেরিকায় কেহ কেহ গমন করিলেন। পৃথিবীর সকলেই ভাই—সকলেরই সহিত হাসাহসি, কোলাকুলি। আহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! দেখিলে অন্তঃকরণ পুলকে পরিপূর্ণ হয়। এ দিকে ঘরের ভাবটি দেখুন, একটি সমাজ তিনটি ভাগে বিভক্ত হইল। যাঁহারা পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য সংস্থাপন করিবেন, তাঁহাদের মধ্যেই অশান্তি। এখন সমালোচক মহাশয় বলুন দেখি, কোন্‌টি ভাল? হিন্দুদিগের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব সঞ্চার হয়, যাহাতে তাহারা এক সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা হয়, তাহা করা উচিত, না কোল বাড়াইয়া সাগর পারের লোকদিগকে আলিঙ্গন করা কর্ত্তব্য?

সমালোচক মহাশয় শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "হয়ত মহাহিন্দু-সমিতির অনুষ্ঠাতা বৃদ্ধ হিন্দু চিন্তা করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের নামেই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর একত্রিত হইবার সম্ভাবনা," এবং সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস উপলক্ষে আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "সে আন্দোলন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধামূলক, তাহা আদৌ ধর্ম্মগত নহে। * * * ধর্ম্মের নামে সে সঞ্জীবনা হিন্দুজাতির মধ্যে এখন আর নাই, তবে তাহা দ্বারা সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের একত্রিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?" ধর্ম্মের প্রতি সমাদর সকল জাতিরই আছে। হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই, যে কোন জাতির মধ্যেই হউক, ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন অবমাননার লক্ষণ দেখিলে বিশেষরূপে ব্যথিত হয়েন। বৃদ্ধ হিন্দু বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত আন্দোলনের সময়ে, "পাটনা নগরে কোন মৌলবী উক্ত আক্রমণের বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন"। যখন একজন মুসলমান শালগ্রাম শিলার অবমাননায় দুঃখিত হইয়া এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুগণ যে তাঁহাদের নিজ ধর্ম্মের অবমাননা দেখিয়া ব্যথিত হইবেন না, ইহা কে স্বীকার করিতে পারে? আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সমগ্র ভারতের হিন্দু মণ্ডলি এক শাস্ত্র দ্বারা শাসিত, এবং যে দুই প্রধান সম্প্রদায়, শাক্ত ও বৈষ্ণব আছে, তাহাদের মধ্যেও, বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহারা যে ধর্ম্মের স্বত্ব ও অধিকার লইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিবে তৎপক্ষে সন্দেহ করা যায় না।' তবে সমালোচক মহাশয় বলিতে পারেন

যে, যাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই তাঁহাদের সমক্ষে শালগ্রাম শিলা বিচূর্ণিত হইলেও তাঁহারা বিচলিত হইবেন না। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেই এরূপ ব্যাপার দেখিলে ব্যথিত হইবেন। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ ত হিন্দুধর্ম্মের কোন ধারই ধারিতেন না। তবে কেন তিনি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ক স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন? বৃদ্ধ হিন্দু মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন এবং আমরাও এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি যে, যখন কলিকাতার নিমতলার ঘাটে শবদাহ রহিত করিবার অনুজ্ঞা প্রচার হয়, রামগোপাল ঘোষ তাঁহার হিন্দু ভ্রাতাদের জন্য বাক্ যুদ্ধ করিয়া সেই অনুজ্ঞা রহিত করান। এই উপলক্ষে তিনি যে জ্বলন্ত বক্তৃতা করেন তন্মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি নিজে গ্রাহ্য করি না আমার মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহ কোন্‌স্থানে দগ্ধ করা হয়, কিন্তু আমি আমার হিন্দু ভ্রাতাদের দুঃখ দেখিতে পারি না, এবং এইজন্যই আমি তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দণ্ডায়মান। হিন্দুগণ জানিত যে, রামগোপাল ঘোষ হিন্দুধর্ম্ম মানিতেন না, তথাপি ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহাদের উপর কোন অত্যাচার হইলে তাহারা রামগোপালের কাছে গিয়া তাহাদের দুঃখ জানাইত এবং উচ্চমনা রামগোপাল তাহাদের দুঃখ বিমোচন জন্য বদ্ধ-পরিকর হইতেন। এই নিমিত্তই তিনি হিন্দুদের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একটী মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার জন্য হিন্দুদিগকে একত্রিত করিতে হইলে, তাহাদিগকে দেখান উচিত যে, যে বস্তু তাহাদের অধিক প্রিয় তাহা যাহাতে বজায় থাকে, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ যত্ন আছে। ধর্ম্ম, হিন্দুদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তাহাদের স্বত্ব সকল যাহাতে সংরক্ষিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্তই বৃদ্ধ হিন্দু গোজাতির রক্ষা ও উন্নতির কথা বলিয়াছেন। গোহত্যা হিন্দু মাত্রেরই পক্ষে পীড়াদায়ক। ইহা যাহাতে নিবারণ হয়, তৎপক্ষে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে, যদি বৃদ্ধ হিন্দুর ভারতের কৃষির উন্নতি করা অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে মহিষাদি পশু রক্ষার উল্লেখ করিতেন। গোজাতির রক্ষা কেবল কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নহে। বলিতে কি, গাভীর দ্বারা চাস করা হিন্দু

দের মধ্যে নিষিদ্ধ। বলদের দ্বারাই চাস হইয়া থাকে। কোন মন্দ স্থানের উল্লেখ করিলে, হিন্দুগণ বলিয়া থাকে, "তারা গাই বলদে চসে"। হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে গাভী বড় আদরের। দুগ্ধের জন্যই গরুর বিশেষ আদর। প্রাচীনকাল হইতেই গরুর সুমাদর। গব্য ঘৃত, যজ্ঞ, হোম ও পূজায় ব্যবহৃত। অন্ন ও গো দুগ্ধে চরু প্রস্তুত হইলে, ঋষিগণের উপাদেয় খাদ্য হইত। অনেক গৃহস্থ, বাটীতে গরু রাখিয়া তাহার পালন করিয়া থাকে। গো-দুগ্ধ হিন্দুদিগের আহারের একটি প্রধান উপকরণ। ইহা হইতে ঘৃত, দধি, ক্ষীর মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোরুর গোময়ে হিন্দুর বাটী পবিত্র, বাটী কেন, দেব গৃহ পবিত্র, গো দুগ্ধে হিন্দুর দেব পূজা সিদ্ধ, গো-দুগ্ধে হিন্দু প্রতিপালিত। প্রাচীন কালে, গরু, ধনীদের ধন বলিয়া পরিগণিত হইত। যে পশু হইতে এত উপকার পাওয়া যায়, তাহার সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা পাওয়া যে সর্ব্বাগ্রে উচিত তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

গোজাতি সংরক্ষণ জন্য যে বৃদ্ধ হিন্দুই কেবল প্রয়াস পাইতেছেন তাহা নহে। এ কথা লইয়া সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে, এবং পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী, যিনি নিরাকারবাদীছিলেন, তিনি গোহত্যা নিবারণ জন্য ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ভারতেশ্বরীর কাছে আবেদন করিবার জন্যও যত্নবান্ ছিলেন। সমালোচক মহাশয় একটা কৌশলের কথা তুলিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন যে, উদ্দেশ্য যতই কেন মহৎ হউক না, আমরা তাহার সিদ্ধির জন্য কখন কৌশলের (Policy) সাহায্য লইতে প্রস্তুত নহি।" মহাহিন্দু সমিতির প্রস্তাবকর্ত্তার উদ্দেশ্য এই যে, যে যে বিষয় লইয়া সমগ্র হিন্দু জাতি একত্রিত হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা। কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হইয়া যাহাতে জাতীয় ভাব রক্ষা হয় এরূপ চেষ্টা কি অন্যায়? পূজার সময়ে ও কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানে, ধূপ দীপ জ্বালা ও শঙ্খ নিনাদ করা জাতীয় ভাব উদ্দীপন করে, এবং ইহা আপামর সাধারণের প্রীতিকর। তবে কেন ইহা অবলম্বিত না হইবে? চেয়ারে উপবিষ্ট অখাদ্যখাদক কৃতবিদ্য দেশীয় লোক অপেক্ষা, বেদীতে উপবিষ্ট উদ্ভিজ্জ আহারী পণ্ডিত সাধারণের নিকট শ্রদ্ধেয়। যিনি অধিক লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যে, সভাপতি করা উচিত তৎপক্ষে সন্দেহ কি? ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাসী।

তাঁহাদের লইয়াই কার্য্য করিতে হইবে। অতএব যাহা তাঁহাদের প্রীতিকর হয়, অথচ অপর সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ক্ষতি কি? ইহা যদি "কৌশল" (Policy) হয়, তাহা হইলেও পৃথিবীতে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে না। সে দিন ব্রাহ্মদিগের কোন পত্রে দেখিলাম একটী প্রস্তাব হইয়াছে যে, প্রচারকগণ যখন ধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন, তখন যদি তাঁহারা গ্রামস্থ ব্যক্তিদের পীড়ার সময়ে তাঁহাদের সুশ্রূষা করেন তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রচার পক্ষে সুবিধা হয়। সমালোচক মহাশয় কি ইহাকে "কৌশল" বলিবেন? সাধারণ লোকের মনকে আকর্ষণ করিবার জন্য ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানগণ নগর কীর্ত্তন করেন। ইহাও কি একটী কৌশল? আমাদের এক জন বন্ধু কোন সুরাপায়ীকে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তিনি আলাপ করিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের মধ্যে নানা প্রকার কথার বিনিময় হয়। আমাদের বন্ধু তাঁহার সাংসারিক অনেক কার্য্যে সহায়তা করেন। এক দিন তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলিলেন, এখন তাঁহার সময় নাই। তাঁহার কোন কোন দ্রব্য খরিদ করিবার প্রয়োজন। বন্ধু বলিলেন, চলুন আমি আপনার সঙ্গে যাইয়া যাহা যাহা আবশ্যক, শীঘ্র খরিদ করিয়া দিব। পরে, আবশ্যক কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজে লইয়া গেলেন। এই রূপে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দেওয়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অন্তরে ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপন হইল। এবং অবশেষে, তিনি সুরা সেবন ত্যাগ করিয়া এক জন নিষ্ঠ ব্রাহ্ম হইলেন। ইহা কি একটী কৌশল? কোন মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য এক একটী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। আমাদের দেখিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন বিশেষ কার্য্য সমাধা করাইতে হইলে, তাহার যাহা প্রিয় কার্য্য, তৎপক্ষে সহায়তা করা আবশ্যক। হিন্দু মহাসমিতির কয়েকটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে। শিল্প কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন, ব্যায়াম চর্চ্চা প্রভৃতি কয়েকটী কার্য্য সাধন ইহার উদ্দেশ্য। সমগ্র ভারতবাসী, অথবা সমস্ত বঙ্গবাসী হিন্দুদিগকে এই সকল উদ্দেশ্য সাধন জন্য একত্রিত করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের মন আমোদ প্রমোদের দিকেই অধিক পরিমাণে প্রধাবিত। কোন একটী চাকরী করিয়া পরিবার

পালন এবং তাস পাশা খেলিয়া অথবা নাটক ও উপন্যাস পড়িয়া সময় ক্ষেপণই অধিকাংশ লোকের কার্য্য। এই সকল লোকের মনের গতিকে ভিন্ন দিকে লইয়া যাওয়া সহজ নহে। বৃদ্ধ হিন্দু যে সকল উপায় স্থির করিয়াছেন, তাহা তৎপক্ষে উপযোগী। প্রথমতঃ ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুদিগের অধিক প্রিয় আর কিছু নাই। আমাদের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি দেখাইতে পারেন যে, হিন্দুদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা যত্নবান্ আছেন, তাহা হইলে, আপামর সাধারণে আনন্দের সহিত অন্যান্য কার্য্যে এই সমিতির সহিত যোগ দিবেন। দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের প্রতি অনেক হিন্দুর বীতরাগ আছে। এমন কি, ইউরোপপ্রত্যাগত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণকে আচার ভ্রষ্ট জ্ঞানে তাঁহারা ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি দেখেন যে, এই সকল ব্যক্তি কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা দিয়া, দেশীয় বেশে গালিচার উপর বসিয়া জাতীয় ভাব রক্ষা করিতেছেন, তাহা হইলে হিন্দু মাত্রেই আনন্দে উৎফুল্ল হইবে এবং তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া এই মহা ব্রত সাধন জন্য বদ্ধ পরিকর হইবে।

সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে, ধুপ, ধুনা ও দীপ দেবতা পূজায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া, নিরাকারবাদীরা তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে না পারেন। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। এরূপ হইলে নিরাকার বাদীগণকেও ত অনেক বস্তু ত্যাগ করিতে হয়। সাকারবাদীরা পুষ্প ও চন্দন দিয়া দেবতা পূজা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি ফুল চন্দনের ব্যবহারও ত্যাগ করিতে হইবে? সরকারবাদীরা দেবতা পূজার সময়ে শিবকে মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান, দুর্গাকে পরমেশ্বরী প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সম্বোধন করিয়া থাকেন। নিরাকারবাদীরা কি ব্রহ্মের উপাসনার সময়ে এসকল শব্দ ত্যাগ করিবেন? পিতা সাকারবাদী, পুত্র নিরাকারবাদী। পিতা দেবপূজায় অর্থ ব্যয় করিবেন, এই আশঙ্কায় কি পুত্র তাঁহাকে অর্থের দ্বারা সাহায্য কবিতে পরাঙ্মুখ হইবেন? এক সময়ে, কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রকার কথা লইয়া আন্দোলন হইয়াছিল। সাকারবাদীদের উৎসবে যে সকল বাদ্য যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা লইয়া ব্রাহ্মদের সংকীর্ত্তনে ব্যবহার করা পাপজনক বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এ প্রকার অনুদার ভাব আজ কাল ব্রাহ্ম সমাজে নাই। আমরা জানি, অনেক ব্রাহ্ম সমাজে ধুপ ধুনা দীপ ব্যব-

হার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে এ সকল ব্যবহৃত হয়, এবং দাক্ষিণাত্যের প্রার্থনা সমাজ সমূহে উৎসব উপলক্ষেও ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে। যদ্যাপি কোন নিরাকারবাদী এ প্রকার অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, যে সকল অনুষ্ঠান সাধারণের প্রীতিকর এবং যাহা প্রকৃত পক্ষে অন্যায় নহে, তাহা অবলম্বন পক্ষে যাঁহারা অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাঁহাদের দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনের আশা করা যাইতে পারে না।

বৃদ্ধ হিন্দু, ভগবদগীতার যে স্তোত্রটী পাঠ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "এরূপ স্তোত্রে কি সকলে পরিতৃপ্ত হইবেন?" যে স্তোত্রটী শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত, তাহা অবশ্যই হিন্দু মাত্রেরই প্রীতিকর হইবে। নিরকারবাদীদের ত ইহাতে কোন আপত্তি হইতেই পারে না। সমালোচক মহাশয় যে প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন, সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সাকারবাদী হিন্দুরা অনুদার নহে। তাহারা মাটীর পুতুল পূজা করে না। তাহার মধ্যে ঈশ্বরের সত্বা অনুভব করিয়া তাঁহারই পূজা করিয়া থাকে। আজ কাল ব্রাহ্মদিগের যে সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে তাহাতে অনেক হিন্দু যোগ দান করে—কত প্রাচীন হিন্দু সংগীত শুনিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে। নানক, কবীর প্রভৃতি মহাত্মারা এক ঈশ্বরের উপাসনা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা হিন্দুদিগের ক্রিয়া-কলাপের নিন্দাও করিয়া ছিলেন। তথাপি আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুগণ নতশীর হইয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উৎসুক অন্তরে তাঁহাদের উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের শাস্ত্রমধ্যে ক্রিয়াকলাপের নিন্দা আছে। যাঁহারা ধর্ম্ম জীবনে বিশেষ রূপে উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে যাগ, যজ্ঞ, দেবতা পূজা যে, অনাবশ্যক, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের অনেকস্থলে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, সমালোচক মহাশয় সামান্য সামান্য বিষয় লই-য়াও গোলযোগ করিয়াছেন। সমিতি কেবল সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনে যত্নবান হইবেন, ইংরাজী, বাঙ্গালা প্রভৃতির উন্নতিপক্ষে কেন যত্নবান হইবেন না, ইহার তাৎপর্য্য কি, তিনি বুঝিতে পারেন নাই। অন্যান্য ভাষার অনুশীলন পক্ষে লোকে সমধিক যত্নবান আছে। দিন দিন সে সকল ভাষা উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার প্রতি সেরূপ যত্ন দেখা যায়

না, অর্থ উপার্জ্জনের লোভে লোকে ইংরাজী ভাষা যত্নের সহিত শিক্ষা করিবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা, হিন্দি, প্রভৃতি ভাষা সকল এখন এক এক প্রদেশের মাতৃভাষা হইয়াছে। তাহার অনুশীলনে সকলকেই যত্নবান দেখা যাইতেছে। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষা, যাহা প্রাচীন আর্য্য কীর্ত্তি পৃথিবীর চারিদিকে বিঘোষিত করিতেছে এবং যাহার অনুশীলন জন্য ইউরোপের বিদ্বান মণ্ডলী বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, আমাদের উদাসীনতায় তাহা তাহার জন্ম স্থান হইতে লোপ পাইবে, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? এ কলঙ্ক মোচন করা কি আমাদের সর্ব্বাগ্রে উচিত নহে? আর্য্য নামাবলী লইয়া সমালোচক মহাশয় আবার একটি গোল তুলিয়াছেন। তিনি বলেন যে কেবল কতকগুলি বড় লোকের নাম আওড়াইলে কি হইবে? তাঁহাদের গুণাবলী সাধারণ সমক্ষে বর্ণনা করা উচিত এবং ইহার মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নাম আছে, যাঁহাদের বৃত্তান্ত কোন খানেই পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কীর্ত্তিবান ব্যক্তিগণের নাম আওড়াইলেও অনেক উপকার আছে। নামেতে অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদে কি আছে হিন্দু মাত্রেই প্রায় অবগত নহে। কিন্তু এই বেদ শব্দটির কেমন মোহিনী শক্তি, যে ইহার নামে হিন্দু মাত্রেই উত্তেজিত হয়। লোকে কথায় বলে, ইহা "বেদ বাক্য"। ফল কথা এই যে, লোকে যদি এক বার হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় যে এই গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট, কিম্বা তাহারা যদি শাস্ত্র পাঠে কিম্বা কোন আচার্য্যের নিকট অবগত হয় যে, অমুক অমুক লোক কীর্ত্তিবান কিম্বা ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাদের নাম করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। প্রাচীন আর্য্য মহাত্মাদের কীর্ত্তি কলাপ অবগত হইলে অধিক ফল দর্শে সন্দেহ নাই। সমিতির অধিবেশনে কোন কোন মহাত্মার জীবন সম্বন্ধে সভ্যগণ প্রবন্ধ পাঠ কিম্বা বক্তৃতা প্রদান করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের নাম অন্যান্য আর্য্য পুরুষদের সহিত বিঘোষিত হইলে, হিন্দুগণ ব্যথিত হইতে পারেন। সমালোচক মহাশয়ের এ কথাটি সমীচীন বটে। ভাল এ দুইটি নাম, উচ্চারণ না করিলেই হয়। তবে, ইহাঁদের যখন দেব ভাব ও মনুষ্য ভাব উভয়ই ছিল, মনুষ্য ভাবের কীর্ত্তি কলাপ বিঘোষিত করিলে কোন দোষ না হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ রাখাল রাজ, ও গোপাল প্রভৃতি নামে অভিহিত। এ নাম লইলে কি তাঁহার অমর্য্যাদা করা হয়। এ সকল সামান্য বিষয় লইয়া আন্দো-

শন করিবার আবশ্যকতা নাই। বৃদ্ধহিন্দুর প্রস্তাব যে ভারতের সর্ব্বত্রেই সম্যক্‌রূপে অবলম্বিত হইবে তাহার কোন কারণ নাই এবং বোধ হয় তাঁহার এরূপ অভিপ্রায়ও নহে। স্থান ও অবস্থা ভেদে সভ্যগণ আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। তবে কএকটি প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতি সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত।

সমালোচক মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবের শেষ ভাগে, গো জাতি সংরক্ষণ সম্বন্ধে আরও কএকটি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "এই গো বধ লইয়া যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কি ভয়ানক বিদ্বেষ দিন দিন প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, তাহা কাহার ও অবিদিত নাই।' তাহার উপর আবার এ সকল প্রসঙ্গ কেন?" যে "কৌশল" লইয়া সমালোচক মহাশয় ইতি পূর্ব্বে মহা আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই "কৌশলের" আশ্রয় লইতে দেখিয়া আমরা এক কালে দুঃখিত ও বিস্ময়ান্বিত হইলাম। সমালোচক মহাশয় বলিয়াছিলেন, "স্বদেশ এবং স্বদেশের উপকার সাধন অপেক্ষা মহাব্রত মানব জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সে ব্রত গ্রহণ করিতে যাইয়া ধর্ম্মের আচ্ছাদন লইব কেন?" গোজাতির সংরক্ষণ আবশ্যক। ইহাতে সমালোচক মহাশয়ও সায় দিয়াছেন। এখন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি পাছে মুসলমানদের বিরাগ ভাজন হইতে হয়, এই ভয়ে আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইব কেন? আর এরূপ চেষ্টা করিলে মুসলমানেরা যে বিরক্ত হইবেন, তাহারও কোন বিশেষ কারণ দেখি না। তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ লোক আছেন। তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন যে শূকর মাংস তাঁহাদের পক্ষে যেরূপ পীড়া দায়ক, গোমাংসও হিন্দুদের পক্ষে সেইরূপ। বিশেষত কি হিন্দু কি মুসলমান গোজাতির নিকট সকলেই উপকৃত। গোহত্যা নিবারণের উদ্যোগ দেখিয়া রাগ না করিয়া তাঁহাদের আরও এ কার্য্যে পোষকতা করা উচিত। গোমাংস না হইলে কি তাঁহাদের দেহ ধারণ হয় না? পৃথিবীতে জানোয়ারের ত অভাব নাই। আর, জীব হিংসা অন্যায় বিবেচনা করিয়া যখন ইংরাজগণ উদ্ভিদ ভোজী হইতেছেন, তখন আমাদের মুসলমান ভায়ারা কি একটি জানোয়ারের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন না? যাহাই হোক, আমরা আমাদের এই কর্ত্তব্য সাধনে কোন মতেই পশ্চাৎপদ হইব না বরং তজ্জন্য মুসলমান ভায়াদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিব।

সমালোচক মহাশয়ের সহিত অনেক ক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিলাম। এখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি। বিদায় কালে, সমালোচক মহাশয়ের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে, যাহাতে এই মহাসমিতি সংস্থাপন হয়, তৎপক্ষে তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ যেন যত্নবান হয়েন।

অগ্রহায়ণ ১২৯৩। শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পুনা।

ধর্ম্ম মীমাংসা।

কেন ভাই এত গণ্ডগোল!
বাজাইয়া করতাল খোল—
যথা নদীয়ার চাঁদ, ভাঙ্গি দলাদলি বাঁধ
যবন চণ্ডালে দিত কোল—
নাচ, আর বল হরিবোল।

২

ভেদ-বুদ্ধি দুঃখের নিদান,
হরিপ্রেম স্বর্গের সোপান;
সর্ব্ব ঘটে বর্ত্তমান চিদানন্দ ভগবান,
তাঁর চক্ষে সকলে সমান,
গীতা ভাগবতের প্রমাণ।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম করি লোকে
সাধু হয় ইহলোকে,
পরলোকে পায় সুখ শান্তি হরি চরণে;
জীবে দয়া, নামে ভক্তি,
যোগসিদ্ধি অনাসক্তি,
এইত ধর্ম্মের লক্ষ্য কহে শাস্ত্র বচনে।

৪

তার জন্যে ঘরে ঘরে
কেন দ্বন্দ্ব করে নরে?
একে অন্যে কেন দেয়
পাঠাইয়া নরকে;
বিবাদে কি প্রয়োজন,
আচর সাধু জীবন,
অশান্তির কোলাহল ঘুচে যাবে পলকে।

৫

উদ্দেশ্যে নাহিক ভেদ,
এক ব্রহ্ম, এক বেদ,
সবাকার ধর্ম্ম এক উপাদানে রচিত,
এক দয়া এক স্নেহ,
এক ছাঁচে গড়া দেহ,
হৃদে হৃদে বহে রক্ত এক বর্ণ লোহিত।

৬

তাই বলি ভাই, গোলে কাজ নাই,
এস গলা ধরাধরি করি,
যাই প্রেমধাম, গাই হরিনাম
আনন্দে বদন ভরি।

৭

ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্য স্থান ;
যে যেমনে পারে, ট্রেনে ইষ্টিমারে
হৌক সেথা আগুয়ান।

৮

উপায় লইয়া উদ্দেশ্য ভুলিয়া
যে জন বসিয়া থাকে ;
তেজি শস্য ফল যথা কৃষীবল
খোসা গুলি ঘরে রাখে।

৯

ঢেঁকি ভজে' যদি এই ভবনদী
পার হতে পার বঁধু ;
লোকের কথায় কিবা আসে যায়,
পিবে সুখে প্রেম মধু।

১০

হরিপ্রেমে তবে এস মাতি সবে
নাচি গাই অবিরাম ;
প্রেম সাধ ধর্ম্ম, প্রেম সাধু কর্ম্ম
প্রেমই কৈবল্য ধাম।

১১

হরির ভিতরে দেখি সব নরে
নরের ভিতরে হরি;
আপন বলিয়া আদর করিয়া
রাখি দোঁহে বুকে ধরি।

১২

ছাড়ি ধর্ম্ম-ভাণ মিছে অভিমান
হইব প্রেমেতে লয় ;
প্রেম আলিঙ্গনে বাঁধি জগজনে
গাইব প্রেমের জয়।

সংসার ধর্ম্ম।

মানুষ অরণ্যবাস ছাড়িয়াই সংসারী হয়। আজ পৃথিবীতে অসভ্য অরণ্যবাসী মনুষ্যের সংখ্যা খুব কম। এখন প্রায় সমস্ত মনুষ্যজাতি সংসারী। সমস্ত সংসারী মনুষ্যের অবস্থা এক রকম নয়। কেহ বা উন্নত কেহ বা অবনত। কেহ বা কৃষিজীবী কেহ বা শিল্পজীবী। কিন্তু মনুষ্যের অবস্থার প্রভেদ থাকিলে সকলেই সংসারী। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সর্ব্বত্রই মানুষ সংসারী। এই সংসারী শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতিকে লইয়া একত্র বাস করা ও তাহাদের ভরণ পোষণ করা এবং এইরূপ একত্রে বাস এবং ভরণ পোষণ করিবার জন্য আবশ্যক মত লোক সাধারণের সহিত আলাপ প্রণয় আদান প্রদান কার-কারবার প্রভৃতি বিষয়কর্ম্ম করা। সামান্যত সংসার করা বলিতে ইহাই বুঝায়। এই অর্থে সংসার-

ধর্ম্ম পৃথিবীতে সকল লোকই করিয়া থাকে। সকল লোকই সর্ব্বত্র প্রতিদিন বিষয়কর্ম্ম করে এবং স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে অন্ন বস্ত্রাদি দিয়া প্রতিপালন করে। হিন্দুও তাহাই করে। অর্থাৎ হিন্দুও প্রতিদিন বিষয়কর্ম্ম করে এবং স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে অন্ন বস্ত্রাদি দিয়া প্রতিপালন করে। কিন্তু হিন্দুর সংসারধর্ম্ম শুধু ঐ টুকু নয়। এবং ঐ টুকু হিন্দুর সংসার ধর্ম্মের সারভাগও নয়। অন্ন বস্ত্রাদির আহরণ ছাড়া হিন্দুকে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ করিতে হয়। সেই পাঁচটি যজ্ঞ না করিয়া যদি তিনি পান ভোজন করেন, তবে তাঁহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান মনু কহিয়াছেন ঃ—

অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্ম কারণাৎ।
যজ্ঞ শিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ॥

(৩ অধ্যায়, ১১৮)

যে ব্যক্তি আপনার জন্য পাক করিয়া ভোজন করে সে কেবল পাপ ভোজন করে, যেহেতু যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের ভোজনের জন্য বিহিত হইয়াছে, অযজ্ঞীয় অন্ন ভোজনের বিধান নাই।

অতএব হিন্দুর সংসারধর্ম্মে ঐ পাঁচটি যজ্ঞ করাই মুখ্য কাজ ; আপনার আপনার খাওয়া-পরা গৌণ কাজ। এখন, ঐ পাঁচটি যজ্ঞ কি, বুঝিতে হইবে। পাঁচটি যজ্ঞের নাম ব্রহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ।

এই পাঁচটি যজ্ঞের মধ্যে কোন্‌টি কি রকম করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, দেখিতে হইবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা ব্রহ্ম যজ্ঞ করিতে হয় ; অন্নাদি দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়া পিতৃ যজ্ঞ করিতে হয় ; হোমের দ্বারা দেব যজ্ঞ করিতে হয় ; বলি অর্থাৎ খাদ্য সামগ্রী দ্বারা ভূত যজ্ঞ করিতে হয় ; এবং অতিথি সেবা দ্বারা নৃ-যজ্ঞ করিতে হয়।

অধ্যাপনং ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পিতৃ যজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃ-যজ্ঞোঽতিথি পূজনং ॥

(৩অ, ৭০)

প্রাচীন হিন্দুর কথা বলিতেছি এবং এখনকার হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা প্রচীন প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের কথাও বলিতেছি।

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা এবং অতিথিসেবা কাহাকে বলে বোধ হয় সকলেই জানেন। বিদ্যাশিক্ষা এবং বিদ্যাদানের নাম অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা। অতিথিসেবার অর্থ, গৃহস্থের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া যে ব্যক্তি আগমন করে তাহাকে ভোজন করান এবং শয্যাদি দিয়া সুশ্রূষা করা। এক্ষণে দেব যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ এবং ভূত যজ্ঞের অর্থ কি বুঝিতে হইবে। মনু বলিতেছেন ঃ—

অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়ো শ্চৈব সমস্তয়োঃ।
বিশ্বেভ্য শ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ॥
কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ।
সহ দ্যাবা পৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্ট কৃতেঽন্ততঃ॥
এবং সম্যগ্ য বিহ্ স্ত্বা সর্ব্বদিক্ষু প্রদক্ষিণং।
ইন্দ্রান্তকাপ্পতীন্দুভ্যঃ সানুগেভ্যো বলিং হরেৎ॥
মরুদ্ভ্য ইতি তু দ্বারি ক্ষিপেদপস্বদ্ভ্য ইত্যপি।
বনস্পতিভ্য ইত্যেবং মুষলোলূখলে হরেৎ॥
উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্য্যাদ্ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোঃ পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ॥
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যোবলিমাকাশ উৎক্ষিপেৎ।
দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এব চ॥
পৃষ্ঠবাস্তুনি কুর্ব্বীত বলিং সর্ব্বাত্মভূতয়ে।
পিতৃভ্যো বলিশেষন্তু সর্ব্বং দক্ষিণতো হরেৎ॥
শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিনাং।
বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্বপেদ্ভুবি॥

প্রথমে অগ্নিকে (অগ্নয়ে স্বাহা) সোমকে (সোমায় স্বাহা) পরে অগ্নী সোমাভ্যাং স্বাহা তদনন্তর বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা বলিয়া বৈশ্বদেব হোম করিবেক এবং ধন্বন্তরিকে ধন্বন্তরয়ে স্বাহা এইরূপে হোম করিবেক॥

যাহাতে সমগ্র চন্দ্রকলার ক্ষয় হয় তাহার নাম কুহূ, দুই প্রহর চতুর্দ্দশী থাকিয়া পূর্ণিমা হইলে তাহার নাম অনুমতি, এই কুহূ অনুমতি প্রজাপতি ব্রহ্মা দ্যাবা পৃথিবীকে এবং অগ্নয়ে স্বিষ্ট কৃতে—স্বাহা বলিয়া অগ্নিকে সকল দেবতার অন্তে হোম করিবেক॥

অনন্যমনা হইয়া উক্ত প্রকারে হবি দ্বারা হোম করিয়া পূর্ব্বাদিদিক্

ক্রমে সকল দিকে সানুচর ইন্দ্রাদি দেবগণের বলি প্রদান করিবেক যথা পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রায় নমঃ ইন্দ্রপুরুষেভ্যো নমঃ। দক্ষিণে যমায়ঃ নমঃ যম পুরুষেভ্যো নমঃ। পশ্চিমে বরুণায় নমঃ বরুণ পুরুষেভ্যো নমঃ। উত্তরে সোমায় নমঃ সোম পুরুষেভ্যো নমঃ॥

দ্বারদেশে মরুদ্ভ্যো বলিয়া বলি দিবেক, জল মধ্যে অদ্ভ্যো নমঃ বলিয়া বলি দিবেক, এবং মুষল বা উলূখলে বনস্পতিভ্যো নমঃ এই বলিয়া বলি প্রদান করিবেক॥

বাস্তুপুরুষের শিরঃ প্রদেশে উত্তর পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মীকে শ্রিয়ৈ নমঃ বলিয়া বলি দিবেক, ও পাদদেশে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে ভদ্রকালীকে ভদ্রকাল্যৈ নমঃ বলিয়া বলি দিবেক, এবং গৃহমধ্যে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মণে নমঃ ও বাস্তুদেবতাকে বাস্তোঃপতয়ে নমঃ বলিয়া বলি প্রদান করিবেক॥

গৃহের আকাশ মধ্যে সকল দেবগণকে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। দিবাচর ভূত সকলকে দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ, এবং রাত্রিচর ভূত সকলকে নক্তংচারিভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ বলিয়া বলি প্রদান করিবেক॥

দ্বিতীয় তলক গৃহের নাম পৃষ্ঠ বাস্তু, তাহাতে কিম্বা বলিদাতার পশ্চাদ্ভাগে সকল জীবগণকে সর্ব্বাত্মভূতয়ে নমঃ বলিয়া বলি প্রদান করিবেক। এই সকল বলি দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় অন্ন দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ মুখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃদিগকে স্বধা পিতৃভ্য এই কথা বলিয়া বলি প্রদান করিবেক।

অপর অন্ন, পাত্রে উদ্ধার করিয়া ধূলি না লাগে এমন করিয়া ভূমিতে কুকুর, পতিত, কুকুরোপজীবী, পাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগকে উহা প্রদান করিবেক।

(৩অ—৮৫—৯২)

অর্থাৎ, দেব যজ্ঞের অর্থ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ঊর্দ্ধ অধঃ জল স্থল মরুৎ ব্যোম অগ্নি যেখানে যাহা আছে,—সমস্তের পূজা, সমস্তের অর্চ্চনা, সমস্তের সেবা। যেখানে যে শক্তি এই সৃষ্টিকে ধারণ পালন পোষণ এবং সংরক্ষণ করিতেছে, তাহারই পূজা, অর্চ্চনা এবং সেবা। এক কথায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্তশক্তির পূজা অর্চ্চনা এবং সেবা। পিতৃযজ্ঞের অর্থ, স্বর্গীয় পিতৃ পুরুষগণের পূজা অর্চ্চনা এবং সেবা।

স্মার ভূত যজ্ঞের অর্থ, দিবাচর নিশাচর ভূচর খেচর জলচর জগতে যত প্রকার জীব আছে সকলের পূজা, অর্চ্চনা এবং সেবা—অন্ন জল দিয়া সকলের প্রাণরক্ষা করা। এই অপূর্ব্ব ভূত যজ্ঞে ক্ষুদ্র ঘৃণিত কৃমিকীটও পূজনীয়, অর্চ্চনীয়, রক্ষণীয়।

ইহাই হিন্দুর প্রাত্যহিক পঞ্চযজ্ঞের অর্থ। এবং এই প্রাত্যহিক পঞ্চ-যজ্ঞই হিন্দুর সংসার ধর্ম্মের মুখ্য অংশ, সার মর্ম্ম, প্রধান অঙ্গ। এই অংশ ছাড়িয়া দিলে, এই মর্ম্ম ভুলিয়া গেলে, এই অঙ্গ ছেদন করিলে, হিন্দুর সংসার ধর্ম্ম লোপ হয়; হিন্দু খায় বটে, পরে বটে, খাওয়ায় বটে, পরায় বটে, কিন্তু সংসারী হয় না; পশুর অধম হইয়া পাপাচরণ করে মাত্র। অতএব হিন্দুর সংসারধর্ম্মের অর্থ—দীন দরিদ্র রুগ্ন শোকার্ত্ত অতিথি অভ্যাগতের সুশ্রূষা, প্রাণী মাত্রের প্রাণ রক্ষা, পবিত্র পিতৃ পুরুষগণের পুণ্য ও পুরুষকারের পূজা, জগতে জ্ঞান এবং শিষ্টাচার প্রচার এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত শক্তির পূজা এবং আরাধনা। ইহাই হিন্দুর প্রাত্যহিক সাংসারিক কার্য্য—কোন রকমে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আপনার ও স্ত্রী পুত্রের খাওয়া পরা নয়। ইংরাজ বল, ফরাসী বল, জর্ম্মাণ বল, মুসলমান বল, সকলেরই সংসার ধর্ম্মের অর্থ, প্রতি দিন অন্নের দ্বারা উদর পূরণ করা এবং বস্ত্রাভরণের দ্বারা অঙ্গের শোভা সম্পাদন করা। হিন্দুর সংসার-ধর্ম্মের অর্থ, প্রতিদিন জগতের অসংখ্য জীবের জীবন রক্ষা করা, জগতের অনন্ত-অতীতের অসীম মানব-স্মৃতি অনন্ত কাল ধরিয়া হৃদয়ে ধারণ করা, জগতে যাহার খাইবার শুইবার স্থান নাই, সকল কর্ম্ম ফেলিয়া তাহাকে খাওয়ান শোয়ান, জগতে থাকিয়া যে জগৎপতির তথ্য জানে না তাহাকে সেই তথ্য শেখান, দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে উপরে নীচে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডপতির অসংখ্য কার্য্য করিতেছে সেই শক্তির পূজা এবং সেই শক্তি বর্দ্ধন করা। অতএব বলিতে পারি যে ইংরাজ বল, ফরাসী বল, জর্ম্মাণ বল, মুসলমান বল, সকলেরই সংসারধর্ম্ম ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র সংসারধর্ম্ম; কিন্তু হিন্দুর সংসারধর্ম্ম বিরাট ব্রহ্মাণ্ডপতির বিরাট সংসারধর্ম্ম। সকল মানুষই মানুষের মতন সংসার করে; কেবল হিন্দু ব্রহ্মাণ্ডপতির মতন সংসার করে। সকল মানুষেরই সংসার মানুষের সংসার; কেবল হিন্দুর সংসার ব্রহ্মাণ্ডপতির সংসার। সকল মানুষই সকল সময়ে ক্ষুদ্র মানুষ; কেবল হিন্দুই প্রতি দিন প্রতি মুহুর্ত্ত বিরাট মানুষ। হিন্দুর **সংসারধর্ম্ম** বলিতেছে—কেবল হিন্দুই পৃথিবীতে ব্রহ্মাণ্ড-রূপী, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, ব্রহ্মাণ্ডগ্রাহী।

এখন জিজ্ঞাস্য ক্ষুদ্র গৃহের ভিতর, স্বল্পায়তন সংসার ক্ষেত্রের মধ্যে এ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সংসার কেন? এ কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, মনুষ্য বিশেষের সম্বন্ধে এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সংসারের কি অর্থ, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যের দুই প্রকার মনোবৃত্তি আছে। এক প্রকার মনোবৃত্তি মনুষ্যকে আপনার মধ্যে সম্বদ্ধ রাখে, আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দকেই আপনার প্রধান উদ্দেশ্য করে। এই প্রকার মনোবৃত্তি যেখানে বেশি স্ফূর্ত্তি পায়, সেখানে মানুষ আপনার ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্ম কিছুই লাভ করিতে পারে না, আপনার বাসনাদির দাসত্বেই চিরকাল ব্যাপৃত থাকে। আর এক প্রকার মনোবৃত্তি আছে, তাহার স্ফূর্ত্তি হইলে মানুষ ক্রমে আপনাকে ছাড়িয়া আপনার বাহিরে যাহা আছে, তাহাতে আসক্ত ও সম্প্রসারিত হইতে থাকে। এই প্রকারে মানুষ আপনাকে ছাড়িয়া সর্ব্বভূতে এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত হইলেই আপনার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীন হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীন হওয়াকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কেন না অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীন বা সম্প্রসারিত হওয়াকেই শাস্ত্রে ব্রহ্মে লীন হওয়া বলে। অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত থাকা ব্রহ্মের যেমন একটি লক্ষণ, মানুষ তেমনি আপনাকে ছাড়িয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত হইতে পারিলে ব্রহ্মের লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মের লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়াকেই হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি বা ব্রহ্মে লীন • হওয়া বলেন। হিন্দুর সংসারধর্ম্মে যে সকল কাজ প্রধান বলিয়া গণ্য, সে সকল কাজের উদ্দেশ্য আপনাকে ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের সেবা করা, অর্থাৎ আপনার স্বার্থ বা আপনিত্ব নষ্ট করিয়া আপনাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত করা। প্রতিদিন ভক্তিভাবে এবং একাগ্রতার সহিত সেই সকল কার্য্য করিলে মানুষ যেমন আপনাকে ছাড়িয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত হইতে পারেন, শুধু মুক্তিতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া বা মোক্ষভাব-মূলক কাব্য বা প্রবন্ধাদিপাঠ করিয়া তেমন হইতে পারেন না। আপনাকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত করা বিষম সাধনার কাজ। এক দিন দুই দিন, এক মাস দুই মাস, বা এক বৎসর দুই বৎসরের সাধনায় তাহা হইয়া উঠে না। জীবনের প্রারম্ভ হইতে প্রতিদিন বহু বৎসর ধরিয়া এই সাধনা করিলে তবে মানুষ আপনাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে

• ইউরোপীয়েরা ব্রহ্মেলীন হওয়ার Absorption in Brahma বলিয়া যে অর্থ করেন, তাহা ঠিক নয়—সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

সম্প্রসারিত করিতে সক্ষম হয়। এই জন্য হিন্দু তাঁহার সংসারধর্ম্মকে এই সাধনার ক্ষেত্র করিয়াছেন। এই জন্য হিন্দু প্রতিদিন আপনাকে ছাড়িয়া আপনাকে ভুলিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত হইতে শিক্ষা করেন। এই জন্য হিন্দুর ক্ষুদ্র গৃহের ভিতর স্বল্পায়তন সংসার ক্ষেত্রের মধ্যে এমন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সংসার পাতিয়াছেন। প্রতি দিন এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সংসারের কাজ না করিলে, মানুষ কেমন করিয়া অনন্তব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত হইবে? কেমন করিয়াই বা অনন্ত ব্রহ্মে লীন হইবে? এই রকম করিয়া ক্ষুদ্র স্ত্রী পুত্রের সংসারকে প্রতি দিন ব্রহ্মাণ্ডরূপী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডপতির সংসারে পরিণত করিলে, তবে মানুষ আপনাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত করিতে পারে বলিয়া, ভগবান মনু বলিয়াছেন যে—

এবং যঃ সর্ব্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্য মর্চ্চতি।
সগচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তি পথার্জ্জুনা॥ (৩ অ—৯৩)

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রতি দিন এই রূপে সকল প্রাণীকে বলি প্রদান করেন, তিনি অতি সরল আলোকময় পথ দ্বারা ব্রহ্মধামে গমন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়েন।

আপনাকে ছাড়িয়া সর্ব্বভূতে সম্প্রসারিত হও, বলিলেই মানুষ আপনাকে ছাড়িয়া সর্ব্বভূতে সম্প্রসারিত হইতে পারে না। বৎসরের মধ্যে একটা উৎসবের দিনে বা একটা মাতমাতির দিনে বা একটা পূজা পার্ব্বণের দিনে পাঁচ জন লোক খাওয়াইলে বা পাঁচজনের সঙ্গে কোলাকুলি বা করমর্দ্দন করিলে বা দশ বৎসর অন্তর একটা দুর্ভিক্ষে দশ মুটা অন্ন দান করিলে মানুষ আপনাকে ছাড়িয়া সর্ব্বভূতে সম্প্রসারিত হয় না। সে রকমে সম্প্রসারিত হওয়া যাবজ্জীবন ধরিয়া নিত্য সাধনার কাজ। এই সাধনার গুরুত্ব, মহত্ত্ব, এবং কঠিনতা বুঝিয়াই হিন্দু তাঁহার ক্ষুদ্র স্ত্রীপুত্রের সংসারকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডপতির সংসার করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দুর সংসারধর্ম্ম হিন্দুর মোক্ষ-সাধনার ক্ষেত্র। পৃথিবীর সকল মনুষ্যের মধ্যে কেবল হিন্দুই প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্ত মোক্ষ পথের পথিক, মোক্ষ, সাধনায় সংযত। হিন্দুর সংসারধর্ম্ম বা গৃহস্থাশ্রম এক মাত্র মোক্ষলাভার্থ—আপনাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত করিবার জন্য। অতএব সংসার ধর্ম্ম বা গৃহস্থাশ্রমের জন্য হিন্দুর যে সহ-ধর্ম্মিণী আবশ্যক সেও কেবল সেই জন্য। আর কোন কারণে নয়। চ.

——:০:——

বুদ্ধচরিত।

গোপার স্বপ্নদর্শন।

ছন্দক চারিদিন চারিবার উদ্যান-যাত্রার উদ্যোগ করিল, কিন্তু শাক্য সিংহ চারিদিনই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন, জগৎ অনিত্য অধ্রুব ও স্বপ্নতুল্য মিথ্যা। শেষ দিনই তাঁহার শেষ দিন— সংসার বাসের শেষ দিন—রাজভোগ ভোগের চরম দিন। সেই দিন হইতেই তিনি নির্জন-সেবী, ধ্যান-রত ও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির উপায় চিন্তায় অভিনিবিষ্ট। প্রবল নিষ্ক্রমণ-চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে; সেই জন্যই তিনি নিরন্তরই নির্জনে বসিয়া একাকী কি চিন্তা করেন, কেহ তাঁহার নিকট গমনে শক্ত হয় না।

ক্রমে রাজা, প্রজা, রাজপরিবার, সমস্ত লোকই আশঙ্কা সঙ্কুল হইয়া উঠিল; সকলেই নানা দুর্নিমিত্ত দেখিতে পাইল, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অন্ধের ন্যায়, বধিরের ন্যায়, পঙ্গুর ন্যায়, খঞ্জের ন্যায়, মূকের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় ও জড়ের ন্যায় হতচেতন হইতে লাগিল।

রাজা শুদ্ধোদন ভবিষ্য অনিষ্টের সূচক দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষ্য করিয়া কাতর হইলেন এবং শাক্যকুলের সমৃদ্ধি অচিরাৎ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে ভাবিয়া আপনাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন।

ললিত বিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে যে, শাক্যসিংহের সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে নিম্ন-লিখিত দুর্নিমিত্ত ও নগরের দুরবস্থা ঘটনা হইয়াছিল। যথা—

১। হংস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, শুক, সারিকা,—ইহারা রব পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং প্রাসাদ মস্তকে ও তোরণ প্রভৃতি স্থানে বসিত না।

২। কি ক্রূর জন্তু কি অক্রূর জন্তু সকলেই দুঃখিত দুর্ম্মনা ও চিন্তাকুল হইয়া অধোমুখে কাল-কর্ত্তন করিয়াছিল।

৩। সরোবরে ও পুষ্করিণীতে পদ্মফুল ফুটে নাই, যাহা ফুটিয়াছিল, তাহা ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

৪। বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, সমস্তই ঝরিয়া গিয়াছিল, আর পল্লবিত পুষ্পিত ও ফলিত হয় নাই।

৫। অকস্মাৎ গীত-গৃহ-স্থিত বীণা প্রভৃতি তন্ত্র-যন্ত্রের তন্ত্র (তার) সকল ছিন্ন হইতে লাগিল এবং বাজাইতে গেলে বাজিত না।

৬। ভেরী, মৃদঙ্গ, ইত্যাদি, চর্ম্মনদ্ধ বাদ্য যন্ত্র সকল বাজিত না, কেহ বাজাইতে গেলে ছিঁড়িয়া যাইত।

৭। সমস্ত নগর নিদ্রায় অভিভূত, মোহে আচ্ছন্ন, কর্ত্তব্য জ্ঞানে বঞ্চিত এবং সর্ব্বদা সুব্যাকুল।

৮। কাহার মনে—গান বাদ্য নৃত্যক্রীড়ার ও অন্যান্য আমোদের—ইচ্ছা হয় নাই।

৯। তদ্দর্শনে রাজা শুদ্ধোদন ভীত ত্রস্ত দীন ও অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া ঘোর দুর্নিমিত্ত দর্শনে অকূল বিপদ সমুদ্র অনুভব করিয়াছিলেন।

১০। সেই দিবস অর্দ্ধরাত্রের সময় শাক্য বধূ গোপা শাক্যসিংহের সহিত এক শয্যায় শয়ানা থাকিয়া ভয়জনক ত্রাসজনক কম্পজনক এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন।

"সর্ব্বেয়ং পৃথিবী প্রকম্পিত মভূৎ শৈলাসকূটাবতা।
বৃক্ষা মারুত ঈরিতাঃ ক্ষিতিপতি উৎপাট্য মূলোদ্ধৃতাঃ।
চন্দ্রা সূর্য্য ন ভাতু ভূমি পতিতৌ স জ্যোতিষাং লক্ষিতৌ।
কেশান দৃশি লূন দক্ষিণ ভুজে মুকুটঞ্চ বিধ্বংসিতং।
হস্তৌ ছিন্ন তথৈব ছিন্ন চরণো নগ্নাদৃশী আত্মনং।
মুক্তাহার তথৈব মেষ রমণীশ্ছন্না দৃশী আত্মনঃ।
শয়নস্যাদৃশি ছিন্ন পাদ চতুরো ধরণী তস্মিংস্বপী।
ছত্রে দণ্ড সুচিত্র শ্রীমরুচিরং ছিন্না দৃশী পার্থিবে।
সর্ব্বে আভরণা বিকীর্ণি পতিতা মুহুস্তিতে বারিনা।
ভর্ত্তুশ্চাভরনা সবস্ত্র মুকুটাং শয্যাং গতো ব্যাকুলা।
উল্কাং পশ্যতি নিষ্ক্রমন্তি নগরাৎ তমসাভিভূতং পুরং।
ছিন্নাজালিক মদৃশাতি সুপিনে রত নাগিকাং শোভনা।
মুক্তা হারু প্রলম্বমান পতিতা ক্ষুভিতো মহাসাগরো।
মেরুং পর্ব্বত রাজসদৃশি তদা স্থানাত্তু সংকম্পিতং।
এতানীদৃশ শাক্যকন্য সুপিনাং সুপিনান্তরে অদৃশি
দৃষ্ট্বা সা প্রতিবুদ্ধ ঘূর্ণ নয়না স্বং স্বামিনং মব্রবীৎ।
দেবা কিংম ভবিষ্যতে খলু ভণ্হ সুপিনান্তরাণী দৃশাং
ভ্রান্তা মে স্মৃতি নো চ পশ্যামি পুনঃ শোকার্দ্দিতংমে মনঃ।"

গোপা স্বপ্ন দেখিতেছেন—

গ্রাম নগর পর্ব্বত প্রভৃতির সহিত সমগ্রা পৃথিবী কাঁপিতেছে—প্রবল বায়ু বহমান হইয়া বৃক্ষকুল উৎক্ষিপ্ত করিতেছে—তাহারা সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূমি পতিত হইতেছে—আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহ প্রভাব নাই—নক্ষত্র সকল খসিয়া পড়িতেছে—দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আপনিই আপনার কেশ ছিন্ন করিয়াছেন—মুকুট বিধ্বস্ত করিয়াছেন—আপনার হস্ত পদ ছিন্ন হইয়া গেল—বস্ত্রহীনা বা নগ্না হইয়াছেন—মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—খট্টার পদ চতুষ্টয় নাই, ছিন্ন হইয়াছে—যেন ধরা শয়ন করিয়া আছেন। রাজার ছত্র দণ্ড চামর এ সকল ছিন্ন ভিন্ন ও ভূপতিত হইয়াছে। আপনার ও স্বামীর সুরুচির আভরণ সকল ইতস্ততো নিক্ষিপ্ত ও ভূপতিত হইয়াছে। রাজার রাজমুকুট নাই—ইহা দেখিয়া তিনি ব্যাকুলা হইয়াছেন। পরে দেখিলেন, নগর দ্বার দিয়া এক পিণ্ড নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—সমস্তপুরী ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইয়াছে—জালক সকল ছিন্ন—শোভন রত্নরাজি বিকীর্ণ—মুক্তাহার খসিয়া পড়িল—মহাসাগর উচ্ছ্বলিত হইতেছে—পর্ব্বতরাজ সুমেরু স্থানভ্রষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছে।"

শাক্য বধূ গোপা অর্দ্ধরাত্র সময়ে ঈদৃশ ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাচ্ছেদ হইল ; প্রতিবুদ্ধ হইয়া তিনি ভয়ে ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া স্বামীকে বলিতে লাগিলেন—"দেব! বলুন, শীঘ্র বলুন, আমার কি হইবে! আমি (কথিত প্রকার) এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, দেখিয়া জ্ঞান হারা হইয়াছি, কিছুই বুঝিতেছি না, আমার মন শোকে দুঃখে ও ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে!"

শুনিয়া বুদ্ধদেব শান্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—

"—ভব প্রমুদিতা পাপং ন তে বিদ্যতে।

যে সত্বাঃ কৃত পুন পূর্ব্ব চরিতো দ্রক্ষ্যন্তি স্বপ্না ইমে,

কোহন্যঃ পশ্য অনেক দুঃখ বিহিতঃ স্বপ্নান্তরাণীদৃশাং।"

গোপে! তোমার ভয় কি? তুমি যাহা দেখিয়াছ, ভয় হেতু নহে, প্রত্যুত পুণ্যহেতু। ভয় পরিত্যাগ কর, প্রমুদিত হও, তোমার কিছু মাত্র পাপ নাই। পূর্ব্বে যাহারা অনেক পুণ্য করিয়াছে তাহারাই ঐরূপ স্বপ্ন দেখে, পাপ মতির ঐরূপ স্বপ্ন হয় না। তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহার ভবিষ্য বলিতেছি, শুন—

তুমি যে পৃথিবীকে কাঁপিতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে দেব যক্ষ নাগ রাক্ষস এবং অন্যান্য সকল জীব তোমাকে অচিরাৎ পূজ্যা শ্রেষ্ঠা করিবে।

তুমি বৃক্ষ মূল উৎপতিত ও কেশপাশ ছিন্ন হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি শীঘ্রই ক্লেশ জাল ছিন্ন করিবে এবং দৃষ্টি জান (জ্ঞান) উদ্ধৃত করিবে।

তুমি যে চন্দ্র সূর্য্য নিষ্প্রভ ও জ্যোতিষ্ক জাল বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছ,তাহার ফলে তুমি শীঘ্রই ক্লেশ শত্রু বিনাশ করিয়া পূজ্যা ও প্রশংসনীয়া হইবে।

তুমি যে মুক্তাহার বিকীর্ণ আপনাকে নগ্ন হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি অচিরাৎ এই স্ত্রী কায়া পরিত্যাগ করিয়া পুরুষকায় (যাহা আত্মার স্বরূপ) লাভ করিবে।

তুমি যে মস্তক চরণ প্রভগ্ন ও ছত্র চামরাদির শীর্ণতা দর্শন করিয়াছ, তাহারই ফলে তুমি অবিলম্বে পাপ চতুষ্টয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে ত্রিলোক মধ্যে এক ছত্র হইতে দেখিবে।

তুমি আমার ভূষণাদি উন্মোচিত হইতে দেখিয়াছ, তাহারই ফলে তুমি আমাকে দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ ভূষিত ও লোকে পূজ্য হইতে দেখিবে।

গোপে! তুমি যে নগর হইতে সম্মিলিত কোটী দীপ নির্গত হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি দেখিবে, শীঘ্রই আমি লোকের মোহান্ধকার নষ্ট করিয়া প্রজ্ঞার আলোক বিস্তার করিব।

গোপে! তুমি দেখিয়াছ, আমার মুক্তাহার বিশীর্ণ হইয়াছে, স্বর্ণ সূত্র ছিন্ন হইয়াছে। আবার শীঘ্রই দেখিবে, ক্লেশ জাল বিধ্বস্ত করিয়া জ্ঞান সূত্রের উদ্ধার ও সংস্কার করিব।

"হর্ষং বিন্দা মাচ খেদং জনেহি
তুষ্টিং বিন্দা মঞ্জহী চ প্রীতিং
ক্ষিপ্রংভেষ্যে প্রীতি প্রামোদ্য লভতী
মেহি গোপে! ভদ্রকান্তে নিমিত্তাঃ॥"

গোপে! তুমি ভীত হইও না, আহ্লাদিতা হও। শোক করিও না, হর্ষ আহরণ কর। তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা দুর্নিমিত্ত নহে, সুনিমিত্ত। শীঘ্রই তুমি প্রীতি সুখে সুখিনী হইবে, পাপ জাল বিধ্বস্ত করিয়া আত্মোদ্ধরণে ক্ষমবতী হইবে।

ভগবান্ শাক্য সিংহ এই রূপে ভয়-ভীতা গোপাকে পরিসান্ত্বনা করিলেন। বুদ্ধিমতী গোপা বিশ্বস্ত চিত্তে পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং প্রমুদিত চিত্তে পুনর্নিদ্রাগতা হইলেন।

—:০:—

ব্রিটেনিয়া

সমীপে

ইণ্ডিয়া।

১

মহাকায় নীল-নিভ নীরধি উপরি,
নিরুপম বেদী এক কতই কৌশলে,
নির্ম্মাণ করেছে, বিধি অতি যত্ন করি,
ঝঞ্ঝা-বাতে নাহি,কাঁপে নাহি কভু টলে,
উত্তাল তরঙ্গে তার কণা নাহি গলে,
নিটোল অটল সদা ভীম বল ধরি॥

২

তদুপরি কোন দেবী বিরাট গৌরবে,
উদধি ঈশ্বরী সমা বসি রত্নাসনে,
বিরাজেন বীর দর্পে চমকিয়া সবে।
বসুধা বারিধি দোঁহে মিলিয়া যতনে,
সাজায়েছে চারু তনু, বিবিধ ভূষণে,
জমকে শোভিছে যাঁরা বিপুল বিভবে॥

৩

ভাসিছে রজত আভা বিমল বরণে,
অদূর সুদূর দেশ করি আলোকিত,
খেলিছে হর্ষের হাস্য বিকচ বদনে।
বিশাল মুকুট কিবা মস্তকে শোভিত,
সমুকুট শির কত চরণে লুণ্ঠিত,
জ্বলিছে প্রজ্জ্বল প্রভা বিলোল লোচনে॥

৪

ভীষণ সমর অস্ত্র এক হাতে ধরা,
জনগণে করে যাহা সন্ত্রাসিত ভয়ে,
ভবানীর করে যথা অসি ভয়ঙ্করা।
এ দিকে অপর হস্তে তুলাদণ্ড লয়ে,
মাপিছেন রত্নরাশি আনন্দিত হয়ে।
ক্ষত্রভাবে বৈশ্যভাব মূর্ত্তি চমৎকারা॥

৫

মহিমা মণ্ডলে দেবী বেষ্টিত হইয়া,
আছেন বসিয়া নিজ তেজ গরিমায়
পৃথ্বী-ব্যাপি প্রতাপের ছটা ছড়াইয়া।
প্রকাশে কতই দর্প ভাব ভঙ্গিমায়,
পারেন প্রলয় যেন করিতে হেলায়,
ভুবন বিখ্যাতা দেবী নাম ব্রিটেনিয়া॥

৬

প্রভূত প্রভুতা ইনি ধরায় বিস্তারি,
রাজ রাজেশ্বরীরূপে করেন বিহার ;
কোটি কোটি নরবৃন্দ করি আজ্ঞাকারী,
পেতেছেন মহারাজ্য অতি চমৎকার,
রাবণ প্রতাপ সম প্রতাপ ইহাঁর,
এঁর রাজ্যে অস্তগিত না হয় ধ্বান্তারি॥

৭

চারি দিকে দেখ এঁর কত রণ তরি,
সিন্ধুজা রাক্ষসী সম ভাসিছে সাগরে,
বজ্রনাদী বজ্র অস্ত্র বক্ষে কক্ষে ধরি।
এরি বলে ব্রিটেনিয়া অর্ণব উপরে
শত্রুকুল তুচ্ছ করি আনন্দে বিহরে,
জিমূত মণ্ডলে যথা বৃত্রাসুর অরি॥

৮

আসুক আর্মেডা গর্বে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে,
যুড়িয়া যোজন অর্দ্ধ নীরধির নীর,
'অজেয়' উপাধি ধরি ঘোর অহংকারে,
দেখাক্ যতই ভয় বোনাপার্ট বীর
সমর অনলে করি য়ুরোপ অধীর,
ব্রিটেনিয়া নাহি টলে, নাহিডরে কারে॥

২৭

সস্নেহ মধুর বাণী শুনি বিদেশিনী,
গদ গদ স্বরে বলে করিয়া বিনয় ;—
সত্য বটে আমি দেবি, সেই অভাগিনী,
বিদেশে ইণ্ডিয়া নামে যার পরিচয়,
স্বদেশে ভারত-ভূমি যারে সবে কয়,
অধুনা হয়েছে যেই তোমার অধিনী ॥

২৮

বসি তব পরাক্রমে তরুর তলায়,
তব নাম জপি, আর তব গুণ গাই,
অবিরত থাকি রত তব অর্চনায়।
যখন যা আজ্ঞা কর করি আমি তাই,
কিঙ্করী কর্ত্তব্য কার্য্যে কভু হেলা নাই,
সঁপিয়াছি তনুমন তোমার সেবায় ॥

২৯

তোমারে তুষিতে যদি নিজে কষ্ট পাই,
যদি কভু হয় ত্যাগ করিতে স্বীকার,
তাহাতেও কভু মম বাধা দ্বিধা নাই ;
সদাই প্রস্তুত আছি, রক্ত আপনার
প্রদানি, করিতে রক্ষা গৌরব তোমার,
তাড়াইয়া দিতে তব আলাই বালাই ॥

ক্রমশ।

বিষম বাজার।

বা

সম্মার্জনী মেলা।

ইংরেজের কল্যাণে,—আর কল্যাণেই বা কেন বলি,—ইংরেজের কৃপায় আমরা কত কি না দেখিলাম, আর কত কি না দেখিব! রাজ্যে দেখিলাম—ভূমি শূন্য রাজা, জমি শূন্য প্রজা। কার্য্যে দেখিলাম—যিনি কাপুরুষ, তিনি বাহাদুর ; যিনি সা-পুরুষ, তিনি দূর, দূর। রাজায় দেখিলাম—বিচার বিক্রয়, শাসন বিক্রয়, শান্তি বিক্রয় ; দান—কেবল আধি ব্যাধি, উপাধি আর সমাধি। নগরে দেখিলাম সমর-হীনা কুলনারী, আর ধর্ম্মহীনা পাদরি। দেশে দেখিলাম—যবন হিন্দুর সমাজ সংস্কারক, আর হিন্দু হিন্দুর সর্ব্বনাশক। ভারতে দেখিলাম—জলে বাষ্প-বোট—স্থলে রেল-রোড, সিন্ধুকে ব্যাঙ্ক নোট—আর সর্ব্বত্র অনবরত হরির লুট। সভায় দেখিলাম—দেশভক্ত রিজোলিউশন করে, রাজভক্ত সটিফিকেট জারি করে, আর প্রজাভক্ত প্রজার রক্ত শোষণ করে। সহরে দেখিলাম—নাস্তিকতায় তত্ত্বজ্ঞানী, ধর্ম্ম কথায় বিজ্ঞানী, অনাচারে ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ব্যবসাদারিতে হিন্দুয়ানি। ভিতরে দেখিলাম—সধবার নিগ্রহ, বিধবার আগ্রহ, আর বহুধবার শুভগ্রহ। বাহিরে দেখিলাম—আল্‌তা পায়ে জুতার চটক, বুড়া নাকে

নোলক দোলক, বড়ির উপর বড়ি, আর বগির উপর জগদ্ধাত্রী। সহরের হাটে দেখিলাম—উশনায় গুঁড়ি, আতপে খড়ি,—দুধে জল, ঘিয়ে বাতি,—লবণে হাড়, বসনে মাড়—সন্দেশে ময়দা, বারুদে কায়দা। গড়ের মাঠে দেখিলাম হাতীর লীলা, ঘোঁড়ার খেলা, আর লোকের রেলা। ওদিকে ব্যাপারটা কি? একজন মুসলমান বলিল,—ঝাঁটার মেলা।—

সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম—বৃহৎ তোরণের উপর ঢল ঢল লাল কাপড়ে বড় বড় স্বর্ণাক্ষরে ছাপা আছে—

BESOM BAZAR

বিষম বাজার।

বুঝিতে পারিলাম না। তোরণের একপার্শ্বে, ভূমি হইতে তিন হাত উর্দ্ধে একটি ছোট গবাক্ষ দ্বার দিয়া, একটি ফুট্‌ফুটে ক্ষুদে বিবি, মাজেণ্টি ঠোঁটে উঁকি মারিতেছে। আমায় কিছু বিস্মিত দেখিয়া—তিনি ইংরাজিতে বলিলেন, "বাবু ভিতরে আসিলেই বুঝিতে পারিবেন। আসুন।" আমি একটু কুণ্ঠিত অথচ প্রফুল্লভাবে বলিলাম—আপনি কৃশাঙ্গী বরং এই ঘুল্‌ঘুলি দিয়া বাহিরে আসিতে পারেন, আমার এই দেহ লইয়া এই পথে আপনার নিকট যাওয়া অসম্ভব। "রমণী কোন কিছু না বলিয়া, ছোট হাতখানি গবাক্ষ দিয়া আমার নিকট ধরিয়া বলিলেন "টাকা।" আমিও অমনই কলের পুতুলের মত বুকের জেব্‌ হইতে একটি টাকা তাঁহাকে দিলাম। মনে মনে বলিলাম 'শুভমস্তু।' রমণী তৎক্ষণাৎ একটি শাদা ক্ষুদ্র কুঁচি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন—"ঐ সাহেবের গালে ইহার বাড়ি মারিলেই তিনি আপনাকে ভিতরে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিবেন।" বলিয়া—'সম্বন্ধ দক্ষিণাবধি' এই কথা বুঝাইবার জন্যই যেন আমার প্রতি বিমুখী হইলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট সাহেবের দিকে চাহিলাম। দেখি—বিবি যেমন ফুট্‌ফুটে,—ছিপ্‌ছিপে, সাহেব তেমনই বিরাট বীভৎস। দুটা কামানের উপর একটা ঢাকাই জালা, তার উপর একখানা জীয়ন্ত মুখস্। সাহেব হাঁসিতেছেন, কি হাই তুলিতেছেন, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পাশে রাস্তার দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, আমি সহস্র চক্ষুর লক্ষ্য হইয়াছি। হতস্থিত শ্বেত কুঁচিটি আর একবার দেখিলাম। বুঝিলাম সেটি হাতীর দাঁতের কুঁচিকাটি—অতি পরিপাটী। ধরিবার হাতলে

Besma = Besem = Besom = Broom.

বিষমা, বিষেম, বিষম, ব্রূম।

তখন সেই যে বৃদ্ধ মুসলমান বলিয়াছিল, ঝাঁটার মেলা,—সেই কথা মনে পড়িল। রাক্ষস সাহেবের গালে বিলাতী ঝাঁটা মারিতে হইবে,—ভাবনা হইল। আবার পার্শ্বের দিকে চাহিলাম—তখনও সকলে আমাকে সেই ভাবে দেখিতেছে। আস্তে আস্তে সাহেবের দিকে অগ্রসর হইলাম। আস্তে আস্তে সাহেবের গালে ঝাঁটা মারিলাম—সাহেব বলিলেন 'এক'। আবার মারিলাম—সাহেব বলিলেন 'দুই' পুনরায় মারিতেই, সাহেব 'তিন' বলিয়া আমার হস্ত হইতে কুঁচিকাটিটি গ্রহণ করিলেন। একটা কাটা দরজা কট্ কট্ রবে খুলিয়া গেল। আমি মেলার ভবনে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমে কতক গুলি নারিকেল, তাল জাতীয় বৃক্ষ,—নল খাগড়ার বন, বেণা, কেশের ঝাড়—ঝাঁটির ঝোপ, বড় বড় ঘাসের কেয়ারি। স্থানটি অতি পরিপাটি করিয়া সাজান। সারি সারি সুপারি গাছ থামের ছড়ের মত বসাইয়াছে, পাতায় পাতায় বিনাইয়া দিয়া খিলান করিয়া দিয়াছে; দুপাশে দূরে আবার নারিকেল, তাল, সাগু গাছের সারি বসাইয়াছে; মাঝে মাঝে বেতের কুঞ্জ, শরের গুচ্ছ; আর নানা বর্ণের ঝাঁটি ফুল চারি দিকে রাশি রাশি ফুটিয়া আছে। এক জন বাবু আপন মনে বলিয়া গেলেন—"এইত ঝাঁটার সূতিকাগার।" কথাটা শুনিয়াই আমার মনে হইল, তবেত ঝাঁটার অদৃষ্ট আমাদের চেয়ে ভাল। আমাদের সূতিকাগারের কথা ভাবিলে মনে হয় আমরা নিতান্ত দৈবী শক্তিতেই বাঁচিয়া আছি।

ক্রমে অগ্রসর হইলাম। একটি সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে উপনীত; ঝাঁটা, ঝাঁটা, ঝাঁটা। চারি দিকেই ঝাঁটা, কোঁচকা, কুঁচি, বাড়ন, ব্রুস্ ও ব্রূম্। থামে ঝাঁটা, দেওয়ালে ঝাঁটা, খিলানে ঝাঁটা। যে বড় বড় দাণ্ডি লাগান ব্রুস্ দিয়া কলিকাতার সদর রাস্তার পাশ গুলা ধুইয়া দেয়, তাহাই দেওয়ালে সাজাইয়া কারিগরি করিয়াছে। ঝাঁটা সাজাইয়া বর্ণ মালা করিয়াছে, খড়কের কোঁচকা গুলা মাকড়সার মত করিয়া বাঁধিয়া বাহার করিয়াছে। সম্মুখে সমগ্র পশ্চিম দিকের দেওয়াল জুড়িয়া এক খানি বিচিত্র চিত্র পট। সেই দিকটা একটু অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। চিত্রপটে সুনীলপটে ছোট বড় তারকা গুলি জ্বলিতেছে আর সেই বিচিত্রপটের নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত কোণাকুণি একটি সুবৃহৎ ধূমকেতু ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে। পটের উপরে লেখা আছে—'স্বর্গীয় সমার্জ্জনী।' তখন, ঠাকুমা আমাকে ছেলে বেলা যাহা বলিয়াছিলেন,

তাহা মনে পড়িল; বলিতেন, "ঐ যোমের ঝাঁটা উঠিয়াছে রে! কোন দেশের লোককে এবার ঝাঁটিয়ে লয়ে যাবে। প্রণাম কর।" তখন প্রণাম করিতাম। এখনও এই অপূর্ব্ব চিত্র পট দেখিয়া স্বর্গের ঝাঁটা-ধারীকে মনে মনে প্রণাম করিলাম। তাহার পর নানাবিধ সম্মার্জনী দেখিতে লাগিলাম।

প্রথমেই কতক গুলি রাজনৈতিক ঝাঁটা; তাহার সর্ব্ব প্রথমে রেসিডেণ্টী সম্মার্জনী। একটু বাঁকাভাবে ওঁচান আছে; নীচে কেবল লেখা আছে;—"Beware of the Engine" গাড়ী যাতায়াত করে, সাবধান!!!" সেই স্থলে আর একটি সম্মার্জনী দেখিলাম। উপরে নাম দেওয়া আছে 'কাশ্মীরী।' কাশ্মীরী খেম্‌টাই জানিতাম—এই বার কাশ্মীরী ঝাঁটা দেখিতে বড়ই কৌতূহল হইল। হাতে তুলিয়া পরীক্ষা করিলাম, সেটি ঝাঁটি শাখার ঝাঁটা; কিন্তু শালের হাঁসিয়া দিয়া বাঁধা। নীচে লেখা আছে—'বাঙ্গালি বিচালনে অনন্ত শক্তি।'

এই স্থলে এক গাছি সম্মার্জ্জনী রহিয়াছে তাহার নাম 'করময়ী।' তাহাতে সহস্র শিখা; রথ কর, পথ কর, আয় কর, ব্যয় কর, বিচারের কর, অত্যাচারের কর, শাসন কর, শোষণ কর, লবণ কর, জল কর, বায়ু কর, জীবন কর; নানাবিধ কর-শিখা অমনই খর খর করিতেছে। নীচে লেখা আছে "ইহাতে ধূলি গুঁড়ি কিছু এড়াইতে পারে না।"

এক গাছির নাম 'দণ্ড শাসনী।' তাহার কাটি গুলি শাদা শাদা; কিন্তু গোড়ায় লাল; যেন রক্ত মাখান। পরিচয় স্বরূপ লেখা আছে,—

তদ্বিরে মিলিবে মুক্তি, তর্কে বহুদূর,
বেতদ্বিরে শ্রীনিবাস বুঝিবে চতুর।

'সিবিল সর্ব্বিস্ সম্মার্জ্জনীর' শলাগুলা কেবল কাঁটায় পূরা। কোনটি বয়সের কাঁটা, কোনটি ভাষার কাঁটা, কোথাও জাহাজের কাঁটা, কোথাও বনের কাঁটা, কেবল কাঁটা; পরিচয় আছে,—

কণ্টকে গঠিল বিধি সর্ব্বিস উত্তমে।
অকূল রাখিল তারে, বুঝিয়া মরমে॥

তাহার পর কতক গুলি ঔপনাসিক ঝাঁটা।

ঐ স্থলে ঝাঁটাগুলি মূর্ত্তি-মন্ত করিয়া রাখিয়াছে। আর দলে দলে বাঙ্গালি বাবুরা আশে পাশে ঘুরিতেছেন। দুপাশে বনাতের পর্দ্দা দেওয়া, সুমুখ খোলা, এক একটি কুঠারীর মত; তাহারই মধ্যে এক এক রূপ সম্মার্জনী লীলা। একটি প্রকোষ্ঠে, এক জন এক হারা ছোক্‌রা পায়ে পম্প চটি,

মাথায় নেয়াপাতি সিঁথি ; গায়ে এক খানি লুই, পৈতার মতন ভাবে এড়ো করিয়া দেওয়া ; বাঁকা হয়ে পীঠ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; আর পার্শ্বে একটি কালো কোলো—বৈষ্ণবের মেয়ে—কপালে উল্‌কি, কাণে দুল, পরণে কস্তাপেড়ে সাড়ী, গায়ে কাঁচুলি, শুকনো গোবর গোলা মাথা এক গাছ মুড়ো ঝাঁটা হাতে, সেই প্রস্তুত পীঠের উপর লক্ষ্য করিয়া আছে। উপরে লেখা আছে, 'দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া।' নীচে লেখা আছে—"প্রেম নানা প্রকার"।

আমি একমনে গিরিজায়ার সম্মার্জনী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি,—এমন সময় আশ পাশ দিয়া কয়জন থিয়েটরের বাবু হঠাৎ আমাকে "মহাশয় যে" বলিয়া নমস্কার করিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম, বিলম্বে প্রতি নমস্কার করিলাম, বলিলাম—"এই দেখিতেছি।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিতেছেন?" আমি বলিলাম "দিগ্বিজয় কিছু হালি ধরণের হইয়াছে।" দিগ্বিজয় আপনিই বলিয়া উঠিল "নহিলে মহাশয় এ মুড়ো ঝাঁটা পীঠ পাতিয়া আর কেহ কি লইতে পারে?" গিরিজায়া হাসিয়া উঠিল, আমি বিরক্ত হইয়া একটু সরিয়া গেলাম।

দেখি—'জলধর জগদম্বা।' জগদম্বা সোণার কঙ্কণ হাতে দিয়া একখানি মট্‌রা চেলী ঘোড়বেড় করিয়া পরিয়া এক বিরাট সম্মার্জনী হস্তে দণ্ডায়মান। সম্মার্জনীতে বড় টিকিট লাগান আছে—"লম্পট দমনী।" জলধর ছিলেন, আমি আসিবার পূর্ব্বেই কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ (বোধ হইল সকলেই বাঙ্গালি) তাঁহাকে খুঁজিতে ও ডাকিতে লাগিলেন।

এক প্রকোষ্ঠে—রৈবতকের সুলোচনার সম্মার্জনী। সুলোচনা সুভদ্রার সহচরী। হাতে তাড়, বাজুবন্দ, কাণে সোণার মুচকুন্দ ; একখানা পাচ রঙ্গা সাড়ী সুমুখটা ঘাঘরার মত করিয়া খানিক গোঁজা ; আর খানিকটা ; বুকের ফতুয়ার উপর দিয়া ঘাড় বেড়িয়া কোমরে জড়ান ; তাহার উপর নীল রেশমি ওড়না। গড়ন খানি মাটো মাটো ; নাক টীকল, মুখখানি ছাঁচি পানের মত ; কথা কহিলে, জিহ্বাটি টং টং করিয়া বাজিতে থাকে। পশ্চাতের লাল পরদায় শ্বেত অক্ষরে এই পদ্য টুকু অঙ্কিত আছে ;—

কৃষ্ণ। গালি দিস্, বিষমুখি, টানি বজ্র জিহ্বা তোর,
সাজাইব অনার্যের কালী।

সুলোচনা। বোকা পুরুষের বুকে নাচি তবে মনসুখে,
রণরঙ্গে দিয়া করতালি।
ব্রহ্মাস্ত্র জিহ্বায় ধরি, বরুণাস্ত্র নেত্র কোণে
করে বজ্র ধরি ভীমা ঝাঁটা,
এরূপে দুর্য্যোধনের দেখি পৃষ্ঠ পরিসর,
ইচ্ছাকরে দেখি বুক পাটা।

[শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত রৈবতক ২৭২ পৃষ্ঠা।]

সুলোচনার হস্তে সম্মার্জনী। হাঁ ঝাঁটা বটে! বেণা গাছের ঝাঁটা; বেণার শিকড়গুলি পাকাইয়া একটি ছোট খোঁপার মত ঝাঁটার গোড়া করিয়াছে। তাহার সুগন্ধ বাহির হইতেছে। হলে কি হয়? উপরের শলা গুলি এক একটি যেন বাঘছপ্‌টি! অমনই লক্ লক্ করিতেছে। মনে করিলাম, ইহারই এক গাছি পাই, বড় বৌয়ের হাতে দিয়ে শম্ভু দাদার রাত্রিবেলা ক্লবে যাওয়া ঘুচাই।

একটি কুঠরিতে, মধ্যে একটি পুরুষ জোড়পদে, নিশ্চলভাবে, দুই হস্ত সমান ভাবে প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান দুগাছা ঝাঁটা বেক্স্রর দুপাশ হইতে ওঁচান রহিয়াছে, সম্মার্জনী দুই গাছির অধিকারিণীদের মূর্ত্তি নাই। নিম্নে লেখা আছে—"চোর নিবারণী দুই সতিনী সম্মার্জনী।" পার্শ্বে এক কোণে, কালি ঝুলি মাখা, টেনাপরা, একটা লোক যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। আমি নিকটস্থ হইবামাত্র সম্মার্জনী মধ্যস্থ বাবু মুখ না বাঁকাইয়া, না হেলিয়া দুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ চোর চোর"। লোকটা কোণ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া করযোড়ে বলিল "প্রভু আমি চোর, উনি সাধু"!!

কিছু দূরে, এক গাছি বড় উলুর ঝাড়ন। ঝাড়নের গোড়ায় পরিষ্কার করিয়া উলু বিনাইয়া বেশ একখানি সুন্দর মুখ গড়িয়াছে। তাহাতে চক্ষু ভ্রূ আঁকিয়াছে; নাকে একটি ক্ষুদ্র মুক্তার নোলক দিয়াছে। কিন্তু মাথার উপর লিখে দিয়াছে—"উপরে নীচে দেখিয়া কার্য্য করিবে"।

একদিকে কতকগুলি প্রকোষ্ঠে ঐতিহাসিক ব্যাপার। দুইগাছি তাহার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ; লোকে দেখিছে, পড়িছে, হাসিছে, কত কি বলিছে। একগাছির নাম 'দরিয়ার নারিকেলী বা সাগরী সম্মার্জনী"।— আর গাছির নাম "নদিয়ার নারিকেলি বা নাগরী সম্মার্জনী"।

সাগরী সম্মার্জনীর কিছুই বৈশেষিকত্ব দেখিলাম না। এই সাধারণ—ঘর কন্নার ঝাঁটাই বটে। বার-ফট্‌কা পুরুষগুলার অদৃষ্টে বা পৃষ্ঠে

ঐরূপই ঘটে ;—তবে এবার আধারের গুণে আধেয়ের কিছু অধিক গৌরব হইয়াছে। গৃহ মধ্যে কেবল ঝাঁটাই বিরাজমানা—পৃষ্ঠপাতক কেহই নাই। তবে পরদার উপর পূর্ব্ব মত কয়েক পংক্তি গদ্য চিত্রিত আছে ;—

"আমার স্ত্রী কোন ক্রমেই নির্ব্বোধ নহেন, বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও সাধু-শীলা। কিন্তু তাঁহার একটি বিষম দোষ আছে ; আমার বাটীতে আসিতে বিলম্ব হইলে, তিনি নিতান্ত অস্থির ও উন্মত্তপ্রায় হন, এবং মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়া অকারণে—আমার সঙ্গে কলহ উপস্থিত করেন"। আর কি করেন, তা ইনিই জানেন।—সম্মার্জনী সংগ্রাহক।

[ভ্রান্তিবিলাস, উপাখ্যান ভাল—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত।]

নদীয়ার নারিকেলি বা নাগরী সম্মার্জনীও সাধারণ ধরণের। তবে শুনিলাম, এবার আধারের গুণে নহে ধারিণীর গৌরবে সম্মার্জনী গৌরবান্বিতা।

এমন ঐতিহাসিকী সম্মার্জনী—বাঁকা, টেরা, ঝুলান, দোলান যে কত রহিয়াছে, তাহা গণিতে পারিলাম না—বিশেষ কৌতূহলও হইল না।

সংস্কারণী সম্মার্জনী মধ্যে সুরাবারিণী অনেকের লক্ষ্য হইয়াছে। কাটিগুলি বেউড় বাঁশের শলা—তবে আগা-গোড়া ক্লোরাইড্ মাখান। বড় দুর্গন্ধ। মনে করিলাম ঝাঁটাতেও হোমিওপ্যাথি আছে নাকি—Like cures like ?

'সভা নিবারণী' ও 'বক্তৃতা বারিণী' সম্মার্জনী উভয়েই নূতন আবিস্কৃত। যুবতীরা স্বয়ং ক্রয় করিলে অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন, বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। মনে করিলাম, এখন অর্দ্ধমূল্য, পরে অবশ্য উপহার হইবে ; সেই সময়ে কোন আত্মীয়াকে সঙ্গে আনিতে পারিলে, চলিবে। তবে বিশেষ আত্মীয়াকে আনা হইবে না—কাজ কি, শেষে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিব কি ?

তাহার পর 'মূল দোষ নিবারিণী" অনেক প্রকার সম্মার্জনী দেখিলাম। মূলের মধ্যে নানা প্রকার আলুই বেশী। কিন্তু আর ঘুরিতেও পারিলাম না। পরদার চিহ্নিত গদ্য পংক্তি কয়টি মনে পড়িতে লাগিল। দ্বার দেশের বিরাট সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ক্ষুদে বিবিকে আর দেখিতে পাইলাম না।